বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫
চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৯৪

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রী নির্মল মিত্র কর্তৃক দি ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯৩এ লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	...	বাণী রায়	৵৹
দুই বাড়ী	...	...	১
মুখোশ ও মুখশ্রী			
মুখোশ ও মুখশ্রী	...	...	১১১
রামু হাড়ি	...	...	১১৮
দৈব ঔষধ	...	...	১২৯
বারিক অপেরা পার্টি	...	...	১৩৬
উডুম্বর	...	...	১৪৪
মাছ চুরি	...	...	১৫১
নেলাড়ি	...	...	১৫৬
কলহান্তরিতা	...	...	১৬৪
উল্টোরথ	...	...	১৬৮
মুক্তপুরুষ হরিদাস	...	...	১৭৪
অন্তর্জলি	...	...	১৮২
বোতাম	...	...	১৯৫
খোলস্	...	...	২০৯
চৌধুরাণী	...	...	২১৮
নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব			
আচার্য কৃপালনী কলোনী	...	...	২৩৩
নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব	...	...	২৩৯
বড়ো বাগদিনী	...	...	২৪৮
প্রভাতী	...	...	২৫২
সাহারা	...	...	২৫৪
গিরিবালা	...	...	২৫৮
চিঠি	...	...	২৬৮
মড়িঘাটের মেলা	...	...	২৭২
হাজারি খুঁড়ির টাকা	...	...	২৭৯
প্রত্যাবর্তন	...	...	২৮৮
পড়ে পাওয়া	...	...	২৯৩
আমার ছাত্র	...	...	২৯৮
অনুসন্ধান			
অনুসন্ধান	...	...	৩১১
টান	...	...	৩৩০
চ্যালারাম	...	...	৩৩৫
যাচাই	...	...	৩৪০
পত্রাবলী	...	...	৩৫১

ভূমিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে প্রমাদ হয় আমার—স্মৃতি। বিভূতিভূষণের সহাস্য প্রোজ্জ্বল মুখ, কৌতুকদীপ্ত চোখ, প্রাণখোলা হাসি আমাকে ঘেরা করে : অবশেষে এই লেখা হচ্ছে ? কত কথা বলেছিলাম কতদিন, কিছুই বিধৃত করে একত্রে আমার সাহিত্য-সম্পর্কে গ্রথিত করে;উত্তরসূরীর হাতে দেওয়া গেল না ?

অল্প বয়সে গুরুজনের অবারিত সান্নিধ্য পেলে সেই পরিচয়-পরিধির প্রয়োজনীয় অংশে বিশেষ মূল্য আরোপ করা হয়ে ওঠে না। অকালমৃত্যু অতি-পরিচিত জনকে জীবনের অন্যতীরে নিয়ে যেতে পারে অকস্মাৎ, একথা কল্পনা করা যায় না। তাই হারিয়ে ফেলেছি অনেক কথা, যেগুলি আজ হয়তো তাঁর রচনায় নূতন আলোকপাত করতে পারত, গতানুগতিক ভূমিকা হত না অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস।

এই ভূমিকাকারের ভাগ্যে বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাসের একটিও পড়েনি। প্রকাশনার অনিবার্য্য প্রয়োজনে শেষের দিকের বিন্যাসে দশম খণ্ডে যে কয়েকটি বই পড়েছে তাই মাত্র।

'পথের পাঁচালী' আমার শৈশবের স্বপ্ন ছিল, গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'র বিষয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে রোমা রোলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিস্টোফ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ('**Dawn & Morning**') মিল খুঁজে পেয়েছি। 'পথের দেবতা' '**God of the Way**' হয়ে এক ভাবেই হেসেছেন।) কিন্তু কি বিচিত্র পার্থক্যে বাংলার মাটি-জলকে অভিনব রূপ দিয়ে, তাকে অতিক্রম করে দূর দিগন্তে লেখকের যাত্রা। বাস্তবের 'নিশ্চিন্দিপুর' আমাদের কল্পনায় ব্যারির '**Never Never Land**' হয়ে চিরদিন, চিররাত্রির মানসিক আশ্রয়। আর 'অপরাজিত'তে অপরাজিত জীবনরহস্য মানবিকসত্তার ভ্রমণ।

'ইছামতী' রচনার প্রথম পরিকল্পনা ঘাটশীলার বারান্দায় বসে তিনি আমাকে বলেছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বের প্রতিরূপ পেয়েছিলাম 'আরণ্যকে'। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র অপার্থিব অভীপ্সা, 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারীঠাকুরের মধ্য দিয়ে, সাধারণ পেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের বিজয়—'অন্তর্বর্তনে' অন্তর্দর্শন—এগুলি বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। লেখার ভার নিয়েছেন আমার চেয়ে বহুলাংশে যোগ্যতর সমালোচকেরা। তবু একবার স্মরণ না করে পারলাম না।

বিভূতিভূষণের রচনাশৈলী বিশ্লেষণ করলে হাতে কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়—প্রকৃতিপ্রেম, পর্য্যবেক্ষণ, কবিত্ব, সারল্য, আন্তরিকতা) ইত্যাদি। সঙ্গে আরও একটি উপাদান অতি প্রকট, মৌলিকতা। বাংলাসাহিত্য যখন নগরাশ্রয়ী অবচেতনমানস ও বিদেশী সাহিত্যের দক্ষিণবাতাসে পুষ্পশ্রী, তখন একমুহূর্ত্তে বিভূতিভূষণ সমগ্র সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। 'উপেক্ষিতা' গল্পটি (প্রথম প্রকাশ ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) পরিহার করেও অনায়াসে আমরা বিভূতিভূষণের সাহিত্যকীর্ত্তি 'পথের পাঁচালী' থেকে ধরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'বিচিত্রা' মাসিকের পাতায় চলে আসি। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির কথা এসূত্রে মনে

পড়ে। বারনার্ড শ বলেছেন : "Value is a matter of comparison", সুতরাং উৎকর্ষ বিচারে অন্য উপমেয়ের কথা স্বতঃই উপস্থাপিত।

'প্রাগৈতিহাসিক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' রূপে 'পূর্ব্বাশা' মাসিকের পৃষ্ঠায় (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ)। বিভূতিভূষণ দক্ষিণ বাংলার রূপকার, মানিক পূর্ব্ব বাংলার। সৃজনধর্মে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইজন।

'পদ্মানদীর মাঝি'র জগৎ আচ্ছন্ন করে বেজে উঠল একটি বিষাদের সুর, একটি রূঢ় জীবনদর্শন। পল্লীগ্রামের শ্যাম লতাগুল্মের অন্তরালে শুধু যে স্নেহ নিঃসৃত হয় না এমন উপলব্ধি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' পেয়েছিলাম। আরও অনেক অগ্রসর হয়ে এলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থনৈতিক সমস্যার স্বীকৃতির সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির অকপট স্বীকৃতি ও ফলে জীবনের বিকৃতি—মানিকের প্রথম যুগের সাহিত্যের উপজীব্য এই।

তির্য্যক দৃষ্টির রাজনীতি শেষযুগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ঘোরতর আদর্শবাদী ছিলেন তিনি সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে। যা সত্য, তা যত বিকৃত হোক না কেন তিনি সন্ধান করবেন। জীবনে তিলমাত্র মমতাবোধ তিনি রাখেন নি। পদ্মার চরে—"ক্ষুধ তৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতার পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।"

আর বিভূতিভূষণের চির আনন্দময় দেবতা অনন্তশয়নে নয়, তৃণপুষ্পশয়নে নিদ্রিত নারায়ণ। দিনপঞ্জীগুলির পাতায়, 'দেবযানে'র সমাপ্তি-অংশে অতি প্রকট, প্রায়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দেবতার। এই প্রায়-পৌরাণিক প্রত্যক্ষ দেবমূর্ত্তি আবার সর্ব্ববিশ্বে ব্রহ্মভাবে ব্যাপ্ত হয়ে প্রচ্ছন্ন প্রভাবে স্রষ্টার জগৎকে আনন্দময় করে তুলেছেন।

—"সকালে অপূর্ব্ব আনন্দ এল মনে।······মনে হ'ল এই অজস্র কাকলিপূর্ণ প্রভাতের স্নিগ্ধতায় ব্রহ্মা বিরাজ করেন—জলে, স্থলে, উর্দ্ধে, অধে, দক্ষিণে, উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে। যেখানে তিনি—সেখানে সব সুন্দর, রসঘন। তাঁর বাইরে কি আছে?"

(বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি—'কথাসাহিত্য' কার্ত্তিক ১৩৭৮)।

তবে তো সারা পৃথিবী আনন্দধ্বনি, বসুধা কুটুম্ব। আনন্দময় পৃথিবীকে কাছে পাবার জন্য তিনি গতি চাইলেন।

আমার 'তৃণাঙ্কুরে'র কপিখানায় বিভূতিভূষণের স্বহস্তে লেখা আছে :—

"শ্রীবাণী রায়ের প্রতি।

গতিই জীবন। মাটির সঙ্গে যোগ রেখে চলে যে জীবনধারা, ভূমার শান্তি ও উদারতায় পূর্ণ সেই জীবনের ছন্দকে মনে মনে চিরকাল শ্রদ্ধা করে এসেচি। তবে শুধু শ্রদ্ধা করলেই তার অধিকারী হওয়া যায় না—তার জন্যে চাই সাধনা, চাই ত্যাগ—সেটাই সবচেয়ে শক্ত ব্যাপার।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০।"

জীবনে যদি আনন্দ ও গতি থাকে তবে কি চাই?

সারা জীবন বিভূতিভূষণ নানা ভাবে পর্যটন করেছেন। 'অভিযাত্রিকে' পায়ে হেঁটে অথবা কাছের শহরতলী বা গ্রামে যেয়ে সে মনের শান্তি দেখা যায়। ভ্রমণকাহিনী পাঠেও বা ভ্রমণের গল্প বলায় তাঁর আসক্তি লক্ষণীয়। 'পথের পাঁচালী'র পথের দেবতা অপুকে শুধু পথিক করেন নি, অন্যান্য গ্রন্থের বহু চরিত্রেও প্রসাদ রেখেছেন। ছোটগল্প 'ডাকগাড়ী'র রাধাও তাই ডোবার ধার ছেড়ে একটু কোথাও বেড়িয়ে আসতে চায় ও ডাকগাড়ী গতির প্রতীক হয়ে তাকে আনন্দ দেয় ('জন্ম ও মৃত্যু')। বিনা কারণে 'সিঁদুরচরণ' বাহাদুরপুরে যায় ঘুরে আসতে (সিঁদুরচরণ—'নবাগত')। 'বিপিনের সংসারে' বিপিন ভ্রাম্যমাণ, 'কেদাররাজা'র কন্যা শরৎ দেশ বিদেশে যায়। 'আরণ্যক' এক অপূর্ব্ব বনভ্রমণের 'সাগা'। 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারীঠাকুর গ্রাম-গ্রামান্তরে বিচরণের পরে বোম্বে যায়। এরকম বহু দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র বিভূতি-সাহিত্যে। আনন্দ থাকায় সকলে আপন, সকলেই আদৃত স্রষ্টার কাছে। গতি থাকায় তিনি চিরনবীন।

প্রগতিশীল অন্তর্দৃষ্টি থাকায় তিনি বস্তাপন্থী প্রাচীন সাহিত্যের সহযাত্রী হন নি।

এক বিদগ্ধ সমালোচক বিভূতিভূষণকে 'মেজাজের দিক থেকে প্রাচীন' বলেছেন। কি করে বলা যায়?

তিনি গ্রামীণ, প্রাচীন নন। বরঞ্চ কিঞ্চিৎ আধুনিক মনোবৃত্তি তিনি গ্রামের মানুষে আরোপ করে তাদের করেছেন আধুনিক। জীবনকে একঘেয়ে লাগে, তারা বেড়িয়ে আসতে যায় কোথাও ; একটু পৃথক বস্তু খুঁজে বেড়ায়।

আধুনিক পারমিট, র‍্যাশান ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ততা দেখা যায় এসব চরিত্রে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ 'অশনি সঙ্কেতে' চিত্রিত হয়। যুগযন্ত্রণা প্রকট ভাবে না থাকলেও 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে জীবনের ছোটখাটো সমস্যাগুলি দেখা যায়। কিন্তু রূপ বা প্রতিক্রিয়া তীব্র নয়। কারণ শহুরে ও গ্রামীণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েও অনুরূপ শহুরে ও গ্রামীণ মানুষের গতির পার্থক্য দেখা যায়। বিভূতিসাহিত্য আলোচনার সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি প্রধানতঃ গ্রামকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। গ্রামের মানুষ ও গ্রামের নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রা ছিল তাঁর উপজীব্য। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি তো পাড়াগাঁ ছাড়া থাকতে পারব না।"

গ্রামকে ছেড়ে দূরে থেকেও (ভাগলপুর, বড়বাসা) গভীর পিপাসায় তিনি গ্রামের কথাই লিখে গেছেন—তার অমরসৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'।

বিভূতিভূষণের প্রতিভা যার থাকে কেবলমাত্র তিনিই সাহস করতে পারেন সমগ্র নাগরিক জগৎকে প্রেম, ঈর্ষা, পাপপুণ্যের জটিলতা থেকে আহ্বান করে নিতে অখ্যাত পল্লীসীমায় দরিদ্রঘরের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর তুচ্ছ পরিমণ্ডলে। বৈচিত্র্যহীন তাই বিচিত্র। সহজ তাইতো জটিল। সাধারণ বলেই অসাধারণ।

সহজ দিনযাত্রার ছবি সহজে লেখা যায় না। বিভূতিভূষণের মত প্রতিভার আবশ্যক হয়।

এক একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ এক এক পথ ধরে হয়। আত্মস্ফূরণ প্রত্যেকের

স্বতন্ত্র। সহজতা বিভূতিভূষণের ছিল নিজেকে বিকাশের পথ। কথায়, ব্যবহারে, বেশে, এই সহজতার অনুশীলন তাঁর রচনাকে অত সহজ করেছিল। অনাড়ম্বরতা ও সহজতাই তাঁর আর্ট। যদি তিনি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন তাহলে হয়তো তাঁর রচনার অমন সহজতা নষ্ট হয়ে যেত।

এখানে উল্লেখ্য, গ্রাম-ভাষ্যকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্ট পৃথক ছিল। মানিকের নায়ক-নায়িকা সহজ পরিবেশে সাধারণ মানুষ, অতিশয় চেনা। কিন্তু তারা সহজ নয়। জটিল মানসিকতায় কখনও তারা দুর্জ্ঞেয়। মানিকের শহরতলী ও শহর সমস্যাজর্জরিত নাগরিক বিভ্রান্তিবিক্ষত। বিভূতিভূষণের শহর ও শহরতলীর কোন আকস্মিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত চিত্র নয়। বর্ণবর্জিত সাদা জলের মত তাদের যেমন স্বাভাবিক রং তেমনি।

এই সূত্রে গ্রাম-বাংলার আরও এক অসাধারণ লেখকের কথা এসে পড়ে, তুলনা যারা বক্তব্য পরিস্ফুট করার চিরন্তন কৌশলের মধ্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ় দেশের গ্রাম, শহর, শহরতলীকে চিত্রায়িত করেছেন তিনি। কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় হৃদয় প্রধান, তারাশঙ্করের রচনায় বুদ্ধি প্রধান।

তিনি দেখেছেন দ্বন্দ্ব—সামাজিক, শ্রেণী-বৈষম্যের। কৃষিনির্ভর সভ্যতা শিল্পনির্ভর সভ্যতায় রূপান্তরিত হ'বার পথে সংঘর্ষ দেখেছেন তারাশঙ্কর, দেখেছেন জমিদারীপ্রথার ডেকাডেন্স, বা অবসাদগ্রস্ত বিলয়।

রসের সাধনায় আত্মলোপী মাধুর্যের পথিক তিনি নন, তাই কখনও বা ঈষৎ বিশুষ্ক। বিভিন্ন গ্রাম্য চরিত্রে অসরল ও বক্র কটাক্ষ তাঁর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধিক তুলনীয় করে। নানা সমস্যার ক্ষেত্রে পদচারণও শরৎচন্দ্রকে ক্রমাগত মনে পড়ায়।

তবু শহরকে ছেড়ে গ্রামের ঐশ্বর্যে দত্তমানস তারাশঙ্কর সমসাময়িক লেখক হিসাবে বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে তুলনীয়।

বিভূতিভূষণের গ্রাম, গ্রামবাসী, কোন মতবাদ, রাজনীতি, সমস্যা, অতি সাম্প্রতিক ঘটনার আবর্ত ইত্যাদি দিয়ে রং-করা নয়। সুতরাং তাৎক্ষণিক চমক না লাগালেও চিরন্তন স্বাভাবিক গতি ও স্থায়িত্বশীলতার গুণে পলাতকা মনের আশ্রয়।

নাগরিক সংঘাতের ঘূর্ণীঝড়, যন্ত্রসভ্যতার নিত্যনূতন আবিষ্কার, স্পেসবিজয়, পাণ্ডিত্যের অভিনব অবদানের মধ্যে এখনও আমরা বিভূতিভূষণের রচনায় শান্তি খুঁজে পাই।

তুচ্ছ নিয়ে বিনা আয়াসে সহজ গল্পগুলি, সাধারণ মানুষ নিয়ে স্বচ্ছন্দ উপন্যাসগুলির কোন্ কোন্ খানি মহৎ সাহিত্যের সঠিক আখ্যায় চিহ্নিত—বলা শক্ত। কিন্তু যে অপরিসীম আনন্দ স্রষ্টার মনে, সে আনন্দ তিনি বিলিয়ে গেছেন প্রত্যেকটি রচনায়। অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য নিয়ে, বিনা কারণে, শুধু বেঁচে থাকার যে আনন্দ (উদাহরণ : 'উৎকর্ণ' 'তৃণাঙ্কুর') সে আনন্দ শিখে নিতে চাই আমরা। যখন বাইরের বস্তুপুঞ্জ, জীবনের যান্ত্রিক কৃত্রিমতা, সভ্যতার আড়ম্বর, আমাদের জীবনকে বিস্বাদ করে তোলে, তখন বিভূতিভূষণে ফিরে যাই। কেন না তুচ্ছকে নিয়ে যে অনির্বচনীয়, অপরিসীম আনন্দ তাই আমরা উপলব্ধির আস্বাদে

ব্যগ্র হই। সফিস্টিকেটেড্ মনের আশ্রয় ওই সহজ, সরল, সত্য ও স্বাভাবিক সাহিত্য।

স্বাভাবিকের সাধনার জন্য বিভূতিভূষণের রচনায় কখনও চড়া সুর, কোনটাই কড়া রং লাগে নি। দুচোখ ভরে তিনি আজীবন দেখে গেছেন গ্রামকে, গ্রামের মানুষকে। গ্রামে জীবনধারা প্রায়ই বাইরের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে না, স্তিমিত নরম গোধূলির আলোয় প্রকৃতির মুখচন্দ্রিকা সেখানে। তাই গ্রামীণ-জীবনের-সর্বতো-সাধক অটা বাইরের আন্দোলনের তীব্র সংঘাত সেখানে দেখান নি। দূর নগরের দূরাগত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখানে ভেসে আসে—একদল লোকের উত্থান ও একদল লোকের পতন-জনিত ধ্বনি। তিনি গ্রামে যেটুকু অনিবার্য স্পন্দন অনুভবে পান, সেটুকুই তিনি লিখে যান। যে চরিত্র তিনি দেখেন, সে চরিত্রের যতটুকু স্বাভাবিক তাই তিনি এঁকে যান। বাহুল্য বা অতিশয় কিছু লেখা এই লেখকের ধর্ম নয়। যে চরিত্রের যা পরিণতি স্বাভাবিক, অসাধারণ কোন পরিণতির অপেক্ষা না রেখে সেখানেই তিনি শেষ দেখেন।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র আমল থেকে চরিত্রানুগত কথোপকথনও তাঁর টেকনিকে। এমন কি কথাবলার ঢং-এ অর্ধসমাপ্তি, ইঙ্গিত, স্থানীয় বুলির (গ্রাম, বিহার, দেহাত, সিংভূম ইত্যাদি) সুকৌশল মিশ্রণ লক্ষণীয়।

"রামতারণ বলিলেন, দেব তো নিশ্চয়ই, তবে আজকাল একটু ইয়ে—একটু টানাটানি যাচ্ছে কিনা।" ('দুই বাড়ী')

"গেলো—বংশের অরুচি—গেলো। তা ভালো হয়ে বোসোও না হয়? কোন্ মক্কায় থাকে তোমার জন্যে বাঁশ তৈরি হয়েছে যে আজ সারাদিন বাইরে বসে থাকা হয়েছিল শুনি?"

(কলহান্তরিতা—'কুশোল ও মুখুজ্জে')

—"ওই নতিডাঙা থেকে বিলেন পটলের দর এনেলাম। যেমন পাতলা খোসা, তেমনি মিষ্টি। দরও খুব তেজী, এক এক দরে পাঁচপণ করে উঠছ সংখ্যে। বলি ভাবছেন গল্পকথা বলচে, তা নয়, পড়িয়ায় জানে পটলের চাষ কি করে করতি হয়। দর পুঁতলিই কি পটল ফলে? ওর কায়কিৎ চাই।—না, দাম দিতি হবে কেন আপনার। ও কথাই তোলবেন না—"

('বেনাতি'—ঐ)

"সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—'এই যে ছোকরা কিছু লেখে এসে গানখানা করে গেল, ওকে আমি একটা রুপোর মেডেল দেবো।' কথা শেষ করিয়াই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—"হাততালি-হাততালি—"

('নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব')

"একটু হমুলেপাতি ওষুধ এনে দিয়েলাম যশোনন্দপুরের ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। দু আনা দাম নিয়েল—তা বুঝি কোনো উপগার হোলো দাদাঠাকুর—তুমি জানো হমুলেপাতি?"

('আমার ছাত্র'—'নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব')

"বারিক বগে হাত দিয়ে আরম্ভ করলে—

—কানু হেন গুণনিধি গেহে না আইল যদি

অঝোরে বহিল দু'নয়ান—

(ও) নয়ান যে বয়ে যায়—"

('বারিক অপেরা পার্টি'—'মুখোশ ও মুখশ্রী')

এই রকম উদাহরণ সহস্রবার তুলে দেখানো যায় বিভূতিভূষণের রচনায়। কথোপকথনের শক্তির উপর চরিত্রগুলি আরও জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার হেতু আরও দু-একটা দেখা যাক।

"হ্যাঁ, রেলটা বসল চাইবাসাতে, তখন আমি কাড়া চরাই আজ্ঞে। তুমি আগুন দিলি ?"

('কালচিতি'—'জ্যোতিরিঙ্গন')

"ইছু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতি পারিনে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।"

('ফকির'—'উপলখণ্ড')

"দিব্যি,—কেমন গুড়্—মোটাসোটা দিব্যি কাপড়—আঃ দাদা, বেঁচে থাকো—অক্ষয় প্রমাই হোক…পথটা মিটিয়ে নি, কত্তা দিনই আর বা ?"

(ইন্দির ঠাকরুণ)

—"মশাই, দশবছর ঘর করলাম—সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েছে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরী হয়ে—হাতে দিয়েছে কামড়ে—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাত্তিরেই বৌ গিয়েছে মরে—এই গেল ব্যাপার মশাই—অদিকে জমি গেল—এদিকেও"—

(কথকঠাকুর)

—"হেঁ হেঁ তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর—রাধারাণীপদে ভরসা…পরিপূন্—আজ্ঞে পরিপূন্—ম্যালেরিয়ার কথা আর বলবেন না বাবাঠাকুর—"

(পিতম কাঁসারি)

—"ও পাঁচী, কাশীর ইনি বলছেন না কি বাবুদের তরকারী রাঁধবেন। কি নাম গা তোমার ? ভুলে যাই"—

(মোক্ষদা বামনী)

শেষ চরিত্র কয়েকটির বাক্যাংশ প্রামাণ্য গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' থেকে।

লোভে বিচলিত হলেও, সংক্ষিপ্ত-পরিসর নিবন্ধে এ প্রকার বহুল উদাহরণ চোখের সম্মুখে থাকলেও, উদ্ধৃতি বিরত হ'তে হচ্ছে। একখানি মাত্র বই দেখলেও বোঝা যায় প্রতি চরিত্রের মুখে লেখক উপযুক্ত কথার যথাযথ বিন্যাসে অসাধারণ দক্ষতা ও শিল্পজ্ঞান দেখিয়েছেন।

ছোট ছোট চরিত্রচিত্রণগুলির ক্ষেত্রে মুখের ভাষায় স্থানকাল ও মানুষ বিচারে নিখুঁত প্রয়োগ কয় লেখকের কলমেই দেখা যায়। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন, অতিরিক্ত কিছু নয়, ভাবালুতা নয়, যেটুকু সেই চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক সেটুকু মাত্র। অতিশয় কঠিন এ কাজ। 'দুই বাড়ী' উপন্যাসখানিতে নিধুর বাবা রামতারণ নিজের দুরবস্থার কথা নায়েবের কাছে মনে মনে বললেও মুখে চরিত্রানুগ ভাবে নির্বাক।

পুরুষ-মহিলা-চরিত্র নির্মাণেষে বিভূতিভূষণ এই দুর্লভ ক্ষমতা দেখিয়েছেন অনায়াস-পটুতায়।

ভাষাভঙ্গি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'-যুগে কবিত্বপূর্ণ, প্রায়ই পারপল্-প্যাচে ভরা।

কবিত্বময় ভাষা ও অনুভূতির তীব্রতার সমন্বয়ে 'purple patch' সৃষ্টি হয়। পিতা মহানন্দের কবিত্বশক্তি পুত্র বিভূতিভূষণকে করেছিল কবি, গানের ঐশ্বর্য্য দিয়েছিল ছন্দ আর উদাসীন পর্য্যটন পুত্রের রক্তধারায় জন্ম দিয়েছিল এক গতির উন্মাদনা।

ভাষা ও শব্দ চয়ন করেছেন তিনি ক্রমাগত, সে সমস্ত আলোচনায় সময় লেগে যাবে—সাদা পাতাও অনেক সংখ্যক লেগে যাবে।

প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় এই কবিত্বশক্তি অপরূপ হয়ে উঠত :—

"তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসকফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিমফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটাগাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনিপাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।" ('পথের পাঁচালী')

হরিহরের প্রাচীন কোঠায় ঝড়ের রাত্রির বর্ণনাও অতি শক্তিশালী।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পৌষ-ফাল্গুনের পালা'র ঝড়ের বর্ণনাটি বিভূতি-ঘরানার।

বাংলার মাঠঘাট, ছোটখাটো ফুল, তুলাফুরটি পর্য্যন্ত লেখকের খাতায় হিসাব মিটিয়ে দিয়ে তবে অব্যাহতি পেয়েছে।

প্রকৃতিকে দেখবার দৃষ্টি বিভূতিভূষণের সমসাময়িক কবি জীবনানন্দের সঙ্গে তুলনীয়।

"দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা," ইত্যাদি—

('মৃত্যুর আগে'—জীবনানন্দ)

রূপ রস স্পর্শ দিয়ে ধরা এঁদের প্রকৃতি—কীট্সের মত সেন্সুয়াস।

বিভূতিসাহিত্য পাঠ আমার আজীবন, শৈশব থেকে। সুতরাং বলার কথা অনেক আছে মনে হয়। অনেকদিনের স্মৃতি মনে পড়ে।

একদিন প্রশ্ন করেছিলাম তারুণ্যের ধৃষ্টতায়, "এখন আপনার লেখা কিন্তু একটু একঘেয়ে লাগছে। যে-কোন বড় লেখকেরও তাই হয় কখনও কখনও। একটু ছেদ দিয়ে থেমে আবার লেখা উচিত মনে করেন না?"

বিভূতিবাবু একটুও বিরক্ত না হয়ে বলেছিলেন, "কিন্তু আপনি যে সব লেখা পড়েছেন কিনা। যারা এখন নূতন আরম্ভ করবে, তাদের কাছে নয়।"

শেষের দিকে তাঁর রচনায় কিছু অবসাদ দেখা যেত কখনও।

অতি প্রচুর লিখতে হ'ত তাঁকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি ওজন হিসাবে পৃষ্ঠাসংখ্যায় উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু বহু ছোটগল্পের লেখক ছিলেন। কোন কোন গল্প তাঁর পূর্ব্ব যুগের মত রসোত্তীর্ণ হত না, কোন গল্পে বা অসঙ্গতি দেখা দিত।

গ্রামের স্তিমিত পরিবেশে গ্রামের কথা ক্রমাগত লিখতে লিখতে যদি তিনি কখনও বা শ্রান্তি বোধ করতেন তবু গভীর সততার সঙ্গে সমগ্র বিষয়বস্তুর পূর্ণপ্রকাশ লিখে যেতেন, সংক্ষেপিত করতেন না সচরাচর। অতএব এই শ্রান্তির চিহ্ন রচনাকে ভারাক্রান্ত করে তুলত মাঝে মাঝে।

তবু অসংখ্য যে মানুষকে তিনি দেখেছেন, তাদের কাউকে অবহেলা করতে পারেন নি। হেমিংওয়ের নায়কের মত কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের তলায় মৃত্যুর পূর্ব্বে মনে করতে হয় নি যে কত মানুষকে দেখে তিনি সাহিত্যে স্থান দেন নি, কত সাধনাকে লিপিবদ্ধ করেন নি। আলস্য, সহজ জীবনের আরাম পথভ্রষ্ট করেছিল 'স্নোস্ অব্ কিলিমাঞ্জারো'র নায়ককে।

বিভূতিভূষণের বিষয়ে সেকথা আমাদের বলতে হয় নি।

উপন্যাস ও গল্প দুটির মান বিভূতিভূষণের সমতুল্য, কিন্তু ঔপন্যাসিক বলেই খ্যাতি অধিক। সাহিত্যিক ডাইরি অতি অপূর্ব্ব। সমসাময়িক কাল ও সাহিত্যের ইতিহাস দিনপঞ্জীগুলি ধরে রেখেছে।

স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের শুচিতা ও নারীর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও মমতা বহুজনবিদিত। রচনাপরিধির মধ্যে নারীর জননী ও সেবিকা কল্যাণময়ী রূপই তাঁর চক্ষে ধরা পড়েছিল। নিষিদ্ধ প্রেমের নায়িকা তিনি দেখতে পেতেন না। রোমান্টিক পরিণত প্রেমচিত্র রচনায় ছিল না বললেই চলে। প্রেমের তীব্র উন্মাদনা, অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষ্যার বেদনা ও কামনার দাহ বিভূতিভূষণে অনুপস্থিত। কোন নারীর অধঃপতনের কাহিনী তিনি অঙ্কিত করতে পারেন নি। 'কেদার রাজা'র পতিতালয়ের চিত্রে তাই দেখি তাঁর অনুৎসাহ অপটুতা। 'অথৈ জল' তাই সার্থক রচনা নয়। 'দেবযানে'র সোনাও আংশিক নকল।

তিনি মেয়েকেই বেশী বুঝতেন নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রেমিকা নারী সর্ব্বদাই সেবিকা। প্রিয়া এবং জননী তাঁর কাছে ভিন্ন-ক্ষেত্রচারিণী নয়।

চারখানি বইএর আলোচনায় মুখবন্ধ হিসাবে এই বক্তব্যকে ঠিক 'ধান ভানতে শিবের গীত' বলা চলে না। যে বিশেষ লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হ'ল, এগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত। জীবনের সর্ব্ব পর্য্যায়ে বিভূতিভূষণের লেখায় মূল সুর বিস্ময়জনক ভাবে একই।

(৩)

'দুই বাড়ী' বিভূতিভূষণের মধ্য পর্য্যায়ের রচনা (১৯৪১)

যে মৌলিকতা 'পথের পাঁচালী'র পরিচ্ছেদ বিন্যাসে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় দেখা যায়, অন্যান্য রচনায়ও সেই নূতন ধরনের বিষয়বস্তুসন্ধান পরিলক্ষিত হয়।

তিনি টাইপ নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন একের পর এক। 'অনুবর্ত্তনে' শিক্ষক, 'বিপিনের সংসারে' প্রথমে নায়েব পরে গ্রাম্য ডাক্তার, 'কেদার রাজা'র রিক্তবিত্ত গ্রাম্য জমিদার, 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' রাঁধুনী বামুন, 'আরণ্যকে' বনানীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, 'অপরাজিত'তে যুবক, 'পথের পাঁচালী'তে এক বালক মূল নায়ক রূপে আবির্ভূত। সুতরাং বোঝা যায় জীবনকে ঔপন্যাসিক নানা ভাবে দেখেছেন।

'দুই বাড়ী' মোক্তারের জীবন—নিধিরাম রায়চৌধুরী, তার পরিবারবর্গ।

দুইটি আখ্যানের অংশ জীবনটিতে মিশেছে, পারিবারিক ও মৃদু রোমান্স এবং মফস্বল আদালতের এক নবীন মোক্তারের কাহিনী। রামনগর কোর্টে পসারহীন অখ্যাত মোক্তার নিধু।

পিতৃবন্ধু বদ্ধ বাঁড়ুয্যে নিধুর পৃষ্ঠপোষক। মফস্বল-মোক্তারের নানা সমস্যা, আদালতের প্রচলিত প্রথা, হাকিমদের বিশেষ প্রতিপত্তি, এই সকলের মধ্য দিয়ে নিধুর ছিন্নবাঞ্ছা প্রেম-জীবনের অপেক্ষা নীরস নয়। মধ্যে আবার সাধন-মোক্তারের ভাইঝিকে বিবাহের প্রশ্ন ও কন্যাপক্ষের চেষ্টা গল্পে নূতন কৌতূহল যোগায়।

'দুই বাড়ী'র একবাড়ী নিধুদের জীর্ণ দরিদ্র সংসার, রাস্তার ওপারের অন্য বাড়ী ধনী 'জজবাবু'-আখ্যাত লালবিহারী চাটুয্যের সুরম্য অট্টালিকা। তিনি বহুদিন পরে দেশে দুর্গাপূজার জন্য এসেছেন।

উপন্যাসে তাঁকে কখনও 'মুন্সেফ' কখনও 'সাবজজ' কখনও 'জজ' বলা হয়েছে। 'জুডি-শিয়াল' সার্ভিসের কোন স্তরে তিনি বোঝা না গেলেও তিনি অতি সচ্ছল অবস্থার সজ্জন লোক।

এককালে মোক্তারী করেছিলেন ও সামনের বাড়ীর ছেলে বলে প্রথম সাক্ষাতে পল্লীগ্রাম-সুলভ ভদ্রতায় নিধুকে আহারে নিমন্ত্রণ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কার্য্যব্যাপদেশে তিনি বাইরে থাকলে নিধুর সোজা অন্তঃপুরে প্রবেশ ও তরুণী মঞ্জুর সঙ্গে অবাধ বন্ধুত্ব হয়তো অনেকে সন্দিহান দৃষ্টিতে দেখবেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, কারণ বিভূতিভূষণ তাঁর পল্লীগ্রামকে চিনতেন আমাদের চেয়ে বেশী।

'দুই বাড়ী' শুধু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন নয়, 'দুই বাড়ী' প্রতীক হিসাবে ধরা চলে।

'দুই' কিনা 'এক' নয়। বাহ্য আকৃতি, পরিবেশ, অবস্থা, শ্রেণীপার্থক্য সমস্ত দিকেই দুই বাড়ী দুই পৃথক মহল। তারা কখনও মিলতে পারে না।

অথচ এক অনবদ্য প্রেমের ইঙ্গিত দেখা যায় শরতের নীল আকাশের নীচে। সে রকম প্রেম একমাত্র বিভূতিভূষণই লিখতে জানেন, অর্থাৎ 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' বইখানির সমস্ত মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব এই অধরা রাগিণীর ছন্দে।

প্রাজ্ঞ সমালোচক বিভূতিভূষণের এই সমস্ত একান্ত নির্দোষ প্রেমাখ্যানগুলি বিষয়ে প্রশ্নরত। আপাতদৃষ্টিতে রূপগুণশালিনী, ধনীকন্তা ও সাধারণ নায়কের প্রেমবন্ধনের হেতু কি?

কেন 'অপরাজিতে'র অভিজাতা লীলা অপুকে ভালবাসল?

কেন 'বিপিনের সংসারে' জমিদারদুহিতা মানী বাবার নিতান্ত অধম কর্মচারী বিপিনকে ভালবাসে? 'বেণীগীর ফুলবাড়ী'র তরুণী মনিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের স্বার্থপর ললিতবাবুর জন্ত কেন সর্বস্ব খোয়ায়?

অবশ্য এগারো বছরের লীলা সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত তের বছরের অপুকে বাল্যপ্রণয়ের আকর্ষণে ও দয়ামমতার প্ররোচনায় মনে রেখেছে। মনিয়া হিন্দুস্থানী, নিজের বংশগত গলদে অধম ললিত ঘোষালের জালে আবদ্ধ হ'য় সারল্য ও অনভিজ্ঞতার জন্ত। কিন্তু 'দুই বাড়ী'র লাল-বিহারী বাবুর রূপবতী গুণবতী কন্তা নিধিরামের প্রেমে পড়ে কেন?

প্রথম যৌবনে হাতের কাছে তরুণ পুরুষকে পেয়ে?

বিভূতির অবকাশ নেই, তাই সোজাসুজি নায়কপ্রকার আলোচনায় আসি। অসংখ্য উপন্যাসে ও গল্পে প্রচুর দৃষ্টান্ত।

বিভূতিভূষণের নায়কেরা শুধু একটি উত্তম নায়িকার নয়, বহু নারীর মনের মানুষ হয়ে দাঁড়ায় একই আখ্যানে।

কারণ তারা আন্তরিক, তারা বিশ্বস্ত।

ললিত ঘোষাল পর্য্যন্ত মনিয়ার প্রেমের প্রতিধ্বনিনী আনেন নি, স্বদেশে একবার পালিয়ে গেলেও ফুলবাড়ীর আশ্রয়েই তিনি রইলেন। মনিয়াকে মোহন করে দেশে ভাইপোকে টাকাকড়ি পাঠানো দেখে বোঝা যায় সেখানে তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। মনিয়ার প্রতিও ভালবাসা ছিল। 'শ্রীকান্তে' বাঙালী পলাতকের বর্মীনারী ত্যাগের সঙ্গে এ গল্পের পার্থক্য আছে।

যাই হোক, 'দুই বাড়ী'র নিধির চেহারা মন্দ নয়, বয়স তরুণ, কবিতা লেখে, ভদ্র বিনয়ী ও কর্তব্যজ্ঞানে মণ্ডিত; পাশাপাশি বাড়ী, মধুর উন্মুখ প্রত্যাশাভরা মনের ও সর্বক্ষণ দমনক্ষেপণের কোন বড় প্রয়োজন বলেই মঞ্জরী নিধুর সঙ্গ অহরহ কামনা করত কি?

অবশ্য বিশ্বস্ততার মূল্য, আন্তরিক প্রেমের মূল্য সব নারী দেয়, তখন তারা রূপগুণের বিচার ভুলে থাকে।

নিধু প্রথম প্রেমে আশাতীত নায়িকা পেয়ে অভিভূত। কপলাকাতে স্বর্গ, বিরহে অতল-স্পর্শী নিরাশার কূপ। অভিমানে নিধু বিচলিত, ভুলবোঝার আবর্তে মজ্জমান। কিন্তু সুযোগ্য পাত্র রামনগরের সাবডেপুটি সুনীলের সঙ্গে মঞ্জুর পরিণয়ে কখনও বাধার সৃষ্টি করে না। সুনীলের প্রাক্-বিবাহ অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তরে—

"নিধুর মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, একথার উত্তর তাহার দেওয়া উচিত। মঞ্জুকে সে সব সময় সর্বত্র বড় করিয়াই রাখিতে চায়। কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে ছোট ধারণা না হয়, এটা দেখা তাহার সর্বপ্রথম কর্তব্য।"

অথচ নিধুর সমস্ত জগৎ তখন বিস্বাদ।

নীচতা ও স্বার্থবর্জিত এই সমস্ত নায়কের রমণীমনোহর হওয়া আশ্চর্য্য নয়, বিশেষতঃ তারা যখন সুদর্শন, অতি মোলায়েম ব্যবহারের লোক।

মঞ্জু—"আসতেই হবে শনিবার"—

নিধু—"বেশ তাহলে আসব"—

নিধু—"যা তোমার ইচ্ছে। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

মঞ্জু—"মনের কথা বলছেন নিধুদা?"

নিধু—"মনের কথা নিশ্চয়, বিশ্বাস কর মঞ্জু।"

নিধু সরল, সহজ, বিভূতিভূষণের অন্য নায়কদের মত। অতি সহজে সে ধনীদুহিতার সঙ্গে মেশে নির্দোষ আনন্দে। আবার মনের কথা খুলে বলে পরে ব্যথাহতা মঞ্জুকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা ও প্রণালী খুঁজে বেড়ায়। নিজের দৈন্য সে গোপন করে না, অথচ তিলমাত্র প্রাপ্তির প্রত্যাশা তার নেই। এই নায়কেরা দিতেই চায়, নিতে চায় না। অপু তাই কখনও দারুণ দুর্দশার মধ্যেও লীলাকে exploit করতে চায় নি। মহত্বে ত্যাগে 'বিপিনের সংসারে'র বিপিন, অপু, 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র নায়ক জিতু, 'দুই বাড়ী'র নিধুদের তুলনা নেই। এখানেই যে তারা চির দুর্লভতার বর পেয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, তারা লম্পট নয়।

আধো আলোছায়া, আধো বলা না-বলায় যে প্রেমজগৎ বিভূতিভূষণ সৃষ্টি করেন, দেহ সেখানে নির্বাক দর্শক মাত্র। সুগভীর স্নেহ এই সমস্ত প্রেমের ভিত্তি রচনা করে, পুরুষ এখানে আশ্রয়দাতা, ভক্ষক নয়।

অতি নিবিড় সাহচর্য্যে অপরিসীম পুলকের ক্ষণেও তারা পিপাসু নয়। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিতা নারীকে তারা গৃহ ও সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে জানে। সুযোগ্যের পাশে প্রেয়সীর প্রতিষ্ঠা দেখে আশীর্বাদ করে নীরবে হৃদয়ব্যথাকে দমন করে।

নারী প্রেম ভালবাসে, অস্বাভাবিক না হ'লে আপ্রাণ ভালবাসে কম, বিশেষতঃ বিভূতি-সাহিত্যের নারীর মত নারী।

অতএব আমাদের প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়।

প্রকৃতির শোভাখচিত বৃন্দুলগাছি গ্রামে দীন মোক্তার নিধিরাম এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের গানের অতি বাস্তব রূপ দেখিয়ে দেয়, যথা :—

"একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।"

কৈশোর প্রেমের অপরূপ এই আলেখ্য অতি স্বাভাবিক অনিবার্য্য বিরহে শেষ হয়।

—"হেমন্তের সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে গাছপালায়।"

(শেষপংক্তি—'দুই বাড়ী')

'দুই বাড়ী'তে প্রকৃতি মানুষের মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে।

প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ এখানে প্রকৃতিকে আলাদা সত্তায় মহীয়সী করেন নি, শুধু যেটুকু প্রয়োজন মানবিক মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষেত্রে। বৃন্দুলগাছি থেকে রামনগরের পথযাত্রায় নিধুর কাছে প্রকৃতি নানা সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। জীবন যখন অবসন্ন তখনি সন্ধ্যা নামে।

বিভূতিভূষণের এই অপ্রধান ছোট উপন্যাসখানি লিপিচাতুর্য্যে তুচ্ছ সুখদুঃখের গ্রাম্য বিকাশের মধ্যে আগাগোড়া রসোত্তীর্ণ। ছোট চরিত্র যথা নিধুর নৎমা, সাধনমোক্তার, সুনীল-বাবু ও নিধুর ভক্ত হৈম অনন্ত রচনাপ্রসাদে উজ্জ্বল।

মধুক্ষরা লেখনী সামান্যের সাধনায় অসামান্য।

বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনের একরূপ শেষাংশে পরিস্ফুট। আমরা জানি বিভূতিভূষণ সহজ স্বাভাবিকের সাধক। যা স্বাভাবিক, যা অনিবার্য্য তিনি তাই লিখেছেন। 'দুই বাড়ী'র মিলন সম্ভব নয়, শুভ নয় তিনি জানতেন। তাঁর রাজকুমারী সুইন্ ক্রিশ্চিনার মত প্রেমে সিংহাসন ত্যাগ করতে চায় না। চোখের জল মুছে জীবনের ঘটনা মেনে নেয়।

তাই :—

"মঞ্জুদের বাড়ী তালাবন্ধ। কেহ কোথাও নাই।

আগেও তো কেহ ছিল না এ বাড়ীতে, কখনো কেহ থাকিত না, এখনো কেহ নাই, ইহাতে নতুন কি আছে?"

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য।

বিভূতি-সাহিত্যে নারী সেবিকা, স্নেহময়ী রূপে সে প্রেমাস্পদকে আহার করায় সাধ্যমত এবং ক্রমাগত। শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীও ক্রমাগত ('চরিত্রহীন') লুচি ভেজেছিলেন, এরাও লুচি ভাজে, কিন্তু কত পার্থক্য!

নায়ক নায়িকার কাছ থেকে এইটুকু মাত্র গ্রহণ করে বিভূতিসাহিত্য সানন্দে। ঔদরিকতা হেতু নয়, এ একপ্রকার আদান-প্রদান মাত্র।

বিভূতিভূষণের প্রেমের ছন্দ এমনি করেই বোধহয় ফাল্গুনী রচনা করে।

বিভূতিসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অথবা প্রেম-প্রণালী নিয়ে বিদগ্ধ নাগরিক আমরা মনে মনে হাসি নিশ্চই। কিন্তু আবার গভীর তুলনায় মনে মনে ভাবি নিশ্চই, বর্তমান

শতাব্দীর অপূর্ণতা-বিফলতার মধ্যে যদি আমরা এমন সহজ সারল্যে, এমন অনায়াস স্বাভাবিকত্বে প্রেমকে পেতাম।

(৪)

'মুখোশ ও মুখশ্রী'—'মৌরীফুলে'র ও 'মেঘমল্লারে'র কতকগুলি গল্পের পেলব মাধুর্য্য না পেলেও, 'জন্মমৃত্যু'র একাগ্র উজ্জ্বলতা না দেখলেও—অনেকক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায়।

আধুনিক সমাজ নিয়ে বিভূতিভূষণ লিখেছেন খুবই কম। কলিকাতা বা জংশবান নগর নিয়ে লেখাও সংখ্যালঘু। উপন্যাসে 'অনুবর্তন', 'অপরাজিতে'র কিছু অংশ, অন্য উপন্যাসে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামান্য অংশ ও কয়েকটি গল্প। অবশ্য তাঁর দিনপঞ্জীর মধ্যে নগরের তৎকালীন সমাজ ও মানুষ বহুল উপস্থিত।

'মুখোশ ও মুখশ্রী'র প্রথম গল্পের নামে বইএর নাম। টেনিসকোর্টে এক আধুনিক জটলার মধ্যে মুখোশধারী মানুষের পাশে প্রকৃত মুখশ্রী যে ব্যোমকেশ মুস্তফী সে-কথা গল্পকার শেষাংশে নাটকীয় ভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। বিখ্যাত পর্যটক এখানে প্রথমে অচেনা বলে হতাদর, কারণ তাঁর বেশ ফ্যাশানেবল্ নয়।

পুরুষের পোশাক নিয়ে, আদবকায়দা নিয়ে, মেয়েদের মধ্যে গবেষণা মনে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ও 'বাঁশরী' নাটক দুখানি। বিশেষতঃ 'শেষরক্ষা'র, ক্ষিতীর নলিনীর প্রতিরূপ দেখা যায় মিঃ বাসুর মধ্যে। ব্যোমকেশ মুস্ত অবশ্য সতীশ নয়, বিভূতিভূষণ।

'অপরাজিতে'র পাতায়ও আধুনিক সমাজ নিয়ে মন্তব্য পাই আমরা। বিভূতিভূষণ তথাকথিত বড়লোকদের সঙ্গে কখনও একাত্ম হতে পারেন নি, কিন্তু সামাজিক পরিমণ্ডলের আলোচনে বিমুখ ছিলেন না। তাঁর আধুনিক সমাজের পর্য্যবেক্ষণে স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে বইকি, কিন্তু সামগ্রিক দর্শনের অভাবে গভীর প্রত্যয় মতামতে পাওয়া শক্ত। 'নীলাঙ্গুরীয়ে' বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপজীব্য ছিল এক স্পর্শকাতর পুরুষ ও হৃদয়ে'র নারী। কিন্তু এখানে সহজ ও সাধারণ পরিবেশে সেই উপাদান কোথায়?

'মুক্তপুরুষ হরিদাসে' আগাগোড়া সুমধুর বিদ্রূপ গল্পটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। এই বিদ্রূপ বিভূতিভূষণের অনেক রচনাকে অতি উপাদেয় করে তোলে স্থানে স্থানে হঠাৎ নির্দোষ অথচ নিরাপদ ব্যঙ্গোক্তে।

'কলহান্তরিতা', 'বেসাতি' গার্হস্থ্যজীবন ও স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে নিখুঁত ছোট গল্প। দারিদ্র্য অথচ মানুষের স্বভাবজ বৃত্তি, কখনও বা মহৎবৃত্তি দেখা দেয় 'বেসাতি' গল্পে।

'কলহান্তরিতা' কলহপ্রিয়া অথচ প্রেমময়ী পত্নীর এক উজ্জ্বল আলেখ্য। তারাশঙ্করে অনুরূপ চিত্র দেখা গেছে বহুশ

'উদ্বন' গল্পটি বিভূতিভূষণের এক বিশেষ শ্রেণীর রচনার পর্য্যায়ে পড়ে। মেটাফিজিক্যাল্ বা বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর বাইরের জগৎ তিনি সন্ধান করেছেন আজীবন। ভৌতিক, অলৌকিক

গল্পের প্রাচুর্য্য আছে তাঁর রচনায়, কখনও বা শক্তিশালী কলমে লেখা। 'দেবযান' উপন্যাস প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'উড্ডুম্বর' স্বর্গলোকের কল্পিত চিত্র। মহাকবি ও মহালিপিকার যথা, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, ভাস, সুবন্ধু এমন কি স্বয়ং ব্যাসদেব নিজ রচনা 'বায়ব আলেখ্য' অর্থাৎ টকি-সিনেমায় রূপান্তরিত করবার আশায় ব্যগ্র। আস্তর পরিহাস ও কৌতুক গল্পের উপজীব্য। এই ধরণের বিদ্রূপে 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা'র ('উপলখণ্ড') কথা মনে পড়ায়।

'মাছ চুরি' গল্প প্রকৃতপক্ষে শিশুসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত। শিশুপত্রিকায় প্রথম গল্পটি পড়ি। কিন্তু সামান্য মাছ থেকে ভুল করে হিংস্র কামট জলচরকে টেনে তোলায় নাটকীয় বিন্যাস সকলেরি ভালো লাগে।

ছোট শিশুপাঠ্য গল্পটির মধ্যে প্রকৃতির উঁকিঝুঁকি চমৎকার :—

"আলো আঁধারের জাল বুনেচে নদীর পাড়ের বনে পাহাড়ে। মেঘভাঙা চাঁদের আলো পড়েচে বড় বড় মানকচু আর ছোট-গোয়ালে পাতার গায়ে। ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ বার হচ্চে বর্ষা সন্ধ্যায়। নদীজলে কেমন এক ধরণের শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকচে বনের অন্ধকার গহনে।"

শিশু-স্বভাব বিভূতিভূষণের শিশুদের জন্য যে সকল রচনা, তার মধ্যেও সাহিত্যমূল্য প্রকট। মাছধরা সম্বন্ধে লেখকের সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে 'বর্শেলের বিপদ' গল্প ('রূপহলুদ') তুলনীয়। 'খোলস' মফস্বল শহরের এক মনোবৃত্তির সার্থক রূপায়ন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মফস্বলী গল্প মনে পড়ে।

'বোতাম' গল্পটি বিভূতিভূষণের প্রেমের গল্পে স্থান পেয়েছে। প্রেম সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা পূর্ব্বেই হয়ে গেছে।

রাঁচি ও সিংভূমের আদিবাসীদের নিয়ে বিভূতিভূষণের অসংখ্য কাহিনীর এটি অন্যতম।

বিভূতিভূষণের এক পরম রমণীয় মধুর রোমান্স এই গল্পটি। আদিবাসী তরুণী চম্পু লেঝো এলিশাবা কুই হয়ে গেছে। বলিবা-গ্রামের কামিন চম্পু। নায়ক তাকে একদা ওভারসিয়ারের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে। পরে চম্পু আহত নায়ককে সেবা করে। প্রতিদানে শুধু বোতাম নেয় নায়কের জামা থেকে।

উত্তরকালে মিশনারী শিক্ষায় সুশিক্ষিতা এলিশাবা কুই হলেন চম্পু—স্বাধীন সালামৌ আদিবাসী কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট্। কুড়ি বছর আগের প্রেম সঞ্জীবিত হয়ে উঠল সাক্ষাতে।

এলিশাবা কুই বোতাম নিয়ে আসবেন—'হারাইনি।'

বিভূতি সাহিত্যে উত্তেজক ও নাটকীয় ঘটনাসংস্থানের অভাব অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু এই গল্পটির যে পটভূমিকা, তা নিয়ে বিদ্যুৎদীপ্ত উগ্র রচনার অবকাশ ছিল। ১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে সালামৌ জেলার সমগ্র বড় অঞ্চলে হুঁয়াস স্বাধীন রাজত্ব ছিল। তখনকার অবস্থা, শ্বেতাঙ্গদের বিপদ, কেমন যেন সিপাইবিদ্রোহের পটভূমিকা মনে করায়। কিন্তু লেখক ও

স্বাভাবিকের সার্থক গল্পকার এখানে দারুণ সুযোগ পেয়েও নিজের একান্ত নিজস্ব আর্ট থেকে একচুল ভ্রষ্ট হ'ন না। আমরা চন্দ্রপুর এলিশাবা তুইএ রূপান্তর একপাত্র মিছরিপানা খাবার মত অনায়াসে মেনে নেই।

বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুরে' লিখেছেন যে সজনীকান্ত দাস তাঁর আর্টটা ঠিক বুঝেছেন।

আমরাও বুঝবার চেষ্টা করেছি। তাই জানি অপার্থিব অথবা দুর্গমের সাধনা অপেক্ষা সহজ সাধনাই তাঁর মনোহারী। সারাণ্ডার ও নানাস্থানের দুর্গম জঙ্গলে তিনি বিচরণ করলেও কলমে কদম ফুল, এড়েঞ্চার ফুল বেশী আকর্ষক হত। 'স্বপ্ন বাসুদেব' ('নবাগত') গল্পটির কথা তুলনায় মনে হয়। বিভূতিভূষন নানা পরীক্ষায় নিরত থাকতেন। এই গল্পটি লিখে আমাকে বারবার পড়ে নিতে বলেছিলেন, "আমিও গ্রীকজাতীয় গল্প লিখেছি আপনার মত।" গল্প তাঁর নিজের পছন্দ হয়েছিল। গল্পে দেখলাম গ্রীক সাহিত্যের ভীষণ-মধুর গাম্ভীর্য্য রূপান্তরিত হয়েছে বিভূতি-সাহিত্যের সহজতায়। অবশ্য এই ধরণের 'মেঘমল্লার' গল্পে রস যেন জমাট। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' অপার্থিব সহজ হলেও সুন্দর।

যাই হোক, নাটকীয়তাও তাঁর কাছে ছিল প্রতিদিনের আওতার মধ্যের সহজতা। সাতটি রং মিলিয়ে রামধনু একটি শান্ত সাদা রংএ। কিন্তু রিক্তবর্ণ নয়, এরি মধ্যে সমস্ত রং থেকে যায়।

'মুখোশ ও মুখশ্রী'র চারটি গল্প, রাস্ব হাড়ি, দৈব ঔষধ, উল্টোরথ, চৌধুরাণী যেন একটু জোর করে লেখা। রচনাকার যা-যা দেখেছেন মনে সঞ্চিত হয়ে আছে, চারপাশের বড় চেনা তারা। মন থেকে কোনক্রমে বার করে ফেলা প্রয়োজন। গল্পে যারা জড়িত, তাদের কথাও বলা চাই, তাই চরিত্রগুলির মধ্যে ভারসাম্য বিতরণ অনেকক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত হয় নি। প্রধান ও অপ্রধানের বিচারভেদে নির্ভুলতার অভাবে প্রধান চরিত্রে একাগ্র ও স্থির মনোযোগ থাকে নি।

এইবার বইখানির শ্রেষ্ঠ গল্প 'বারিক্ অপেরা পার্টি' ও তাৎপর্য্যপূর্ণ গল্প 'অন্তর্জলি'র কথা আলোচনা করলেই বই শেষ হয়।

'বারিক অপেরা পার্টি' পরবর্ত্তী সার্থক ও অসামান্য লেখক তারাশঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা'র নাম স্মরণ করালেও পৃথক স্বাদের রচনা। 'কেদাররাজা'র সঙ্গে যৎসামান্য মিল পাওয়া গেলেও 'বারিক' বিভূতিভূষণের অমর সৃষ্টি। কাঁচাপাকা দাড়িওলা মুসলমান বারিক গান-বাজনার মহড়া দিয়ে অনাহার দারিদ্র্য ভুলে গলা ছেড়ে 'ভাম লটবরে'র গান গায়। পাওনাদার গাইবলদ সর্ব্বস্ব ক্রোক করে নিলেও বেহালার তার কেনে সে, ডুগী তবলা ছেয়ে নেয় মহাজনের ধার শোধ না করে। সে মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, ফাঁকিবাজ, কিন্তু কী আশ্চর্য্য মনোমোহন, প্যাক্ষেবল্!

সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ;—

লেখক হাটে খবর পেয়েছেন যে বারিক তাঁর কাছ থেকে কলাই বোনার টাকা নিয়ে ফসল উঠলে ধার শোধ না করে কলাইমুগ ইত্যাদি বেচে দিয়েছে। অতএব ক্রুদ্ধ হয়ে

তিনি যান মহেজরিন ভবনে।

—"আমার টাকা দাও"—

—"টাকা এখনও মোর হাতে আসে নি বাবু।"

—"মিথ্যে কথা।…আহম্মদ কারো পয়সা বাকী রাখবার লোক নয়। টাকা বের করো"—

বারিক নির্বিকার ভাবে আমার জন্যে তামাক সাজতে লাগলো। তামাক সাজা শেষ করে আমার দিকে কলকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে, "তামুক সেবন করুন"—

—"আমার কথার উত্তর দাও।"

—"আপনি ন্যায্য বলেছেন। টাকা ওরা দিইছিল তা সংসারের জন্য, সে টাকা মোর খরচ হয়ে গিয়েছে। তবলা ছাইতে খরচ হোল তিনটাকা। বেহালার তার এনেলাম মুকুন্দ তেলীর দোকান থেকে।"

বারিককে উপস্থিত অন্য সকলে তিরস্কার করলেও "বারিক মুখ চুন করে বসে রইল আর হাতে হাতে কলকে পরিবেশন করতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে চলে এলাম।"

শেষাংশ অতি চমকপ্রদ। সদা হাস্যমুখ বারিক ছেলে দুইটিকে নিয়ে 'সাধনসমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' পালার রিহার্সেল দিতে দিতে বড় ছেলেটি মারা গেল অকস্মাৎ।

কিন্তু 'বারিক অপেরা'র জয়যাত্রা কি শেষ হয়ে যাবে?

—"আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্ছে। পালা হচ্ছে 'সাধনসমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

গল্পটি নিজের কথা নিজেই বলেছে, অধিক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বাৎসল্য ও করুণরস বিভূতিভূষণের সহজাত বস্তু। বাৎসল্যে কখনও করুণরস মিশে অনবদ্য করে তোলে কাহিনী। করুণরস সাধারণতঃ এক সুগভীর গূঢ় অনুভূতি, চোখের জলে পথ পিছল নয়।

নাম থেকেই প্রতীয়মান যে 'অন্তর্জলি' গল্পটি করুণ। অন্ততঃ আমরা সেটুকু আশা করি। গল্পে স্বাভাবিক এবং সহজতার সাধনায় বাংলা ১২৭৮ সালে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্তীর 'অন্তর্জলি'র পরিবেশেও তাঁর স্বকীয়তা রক্ষা করা হয়েছে ও উপস্থিত জনতাকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

কবিগানের বিষয়ে পরবর্তী যুগের অনেক লেখকের কিঞ্চিৎ উপাদান যোগাবার পথিকৃৎ গল্প বলা চলে।

কবিগানের প্রচুর উদ্ধৃতি ও কবিয়ালের জীবনযাত্রার কবিজনোচিত মেজাজটি গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

কানাইহাটির নাটমন্দিরে নবাইঠাকুরের সঙ্গে দীনদয়ালের বিখ্যাত কবির লড়াইতে দীনদয়ালের সম্পূর্ণ অশ্লীলতাবর্জন ও 'ভাষা ও ভাবের মহিমায়' 'নতুন ভাবের ঢেউ' এনে দেওয়ার আখ্যানভাগে তারাশঙ্করের অমর সৃষ্টি 'কবি'র নিতাই কবিয়ালের কথা মনে পড়ে।

তবে, আনন্দের সাধনায় মত্ত সাধকের কন্ঠে আবার অত কেন ?

কিন্তু গতির দর্শনের শেষে তো তাই। অনিবার্য্য যে ছেদ, স্বাভাবিক ও সহজ রসের সাধক দেখেন চোখ মেলে। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন না।

কবিরাজ দীনদয়ালের দুঃখলাঞ্ছিত জীবন গঙ্গাঘাটে শেষ হয়।

'হিংয়ের কচুরি' (জ্যোতিরিঙ্গণ) গল্পের কুসুম তার রূপযৌবন হারিয়ে ঝি-গিরি করে। 'বহু হাজরা ও সিথিধ্বজে' ('জন্ম ও মৃত্যু') বৃদ্ধ শিল্পী নায়ক বহু হাজরা ভিখারির মত একটু খাবার চেয়ে খায়। তবু এক আশ্চর্য্য রসলোকে তারা মুক্তি পেয়েছে, লেখকের নিজস্ব রসদৃষ্টির মায়ায়—

—"কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, সেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যাবেলায় ঠোঙা হাতে হিংয়ের কচুরী নিয়ে আসে নিয়মমত।" সেখানে নির্ভীক মৃত্যুপথযাত্রী দীনদয়ালের জীবন ভরে যায় গানে, মাধুর্যে; তাঁর প্রণয়িনী বিনোদিনী বালিকার মত কৌতুকে হাসে। বিয়োগ সেখানে একজীবনের ছেদ মাত্র, সমাপ্তি নয়। লেখকের অনুরোধে পার্কে বহু হাজরার শেষ অভিনয়ে—"বহু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নট বহু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।"

এই রকম অজস্র উদাহরণ থেকে বিভূতিভূষণের আর্টের প্রকৃত রূপের একটা দিক ধরা যায়।

—"এখন বুঝেছি হারানো বসন্তের জন্যে আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের মত বসন্তের পাখীর কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার ফুরিয়ে যাবে—তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।"

('দৃষ্টিপ্রদীপ')

তাই প্রেমকে হারিয়ে ফিরে পান নায়ক চিরপ্রেমিকাকে অহর্নিশ স্বপ্নজাগরণে তার তীব্র অনুভূতির মধ্যে।

'কিন্নরদলে' তাই দেহান্তরিতা মীরাবৌদির 'অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠ ('কিন্নর দল') রেকর্ডে বাজে—

"বিরহিণী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর"—

(৫)

'নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব' গল্পগ্রন্থ পাঁচমেশালী বারোটি গল্পের সমষ্টি। প্রধানতঃ চরিত্র-কেন্দ্রিক গল্পগুলি। পূর্ব্বে বইখানির নাম ছিল 'আচার্য্য কৃপালনী কলোনী'। উক্ত নামীয় গল্পটিতে দেশবিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে জমির ক্রেতা ও জমির দর অত্যধিক বেড়ে যাওয়া, সঙ্গে প্রতারকের উদ্ভব ইত্যাদির এক রসালো কাহিনী। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকের বিভ্রান্তি নিয়ে এই গল্প রচিত হলেও বাকী কয়েকটি গল্প গ্রামের।

'নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব' নীলকরদের ইতিবৃত্ত। পরে 'ইছামতী' পুস্তকে অতিবিস্তৃত রূপ পেয়েছে অন্যান্য নীলকরদের আখ্যায়িকা।

'পথের পাঁচালী' থেকে আরম্ভ করে দিনপঞ্জীগুলির নানা স্থানে নিজগ্রামের নীলকুঠী ও তার চারিপাশে বালকের অপরিসীম কৌতূহল দেখা যায়।

অতি স্বাভাবিক এই ফালমন্ চরিত্রটি। বাংলা বলার ঢংও সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলের সাহেবদের বাংলার নিখুঁত ঢং। স্থানীয় লোকের বুলিতে অনর্গল সাহেবের বাংলা বলা অতি উপভোগ্য। প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র কথা স্মরণ করায়। সাহেবের হাস্য রসের, নীলকণ্ঠের গানের প্রতি ভক্তি, ন্যায় বিচার, স্ত্রীর আত্মার মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণ ভোজন, মহত্ব সমস্ত কিছু বাংলার প্রিয় এক পরদেশীর চিত্র। সেখানে অবশ্য নারীঘটিত দুর্বলতা, ক্রোধবশে স্বজাতীয়কে হত্যা, মামলা ধামা চাপা দেওয়া—এসব নীলকরদের আদি দুর্বলতা বিভূতিভূষণ অতিক্রম করে সাহেবকে রাতারাতি দেবত্ব দেবার প্রয়াস পান নি। কিন্তু বাংলার প্রাণের মানুষের মত এদেশেই তাঁকে 'মাটি মুড়ি' দিয়ে রেখেছিলেন। নীলকর ও বিদেশী অত্যাচারের অগণিত কাহিনীর মধ্যে ফালমন্ সাহেবের চিত্রখানি গৌরবোজ্জল এদেশের প্রতি ভালবাসায়:—

"এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়?"

অন্যান্য গল্পগুলি লেখকের দেখা চরিত্রসমূহ উদ্ঘাটনের প্রয়াস—বড়ো বাগদিনীকে তিনি ভাল করেই চেনেন; দেখেছেন গিরিবালাকে। 'মড়িঘাটের মেলা'র তুঁড়িয়াল সাধুকে জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি—তাকে লোকসেবার আগ্রহ ও করুণাকোমল হৃদয় দিয়ে।

'মড়িঘাটের মেলা'র উৎসবগন্ধে রঙীন মেলার চিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে পটচিত্রের মত খুলে ধরা হয়। শেষাংশের আধ্যাত্মিকতা বিভূতিদর্শনে মূল্যবান দৃষ্টান্ত। গিরিবালার আত্মসমর্পণার অনুরূপ আগ্রহও 'উৎকর্ণে' দেখা যায়। লেখক বিশাল ব্যাপ্তি দেখেছেন ঈশ্বরের, আবার গিরিবালার মত 'বড় নদীর একটি ক্ষুদ্র সোঁতা'রও প্রয়োজন বুঝেছেন 'ছোট্ট অজ চাষীদের গ্রামে' প্রেম-ভক্তি বিতরণের ক্ষেত্রে।

'হাজারি খুঁড়ির টাকা'য় সতীশ ঘোষ সেকালীন সততার উদাহরণ। ভদ্র ও অভদ্রেতর, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ব্যক্তির কর্তব্যজ্ঞান ও সততা যে গ্রামে ছিল বোঝা যায়। কাউকে লম্বা ভাষণের মাধ্যমে লেখক মহীয়ান করে তোলেন নি, কিন্তু সাধারণের মধ্যে যে অসাধারণের প্রকাশ, সহজ কথায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনা বালবৃদ্ধের উপভোগ্য। এই বইখানির দুইটি গল্প 'পড়ে পাওয়া' ও 'প্রত্যাবর্তন' দ্বিবিধ রসের রচনা, অর্থাৎ বালবৃদ্ধের উপভোগ্য রস। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'শিশুভোলানাথ' বা অন্যান্য শিশুপাঠ্য সাহিত্যের ন্যায় শিশু ও বয়স্কলোকের উভয়ের খোরাক।

'প্রত্যাবর্তনে' বাৎসল্য ও করুণ রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় এক ভাগ্যহীন বালকের আত্মলিপির মাধ্যমে। ধীরে ধীরে বাড়ী ফেরার পথে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ কিশোরকে

কেমন অবশ করে ফেলেছে, বর্ণনা শক্তিশালী ও সকরুণ। পুরুত-ঠাকুরের বউটুকু পুরুতগিন্নী অত্যাচারে আশ্রিত বিনোদের ক্ষেত্রে শীতল স্নেহপ্রলেপ।

'চিঠি' গল্পটি পল্লীবধূ কোনও এক 'নিরুপমা' নামধারিণীর পত্র নিয়ে নাটকীয় বিন্যাস। নায়কের পরলোকগতা প্রথমা স্ত্রীর নাম ছিল নিরুপমা। ত্রিশবৎসর পরে এই 'বানান ভুল, ভাষা ভুল, ছেদচিহ্নহীন' চিঠিখানা কি ঠিকানা খুঁজে পেল। টিপিক্যাল, পল্লীবাংলার প্রেম-পত্রখানি কৌতুকপ্রদ।

'সাহায্য' গল্পে জমাটবাঁধা মমতা। এক অনিচ্ছুক অথচ হৃদয়বান পথিকের বসন্তরোগ-কবলিত মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে রাত কাটানোর গল্প। তুচ্ছ নিয়ে লেখা কত চমৎকার হয়ে ওঠে গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়।

'প্রভাতী' আঙ্গিকের দিক থেকে ঠিক গল্প নয়, নদীর তীরে প্রভাতে লেখকের অনির্বচনীয় অনুভূতির বিশদ এবং নিখুঁত বর্ণনা।*

'জন্ম ও মৃত্যু' গল্পপুস্তকের 'অকারণ' রচনার মধ্যেও অনুরূপ অনুভূতি সর্ব প্রমাদ অতিক্রম করে আনন্দলোকে উন্নীত।

'আমার ছাত্র' গল্পটি শেষ গল্প। উল্লেখযোগ্য গল্প এটি বিভূতি-সাহিত্যে।

এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টি বিভূতিভূষণের বিশেষত্ব। সরল চাষী গণেশ মুচি তত্রকেশ। সে লেখকের ছাত্র, কয়েক-ডজন ইংরেজি শব্দ শেখার আগ্রহে দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা তার। বনফুলের 'আরোহী' মনে পড়ায়। লেখকের পাত্রপাত্রী মনোনয়নের চাবিকাঠিটি এই গল্পে আছে:—

—"ওর নিরুপকরণ ও অনাড়ম্বর সাহচর্য্যই আমার মনে একটি মৌন শিল্পিকের আবেদন বহন করে আনে।"

গণেশদাদা শিক্ষককে বলে—"আর তুমি না এলি তো চর্চ্চা হয় না, সব মুরুক্ষু—কার সঙ্গে ইন্‌জিরি বল্‌বো বলো দিকি?"

নিরক্ষর মাহিন্দরের উক্তি হাসি যোগাতে না যোগাতে তৎক্ষণাৎ বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব জীবন-দর্শনটি পেয়ে যাই শেষ ছত্রে:—

"কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশদাদা সারাজীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল।"

রবীন্দ্রকাব্যে এই দর্শনটি পাই সুমধুর সঙ্গীতে—

"জীবনে যত পূজা হোল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
আমারি অনাগত; আমারি অনাহত
তোমারি বীণাতারে বাজিছে তারা।"

এইবার দশম খণ্ডের শেষ গল্পসংকলন 'অনুসন্ধান'।

পুস্তকখানি বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে নানবিধ রচনা নিয়ে প্রকাশিত। সমালোচনা কি করব ?

প্রথম গল্প 'অনুসন্ধান' চলচ্চিত্রের কাহিনী হিসাবে রচিত হয় ১৩৫৪-এ।* অতএব এখানে সাহিত্যরস অনুসন্ধান বৃথা। 'অনুবর্তনে'র সেই সমস্ত শিক্ষক' নারাণবাবু, ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, ক্যানভাসার রাখালবাবুকে এঁদেরি পৃথক সত্তায় পাই। আদর্শবাদী নারাণবাবু এখানেও তাই, তবু তিনি বিবাহিত গৃহস্থ। মিস্টার আলম অন্য নামে উপস্থিত। স্কুলশিক্ষক জীবনের প্রমাদ ও অভাব-অভিযোগের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের সে প্রাণময় চিত্র এখানে অদৃশ্য। ধর্মতলা, মলঙ্গা লেন, মোড়ের চা-এর দোকান, সমস্ত মেশে যে প্রাণস্পন্দন, গ্রাম্য পরিবেশে পাই না সেটি। কলিকাতায় দারিদ্র্য, অনাহার থাকলেও শিক্ষকেরা যে প্রাণচঞ্চল কলকাতাকে ছেড়ে গ্রামে থাকতে পারেন না, সেই কলকাতাকে নূতন করে চিনি আমরা 'অনুবর্তনে।' অতিরিক্ত আদর্শবাদের ছোঁওয়ায় নারাণবাবু রক্ত-মাংসের মনুষ্যশ্রেণীর ঊর্ধ্বে আছেন; অতএব বোরিং এ কাহিনীতে। কিন্তু হয়তো ব্লেজেনেটখানা ফরমাসী লেখা, বেশী আলোচনা না করলেই চলে।

'চ্যাপারাম' গল্প শিশুপাঠ্য। শিশুসংকলনে অধিক আদৃত। মুজতবা আলির কাহিনী বিন্যাস ও পরিবেশ মনে পড়ে যায়।

'চান' গল্পটি বিভূতিভূষণের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত কাহিনীর পর্য্যায়ের। 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'বিরজাহোম ও তার বাধা', 'কাশী কবিরাজের গল্প', 'ভৌতিক পালঙ্ক' থেকে শুরু করে, 'ছায়াছবি' 'কবিরাজের বিপদ' 'দেবযান' ইত্যাদি নিয়ে বিভূতিভূষণের যে ভৌতিক বা-প্রেততাত্ত্বিক অভিযান, তার মধ্যে গৃহস্থরের হাসিকান্নায় কাহিনীকারকে হারিয়ে ফেলতে ভাল লাগে না। 'আরণ্যকের' মধ্যে সন্নিবিষ্ট অলৌকিক কাহিনী কিন্তু দুর্গম আরণ্য চরিত্রেরই এক অংশ বলে চমৎকার মানানসই।

বন্ধুর নাইরোবির শ্মশানে বাবা-ঝিএর পালিতা কন্যার টানে তার চিতার পাশে ভৌতিক দেহে দৃশ্যমান হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে নিরুত্তর থাকাই ভাল। মনে রাখতে হবে যে এটি গল্প। বিভূতিভূষণের ভৌতিক ও অলৌকিক কাহিনী যথেষ্ট জনপ্রিয়। ত্রৈলোক্যনাথের পথচারী তিনি ভূতত্ত্বে মনে হয়।

বিভূতিভূষণ 'দেবযান' উপন্যাসখানি আমাকে পড়তে বলে মতামত চান। যে অলৌকিক লোকের কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন সেই দিব্যলোক ও দেহহীন সত্তার বর্ণনায় দুর্বোধ ও রহস্যের অভাব রচনায় আছে বলে মনে করেছিলাম। তাছাড়া আমার প্রত্যয় ছিল না।

বিভূতিভূষণ আমার মাতা লেখিকা গিরিবালাদেবীকে জানিয়েছিলেন যে পরকাল ও অতীন্দ্রিয়লোক সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

কাজেই এইটুকু বলা চলে যে তাঁর লিখিত বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ছিল।

গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প 'বাচাই'। 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থে' ইংরাজি অনুবাদে মুদ্রিত হয়।

গ্রামের চিরন্তন পরিবেশে স্বামীহীনা ননীবালা পুত্র সুরেশকে নিয়ে একুশ বৎসর পরে ফিরে প্রতিমুহূর্তে স্মৃতির পীড়নে স্বামীবিরহে ম্রিয়মাণ।

ধীরে ধীরে গল্পটি ক্লাইম্যাক্সে শেষ হয়। দীর্ঘজীবী চাটুজ্যে মশায়ের স্ত্রীপুত্র থাকতেও নিঃসঙ্গ অনাথ জীবন। তুলনা করে ননীবালা অবশেষে শান্তি পান যে ভালই হয়েছে, তিনি 'সহযানে' চলে গেছেন। শেষের তো এই শেষ?

মধুক্ষরা লেখনী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মস্তিষ্কের শ্রম নেই, অথচ হৃদয় ভরে ওঠে। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ যেমন মোলায়েম রেশমের স্পর্শে, তেমনি সুকোমল নিবিড় স্বস্তি পাই আমরা বিভূতিভূষণের সাহিত্যলোকে। সাহিত্য এখানে আনন্দবাহক বাস্তব অনুভূতি। অনেকদিনের চেনা, অনেকদিনের পড়া একত্রিত করে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার এই অক্ষম প্রয়াস আমার ভূমিকা লেখা নয়—সেই অসাধারণ প্রতিভাধরের উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাণী রায়

'দুই বাড়ী' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা

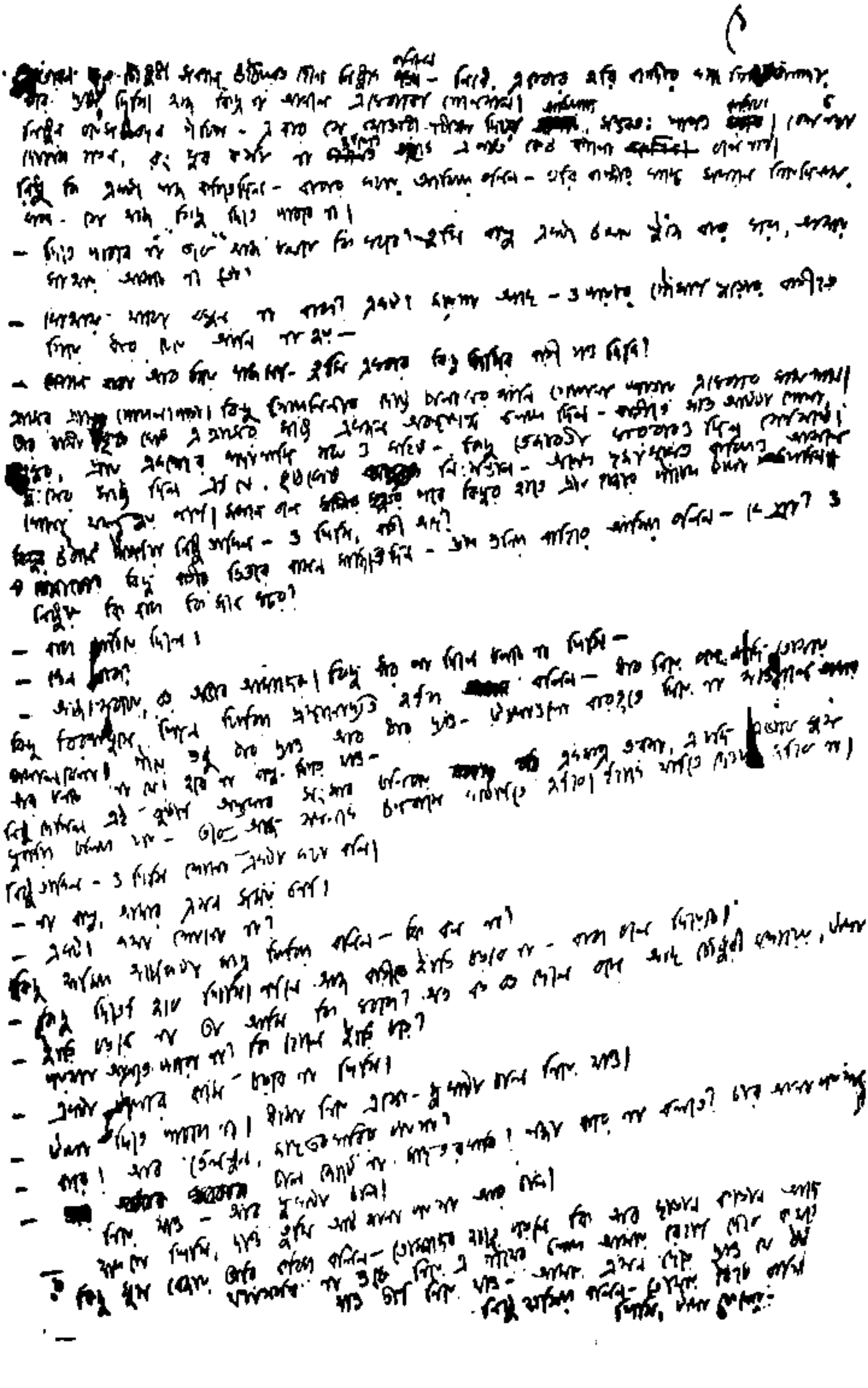

দুই বাড়ী

রামতারণ চৌধুরী সকালে উঠিয়া বড় ছেলে নিধুকে বলিলেন—নিধে, একবার হরি বাগ্‌চীর কাছে গিয়ে তাগাদা করে দ্যাখ দিকি। আজ কিছু না আনলে একেবারেই গোলমাল।

নিধুর বয়স পঁচিশ, এবার সে মোক্তারী পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সম্ভবত পাশও করিবে। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন, রঙ খুব ফরসা না হইলেও তাহাকে এ পর্যন্ত কেউ কালো বলে নাই। নিধু কি একটা কাজ করিতেছিল, বাবার কথায় আসিয়া বলিল—সে আজ কিছু দিতে পারবে না।

—দিতে পারবে না তো আজ চলবে কি করে? তুমি বাপু একটা উপায় খুঁজে বার কর, আমার মাথায় তো আসচে না।

—কোথায় যাব বলুন না বাবা? একটা উপায় আছে—ও পাড়ার গোঁসাই-খুড়োর বাড়ীতে গিয়ে ধার চেয়ে আনি না হয়—

—সেখানে বাবা আর গিয়ে কাজ নেই—তুমি একবার বিন্দুপিসীর বাড়ী যাও দিকি।

গ্রামের প্রান্তে গোয়ালাপাড়া। বিন্দু গোয়ালিনীর ছোট্ট চালাঘরখানি গোয়ালাপাড়ার একেবারে মাঝখানে। তাহার স্বামী কৃষ্ণ ঘোষ এ গ্রামের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল—বাড়ীতে সাত-আটটা গোলা, পুকুর, প্রায় একশোর কাছাকাছি গরু ও মহিষ—কিছু তেজারতি কারবারও ছিল সেই সঙ্গে। দুঃখের মধ্যে ছিল এই যে কৃষ্ণ ঘোষ নিঃসন্তান—অনেক পূজামানত করিয়াও আসলে কোনো ফল হয় নাই। সকলে বলে স্বামীর মৃত্যুর পর বিন্দুর হাতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা পড়িয়াছিল।

বিন্দুর উঠানে দাঁড়াইয়া নিধু ডাকিল—ও পিসী, বাড়ী আছ?

বিন্দু বাড়ীর ভিতর বাসন মাজিতেছিল, ডাক শুনিয়া আসিয়া বলিল—কে গা? ও নিধু! কি বাবা কি মনে করে?

—বাবা পাঠিয়ে দিলে।

—কেন বাবা?

—আজ খরচের বড় অভাব আমাদের। কিছু ধার না দিলে চলছে না পিসী।

বিন্দু বিরক্তমুখে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল—ধার নিয়ে বসে আছি তোমার সকালবেলা। গাঁয়ে শুধু ধার দাও আর ধার দাও—টাকাগুলো বারোভূতে দিয়ে না খাওয়ালে আমার আর চলছে না যে! হবে না বাপু, ফিরে যাও—

নিধু দেখিল এই বুড়িই অদ্যকার সংসার চলিবার একমাত্র ভরসা, এ যদি এভাবে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়—তবে আজ সকলকে উপবাসে কাটাইতে হইবে। ইহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিধু ডাকিল—ও পিসী, শোনো একটা কথা বলি।

—না বাপু, আমার এখন সময় নেই।

—একটা কথা শোনো না।

বিন্দু একটু থামিয়া অর্দ্ধেকটা ফিরিয়া বলিল—কি বল না?

—কিছু দিতে হবে পিসী। নইলে আজ বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না বাবা বলে দিয়েচে।

—হাঁড়ি চড়বে না তো আমি কি করব? এত বড়-বড় ছেলে বসে আছ চৌধুরী মশাইয়ের, টাকা-পয়সা আনতে পার না? কি হলে হাঁড়ি চড়ে?

—একটা টাকার কমে চড়বে না পিসী।

—টাকা দিতে পারব না। ধামা নিয়ে এস—দু-কাঠা চাল নিয়ে যাও।

—বা রে! আর তেল-নুন মাছ-তরকারির পয়সা?

—চাল জোটে না—মাছ-তরকারি! লজ্জা করে না বলতে? চার-আনা পয়সা নিয়ে যাও আর দু'কাঠা চাল।

—যাকগে পিসী, দাও তুমি আট-আনা পয়সা আর চাল।

বিন্দু মুখ ভারি করিয়া বলিল তোমাদের হাতে পড়লে কি আর ছাড়ান-কাড়ান আছে বাবা? যথাসর্ব্বস্ব না শুষে নিয়ে এ গাঁয়ের লোক আমায় রেহাই দেবে কখনো? যাও তাই নিয়ে যাও—আমায় এখন ছেড়ে দাও যে বাঁচি।

নিধু হাসিয়া বলিল—তোমায় বেঁধে রাখিনি তো পিসী—টাকা ফেল—ছেড়ে দিচ্ছি।

বিন্দু সত্যিই বাড়ীর ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া নিধুর হাতে দিয়া বলিল—যাও, এখন ঘাড় থেকে নেমে যাও বাপু যে আমি বাঁচি—

নিধু হাসিয়া বলে—তা দরকার পড়লে আবার ঘাড়ে এসে চাপব বৈকি!

—আবার চাপলে দেখিয়ে দেব মজা। চেপে দেখ কি হয়—

নিধু বাড়ী আসিয়া বাবার হাতে টাকা দিয়া বলিল—বিন্দুপিসীর সঙ্গে একরকম ঝগড়া করে টাকা নিয়ে এলাম বাবা। এখন কি ব্যবস্থা করা যাবে?

পিতাপুত্রের কথা শেষ হয় নাই এমন সময় পথের মোড়ে গ্রামের ছহু জেলেকে মাছের ডালা মাথায় যাইতে দেখা গেল। রামতারণ হাঁক দিলেন—ও বাবা ছহু, শুনে যা—কি মাছ, ও ছহু?

ছহু জেলে ইহাদের বাড়ীর ত্রিসীমা ঘেঁষিয়া কখনো যায় না। সে বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছে এ বাড়ীতে ধার দিলে পয়সা পাইবার কোনো আশা নাই। আজ রামতারণের একেবারে সামনে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া উঠিল। রামতারণ পুনর্ব্বার হাঁক দিলেন—ও ছহু, শোনো বাবা—কি মাছ?

ছহু অগত্যা ঘাড় ফিরাইয়া এদিকে চাহিয়া বলিল—খয়রা মাছ—

—এদিকে এস, দিয়ে যাও—

গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেয়াদবি করা ছহুর সাহসে কুলাইল না, নয়তো মনের মধ্যে অনেক কড়া কথা রামতারণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে জমা হইয়া ছিল।

সে কাছে আসিয়া ডালা নামাইয়া কহিল—কত সের মাছ নেবেন?

—দাও আনা দুইয়ের—দেখি—বলিয়া রামতারণ চুপড়ির ভিতর হইতে নিজেই বড়-বড়

মাছ বাছিয়া তুলিতে লাগিলেন। ছিহু বলিল—আর নেবেন না বাবু, দু-আনার মাছ হয়ে গিয়েচে—

—বলি কাউ তো দিবি? দু-আনার মাছ একজায়গায় এক সঙ্গে নিচ্চি, কাউ দিবিনে?

মাছ দিয়া ডালা তুলিতে-তুলিতে ছিহু বিনীতভাবে বলিল—বাবু, পয়সাটা?

রামতারণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—সে কি রে? সকালবেলা নাইনি ধুইনি, এখন বাক্স ছুঁয়ে পয়সা বার করব কি করে? তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল রে ছিহু?

ছিহু মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিল—না, না, তা বলিনি বাবু, তবে আর-দিনের পয়সাটা তো বাকি আছে কিনা। এই সবসুদ্ধ সাড়ে-চার আনা পয়সা এই দুদিনের—আর ওদিকের দরুন ন-আনা।

রামতারণ তাচ্ছিল্যের ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—যা, এখন যা—ওসব হিসেবের সময় নয় এখন।

গ্রামের ভদ্রলোক বাসিন্দা যাঁরা, তাঁরা চিরকাল এইভাবে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে কখনো চোখ রাঙাইয়া কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ধারে জিনিসপত্র খরিদ করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন—ইহা এ গ্রামের সনাতন প্রথা। ইহার বিরুদ্ধে আপীল নাই। সুতরাং ছিহু মুখ বুজিয়া চলিয়া যাইবে ইহাই নিশ্চিত, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা রামতারণ চৌধুরী কাছারীবাড়ীর ডাক পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন ছিহু তাহার প্রাপ্য পয়সার জন্য কাছারীতে নালিশ করিয়াছে। কাছারীর নায়েব দুর্গাচরণ হালদার—ব্রাহ্মণ, বাড়ী নদীয়া জেলায়। এই গ্রামের কাছারীতে আজ দশ-বারো বছর আছেন। নায়েবমহাশয়ের হাঁকডাক এদিকে খুব বেশি, সুবিবেচক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকায় জেলা কোর্টে আজ বছর কয়েক জুরি নির্বাচিত হইয়াছেন।

অজ্ঞ প্রজাদের কাছে তিনি গল্প করেন—বাপু হে, সাতদিন ধরে জেলায় ছিলাম—মস্ত বড় খুনী মামলা। আসামীর ফাঁসি হয়-হয়, কেউ রদ করতে পারত না। আমি সব দিক শুনে ভেবে-চিন্তে বললাম, তা হয় না, এ লোক নির্দোষ। জজসাহেব বললেন, নায়েবমশায়ের কথা ঠিক, আমি আসামীকে খালাস দিলাম, এক কথায় খালাস হয়ে গেল—

রামতারণ কিছু বলিবার পূর্বেই নায়েবমহাশয় বলিলেন—চৌধুরীমশায়, এসব সামান্য জিনিস আমাদের কাছে আসে, এটা আমরা চাইনে। ছিহু বলছিল, সে নাকি আপনার কাছে অনেকদিন থেকে মাছের পয়সা পাবে?

রামতারণ গলা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন—তা আমি কি দেব না বলেচি?

—না, তা বলেননি। কিন্তু ও বেচারাও তো গরীব, কতদিন ধার দিয়ে বসে থাকতে পারে? দু-একদিনের মধ্যে শোধ করে দিয়ে দিন। আচ্ছা, যা, ছিহু তোর হয়ে গেল, তুই যা—

হরু চলিয়া গেলে রামতারণ বলিলেন—বেশ তো নিশ্চয়ই, তবে আজকাল একটু ইয়ে—একটু টানাটানি যাচ্ছে কিনা—

—সে আমার দেখবার দরকার নেই চৌধুরীমশায়। নালিশ করতে এসেছিল পয়সা পাবে, আমি নিষ্পত্তি করে দিলাম দুদিনের মধ্যে ওর পয়সা দিয়ে দেবেন—মিটে গেল।

—দুদিন নয়, এক হপ্তা সময় দিন নায়েবমশায়, এই সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে—

—কত পয়সা পাবে? দাঁড়ান, সাড়ে-বারো আনা মোট বোধ হয়। এই নিন একটা টাকা—ওর দাম চুকিয়ে দিন। ও ছোটলোক, একটা কড়া কথা যদি বলে, ভদ্রলোকের মানটা কোথায় থাকে বলুন তো? ওর দেনা শোধ করুন, আমার দেনা আপনি যখন হয় শোধ করবেন।

রামতারণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হইল নায়েবমশায়কে তাঁহার সংসারের সব দুঃখ খুলিয়া বলেন। বলেন—নায়েবমশায় কি করব, বড় কষ্টে পড়েছি। দুবেলা খেতে অনেকগুলি পুষ্যি, বড় ছেলেটি সবে পাশ করেছে, এখনো কিছু রোজগার করে না। আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি—জমিজমাও এমন কিছু নেই তা আপনি জানেন—যা সামান্য আছে তাতে সংসার চলে না। এই সব কারণে অনেক হীনতা স্বীকার করতে হয়, নইলে সংসার চলে না নায়েবমশায়—

মনে-মনে এই কথাগুলি কল্পনা করিয়া রামতারণের চক্ষে জল আসিল। মুখে অবশ্য তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না, নায়েবমহাশয়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলেন।

এমন অপমান তিনি জীবনে কখনো হন নাই—শেষে কিনা জমিদারী-কাছারীতে হরু জেলে তাঁহার নামে করিল নালিশ!

কালে-কালে সবই সম্ভব হইয়া উঠিল—রামতারণের বাল্যকালে বা যৌবন-বয়সে গ্রামে এরূপ একটি ব্যাপার সম্ভবই ছিল না। সে দিন আর নাই।

নিধু পিতার পদধূলি লইয়া বলিল—তাহলে যাই বাবা—

রামতারণের চোখে জল আসিল। বলিলেন—এস বাবা, সাবধানে থেকো। যা তা খেও না—আমি যদুবাবুকে লিখে দিলাম তিনি তোমাকে দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবেন, মুলুক-সন্ধান দেবেন। অত বড়লোক যদিও আজ তিনি, এক সময়ে দুজনে একই বাসায় থেকে পড়াশুনো করেছি। তিনিও গরীবের ছেলে ছিলেন, আমিও তাই। গাড়ী যেন একটু সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যায় দেখো।

কথাটা ঠিক বটে, তবে রামতারণ যে গরীব সেই গরীবই রহিয়া গিয়াছেন, যদু বাঁড়ুয্যে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিষয়-আশয় এবং নগদ টাকায় বর্তমানে মহকুমা আদালতের মোক্তার-বারের শীর্ষস্থানীয়। যদু বাঁড়ুয্যের বাড়ী প্রাসাদোপম না হইলেও নিতান্ত ছোট নয়, যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সারা টাউনের মধ্যে অমন

ফ্যাশানের বাড়ী একটিও ছিল না—আজকাল অবশ্য অনেক হইয়াছে।

নিধু ফটকের সামনে গরুর গাড়ী রাখিয়া কম্পিতপদে উঠান পার হইয়া বৈঠকখানাতে ঢুকিল। মহকুমার টাউনে তার যাতায়াত খুবই কম—কারণ সে লেখাপড়া করিয়াছে তাহার মামা-বাড়ীর দেশ কবিলপুরে। যদু বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে সে কখনো দেখে নাই।

সকালবেলা। পসারওয়ালা মোক্তার যদু বাঁড়ুয্যের সেরেস্তায় মক্কেলের ভিড় লাগিয়াছে। কেহ বৈঠকখানার বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ-কেহ নিজ সাক্ষীদের সঙ্গে মকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে।

নিধু ভিড় দেখিয়া ভাবিল, ভগবান যদি মুখ তুলিয়া চান, তবে তাহারও মক্কেলের ভিড় কি হইবে না?

যদুবাবু সামনেই নথি পড়িতেছিলেন, নিধু গিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। যদুবাবু নথি হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে আমি কুন্দুনগাছির রামতারণ চৌধুরীর ছেলে। এবার মোক্তারী পাশ করে প্র্যাকটিস করব বলে এসেছি এখানে। বাবা আপনার নামে একটা চিঠি দিয়েছেন—

যদুবাবু একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—রামতারণের ছেলে তুমি? মোক্তারী পাশ করেচ এবার? লাইসেন্স পেয়েচ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাসা ঠিক আছে?

—কিছুই ঠিক নেই। আপনার কাছে সোজা আসতে বলে দিলেন বাবা। আমাদের অবস্থা সব তো জানেন—

যদুবাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন—তাইতো, বাসা ঠিক কর নি? তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসেচ নাকি? কোথায় সেসব?

—আজ্ঞে, গাড়ীতে রয়েছে।

যদুবাবু হাঁকিয়া বলিলেন—ওরে লখাই, ও লখাই, বাবুর জিনিসপত্তর কি আছে নামিয়ে নিয়ে আয়। বাবাজি তুমি এখানেই এবেলা খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

নিধু বিনীতভাবে জানাইল যে সে বাড়ী হইতে আহারাদি করিয়াই রওনা হইয়াছে।

—এত সকালে? এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ? রাত থাকতে উঠে না খেলে তো তুমি কুন্দুনগাছি থেকে এতটা পথ গরুর গাড়ী করে আসতে পারোনি।

—আজ্ঞে, মা বললেন হবিষ্যান্ন করে বেরুতে হয়, তাই ঘরে পাতা দই দিয়ে দুটো ভাত খেয়ে ভোরবেলা—

—হুঁ, তা বটে। তবে কথা কি জানো বাবা, সব বাজে। ও হবিষ্যান্নও বুঝিনে, কিছুই বুঝিনে—বরাতে না থাকলে হবিষ্যান্ন কেন, তোমার ও সোমযাগ, বাজপেয়যজ্ঞতেও কিছু করার যো নেই, বুঝলে বাবা?

কথা শেষ করিয়া বদু বাঁড়ুয্যে চারিপাশে উপবিষ্ট মুহুরী ও মক্কেলবৃন্দের প্রতি সগর্ব দৃষ্টি ঘুরাইয়া আনিলেন। পরে আবার বলিলেন—এই মহকুমায় প্রথম যখন প্র্যাকটিস করতে এসেছিলাম—সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। একটা ঘটি আর একটা বিছানা সম্বল ছিল। কেউ চিনত না, শ্যাম সাউদের খড়ের বাড়ী তিন টাকা মাসিক ভাড়ায় এক বছরের জন্য নিয়ে মোক্তারী শুরু করি। তারপর কত এল কত গেল আমার চোখের সামনে, আমি তো এখনো যাহোক টিকে আছি।

একজন মক্কেল বলিল—বাবু, আপনার সঙ্গে কার কথা? আপনার মতো পসার জেলার কোর্টে কজনের আছে?

অনেকেই মোক্তারবাবুর মন যোগাইবার জন্য একথায় সায় দিল।

বদু-মোক্তার নিধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাবাজি, সারা পথ গরুর গাড়ীতে এলেচ, তোমাদের গ্রাম তো এখেনে নয় সেখানে যাওয়ার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া সোজা। একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর কথাবার্তা হবে এখন বিকেলে।

মহকুমার টাউন থেকে কুড়ুলগাছি পাঁচ মাইল পথ। নিধু মাঝে-মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে, স্বাস্থ্য তত ভালো নয়, এইটুকু পথ আসিয়াই সত্যই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বদু বাঁড়ুয্যের বৈঠকখানায় ফরাসের উপর শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে বদুবাবু কোর্ট হইতে ফিরিলেন, গায়ে চাপকান, মাথায় শামলা, হাতে এক তাড়া কাগজ। নিধুকে বলিলেন—চা খাও তো হে? বস, চা দিতে বলি—

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—থাক, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না কাকাবাবু।

—বিলক্ষণ, বস আসচি—

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চাকর আসিয়া নিধুকে বলিল—কর্তাবাবু ডাকচেন বাড়ীর মধ্যে।

নিধু সসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল চাকরের পিছু-পিছু। বদুবাবু রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে আর একখানা পিঁড়ি পাতা।

বদুবাবু রান্নাঘরের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওগো, এই এসেচে ছেলেটি। খাবার দাও।

মোক্তারগৃহিণী আধ-ঘোমটা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেই নিধু তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি তাহার পাতে গরম লুচি, বেগুনভাজা ও আলুর তরকারি দিয়া গেলেন। নিধু চাহিয়া দেখিল, বদুবাবু মাত্র এক বাটি সাবু খাইতেছেন।

নিধু ভাবিল, ভদ্রলোকের নিশ্চয় আজ জ্বর হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—কাকাবাবু, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? সাবু খাচ্ছেন যে?

মোক্তারগৃহিণী এবার জবাব দিলেন—বাবা, ওঁর কথা বাদ দাও। বারোমাস সাবু জলখাবার দুবেলা।

বদুবাবু বলিলেন—হজম হয় না বাবাজি, আর হজম হয় না। আর কি তোমাদের বয়েস

আছে ? এই এক বাটি সাবু খেলাম, রাত্রে আর কিছু না। বড্ড খিদে পায় তো দুখানি রুটির কটি আর একটু মাছের ঝোল। তা সব দিন নয়।

নিধু এবার সত্যিই অবাক হইল। সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শখ করিয়া যে কেউ সাবু খায়, ইহা সে দেখে নাই। তাহার বাবাও তো যদুবাবুর সমবয়সী, তিনি এখনো যে পরিমাণে আহার করেন, যদুবাবু দেখিলে নিশ্চয়ই চমকাইয়া যাইবেন।

জলযোগের পরে বাহিরের ঘরে আসিতেই চাকর কলসিতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। যদুবাবু তামাক টানিতে-টানিতে বলিলেন—তারপর একটা কথা জিগ্যেস করি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না, মোক্তারী করতে এলে, সঙ্গে কত টাকা এনেচ ?

নিধু প্রশ্নের উত্তর ভালো বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আজ্ঞে টাকা ? কিসের টাকা ?

—বসে-বসে খেতে হবে তো, খরচ চালাতে হবে না ?

—আজ্ঞে তা বটে। টাকা সামান্য কিছু—ইয়ে—মানে হাতে আছে কিছু। চাল এনেচি দশ সের বাড়ী থেকে—তাই খাব। . .

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন—বাবাজি, একেই বলে ছেলেমানুষ। দশ সের চাল তোমার বাবা তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েচেন খাবার জন্যে। অর্থাৎ এই চাল কটা ফুরোবার আগেই তুমি রোজগার করতে আরম্ভ করে দেবে, এই কথা তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বাবা সেই ভেবেই দিয়েচেন।

নিধু সব কথা ভাঙিয়া বলিল না। এক টাকার ধান ধারে কিনিয়া আনিয়া নিধুর সৎমা চালগুলি কাল সারা বিকেলবেলা ধরিয়া ভানিয়া কুটিয়া তৈরি করিয়া দিয়াছেন। নিধুর আপন মা নাই, আজ প্রায় পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্ব্বে নিধুর বাল্যকালেই মারা গিয়াছেন।

যদুবাবু বলিলেন—বাবা, খেজুর গাছ ভেলপানা নয়। তোমার বাবা যা ভেবেচেন তা নয়। সেকাল কি আর আছে বাবাজি ? আমরা যখন প্রথম বসি প্র্যাকটিসে—সে কাল গিয়েচে। এখন ওই কোর্টের অশথতলায় গিয়ে ভাখো—একটা লাঠি মারলে তিনটে মোক্তার মরে। কারো পসার নেই। আবার কেউ-কেউ কোটপ্যান্ট পরে আসে—মক্কেল কিছুতেই তোলে না—

নিধুর মুখে নিরাশার ছায়া পড়িতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—না, না, তুমি তা বলে বাড়ী ফিরে যাও আমি তা বলিনি। ছেলে-ছোকরা, দমবে কেন ? আমি বলচি কাজ খুব সহজ নয়। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কাল গিয়েচে। লেগে যাও কাজে—আমি যতদূর পারি সাহায্য করব। তবে একটি বছর কলসীর জল গড়িয়ে খেতে হবে।

—আজ্ঞে, কলসীর জল ?

—তাই। বাড়ী থেকে জমানো টাকা এনে খরচ করতে হবে বাবাজি। দশ সের চালে কুলুবে না। রাগ কোরো না বাবাজি। অবস্থা গোপন করে তোমাকে মিথ্যে আশা না দেওয়াই ভালো। আমি স্পষ্টবাদী লোক। বাসা ভাড়া দিতে পারবে কত ?

—আজ্ঞে, দু-তিন টাকার মধ্যে যাতে হয় তাই করে নেব। তার বেশি দেবার ক্ষমতা

নেই। বাবার অবস্থা সব জানেন তো আপনি।

যদুবাবু বলিলেন—আচ্ছা, সস্তায় একটা বাসা তোমায় দেখে দেব এখন। দু-চারদিন এখান থেকে কোর্টে যাতায়াত করতে পারতে অনায়াসেই কিন্তু তাতে তোমার পসার হবে না। উকীল মোক্তার নিজের বাসায় না থাকলে সম্মান হয় না। তোমার ভবিষ্যৎটা তো দেখতে হবে।

সেদিন যদুবাবু নিধুর জন্যে একটা ছোট বাসা পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঠিক করিয়া দিলেন।

যদু বাঁড়ুয্যের খাতিরে নিধু দু-একটি মক্কেল পাইতে আরম্ভ করিল। নিধু বড় মুখচোরা ও লাজুক, প্রথম-প্রথম কোর্টে দাঁড়াইয়া হাকিমের সামনে কিছু বলিতে পারিত না—মনে হইত এজলাস সুদ্ধ মোক্তারের দল তাহার দিকে চাহিয়া আছে বুঝি। ক্রমে ক্রমে তাহার সে ভাব দূর হইল। যদুবাবু তাহাকে কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—দাখ, জেরা ভাল না করতে পারলে ভালো মোক্তার হওয়া যায় না। জেরা করাটা ভাল করে শেখবার চেষ্টা কর। যখন আমি কি হরিহর নন্দী জেরা করব, তুমি মন দিয়ে শুনো, উপস্থিত থেকে সেখানে।

নিধু কিন্তু এক বিষয়ে বড় অসুবিধায় পড়িল।

যদুবাবুর সেরেস্তায় সকালে সে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া দেখিত—মক্কেলকে তিনি বড় মিথ্যা কথা বলিতে শেখান। আসামী, ফরিয়াদী বা সাক্ষীদের তিনঘণ্টা ধরিয়া মিথ্যা কথায় তালিম না দিয়া তাঁহার কোনো মোকর্দ্দমা তৈরি হয় না।

একদিন সে বলিল—কাকাবাবু, একটা কথা বলব?

—কি বল?

—ওদের অত মিথ্যা কথা শেখাতে হয় কেন?

—না শেখালে জেরায় মার খেয়ে যাবে যে।

—সত্যি কথা যা তাই কেন বলুক না?

—তাতে মোকর্দ্দমা হয় না বাবাজি। তা ছাড়া অনেক সময় সত্যি কথাই ওদের বার বার শেখাতে হয়। শিখিয়ে না দিলে ওরা সত্যি কথা পর্য্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারে না। আমাদের ওপর অবিচার কোরো না তোমরা—এমন অনেক সময় হয়, মক্কেলে বাপের নাম পর্য্যন্ত মনে করতে পারে না কোর্টে দাঁড়িয়ে। না শেখালে চলে?

—আমাকেও অমনি করে শেখাতে হবে?

—যখন এ পথে এসেচ, তা করতে হবে বৈকি। আর একটা কথা শিখিয়ে দিই, হাকিম চটিও না কখনো। হাকিম চটিয়ে তোমার খুব ইস্পিরিট দেখানো হল বটে, কিন্তু তাতে কাজ পাবে না। হাকিম চটালে নানা অসুবিধে। মক্কেল যদি জানে, অমুক মোক্তারের ওপর হাকিম সন্তুষ্ট নয়—তার কাছে কোনো মক্কেল ঘেঁষবে না।

নিধু মাসখানেক মোক্তারী করিয়া যদুবাবুর দৌলতে গোটা পনেরো টাকা রোজগার করিল। তার বেশির ভাগই জামিন হওয়ার ফি বাবদ রোজগার। যদুবাবু দয়া করিয়া তাহাকে দিয়া জামিন-নামা সই করিয়া লইয়া মক্কেলের নিকট ফি পাওয়াইয়া দিতেন।

একদিন একটি মক্কেল আসিয়া তাহাকে মারপিটের এক মোকর্দমায় নিযুক্ত করিতে চাহিল।

নিধু জিজ্ঞাসা করিল—অপরপক্ষে কে আছে জানো?

—আজ্ঞে যদু বাঁড়ুয্যে—

নিধু মুখে কিছু না বলিলেও মনে-মনে আশ্চর্য্য হইল। প্রবল প্রতাপ যদু বাঁড়ুয্যের বিপক্ষে তাহার মতো জুনিয়র মোক্তার দেওয়ার হেতু কি? লোকটি তো অনায়াসে যদু বাঁড়ুয্যের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীণ মোক্তার হরিহর নন্দী কিংবা অন্নদা ঘটক অভাবপক্ষে মোজাহার হোসেনের কাছেও যাইতে পারিত।

কথাটা ভাবিতে-ভাবিতে সে কোর্টে গিয়া যদু বাঁড়ুয্যেকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া ফেলিল।

যদুবাবু বলিলেন—ও, ভালোই তো বাবাজি। কিন্তু তোমার মক্কেলের মনের ভাব কি জানো না তো? আমি বুঝেচি।

—কি কাকাবাবু?

—আমি তোমাকে স্নেহ করি, এটা অনেকে জেনে ফেলেচে। তোমাকে কেস দেওয়ার মানে—আমি বিপক্ষের মোক্তার, কেসে মিটমাটের সুবিধে হবে।

—কেস মেটাতে চায়?

—নিশ্চয়ই। নইলে তোমাকে মোক্তার দিত না। অন্য মোক্তারের কথা যদি আমি না শুনি? যদি কেস চালাবার জন্যে মক্কেলকে পরামর্শ দিই? এই ভয়ে তোমাকে মোক্তার দিয়েচে। ভালো তো। ওর কাছে থেকে বেশ করে দু-চারদিন কি আদায় কর, দু-চারদিন তারিখ পাল্টে যাক—হাতে কিছু আসুক—তারপর মিটমাটের চেষ্টা দেখলেই হবে।

—বড্ড অধর্ম্ম হবে কাকাবাবু—আজই কেন কোর্টে মিটমাটের কথা হোক না?

—তাহলেই তুমি মোক্তারী করেচ বাবা! মাইনর পাশ করে সেকালে মোক্তারীতে ঢুকেছিলাম—আর চুল পাকিয়ে ফেললাম এই কাজ করে। তুমি এখনো কাঁচা ছেলে—যা বলি তাই শোনো। তোমার মক্কেল মিটমাটের কথা কিছু বলেচে?

—আজ্ঞে না।

—তবে তুমি ব্যস্ত হও কেন এখুনি? আগে বলুক, তারপর দেখা যাবে।

একমাস শহরে মোক্তারী করিয়া নিধু বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যদু মোক্তার বলিলেন—বাবাজি, সোমবার যেন কামাই করো না। শনিবারে যাবে, সোমবারে আসবে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আসবে। নতুন প্র্যাকটিসে ঢুকে কামাই করতে নেই একেবারে।

নিধু 'যে আজ্ঞে' বলিয়া বিদায় লইয়া মোক্তার-লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া নিজের বাসায় আসিল। অনেকদিন পরে বাড়ী যাইতেছে কাল—ভাইবোনগুলির জন্য কি লইয়া যাওয়া যায়? বাবার জন্য অবশ্য ভালো তামাক খানিকটা লইতেই হইবে। মায়ের জন্যই বা কি লওয়া উচিত?

সারাদিন ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সকলের জন্যই কিছু না কিছু সস্তাদামের সওদা করিল এবং শনিবার কোর্টের কাজ মিটিলে বড় একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া হাঁটাপথে বাড়ী রওনা হইল। পাঁচ-ছ ক্রোশ পথ—গাড়ী একখানা দুই-টাকা আড়াই-টাকার কমে যাইতে চাহিবে না—অত পয়সা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতে সে প্রস্তুত নয়।

বর্ষাকাল।

সারাদিন কালো মেঘে আকাশ অন্ধকার, সজল বাদলার হাওয়ায় ভ্রমণে ক্লান্তি আনে না—পথের দুপাশে ঘন সবুজ দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত,- আউশ ধানের কচি জাওলার প্রাচুর্য্যে চোখ জুড়াইয়া যায়। তবে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কাঁচা রাস্তায় বড় কাদা—জোরে পথ হাঁটা যায় না মোটেই।

এক জায়গায় পথের ধারে বড় একটা পুকুর। পুকুরে অন্য সময় তত জল থাকে না, এখন বর্ষার জল পাড়ের কানায়-কানায় ঘাসের জমি ছুঁইয়া আছে, জলে কচুরিপানার নীলফুল, ওপারে ঘন নিবিড় বনঝোপে তিৎপল্লার হলুদ রঙের ফুল।

নিধুর ক্ষুধা পাইয়াছিল—সঙ্গে একটা ঠোঙায় নিজের জন্য কিছু মুড়কি কিনিয়া আনিয়াছিল। মোক্তারবাবুর যেখানে-সেখানে বসিয়া খাওয়া উচিত নয়—সে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঠোঙা হইতে মুড়কি বাহির করিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিল।

বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গে সে তাহাদের গ্রামের পাশের গ্রাম সন্দেশপুরে ঢুকিল।

সন্দেশপুর চাষা গাঁ—রাস্তার ধারে তালের গুঁড়ির খুঁটি লাগানো মক্তবঘর, মক্তবের মৌলবী সাহেব তখনো ছাত্রদের ছুটি দেন নাই—যদিও আজ শনিবার—তাহারা মক্তবঘরের সামনের প্রাঙ্গণে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে নামতা পড়িতেছে।

মৌলবী ডাকিলেন—ও নিধিরাম, শুনে যাও হে—

মৌলবী সাদা-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার চেয়েও বয়সে বড়। নিধিরামকে তিনি এতটুকু দেখিয়াছেন।

নিধিরাম দাঁড়াইয়া বলিল—আর বসব না মৌলবী সাহেব, যাই—বেলা নেই আর। এখনো ইস্কুল ছুটি দাওনি যে?

—আরে এস না—শুনে যাও।

—নাঃ, যাই।

মৌলবী সাহেব স্কুল-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া আসিয়া নিধিরামের রাস্তা আটকাইলেন।

—চল, বস না একটু। এস—ওরে একখানা টুল বের করে দে মাঠে। আরে তোমরা শহরে থাক, একবার শহরের খবরটা নিই—

নিধিরাম অগত্যা গেল বটে—তাহার দেরি সহিতেছিল না—কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিবে ভাবিতেছে না আবার এই উপসর্গ! সে ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলিল—কি আবার খবর?

—কি খবর আমরা জানি?. তুমি বল শুনি। মোক্তারি করচ শুনলাম সেদিন কার কাছে যেন। তারপর কেমন হচ্চে-টচ্চে?

—নতুন বসেচি, এখুনি কি হবে বল! যত্ন-মোক্তার খুব সাহায্য করচে।

—যত্ন-মোক্তার? ওঃ, অনেক পয়সা কামাই করে। সবই নসীব বুঝলে? মাইনর পাস করি আমরা একই ইস্কুল থেকে। অবিশ্যি আমার চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট। তাখ আমি কি করচি—আর যত্ন কি করচে!

—বাবারও তো ক্লাসফ্রেণ্ড—বাবাই বা কি করচেন তাও ভাখ—

—তাই বলচি সবই নসীব। একটা ডাব খাবে?

—পাগল! শ্রাবণ মাসের সন্দেবেলা ডাব খাব কি! ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!

—তুমি তো তামাকও খাও না। তোমাকে দিই কি?

—তামাক খেলেই কি তোমার সামনে খেতাম মৌলবী সাহেব, তুমি আমার বাবার চেয়ে বড়।

—তোমরা মান খাতির রেখে চল তাই—নইলে নাতির বয়সী ছোকরারা আজকাল বিড়ি খেয়ে মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে তায়। সেদিন আটঘরার দাশরথি ডাক্তারের ডাক্তারখানায় বসে আছি—

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিবার বেশি দেরি নাই, নিধিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি আসি মৌলবী সাহেব, সন্দের পর যাওয়ার কষ্ট হবে—সুমুখে আঁধার রাত—

—আরে, তোমাদের গাঁয়ের পাঁচ-ছটা ছেলে পড়ে এখানে। দাঁড়াও না, নামতাটা পড়ানো হয়ে গেলেই ওরাও যাবে। এক সঙ্গে যেও।

—এখনো আজ ইস্কুল ছুটি দাওনি যে! রোজই এমন নাকি? আজ তার ওপর শনিবার।

—আরে বাড়ী গিয়ে তো চাবার ছেলে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসবে, নয়তো গরুর জাব কাটতে বসবে তার চেয়ে এখানে যতক্ষণ আটকানো থাকে—একটু ভালোমানুষের লোকের সঙ্গে তো থাকতে পারে। দুটো ভালো কথাও তো শোনে! বুঝলে না? আমার রোজই সন্দের আগে ছুটি।

সন্ধ্যার পর নিধু গ্রামে ঢুকল।

নিজের বাড়ী পৌঁছিবার আগে সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বাড়ীর ঠিক সামনে সরু গ্রাম্য-রাস্তার এপাশে লালবিহারী চাটুয্যেদের যে বাড়ী সে ছেলেবেলা হইতে জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে—সে বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে! এক-আধটা আলো নয়, দোতলার প্রত্যেক জানালা হইতে আলো বাহির হইতেছে—ব্যাপার কি?

সে বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল বৈঠকখানায় অনেক গ্রাম্য ভদ্রলোক

জড় হইয়াছেন, তাহার বাবা রামতারণ চৌধুরীও আছেন তাহাদের মধ্যে। একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক সকলের মাঝখানে বসিয়া হাত নাড়িয়া কি বলিতেছেন।

নিধু নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ছুটিয়া আসিল নিধুর ভাই রমেশ।

—ওমা, ও কালী, দাদা বাড়ী এসেচে—দাদা—

তখন বাকি সবাই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সম্মিলিত ভাবে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। নিধুর মা আসিয়া বলিলেন—তোরা সরে যা, ওকে আগে একটু জিরুতে দে—বস নিধু, পাখা নিয়ে আয় কালী—

নিধু জিজ্ঞেস করিল—মা কারা এসেচে ও বাড়ীতে?

—জজবাবু বাড়ী এসেচেন ছুটি নিয়ে। এবার নাকি পুজো করবেন বাড়ীতে—

—লালবিহারীবাবু!

—হ্যাঁ। তোর কাকা হন, কাকাবাবু বলে ডাকবি। বড়লোক। এতে কি?

—ভালো কথা। ওতে একটা মাছ আছে, যে-গড়ার বিলে ধরছিল, কিনে এনেচি।

—ও পুঁটি, তোর দাদা মাছ এনেচে—আগে কুটে ফ্যাল দিকি, পচে যাবে—বলিয়া নিধুর মা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরে একঘটি জল ও গামছা আনিয়া নিধুর সামনে রাখিয়া বলিলেন—হাত মুখ আগে ধুয়ে ফেল বাবা, বলচি সব কথা।

নিধুর আপন মা নাই, ইনি সৎমা এবং রমেশ নিধুর বৈমাত্রেয় ভাই। রমেশ বলিল—দাদা একটা ডাব খাবে? আমি একটা ডাব এনেছিলাম বন্ধুদের গাছ থেকে।

নিধুর মা ধমক দিয়া বলিলেন—যাঃ, বর্ষাকালের রাত্তিরে এখন ডাব খায় কেউ? তারপর জ্বর হোক। তুই হাত মুখ ধুয়ে নে—আমি খাবার নিয়ে আসি—

খাবার অন্য কিছু নয়, চাল ভাজা আর শহর থেকে সে বাড়ীর জন্য যে ছানার গজা আনিয়াছে তাহাই দুখানা। জলপান শেষ করিয়া নিধু কৌতূহলবশত লালবিহারীবাবুর বৈঠকখানার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ওখানে দাঁড়িয়ে কে? ভেতরে এস না—

নিধু সসংকোচে বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকিতে রামতারণ চৌধুরী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন —নিধু কখন এলে? এটি আমার ছেলে—এরই কথা বলছিলাম তোমাকে। মোক্তারীতে ঢুকেচে এই সবে—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটিই লালবিহারী চাটুয্যে—নিধু তাহা বুঝিল। সে বাবাকে ও লালবিহারীকে আগে প্রণাম করিয়া পরে একে-একে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীদেরও প্রণাম করিল।

লালবিহারী চাটুয্যে বলিলেন—বস, বস। তারপর পসার কেমন হচ্ছে?

নিধু বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে, এক রকম হচ্ছে। সবে তো বসেচি—

লালবিহারী পূর্বস্মৃতি মনে আনিবার ভাবে বলিলেন—তোমার মতো আমিও একদিন

প্র্যাকটিস করতে এসেছিলাম বহরমপুরে। তিনবছর ওকালতি করেছিলাম। সে সব দিনের কথা আজও মনে আছে—বেশ ভালো করে খেটো হে মক্কেলের জন্যে। ফাঁকি দিও না। তাহলেই পসার হবে। মক্কেল নিয়ে ব্যবসা তোমার মতো আমিও একদিন করেছি, জানি তো।

পুত্রগর্বে রামতারণের বুক ফুলিয়া উঠিল। এত বড় একজন লোক, একটা মহকুমার ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক—তাঁহার ছেলে নিধুর সহিত সমানে সমানে কথা কহিতেছেন। কই, আরও তো কত লোক গাঁয়ের বসিয়া আছে, কজনের ছেলে আছে—উকীল মোক্তার?

লালবিহারী পুনরায় বলিলেন—তুমি কাল যাবে না পরশু যাবে?

নিধু উত্তর দিল—পরশু সকালে উঠেই চলে যাব—

—তাহলে কাল আমার বাড়ী দুপুরে খেও, দু-একটা কথা বলব।

রামতারণ একবার সগর্বে সকলের দিকে চাহিয়া লইলেন। ভাবটা এইরূপ—কই, তোমাদের কাউকে তো লালবিহারী খেতে বললে না? মানুষেই মানুষ চেনে।

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে তা বেশ।

—আমার ছেলে অরুণকে তুমি দ্যাখ নি—আলাপ করিয়ে দেব এখন—সেও ল' পড়চে। সামনের বছর এম. এ. দেবে। তোমার বয়সী হবে।

নিধু বলিল—আচ্ছা, এখন তাহলে আসি কাকাবাবু—

নিধুর মা শুনিয়া বলিলেন—বড়লোক কি আর এমনি হয়! মন ভালো না হলে কেউ বড়লোক হয় না। তবে কর্তা যেমন, গিন্নি কিন্তু তেমন নয়! একটু ঠ্যাকারে আছে—তা থাক, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের তাতে কিই বা আসে যায়! আমরা সকলের চেয়ে ছোট হয়েই তো আছি। থাকবও চিরকাল—

পরদিন সকালে রমেশ ছুটিয়া আসিয়া নিধুকে বলিল—দাদা, শিগগির এস, জজবাবুর ছেলে তোমায় ডাকচে—

নিধুদের বাহিরের ঘর নাই—তবে রোয়াকের উপর একখানা খড়ের চালা আছে, নিধু বাহিরে গিয়া দেখিল একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে চালার নিচে রোয়াকে বসিয়া কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে।

নিধু ছেলেটিকে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া বসাইল। ছেলেটি বলিল—আপনাদের বাড়ীতে কোনো বাংলা বই আছে?

নিধু ভাবিয়া দেখিয়া বলিল—না, বই তেমন কিছু নেই তো? বাংলা রামায়ণ মহাভারত আছে—

—ও সব না। আমার বোন মঞ্জু বড্ড বই পড়ে। তার জন্যে দরকার—সে পাঠিয়ে দিলে—

—তোমাদের বাড়ী বই নেই ?

—সব পড়া শেষ। মঞ্জু একদিনে তিনখানা করে বই শেষ করে—সিমলে বান্ধব লাইব্রেরী অত বড় লাইব্রেরী তার জন্যে ফেল—বই যুগিয়ে উঠতে পারে না—

—তোমার বোন কি কলকাতায় থাকে ?

—ও যে মামার বাড়ী থেকে পড়ে—এবার সেকেন ক্লাসে উঠল। সামনের বার ম্যাট্রিক দেবে। বাবা মফঃস্বলে বেড়ান, সব জায়গায় মেয়েদের হাইস্কুল তো নেই, তাই ওকে মামারবাড়ী কলকাতায় রেখেছেন পড়ার জন্যে।

দুপুরে সেই ছেলেটিই তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। নিধু উঁহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল। বড়লোকের বাড়ী বটে। চক-মিলানো দোতলা বাড়ীর বারান্দা হইতে দামী-দামী সুদৃশ্য ভিজা শাড়ী ঝুলিতেছে, বারান্দায় সুবেশা সুন্দরী মেয়েরা ঘোরাফেরা করিতেছে, কোন ঘরে গ্রামোফোন বাজিতেছে—লোকজনে, ভিড়ে, হৈচৈয়ে সরগরম। এই বাড়ীটি সে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিতেছে বাল্যকাল হইতে। কখনো ইহারা দেশে আসেন নাই—নিধু বাড়ীটার মধ্যে কখনও ঢুকিয়া দেখে নাই এর আগে। বাবার মুখে সে শুনিয়াছে তাহার যখন বয়স চারি বৎসর, তখন একবার ইহারা দেশে আসিয়া ঘরবাড়ী মেরামত করে ও নতুন করিয়া অনেকগুলি ঘর বারান্দা তৈরি করে—কিন্তু সে কথা নিধুর স্মরণ হয় না।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা তাহাকে যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া বসাইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরী মেয়ে তাহার সামনে ভাতের থালা রাখিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি আবার আসিয়া তাহার সামনে বসিলেন। নিধু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। মহিলাটি বলিলেন—লজ্জা করে খেও না বাবা। তোমাকে সেবার এসে দেখেছিলাম এতটুকু ছেলে, এর মধ্যে কত বড়টি হয়েচ। ও মঞ্জু, এদিকে আয় তোর দাদার খাওয়া দ্যাখ, এখানে দাঁড়া এসে, আমি আবার ওদিকে যাব। মেয়েটি আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল। বলিল—বা রে, আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে।

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—আপনাকে বলতে হবে না—আমি ঠিক খেয়ে যাব—

মেয়ের মা বলিলেন—ওকে 'আপনি' বলতে হবে না বাছা। ও তোমার ছোট বোনের মতো—এক গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ী, থাকা হয় না, আসা হয় না তাই। নইলে তোমরা প্রতিবেশী, তোমাদের চেয়ে আপন আর কে আছে ? তোমার মাকে ওবেলা আসতে বোলো। বসে খাও বাবা—মঞ্জু, দাঁড়া এখানে—

গৃহিণী উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েটি বলিল—আমি মাংস এনে দিই—

—মাংস আমি খাইনে তো।

মেয়েটি আশ্চর্য হইবার সুরে বলিল—খান না ? ওমা, তবে মাকে বলে আসি। কি দিয়ে খাবেন ?

নিধু এবার হাসিয়া বলিল—সেজন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। এই আয়োজন হয়েছে,

আমার পক্ষে এত খেয়ে ওঠা শক্ত। মনে-মনে সে ভাবিল, ইহার অর্দ্ধেক রান্নাও তাহাদের বাড়ীতে বিশেষ কোনো পূজাপার্ব্বণ কি উৎসবেও কোনোদিন হয় না। বড়লোকেরা, প্রত্যহ কি এইরূপ খাইয়া থাকে?

মহকুমার বড়-মোক্তারের বাড়ী সে খাইয়াছে—ইহার অপেক্ষা সে অনেক খারাপ। বহুলোক সেখানে খায়—সে একটা হোটেলখানা বিশেষ।

খাওয়ার পরে সে বাহিরে আসিতেছিল, ছেলেটি তাহাকে বলিল—আসুন, আমার আঁকা ম্যাপ আর মঞ্জুর হাতে-গড়া মাটির পুতুল দেখে যান।

এই সময়ে লালবিহারীবাবু কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিলেন। নিধুকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—খাওয়া হয়েচে বাবা?

—আজ্ঞে এই উঠলাম খেয়ে।

—বেশ পেট ভরেচে তো? আমি তো দেখতে পারলুম না, মাঠে একটি পৈতৃক জমি আজ তিন-চার বছর বেদখল করেচে, তাই দেখতে গিয়েছিলুম—

—না কাকাবাবু, সেজন্যে ভাববেন না। অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেল। খুড়ীমা ছিলেন বসে—

লালবিহারীবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন—ছেলেটির নাম বীরেন, সে নিধুকে অন্তঃপুরের একটা ছোট ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার হাতে পানের ডিবা দিয়া বলিল—পান খান দাদা—আমার পুতুল দেখেন নি বুঝি? দাঁড়ান দেখাই—

মঞ্জু একটা আলমারির ভিতর হইতে এক রাশ মাটির কুমির, কুকুর, রাধাকৃষ্ণ, সিপাই প্রভৃতি বাহির করিয়া বলিল—দেখুন, কেমন হয়েচে?

—ভারি চমৎকার। বাঃ—

মঞ্জু হাসিমুখে বলিল—আমাদের স্কুলে এসব তৈরি করতে শেখায়। আরও একটা জিনিস দেখাব—কাল আসবেন তো?

নিধু বলিল—না, সকালেই যেতে হবে। এখন নতুন মোক্তারীতে ঢুকে কামাই করা চলবে না। তা ছাড়া কেস রয়েচে।

—বিকেলে এসে চা খাবেন কিন্তু।

—চা তো আমি খাইনে—

—চা না খান, জলখাবার খাবেন—সেই সময় দেখাব। আসবেন কিন্তু দাদা অবিশ্যি—

এই সময় বীরেন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মঞ্জু কিন্তু বেশ গান গাইতে পারে। শোনেন নি বুঝি নিধুদা? ওবেলা গান শুনিয়ে দে না মঞ্জু—

মঞ্জু বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বেশ নিঃসঙ্কোচেই বলিল—উনি ওবেলা জল খেতে আসবেন নেমন্তন্ন করেচি—সেই সময় শোনাব।

নিধু বাড়ী আসিলেই তাহার মা জিগগেস করিলেন—ভালো খেলি?

—খুব ভালো।

—কি কি খেলি বল্। গিন্নির সঙ্গে দেখা হল ?

—হ্যাঁ, তিনি তো খাবার সময়ে বসে ছিলেন।

—আর কার সঙ্গে আলাপ হল ?

—আর ওই যে বীরেন বলে ছেলেটি, বেশ ছেলে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, নিধুর মনের প্রবলতম ইচ্ছা যে সে মায়ের কাছে মঞ্জুর কথা বলে, সেটাই কিন্তু সে বলিতে পারিল না। মঞ্জুর সম্পর্কিত কোনো উল্লেখই সে করিতে পারিল না।

নিধুর মা বলিলেন—গিন্নির সঙ্গে আমার ইচ্ছে যে একটু আলাপ করি। বড়লোকের বউ আলাপ রাখা ভালো।

—তা তুমি গিয়ে আলাপ করলেই পার—তিনি কি তোমার এখানে আসবেন, তোমার যেতে হবে।

—একা যেতে ভয় করে—

—তুমি যেন একটা কি! প্রতিবেশীর বাড়ী যাবে এতে ভয় কি ? বাঘ না ভালুক ? তোমায় টপ করে মেরে ফেলবে নাকি ?

—তুই যদি যাস, তোর সঙ্গে যাই—

—তা চল না। আমায় তো—ইয়ে—ওরা বিকেলে জল খেতে বলেচে ওখানে—

নিধুর মা আগ্রহের সহিত বলিলেন—কে, কে বললে তোকে ? গিন্নি বললে নাকি ?

—হাঁ তাই—ওই গিয়ে ঠিক গিন্নি ছিলেন না সেখানে, তবে ওই গিন্নিই বলে পাঠালেন আর কি।

—তোকে বোধহয় গিন্নির খুব ভালো লেগেচে—

মায়ের এই সব কথা বড় অস্বস্তিকর। নিধু দেখিতেছে চিরকাল তার মায়ের ব্যাপার—বড়লোক দেখিলে অত ভাঙিয়া-চুইয়া পড়িবার যে কি আছে। তাহাকে ভালো লাগিলেই বা কি, উঁহারা তো তাহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে যাইতেছে না। সুতরাং ভাবিয়া লাভ কি এসব কথা ? মুখে উত্তর দিল—তা কি জানি। হয়তো তাই।

নিধুর মা সগর্ব্বে বলিলেন—ভালো লাগতেই হবে যে। না লেগে উপায় কি ?

নাঃ, মা'র জ্বালায় আর পারিবার যো নাই। এত সরল আর ভালোমানুষ লোক হইলে আজকালকার কালে জগতে তাহাকে লইয়া চলাফেরা করাও মুশকিল।

পৃথিবীতে যে কত খারাপ, জুয়াচোর, বদমাইস লোক থাকে, নিধুর ইতিপূর্ব্বে কোনো ধারণা ছিল না সে সম্বন্ধে। কিন্তু সম্প্রতি মোক্তারীতে সে ঢুকিয়া সে দেখিতেছে। মা'র মতো সরলা এ পৃথিবীতে চলে না।

বেলা ছটার সময় বীরেন বাহির হইতে ডাকিল—নিধু-দা, আসুন—ও নিধু-দা—

নিধু বাহিরে আসিতেই বলিল—দেরি করে ফেললেন যে। মঞ্জু কতক্ষণ থেকে খাবার সাজিয়ে বসে—আমায় বললে ডাক দিতে।

নিধুর মনে হঠাৎ বড় আনন্দ হইল। এ অকারণ পুলকের হেতু প্রথমটা সে নির্ণয় করিতে পারিল না—পরে ভাবিয়া দেখিল, মঞ্জু তাহার জন্ত খাবার লইয়া বসিয়া আছে—এই কথাটা তাহার আনন্দানুভূতির উৎস।

—বেশ দাদা, এই বুঝি আপনার বিকেল?

নিধু রোয়াকের একপাশে গিয়া গো-চোরের মতো বসিল। এবার সে আরও বেশি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—কারণ বিকালে আরও দু-তিনটি মহিলা সাজগোজ করিয়া এদিক-ওদিক অস্ত লঘুপদে ঘোরাফেরা করিয়া সংসারের ও রান্নাঘরের কাজকর্ম দেখিতেছেন।

—চা খাবেন না ঠিক?

—না, শরীর খারাপ হয় খেলে। অভ্যেস নেই তো—

—তবে থাক। একটু শরবৎ করে দেব?

—ও সবের দরকার নেই, থাক। কিন্তু আমি সেই জন্তে আরও এলাম—

মঞ্জু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি জন্তে?

এটা মঞ্জুর ভান। নিধু কি বলিতেছে তাহা সে কথা পাড়িতেই বুঝিয়াছে।

নিধু বলিল—তোমার গান শুনব—তা ছাড়া আমার মা আসবেন এক্ষুনি—

—জ্যাঠাইমা! বাঃ একথা তো বলেন নি এতক্ষণ?

মঞ্জু মাকে ডাক দিয়া বলিল—ওমা, শুনচো জ্যাঠাইমা পাশের বাড়ীর, আজ এক্ষুনি আসবেন আমাদের বাড়ী। গিয়ে নিয়ে আসব?

—না, তোকে যেতে হবে কেন? তুই বরং নিধুকে খাবার দে—পাশের বাড়ী, তিনি ঠিক আসবেন এখন।

মঞ্জু নিধুকে খাবার দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই আবার আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

নিধু জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

—সেকেন ক্লাসে।

—কোন স্কুলে?

—সিমলে গার্লস হাইস্কুল।

নিধু শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে কখনো মেশে নাই। এসব পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়া দূরের কথা অনেকে বাংলা লেখাপড়াই ভালো জানে না। নিধুর মনে হইল সে এমন একটি জিনিস দেখিতেছে, যাহা সে কখনো পূর্ব্বে দেখে নাই। তাহার মনে চিরকাল সাধ ছিল ভালো লেখাপড়া শিখিবে—কিন্তু দারিদ্র্য বশত সে সাধ পূর্ণ হইল না। তবুও লেখাপড়ার কথা বলিতে সে ভালোবাসে। এ পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়াজানা লোক নাই, কলা কুমড়া চাষের কথা শুনিতে বা বলিতে তাহার ভালো লাগে না, অথচ এখানকার গ্রাম্য মজলিসে ওসব কথা ছাড়া অন্ত বিষয়ের আলোচনা করিবার লোক নাই।

নিধু বলিল—আচ্ছা, তোমার ছিল্লি আছে? এ্যাডিশনাল কি নিয়েচ?

—এ্যাডিশনাল ডিগ্রিই তো নিয়েছি, আর সংস্কৃত।

—অঙ্ক না ?

—উঁহু, ও সুবিধে হয় না আমার।

নিধু হাসিয়া বলিল—আমার মতন। আমারও তাই ছিল ম্যাট্রিকে। অঙ্ক আমারও তত সুবিধে হত না।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—সেদিক থেকে বেশ মিলেচে বটে! আপনি কোন বছর ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন ?

—আজ ছ-বছর হল—

—কোথায় পড়তেন ?

—আমার বাড়ী থেকে।

এই সময় মায়ের গলার আওয়াজ পাইয়া নিধু ব্যস্তভাবে বলিল—মা এসেচেন—

মঞ্জু বলিল—আপনি যান—আমি দেখচি—

খানিক পরে গিন্নির সহিত নিধুর মাকে রান্নাঘরের সামনের রোয়াকে বসিয়া কথা বলিতে দেখা গেল। নিধুর মা অত্যন্ত সংকোচের সহিত কথা বলিতেছেন, পাছে তাঁহার কথার মধ্যে অত বড়লোকের গিন্নি কোনো দোষ-ত্রুটি ধরিয়া ফেলেন এই ভয়েই যেন তিনি জড়সড়।

গিন্নি বলিলেন—আচ্ছা এখানে ম্যালেরিয়া কেমন ?

নিধুর মা বলিলেন—আছে বই কি দিদি। ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া—

—এখানে বারোমাস কিন্তু বাস করা চলে না, যাই বলুন—

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না দিদি, আমরা কি তার যুগ্যি ? আপনি বয়সেও বড়, মানেও বড়।

গিন্নি খুশি হইয়া বলিলেন—সে আবার কি কথা ? আচ্ছা তাই হবে। তুমিই বলব এর পরে—

নিধুর মা বলিলেন—আপনি বলচেন বারো মাসবাস করা চলে না—বাস না করে যায় কোথায় সব। এ গাঁয়ে কারো কি ক্ষমতা আছে ?

—সে যাই বল। আমি তো এই সাতদিনও আসি নি, এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়েচি। ওঁকে বলছিলাম চল এখান থেকে যাই—উনি বলেন পৈতৃক ভিটেটা—এবার পুজোটা করব ভেবেচি তা আমি বলি—চোখ-কান বুজে থাকি একটা মাস, আর কি করব ?

—আপনারা রাজা লোক দিদি, আপনাদের কথা আলাদা। আমরা আর যাব কোথায়, তেমন ক্ষমতাও নেই, সুবিধেও নেই। কাজেই কাদায় গুণ পুঁতে পড়ে থাকা—

—ওকে বলি, বালিগঞ্জে একটা বাড়ী করে ফেল এই বেলা।

—সে কোথায় দিদি ?

—বালিগঞ্জ কলকাতায়। খুব ভালো জায়গা। আমার কাকা আলিপুরে বদলি হলেন এবার—সবজজ ছিলেন দিনাজপুরে—আমায় বললেন হৈম, জামাইকে বল আমার বাড়ীর

পাশে একটু জমি নিয়ে বাড়ী করতে। কাকা আজ বছর দুই বাড়ী কিনেচেন কিনা বালিগঞ্জে, দুই খুড়তুতো ভাই বড় চাকরী করে, একজন মুন্সেফ, একজন সবডেপুটি—খুব বড় ঘরে বিয়েও হয়েচে দুজনের। দান সামগ্রি আর ফার্নিচার দুখানা ঘরে ধরে না—

এই সময় মঞ্জু আসিয়া নিধুর মাকে পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

গিন্নি বলিলেন—এই আমার বড় মেয়ে। কলকাতায় পড়ে—

নিধুর মা মঞ্জুর দিকে চাহিলেন এবং সম্ভবত তাহার সাজগোজের পারিপাট্য ও রূপের ছটায় এমন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে আশীর্ব্বাদ দূরে থাক, কোনো কিছু কথা পর্য্যন্ত বলিতে ভুলিয়া গেলেন।

গিন্নি বলিলেন—নিধুকে খাবার দিয়েচিস?

মেয়ে বলিল—নিধুদা খাচ্চে বসে। খুড়ীমা, আপনি চা খান তো?

নিধুর মা বলিলেন—না মা, চা খাওয়ার অভ্যেস তো নেই।

নিধুর মায়ের প্রত্যেক কথায় ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল যেন ইহাদের বাড়ী আসিয়া এবং ইহাদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

মঞ্জু খানিকটা নিধুর মা'র কাছে থাকিয়া আবার নিধুর কাছে চলিয়া গেল। বীরেন সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

বীরেন মঞ্জুকে দেখিয়া বলিল—নিধুদা তোকে কি গান করতে বলচেন—

নিধু বলিল—ও বেলা বলেছিলে যে। জল খাওয়ার সময়ে গান করবে—

মঞ্জু বেশ সহজ সুরে বলিল—বেশ, করব এখন। খুড়ীমা তো শুনবেন—ওঁরা গল্প করচেন যে।

—আমি মাকে ডাকব?

—না, না, এখন থাক্। আমি করব এখন গান, ততক্ষণ ওঁদের গল্প হয়ে যাক।

নিধুর আগ্রহ বেশি হইতেছিল—মেয়েদের মুখে গান সে কখনো শোনে নাই। এ সব দেশে মেয়েরা গান গাহে না। মেয়ে হারমোনিয়ম বাজাইয়া পুরুষের সামনে গাহিতেছে, এ একটা নূতন দৃশ্য যাহা সে কখনো দেখে নাই।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু সত্যিই হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিল। অনেকগুলি গান। তাহার কোনো লজ্জা সঙ্কোচ নাই, বেশ সহজ, সরল ব্যবহার। নিধুর মা তো একেবারে মুগ্ধ। মেয়েটির দিক হইতে তিনি আর চোখ ফিরাইতে পারেন না।

গান যে ধরনের, সে ধরনের গান তিনি কখনো শোনেন নাই—অনেক জায়গায় কথা বুঝিতে পারা যায় না—কি লইয়া গান—তাহাও বোঝা যায় না। শ্যামা-বিষয় বা রামপ্রসাদী গান নয়। দেহতত্ত্বও নয়। অবিশ্যি এতটুকু মেয়ের মুখে দেহতত্ত্বের গান ভালোও লাগিত না।

শুনিতে-শুনিতে নিধুর মায়ের মনে হইল—তিনি যেন কোথায় স্বপ্নলোকে চলিয়া যাইতেছেন উড়িয়া। সেখানে যেন—বাল্যকালে তাঁহার বাপের বাড়ীতে যেমন ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শুকনো ধুধুলের উড়ন্ত পাপড়ি ধরিয়া আনন্দ পাইতেন—বাবুর হাটের সেই পুকুরের

থায়ে, সেই ফুলগাছতলায় বসিয়া বারো বছরের বালিকাটির মতো আবার ধুন্দুলের পাপড়ি ধরিতেছেন—আবার সেই আনন্দভরা বাল্যকাল তাঁহার স্নেহময় পিতাকে লইয়া ফিরিয়াছে, যে পিতার মুখ মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এখন আর ফোটে না। কথাবার্তাও অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

নিজের অজ্ঞাতসারে কখন নিধুর মা'র চোখে জল আসিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হারমোনিয়মের আওয়াজ পাইয়া পাড়ার আরও অনেকগুলি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে সাহস না করিয়া দরজার সামনে ভিড় করিতেছে দেখিয়া মঞ্জু বীরেনকে বলিল—দাদা, ওদের ডেকে নিয়ে এস বাড়ীর মধ্যে—

নিধুও মুগ্ধ। মঞ্জুর মুখের গান শুনিয়া তাহার মনে হইল এ এমন এক ধরনের জীবন, যাহার মধ্যে সে এই প্রথম প্রবেশ করিল। জীবনে এত ভালো জিনিসও আছে। শুধু সাক্ষী শেখানো, কেস সাজানো, মক্কেল মোক্তারের ব্যবসার সম্বন্ধে উপদেশ—মক্কেল ও হাকিমকে তুষ্ট রাখিবার নানা কলাকৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা—বাড়ীর দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ—এ সবের ঊর্দ্ধেও এমন জগৎ আছে—আকাশ যেখানে নীল, সূর্য্যোদয় অরুণরাগরক্ত, সারাদিনমান বিহঙ্গ-কাকলীমুখর। যেখানে উদ্বেগ নাই, গাউনপরা উকীল-মোক্তারের ভিড় নাই, হাকিমদের গম্ভীর গলার আওয়াজ নাই, জেরায় প্রতিপক্ষের মোক্তারের ধূর্ত্ত চোখের দৃষ্টি নাই। নিধু বাঁচিল, সে বাঁচিয়া গেল আজ, জগতের সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস বদলাইয়া গেল—সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সে খুঁজিয়া পাইল এতদিনে।

ইতিমধ্যে কখন নিধুর ছোট ভাই রমেশ আসিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

নিধু বলিল—তুই কখন এলি রে ?

রমেশ হাসিয়া বলিল—এই এলাম—

আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দিদির গলা শুনে—একবার ভাবলাম যাব কি না যাব, তারপর আর পারলাম না—

নিধু বলিল—তা আসবিনে কেন ? বেশ করেচিস—

সে আরও তৃপ্তি পাইল যে তাহার মা ও রমেশ এমন গান শুনিতে পাইল, কখনো শোনে না তো এ সব।

মঞ্জু বলিল—আপনার ছোট ভাই বুঝি ?

নিধু ঘাড় নাড়িল।

—পড়ে ?

—পড়ার সুবিধে হয় না এখানে, তবে ওকে মামার বাড়ী রেখে কিংবা নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে এবার পড়াব—খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

—আমরা যদি কলকাতায় বাড়ী করি, আমাদের বাড়ীতে রেখে দেবেন না ?

মঞ্জুর উদারতায় নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল। এ রকম কেহ বলে না। মঞ্জু ছেলেমানুষ, মন এখনো

সরল—তাই বোধ হয় বলিল। পরের কথাটি কে সহজে আজকাল ঘাড়ে করিতে চায়?

রমেশ লজ্জায় ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

বীরেন বলিল—রমেশ ফুটবল খেলতে পার? একটা ফুটবল টিম করব ভাবচি।

নিধু রমেশের হইয়া উত্তর দিল—ফুটবল এখানে কে খেলবে? অনেকে চোখেও দেখেনি। তবে ও খেলা শিখে নিতে পারবে চট করে। গাছে উঠতে, সাঁতার দিতে, দৌড়াদৌড়িতে ও খুব মজবুত।

বাড়ী ফিরিয়া পর্য্যন্ত নিধুর মায়ের মন ছটফট করিতে লাগিল, জজবাবুর বাড়ী যে তিনি ও তাঁহার ছেলেরা এত খাতির পাইয়া আসিলেন, কথাটা কাহার কাছে গল্প করেন।

তাঁহার জীবনে এত বড় সম্মান আর কখনো কেহ তাঁহাকে দেয় নাই। ওদের ঘরের লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেনই বা কবে?

পুকুরের ঘাটে গা ধুইতে গিয়া দেখিলেন পুবপাড়ার প্রৌঢ়া জগোঠাকরুণ বাসন মাজিতেছেন।

জগোঠাকরুণ গর্ব্বিতা ও ঝগড়াটে প্রকৃতির বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। তাহার উপর জগোঠাকরুণের অবস্থাও ভালো। কিন্তু কথাটা যে না বলিলেই নয়। নিধুর মা সহজভাবে ভূমিকা ফাঁদিলেন।

—ও দিদি, আজ যে এত দেরিতে বাসন মাজচ?

জগোঠাকরুণ বাসনের দিকে চোখ রাখিয়াই বলিলেন—সময় পাই নি। আজ ওবেলা দুজন কুটুম এল বাড়ীতে, তাদের জন্যে রান্নাবান্না করতে দেরি হয়ে গেল। তারপর বড় ছেলে এসে বললে—মা, খাবার তৈরি করে দাও, আটঘরার হাটে যাব। এই সব করতে বেলা গেল একেবারে—

নিধুর মা বলিলেন—আমারও আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল। অন্য দিন এর আগেই ঘাট সেরে চলে যাই—

জগোঠাকরুণ চুপ করিয়া আপন মনে বাসন মাজিতে লাগিলেন।

নিধুর মা পুনরায় বলিলেন—মঞ্জু কি চমৎকার গান করলে দিদি!

জগোঠাকরুণ মুখ তুলিয়া বলিলেন—কে?

—ওই যে জজবাবুর মেয়ে মঞ্জু। ওরা আজ খুব খাতির করেচে নিধুকে। ওকে চা দিয়ে খাবার দিয়ে জজবাবুর মেয়ে নিজের কাছে বসে গান শোনালে। বেশ লোক জজগিন্নিও—তিনি তো ভারি ব্যস্ত, বলেন—নিধুকে আগে দে জলখাবার, ও আমার ছেলের মতো। আমায় তো কাছে বসিয়ে কত সুখদুঃখের কথা—

কথাটা জগোঠাকরুণের তেমন ভালো লাগিল না।

তিনি মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—বাদ দাও ওসব বড়মানুষের কথা। বলে, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। কারও বাড়ী যাইওনে, সময়ও নেই। ওদের

সঙ্গে মেলামেশা কি আমার সাজে? তুমি বড়লোক আছ, বড়লোক আছ। আমি কেন যাব তোমার বাড়ী খোশামোদ করতে? আমার ও স্বভাব নেই—তা তোমরা বুঝি দেখা করতে গিয়েছিলে?

—ওমা, এমনি দেখা করতে যাব কেন? নিধুকে যে জজবাবু নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলা কত যত্ন করে খাওয়ালে। আবার বিকেলে জলখাবারের নেমন্তন্ন করলে তার ওপর। নিধু তো লাজুক ছেলে—কিছুতেই যাবে না, ওরাও ছাড়বে না। শেষে জজবাবুর ছেলে নিজে এসে আমাকে, নিধুকে ডেকে নিয়ে গেল। একেবারে নাছোড়বান্দা—

জগোঠাকরুন সংক্ষেপে বলিলেন—বেশ।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। পরে নিধুর মা-ই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—না, বেশ লোক কিন্তু ওরা।

জগোঠাকরুন মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন—কি জানি বাপু, কারো ছন্দাংশেও কোনোদিন থাকিনি—থাকবও না। বেশ হোক, খারাপ হোক, যারা আছে, তারাই আছে। মেয়েটার নাম কি বললে?

—মঞ্জু। কি চমৎকার মেয়ে দিদি।

—বয়েস কত?

—এই পনেরো-ষোলো হবে। ধপধপে ফরসা রঙ কি! চেহারা কি!

—তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি? বেল পাকলে কাকের কি? ওরা নিধুর সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়ে দেবে?

—না, না—তা আমি বলচিনে। তাই কি কখনো দেয়?

—তবে চুপ করে থাক। চেহারা হবে না কেন বল? তোমার মতো আমার মতো পুঁই শাক খেয়ে তো মানুষ নয়? নির্ভাবনায় দুধ-ঘি খেলে তোমারও চেহারা ভালো হত, আমারও চেহারা ভালো হত।

—সে কথা তো ঠিক দিদি।

—অত বড় পনেরো-ষোলো বছরের ধিঙ্গী মেয়ে যে নিধুর সামনে মা-বাপের সামনে হারমোনি বাজিয়ে গান করবে—এতেই দেখ না কেন? তোমার বাড়ীর মেয়ে আমার বাড়ীর মেয়ে করুক দিকি, কালই গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে এখন। বড়মানুষের ওপর কথা বলে কে? ওরা জানচে আজ এসেচি এগাঁয়ে, কাল যাব চলে হিল্লি-দিল্লি—আমাদের নাগাল পায় কে? তাই বলি ওদের সঙ্গে আমাদের মিশতে যাওয়াই বেবুঝি—আমি যাচ্ছি দেখাশুনো করচি ভেবে, ওরা তাবে খোশামোদ করতে আসচে।

শেষের দিকের কথায় বেশ কিছু শ্লেষ মিশাইয়া জগোঠাকরুন তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন এবং মাজা বাসনের গোছা তুলিয়া লইয়া পুকুরের ঘাট ত্যাগ করিলেন।

সকালে নিধু চলিয়া যাইবে বলিয়া নিধুর মা ভোরে রান্না চড়াইয়াছিলেন। বড় মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর দাদাকে নেয়ে আসতে বল, ও পুঁটি—

পুঁটি বলিল—বড়দা এখনও বিছানা থেকে ওঠে নি—

—সে কি রে? ওকে উঠতে বল্। কখন নাইবে, কখন খাবে—বেলা দেখতে-দেখতে হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিধু স্নান সারিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

নিধুর মা বলিলেন—যাবার সময় একবার ওদের সঙ্গে দেখা করে যা না?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কাদের সঙ্গে?

জজবাবুদের—ওই ওদের—গিন্নীর সঙ্গে, মঞ্জুর সঙ্গে?

—হ্যাঁ, আমি আবার যাই এখন? কি মনে করবে, ভাববে জলখাবার খেতে এসেচে সকালবেলা।

—তোর যেমন কথা। তা আবার কেউ ভাবে বুঝি? যা না?

—আমার সময় নেই। ক' কোশ রাস্তা যেতে হবে জানো?

মুখে একথা বলিলেও নিধু মনে-মনে ভাবিতেছিল মঞ্জুর সঙ্গে একবার যাওয়ার সময় দেখাটা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু মা বলিলেই তো সেখানে যাওয়া যায় না।

নিধুর মা বলিলেন—সামনের শনিবারে আসবি কিন্তু। আর পুঁটির জন্যে দু-গজ ফিতে কিনে আনিস—রমেশের জন্যে এক দিস্তে কাগজ। ও ভয়ে তোকে বলতে পারে না। আমায় এসে চুপি-চুপি বলচে, আমি বললাম—তুই গিয়ে তোর দাদার কাছে বল না? বললে—না মা আমার ভয় করে।

নিধু মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া রওনা হইবার পূর্ব্বে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া পায়ের ধুলা লইবার চেষ্টায় পরস্পর ধাকাধাকি করিতে লাগিল। নিধু শাসনের সুরে বলিল—রমু, চব্বিশখানা ইংরিজি-বাংলা হাতের লেখার কথা যেন মনে থাকে। শনিবারে এসে না দেখলে পিঠের ছাল তুলব।

রমেশ দাদার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। বড় লোকের সম্মুখে পড়িলেই বড় বিপদ, আড়ালে থাকিলে বহু হাঙ্গামার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

পথে পা দিয়াই নিধু একবার জজবাবুর বাড়ীর দিকে চাহিল। এখনো বোধ হয় কেউ ওঠে নাই—বড়লোকের বাড়ী, তাড়াতাড়ি উঠিবার গরজই বা কিসের।

ছায়াভরা পথে শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় যেন নবীন আশা, অপরিচিত অনুভূতি সারা দেহের ও মনের নব পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। গাছের ডালে বন্য মটরলতা দুলিতেছে, তিৎ-পল্লার ফুল ফুটিয়াছে—এবার বর্ষায় যেখানে সেখানে বনকচুর ঝাড়ের বৃদ্ধি অত্যন্ত যেন বেশি। নিধু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—এসব জিনিসের দিকে তাহার মন তো কখনো তেমন যায় না, আজ ওদিকে এত নজর পড়িল কেন?

শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া আছে কাল বিকালে শোনা মঞ্জুর গানের সুর।

সে সুর তাহার সারারাত কানে ঝঙ্কার দিয়াছে—শুধু মঞ্জুর গানের সুর নয়—তাহার সুন্দর ব্যবহার, তাহার মুখের সুন্দর কথা—ঘাড় নাড়িবার বিশেষ ভঙ্গিটি। বড়-বড় কালো চোখের চপল চাহনি।

সত্যই রূপসী মেয়ে মঞ্জু। মহকুমার টাউনে তো কত মেয়ে দেখিল—অমন মুখ এ পর্যন্ত কোনো মেয়েরই সে দেখে নাই জীবনে। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা না হইলে অমন ধারা রূপ যে মেয়েদের হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই—ইহা সে ধারণা করিতে পারিত না।

মঞ্জু স্কুলে পড়ে। স্কুলে-পড়া মেয়ে সে এই প্রথম দেখিল। মেয়েদের এমন নিঃসঙ্কোচ ধরন-ধারণ সে কখনো কল্পনা করিতে পারিত না। এসব গ্রামের অশিক্ষিত কুরূপা মেয়েগুলা এমন অকালপক্ব যে বারো-তেরো বছরের পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতৃব্য সমতুল্য প্রতিবেশীর সামনে দিয়া চলাফেরা করিতে বা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ করে।

নিধুর কি ভালোই লাগিয়াছে মেয়েটিকে।

আচ্ছা, অত বড় লোকের মেয়ে সে—তাহার মতো সামান্য অবস্থার লোকের প্রতি অত আদর যত্ন দেখাইল কেন? জীবনে এধরণের ব্যবহার কোনো অনাত্মীয় মেয়ের নিকট হইতে সে কখনো পায় নাই।

মঞ্জুর সহিত আবার যদি দেখা হইতে আজ সকালটিতে!

সামনের শনিবারে—তবে একটা কথা। সামনের শনিবারে মঞ্জু নাও থাকিতে পারে। সে স্কুলের ছাত্রী, কতদিন স্কুল কামাই করিয়া বসিয়া থাকিবে? যদি চলিয়া যায়?

কথাটা ভাবিতে নিধুর যেন রীতিমত বেদনা বোধ হইতে লাগিল। পরের মেয়ের প্রতি এ ধরণের মনোভাব তাহার এই প্রথম। সারাপথ নেশার আচ্ছন্নভাবে কাটিয়া গেল নিধুর। সামনে ওই সারি-সারি আড়ত দেখা দিয়াছে—টাউন আর আধমাইল পথ।

নিজের বাসায় পৌঁছিয়া সে দেখিল বাড়ীওয়ালার সরকার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

নিধুকে দেখিয়া বলিল—মোক্তারবাবু, বাড়ী থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ, কালীবাবু কি ভাড়ার জন্যে বসে আছেন?

—আজ্ঞে বাবু বললেন মোক্তারবাবুর কাছ থেকে ভাড়াটা নিয়ে আসতে।

—আর দুদিন যাক। বাড়ী থেকে আসচি, হাতে কিছু নেই। বুধবারে আসবেন—

কোর্টে বড়-মোক্তার তাহাকে বলিলেন—ওহে একটা জামিননামায় সই করতে হবে।

—জামিন মুভ্ করলে কে?

—আমি করলাম। পাঁচশো টাকার জামিন। বা আদায় করতে পার।

—আপনি বলে দিন। ভালো লোক তো?

—কপাল ঠুকে জামিন হয়ে যাও। কি ছাড় কেন?

—তা নয়, আমি বলচি না পালায় শেষকালে। বেশি টাকার জামিন তাই ভয় হয়।

—কোনো ভয় নেই।

নতুন মোক্তার সে, জামিননামায় কি প্রধান সম্বল। যদুবাবু অনুগ্রহ করেন বলিয়া তা মেলে—নতুবা তাহাই কি সুলভ? এক মাসের মধ্যে একটিবার সে জুনিয়ার হইয়া একটি মোকর্দ্দমায় জামিনের দরখাস্ত দাখিল করিয়া ছিল। এ ব্যবসা চলিবে কিনা কে জানে? বুধবার বাড়ীভাড়া দিবে তো বলিল—কিন্তু দিবে কোথা হইতে?

মোক্তার-বারের ঘরের এক কোণে সাধন-মোক্তার সাক্ষী পড়াইতেছেন, অর্থাৎ যে মিথ্যায় তালিম একবার সকালে দিয়া আসিয়াছেন—এখন আবার তাহা সাক্ষীদের মনে আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা লইতেছেন।

সাধনবাবু বলিলেন—এই যে নিধিরাম! বাড়ী থেকে এলে নাকি?

নিধু নীরসকণ্ঠে বলিল—এই এখন এলাম। সব ভালো?

—ভালো আর কই তেমন? বাতে ভুগচি। তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা।

—কি বলুন?

—এখন নয়। তিনটের পর ঘর একটু নিরিবিলি হলে তখন বলব। চলে যেও না যেন।

—আচ্ছা, আমি একবার যদুবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। কাজ আছে।

তিনটার পর ব্রিফহীন মোক্তারের দল বড়-কেউ বার-লাইব্রেরীতে উপস্থিত থাকে না। থাকেন দু-একজন প্রবীণ ও পসারওয়ালা মোক্তার, তাঁহাদের কেস থাকে—মক্কেলকে শিখাইতে পড়াইতে হয়। হাকিমের এজলাসে অকারণেও দু-একবার ঢুকিয়া অনাবশ্যক মিষ্ট কথাও দু-একটা বলিতে হয়।

নিধুর আজ মন তত ভালো ছিল না। সে তিনটার কিছু পূর্ব্বে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া দেখিল—হরিবাবু মোক্তার বসিয়া-বসিয়া ধরণী-মোক্তারের সঙ্গে কোর্টে সেদিন প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে কি করিয়া জেরায় জব্দ করিয়াছেন—তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া যাইতেছেন। ধরণী জুনিয়ার মোক্তার, হরিবাবুর কাছে জামিনটা-আসটার আশা রাখে—সে বেচারী ঘন-ঘন সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িতেছে।

হরিবাবু বলিলেন—আরে নিধিরাম যে! কোর্টে দেখলাম না?

—কোর্টে দেখবেন কি বলুন হরিদা। আমরা হলুম তৃণভোজী জীব—আপনারা বাঘ ভালুক, আপনাদের ছেড়ে আমাদের কাছে কি মক্কেল ঘেঁষে যে হাকিমের এজলাসে সওয়াল-জবাব করতে যাব?

হরিবাবু সহাস্যবদনে বলিলেন—তোমার উপমাটা লাগসই হল না যে! তৃণভোজী জীবের মধ্যে হাতিও যে পড়ে।

—আজ্ঞে তা পড়ে। তবে আমাদের ওজন কম, কাজেই হাতি নই একথা বুঝতে দেরি

হয় না। যাঁদের ওজন বেশি, তাঁরা ওটা হবার দাবী করতে পারেন।

—চল হে ধরণী যাওয়া যাক, বলিয়া হরিবাবু উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাধন ভট্টাচার্য্য ঘরে ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন—কেউ নেই ঘরে? হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি বলুন?

—তুমি বিয়ে করবে?

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন, বলুন তো?

—আমার একটি ভাইঝি আছে—দেখতে-শুনতে—মানে—গেরস্তঘরের উপযুক্ত। রান্নাবান্না—

নিধু বাধা দিয়া বলিল—খুব ভালো পারে বুঝলাম। কিন্তু আমি বিয়ে করে খেতে দোব কি? পসার কি রকম দেখচেন তো?

সাধন ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—ওহে, ওসব কথা ছোকরা মাত্রেই বিয়ের আগে বলে থাকে। আর মোক্তারীর পসার একদিনে হয় না। আমি চব্বিশ বছর এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, আমি সব জানি। তুমি যখন যদুদার মতো মুরুব্বি পেয়েচ, তোমার পসার গড়ে উঠতে দুবছরও লাগবে না। ঢুকেচ তো মোটে একমাস। এখুনি বিগ্ ফাইভদের অন্ন মারবার আশা কর?

—যদুবাবুর ওপর ভরসা করে আমার মতো ব্রিফ্‌লেস্ মোক্তারের বিয়ে করা চলে না।

—খুব চলে—তা ছাড়া আমি তোমায় সাহায্য করব—আমার জামাইকে আমি দেখতে পারব।

ইহাতে নিধু খুব আশান্বিত হইল না, কারণ সাধন-মোক্তারের পসার এমন কিছু লোভনীয় ধরনের নয়। সে বলিল—না দাদা, ওসব আমাদের সাজে না—আপনিই ভেবে দেখুন না?

—তোমার সংসারে কে-কে আছেন?

—বুড়ো বাবা, মা—মানে আমার সৎমা, একটি বৈমাত্র ভাই, আর আমার কটি ভাই-বোন।

—বৈমাত্র ভাইয়ের বয়েস কত?

বুদ্ধিমান নিধু বুঝিল সাধন-মোক্তার আসলে তাহার সৎমা'র বয়স জানিবার জন্য এই প্রশ্নটি করিয়াছেন সুতরাং সে বলিল—তার বয়েস এই চোদ্দ-পনেরো, তবে আমার সৎমা আমাকে মানুষ করে এসেচেন ছেলেবেলা থেকে। মা'র কথা আমার মনেই পড়ে না।

—তুমি এই রবিবারে আমার বাড়ী খাবে।

—সে তো হয় না। শনিবারে যে বাড়ী যেতে হবে—

—না, না, এই শনিবারে তো গিয়েছিলে। যেতেই হবে—না গেলে শুনব না। এক

শনিবার না হয় নাই গেলে বাড়ী ?

নিধিরাম আরও দু-একবার আপত্তি করিল—কিন্তু সাধন মোক্তার তাহার কথায় আমল দিলেন না। নিধিরাম ভালোমানুষ ও লাজুক, বারের অন্যতম প্রবীণ মোক্তার সাধন ভট্টাচার্য্যের মুখের উপর জোর করিয়া না বলিতে পারিল না। ঠিক হইয়া গেল নিধিরাম রবিবার সকালে উঠিয়া তাঁহার বাসায় যাইবে, সেখানেই চা খাইবে—তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া চলিয়া আসিবে।

বাসায় আসিয়া নিধিরাম মনমরা হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। এ আবার কোথা হইতে কি উপসর্গ আসিয়া জুটিল দেখ! কোথায় সে শনিবারের অপেক্ষায় আঙুলে দিন গুনিতেছে, কোথা হইতে বুড়ো সাধন ভট্‌চাজ কি বাদ সাধিল।

সে বুঝিতে পারিয়াছে মঞ্জুর সহিত আর তাহার দেখা হইবে না। হয়তো সামনের সোমবারেই সে কলকাতায় তাহার মামার বাড়ী চলিয়া যাইবে। এ শনিবারে গেলে দেখাটা হইত। এবার যদি দেখা না হয়, তবে আবার সেই পূজার ছুটি ছাড়া মঞ্জু নিশ্চয়ই বাড়ী আসিবে না।

তাহার এখনো তো কতদিন বাকি।

মাথাটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সে ভাবিল, মঞ্জুকে এমন করিয়া সে দেখিতে চায় কেন? কেন তাহার মন এত ব্যাকুল সেজন্য? মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করিয়া লাভ কি? আচ্ছা, এবার না হয় সে দেখাই পাইল—কিন্তু জজবাবু যদি আর গ্রামে পাঁচ বছর না আসেন, যদি আদৌ আর না আসেন—তবে মঞ্জুর সঙ্গে দেখাশোনা তো এমনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিসের মিথ্যা মোহে সে রঙিন স্বপ্ন বুনিতেছে?

রবিবারে সাধন-মোক্তার আটটা বাজিতে না বাজিতে নিধুর বাসায় আসিয়া হাজির হইলেন। নিধু বসিয়া-বসিয়া বড়-মোক্তারের বাড়ী হইতে আনা ক্যালকাটা ল' রিপোর্ট পড়িতেছিল। সাধন দেখিয়া বলিলেন—কি পড়ছ হে? বেশ, বেশ। নিজের উন্নতি নিয়েই থাকতে হবে। বড়দার বই? তা ছাড়া আর কে এখানে বই কিনবে বল?

নিধু বলিল—বসুন, একটু চা খাবেন না?

—না, না, তুমিও আমাদের বাড়ী গিয়েই চা খাবে—সব ঠিক করে রেখেচে মেয়েরা। ওঠ—

সাধন-মোক্তারের বাড়ী টাউনের পূর্ব্বপ্রান্তে টিকাপাড়ায়। দুজনে হাঁটিয়া আসিলেন, নিধু বাসার চেহারা ও আসবাবপত্র দেখিয়া বুঝিল সাধন-মোক্তারের অবস্থা যে বিশেষ ভালো তাহা নয়। বাহিরের ঘরে একখানা ভাঙা তক্তপোশের আধ-ময়লা ফরাশের উপর বসিয়া সাধনের মুহুরী কৃপারাম বিশ্বাস লেখাপড়া করিতেছে—একদিকে মক্কেলদের বসিবার নিমিত্ত একখানি কাঠের বেঞ্চি পাতা। একটা পুরোনো আলমারিতে সামান্য হাতের টিপকলের তালা লাগানো—ঘরের মেঝের বাঁ দিকে তামাক খাইবার সরঞ্জাম, জায়গাটা টিকের গুঁড়ো

তামাকের গুল, আধপোড়া দেশলাই-কাঠি পড়িয়া রীতিমতো নোংরা। দেয়ালে স্থানে-স্থানে পানের পিচের দাগ।

নিধু বাহিরে গিয়া বসিতেই কৃপারাম বিশ্বাস অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—আসুন বাবু, এ শনিবারে বুঝি বাড়ী যান নি? বেশ। বাবু, সোনাতনপুরের মারামারির কেসে কি আপনার কাছে লোক গিয়েছিল?

নিধু বলিল—না, যদুবাবুর কাছে গিয়েচে এক পক্ষ শুনেচি—আমাদের জামিননামা সবল, সেটা পাবেই। পক্ষ কি আমাদের মতো জুনিয়ার মোক্তারের কাছে যায়?

কৃপারাম বিনয়ে গলিয়া গিয়া দুহাত কচলাইয়া বলিতে লাগিল—হেঁ-হেঁ বাবু, ওটা কি কথা—আপনার মতো লোক—ইত্যাদি।

নিধুর মনে হইল কৃপারাম যে তাহাকে অতখানি বিনয় প্রদর্শন করিয়া খাতির করিতেছে—ইহার মূলে রহিয়াছে তাহার সহিত সাধন-মোক্তারের পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা। নতুবা প্রবীণ সাধন-মোক্তারের মুহুরী ঘুঘু কৃপারাম বিশ্বাসের কথা নয় তাহার প্রতি এতটা হাত কচলাইয়া সম্ভ্রম দেখানো। কই, বার লাইব্রেরীতে গত দেড় মাসের মধ্যে কৃপারাম কোনোদিন তাহার সঙ্গে দুটি কথাও বলে নাই তো!

সাধন বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন—একটা বালিশ দেবে কি নিধিরাম? কষ্ট হচ্চে বসতে!

নিধিরাম হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, বালিশ কি হবে আমার? আপনি বরং একটা আনান—

এই সময়ে চাকরে একখানা রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা, দুটি সন্দেশ এবং এক বাটি চা আনিয়া নিধুর সামনে রাখিল। সাধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—জল, জল নিয়ে আয় এক গ্লাস—আর ওরে শোন্, পান দুটো অমনি—পান—

নিধু জানাইল সকালবেলা সে পান খায় না। সাধনকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি খাবেন না?

—নাঃ, আমার অম্বল। কিছু সহ্যি হয় না, কাল রাত্তে খেয়েচি এখনো পেট ভার। তুমি খাও—তোমরা ছেলে-ছোকরা মানুষ! আরও লুচি দেবে?

—কি যে বলেন! আর কিছু দিতে হবে না। আর দিলে খাওয়া যায়?

চা পানের পরে এ-গল্পে ও-গল্পে বেলা প্রায় দশটা সাড়ে-দশটা হইয়া গেল। সাধন বলিলেন—তাহলে নিধিরাম এবার স্নানটা করে নাও এখানেই। ও, নেয়ে এসেচ? তবে আমি একবার বাড়ীর মধ্যে থেকে আসি।

কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনি নিধুকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

ক্ষুদ্র বাসা, দু-তিনখানি মাত্র ঘর, কিন্তু বাসার লোকজন ও ছেলেমেয়ে নিতান্ত মন্দ নয় সংখ্যায়। নিধু মনে-মনে ভাবিল—বাবা, এ পঙ্গপাল সব থাকে কোথায় এই কটা ঘরে?

বারান্দায় দুখানি কার্পেটের আসন পাতা। একখানিতে নিধুকে বসাইয়া সাধন তাহার পাশের আসনটিতে বসিয়া বলিলেন—ও মুড়ি, নিয়ে এস মা—

একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের না-ফরসা না-কালো রঙের রোগা গড়নের মেয়ে দুজনের সামনে ভাতের থালা নামাইয়া চলিয়া গেল এবং পুনরায় আর একখানা থালার ওপর বাটি সাজাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনের সামনে তরকারির বাটিগুলি স্থাপন করিল। তখন সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সাধন তাহাকে বেশিক্ষণ চোখের আড়ালে থাকিতে দিলেন না। কখনো নুন, কখনো লেবু, কখনো জল ইত্যাদি এটা-সেটা আনিবার আদেশ করিয়া সব সময় তাহাকে ঘর-বার করাইতে লাগিলেন। সে এই থাকে এই যায়, আবার আসে সাধনের ডাকে। নিধু মনে-মনে হাসিল, সে ব্যাপারটা আগেই বুঝিয়া লইয়াছে—এই সেই ভাইঝিটি, যাহাকে কৌশল করিয়া দেখাইবার জন্যই আজ এখানে তাহাকে খাওয়াইবার এই আয়োজন। এমন কি নিধুর ইহাও মনে হইল পাশের ঘরের কবাটের ফাঁক দিয়া বাড়ীর মেয়েরা তাহাকে দেখিতেছেন। একবার তো একজোড়া কৌতূহলী চোখের সহিত অতি অল্পক্ষণের জন্য তাহার চোখোচোখিই হইয়া গেল।

সাধন বাহিরে আসিয়া বলিলেন—নিধিরাম, আমার সামনে লজ্জা কোরো না, তামাক খাও তো চাকরে দিয়ে যাচ্ছে—কৃপারাম, যাও গিয়ে নেয়ে নাও গে—বেলা হয়েছে অনেক।

নিধিরাম বিড়িটি পর্য্যন্ত খায় না। সে বলিল—আমি খাইনে, আমি বরং পান খাব একটা—

—একটা কেন তুমি চারটা খাও—ওরে ও ইয়ে—আরও পান নিয়ে—

সাধন-মোক্তার খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কৃপারাম মুহুরীকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঘরে কেহ নাই—সাধন একটু উসখুস করিয়া নিধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহলে নিধিরাম আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে?

নিধিরাম আশ্চর্য্য হইবার ভান করিয়া বলিল—কৈ, কে বলুন তো?

সাধন-মোক্তার বলিলেন—বেশ, ওই তো তোমাকে পরিবেশন করলে।

—ও! তা—তা বেশ, ভালোই। দিব্যি মেয়েটি।

এটা অবশ্য নিধু বলিল নিছক ভদ্রতা ও শোভনতার দিক লক্ষ্য করিয়া, কোনো প্রকার বৈবাহিক মনোভাব ইহার মধ্যে আদৌ ছিল না। সাধন কথা শুনিয়া খুশি হইলেন বলিয়া মনে হইল নিধুর। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি আপাতত কোনো কথা না উঠাইয়া কয়েকদিন পরে আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নিধু গিয়া দেখিল সাধন-মোক্তার আসামী পড়াইতেছেন। সকালবেলা মক্কেলের ভিড় যাহাকে বলে তাহা না থাকিলেও দু-পাঁচটি মক্কেল গরুর গাড়ী করিয়া দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছে।

—বস নিধিরাম, একটু বস। আমি কাজ সেরে নিই—তারপর বল তোমার মেয়েছিল কেন?

যাহাকে শিখানো হইতেছে সে বৃদ্ধা, মারপিটের নালিশ করিতে আসিয়াছে, সঙ্গে দু-তিনটি প্রতিবেশীও আনিয়াছে। বৃদ্ধা শিক্ষা মতো বলিয়া যাইতে লাগিল। আমার বাছুর ওনার

ধানখেতে গিয়ে নেমেছিল, তাই উনি মারামারি করে বাছুরতাকে, আমি তাই দেখে বকি ওনাকে—

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, সব ভুলে মেরে দিলে? তুমি বকবে কেন? তুমি কি বললে?

—আমি দু একটা গালমন্দ দেলাম, বুড়োমানুষ, মুখি এখন তো আর ছুট নেই—

—ওকথা বললে তোমার মোকর্দ্দমা কাৎ হবে—কি শিখিয়ে দিলাম?। বলবে, আমি বললাম ওঁকে, তুমি বাছুর মারছ কেন? তোমার ধান খেয়ে থাকে তুমি পণ্টঘরে দাওগে যাও—মারো কেন?

বুড়ী বলিল—হুঁ।

সাধন-মোক্তার মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—কি বিপদেই পড়েচি রে। 'হুঁ' কি? কথাটা বলে যাও আমার সঙ্গে-সঙ্গে। তুমি কি বললে বল?

—এই বললাম, তুমি বাচুর মারচ কেন, আমার আজ দুই জোয়ান বেটা যদি বেঁচে থাকত, তবে কি তুমি আমার বাচুরের গায়ে হাত দিতি—তোমারও যেন একদিন এমনি হয়—

—আহা হা—কোথাকার আপদ রে। জোয়ান বেটার কথায় কি দরকার আছে? জোয়ান বেটা মরুক বাঁচুক কোর্টের তাতে কি? বল আমি বললাম—বাছুর তুমি মারচ কেন, পণ্টঘরে দাও যদি অনিষ্ট করে থাকে—

—হুঁ—

—আবার বলে হুঁ! আমি যা বলে দিলাম তা বলে যাও না বাপু। এখানে আমার সময় নষ্ট করবে আর কতক্ষণ, দু-ঘণ্টা তো হয়ে গেল। তারপর যা শিখিয়ে দিলাম, কোর্টে গিয়ে এজাহারের সময় সব ভুলে তাল পাকিয়ে—ভোঁতা মুখ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেও এখন। তুমি ওকথা বলতে সে তোমায় কি বললে?

—বললে—ধান আমার যা লোকসান হয়েচে পণ্টঘরে দিলি তা পূরণ হবে না—ওর দাম দিতি—

—ওরে না বাপু না। ও কথা বললে মোকর্দ্দমা সাজানো যাবে না। বলে দিলাম হাজার বার করে যে! কতবার শেখাব এক কথা? বল—আমার কথার উত্তরে সে আমায় অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিলে—

—কি বলব বাবু—সে আমায় কি বললে?

—এমন গালাগালি দিলে যা হুজুরের সামনে বলা যায় না। বল?

—এমনি গালাগালি দিলে যা হুজুরের সামনে উচ্চারণ করা যায় না—

—হুঁ। বেশ হয়েচে—যাও, এখন কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবে করে ঠিক বেলা এগারোটার সময় কাছারী যাবে। সকালে কাছারীতে না গেলে মোকর্দ্দমা রুজু হবে না—তারপর হাঁ্যা নিধিরাম, চা খাবে একটু? এই একটু অবসর পেলাম সকাল থেকে।

—আজ্ঞে না, চা খাব না। কি বলছিলেন আমায়?

সাধন-মোক্তার কিছু ভূমিকা ফাঁদিয়া পুনরায় ভাইঝির বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেন।

নিধিরাম বড় লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল—বিবাহের সম্বন্ধে সে এ পর্য্যন্ত কোনো কথাই ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যেই একথা নাই। কি কুক্ষণেই সাধনের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল।

সে বলিল—দেখুন আমি তো এ বিষয়ে কিছু ঠিক করি নি, তা ছাড়া আমার বাবা রয়েছেন—

সাধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আহা হা, তোমার মত আছে যদি বুঝি তবে তোমার বাবার কাছে এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমার কথা আগে বল—

নিধু মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তত দুদিন সময় নেওয়া দরকার—তারপর ভাবিয়া একটা ভদ্রতাসঙ্গত উত্তর অন্তত দেওয়া যাইতে পারে।

সে বলিল—আচ্ছা কাল শনিবার বাড়ী যাচ্ছি, মা'র কাছে একবার বলে দেখি, সোমবার আপনাকে—

সাধন খপ করিয়া হঠাৎ নিধিরামের হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন—একাজ করতেই হবে নিধিরাম। আমাদের বাড়ীসুদ্ধ সব মেয়েদের তোমাকে দেখে বড্ড পছন্দ হয়েছে। আর ও টাকাকড়ি, পসার-টসারের কথা ছেড়ে দাও। কপালে থাকে হবে, না থাকে না হবে। বলি বড়-দার কি ছিল? ভাঙা থালা সম্বল করে এসেছিলেন এখানকার বারে মোক্তারী করতে। কপাল খুলে গেল, এখন লক্ষ্মী উছলে উঠচে ঘরে! অমনিই হয়। তাহলে সোমবারে যেন পাকা মত পাই—একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে না?

শনিবারে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বাড়ী যাইবার সময় ছায়াস্নিগ্ধ তাম্র অপরাহ্ণে সুনীল আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তূপ দেখিতে দেখিতে নিধুর মন কিসের আনন্দে ও নেশায় যেন ভরপুর হইয়া উঠিল। মঞ্জুকে আজ সে দেখে নাই দীর্ঘ তেরো দিন—যদি সে থাকে, যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয়! কথাটা ভাবিতেই নিধুর বুকের মধ্যে যেন কেমন তোলপাড় করিতে লাগিল। দেখা হওয়া কি সম্ভব? নাও তো হইতে পারে। মঞ্জু কি আর তাহার জন্য গ্রামে বসিয়া থাকিবে পড়াশুনা ছাড়িয়া?

ভাবিতে-ভাবিতে গ্রামের কাছে সে আসিয়া পড়িল।

আর বেশি দূর নাই। ওই কেঁদেটির বিলের আগাড় দেখা যাইতেছে।

নিধু অনুভব করিল তাহার বুকের ভিতরটাতে যেন কেমন এক অশান্ত, চঞ্চল আবেগ, এতদিন এ ধরনের আবেগের অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না। বাড়ী পৌঁছিয়াই প্রথমে নিধুর চোখে পড়িল তাহার মা বসিয়া-বসিয়া কচুর ডাঁটা কুটিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই হাসিমুখে বলিলেন—ওই ভাখ এয়েচে! আমি ঠিক বলেচি সে এ শনিবার আসবেই। তাই তো কচুর শাক তুলে রেখেছি ধুয়ে—ওরে ও পুঁটি, শিগগির তোর দাদাকে হাত-পা ধোয়ার জল এনে দে—

হাতমুখ ধুইয়া সুস্থ হইয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিধু মায়ের সহিত গল্প করিতে

বলিল। প্রথমে এ কেমন আছে, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বলিল—জজবাবুদের বাড়ী সব ভালো ?

নিধুর মা বলিলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা—তোকে যে মঞ্জু একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, গেল শনিবারে। তা আমি বলে পাঠালাম সে এ হপ্তাতে আসবে না লিখেচে। এই তো পরশু না করে আবার জজবাবুর ছেলে এসে জিগ্‌গেস করে গেল তুই আসবি কি না।

নিধু বলিল—ও।

—তা একবার যাবি না কি ?

—আজ এখন ? সন্ধে হয়ে গেল যে একেবারে। কাল সকালে বরং—

কথা শেষ না হইতেই বাহিরে মঞ্জুর ছোট ভাই নৃপেনের গলা শোনা গেল—ও নিধুবাবু, এসেচেন নাকি ?

নিধু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতেই ছেলেটি বলিল—আপনি এসেছেন ? বেশ, বেশ। আসুন আমাদের বাড়ী, মঞ্জুদিদি ডেকে পাঠিয়েচে। আমায় বললে—দেখে আসতে আপনি এসেচেন কিনা—যদি আসেন তবে ডেকে নিয়ে যেতে বলেচে।

—বীরেন কোথায় ?

—মেজদা কাল কলকাতা চলে গেল।

নিধু ছেলেটির পিছু-পিছু মঞ্জুদের বাড়ী গিয়া বাহিরের ঘর পার হইয়া ভিতরের বাড়ী ঢুকিল। সেদিনকার সেই ঘরের সামনে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল মঞ্জু দাঁড়াইয়া বাড়ীর ঝিকে কি বলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মঞ্জুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া রোয়াক হইতে উঠানে নামিয়া বলিল—একি! নিধুদা যে! আসুন আসুন—ও মা—নিধুদা এসেছে—

মঞ্জুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে বলিলেন—নিয়ে গিয়ে বসা দালানে—যাচ্ছি আমি—

নিধুর বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। সে কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া মঞ্জুর পিছু-পিছু দালানে গিয়া বসিল।

মঞ্জু কাছেই একটা টুলের উপর বসিয়া বলিল—তারপর, ও শনিবারে এলেন না যে।

—বিশেষ কাজ ছিল একটা—

—আমি ডাকতে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, জানেন ?

—হ্যাঁ শুনলাম।

—কেন জানেন না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, চা খেয়ে নিন আগে তারপর—ও তার মধ্যে আপনি তো চা খান না আবার। জলযোগ করুন বলতে হবে আপনার বেলা। না ?

—যা খুশি বলুন—

—সেদিন যে বলে দিলাম আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করবেন না ? ভুলে গেলেন এরি মধ্যে ?

—আচ্ছা বেশ, এখন থেকে তাই হবে।

—বসুন আপনি, আমি আসচি—

একটু পরে মঞ্জু একটা রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া আসিল, নিধুর হাতে দিয়া বলিল—খেয়ে নিন আগে—

নিধু রেকাবির দিকে তাকাইয়া বলিল—এত ?

—ও কিছু না। খান আগে—আমি জল আনি—

জলযোগের পাট চুকিয়া গেলে মঞ্জু বলিল—শুনুন। কাল রবিবার বাবার জন্মদিন। বাবা জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে চান না, আমরা মাকে ধরেচি বাবার জন্মদিন আমরা করবই। আপনি এসেছেন খুব ভালো হল। আপনি অবিশ্যি আসবেন, জ্যাঠাইমাকেও কাল বলে আসব—আমরা একটা লেখা পড়ব, সেটা একবার আপনি শুনে বলুন কেমন হয়েছে—এই জন্যেই আমি ও-শনিবার থেকে—

নিধু হাসিয়া বলিল—বা রে, আমি কি লেখক নাকি ? লেখার আমি কি বুঝি ?

মঞ্জু বলিল—ইস্। আমি বুঝি জানিনে—আপনার ভাই রমেশ আপনার একটা খাতা দেখিয়েচে আমাদের—তাতে আপনি কবিতা লিখেচেন দেখলাম যে। বেশ কবিতা, আমার খুব ভালো লেগেচে—মাও শুনেচেন—

নিধু লজ্জায় সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িল। রমেশ বাঁদরটার কি কাণ্ড! ছেলেমানুষ আর কাকে বলে! দাদাকে সব দিক হইতে ভালো প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে তাহার মনে যেন আর স্বস্তি নাই।

কি দরকার ছিল ইহাদের সে খাতা টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইবার ? নিধু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—সে আবার লেখা! তা—সে সব—রমেশের কথা বাদ—

—কেন সে কিছু অন্যায় করে নি।

—সে সব কবিতা স্কুলে থাকতে লিখতাম—কাঁচা হাতের লেখা—

মঞ্জু প্রতিবাদের সুরে বলিল—কেন, আমাদের বেশ ভালো লেগেচে কবিতাগুলো। খুকুকে উদ্দেশ করে যে সিরিজ, গুগুলো সত্যিই চমৎকার! খুকু কে ?

নিধু লজ্জিতভাবে বলিল—ও আমার ছোট বোন—ওর ডাক নাম রেবু। তিনবছর বয়েস ছিল তখন, এখন বছর আট-নয় বয়েস। দেখো নি তাকে ?

—না আমি দেখি নি। এখুনি তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি—আজ দেখতেই হবে। কবির প্রেরণা যে যোগায়, সে বড় ভাগ্যবতী।

—সে তো এখানে নেই। মামার বাড়ী রয়েচে দিদিমার কাছে—দিদিমা বড় ভালো-বাসেন কিনা! পুজোর সময় আসবে।

—তবে আর কি হবে! আমাদেরই কপাল। দেখা অদৃষ্টে থাকলে তো!

এই সময়ে মঞ্জুর মা আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—নিধু এসেচ বাবা ? মঞ্জু তো কেবল তোমার কথা বলচে কদিন তোমার কবিতা পড়ে। ওঁ নাকি কি কাগজ বার করবে, তাতে তোমায় লিখতে হবে।

মঞ্জু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মা সব কথা ফাঁস করে ফেললে তো! আমি সে কথা বুঝি এখনও বলেচি নিধুদাকে! যেমন তোমার কাণ্ড!

নিধু বলিল—কেন, কাকীমা ঠিক বলেচেন। শুনতেই তো পেতাম একটু পরেই—

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—একখানা হাতের লেখা কাগজ বের করব ভাবচি, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

মঞ্জুর মা কন্যার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—ও একখানা কাগজ আগেই বের করেছিল, ওঁর সঙ্গে কাজ করেন বি. দাসগুপ্ত নাম শুনেচ তো? সবজজ—খুব পণ্ডিত লোক, তিনি দেখে বলেছিলেন এমন লেখা—

মঞ্জু সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা, মা—

—কেন আমায় বললি, সব কথা ফাঁস করে ফেলি যে! যখন করলাম ফাঁস, তখন ভালো করেই ফাঁস করা ভালো।

মঞ্জু আবদারের সুরে বলিল—মা, নিধুদাকে রাত্তিরে এখানে খেতে বল না? আমরা সব একসঙ্গে—

মঞ্জুর মা বলিলেন—আজ তো খাবার তেমন কিছু ভালো নেই—কি খাওয়াবি নিধুদাকে? তার চেয়ে কাল দুপুরে ওঁর জন্মদিনে পোলাও মাংস হবে, ভালো খাওয়া-দাওয়া আছে, কাল নিধু এখানে তো খাবেই—

—না মা, মাংস দরকার নেই শুভদিনে, তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবাকে আমি বলব এখন—আর আমি বলি শোন মা। নিধুদা ঘরের ছেলে, আজও খাবে ডাল ভাত—কাল যা খাবে তা তো খাবেই—

তাহাকে লইয়া মাতাপুত্রীর এত কথা হওয়াতে প্রথমটা নিধু কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু ইহারা এত সহজ ভাবে সে কথা বলিতেছে যে নিধুর ক্রমশ বোধ হইতে লাগিল যে এই পরিবারের সঙ্গে তাহার বহুদিনের পরিচয়—সত্যই সে যেন তাহাদের ঘরের ছেলেই। এখানে আজ রাত্রে খাইতে কিন্তু নিধুর যে আপত্তি ছিল—তাহা অন্য কারণে। সে বাড়ী ফিরিয়াই বিকালে দেখিয়াছে তাহার বৃদ্ধা মা বসিয়া-বসিয়া কচুর শাক কুটিতেছেন। কোনো কিছুর বিনিময়েই সে মা'র রান্না কচুর শাককে উপেক্ষা করিয়া মা'র প্রাণে কষ্ট দিতে পারিবে না। কথাটা সে অন্য ভাবে ঘুরাইয়া মঞ্জুকে বলিল।

মঞ্জু ইহা লইয়া বেশি নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখাইল না, নিধু সেজন্য এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে নিধু চলিয়া আসিবার সময় মঞ্জু বলিল—কাল সকালে উঠেই এখানে আসবেন কিন্তু। আপনার পরামর্শ নিয়ে আমরা সব সাজাব—অনুষ্ঠান কি রকম হবে না হবে সব তাতেই আপনার সাহায্য না পেলে—

—সে জন্যে ভাবনা নেই। আমি আসব এখন—

—শুধু আপনি নন নিধুদা—আপনাদের বাড়ীসুদ্ধ সব কাল নেমতন্ন। মা বলে দিলেন

আপনাকে বলতে—কাল সকালে আমি গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসব।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িতেই নিধুর মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বললে ওরা? কাল ওদের বাড়ী কি রে নিধু, রমেশ বলছিল—

—ব্রজবাবুর জন্মদিন।

—ওমা, ওই বুড়োর আবার জন্মদিন!

—পয়সা থাকলে সব হয় মা—তোমার পয়সা থাকলে তোমারও জন্মদিন হত।

—আমার জন্মদিন মাথায় থাকুক বাবা—পয়সার অভাবে তোর, রমেশের, পুঁটুর জন্মদিন কখনো করতে পারিনি। এ দেশে ওর চলনই নেই। থাকবে কি, অবস্থা সব সমান।

নিধু কি সব বলিয়া গেল খানিকক্ষণ ধরিয়া ইহার উত্তরে—কিন্তু নিধুর মা কি যেন ভাবিতেছিলেন—তাঁহার কানে সম্ভবত কোনো কথাই ঢোকে নাই।

নিধুর কথা শেষ হইলে তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—আচ্ছা, তোর জন্মদিন কবে মনে আছে তোর? আশ্বিন মাসে তো জানি—কিন্তু তারিখটা—

মায়ের কথা শুনিয়া নিধুর হাসি পাইল। বলিল—কেন মা, জন্মদিন করবে নাকি?

—না, তাই বলচি—বলিয়াই নিধুর মা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—জল আছে ঘরে? এক গ্লাস জল হবে তো রে? আমি যাই?

পরদিন সকালে প্রায় সাড়ে-আটটার সময় মঞ্জুই তাহার ভাইয়ের সঙ্গে নিধুদের বাড়ী আসিল। নিধুর মা তাহাদের দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসান, কি করেন যেন ভাবিয়া পান না এমন অবস্থা। তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন—এস মা বস। এস বাবা—বড় ভাগ্যি যে তোমরা এলে—

মঞ্জু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না জ্যাঠাইমা। নিধুদা কোথায়?

—সে এইমাত্র যে কোথায় বেরুল—এখুনি আসবে, বস মা।

—আপনারা সবাই পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের বাড়ী মা বলে দিলেন। ওখানেই দুপুরে খাবেন সবাই কিন্তু—জ্যাঠাবাবুকে বলবেন।

নিধুর মা চোখমুখ ও কথার ভাবে বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে গিয়া যেন গলিয়া পড়িলেন।

মঞ্জু খানিক বসিয়া চলিয়া যাইবার সময় বার-বার করিয়া বলিয়া গেল, নিধুদা আসিলেই যেন সে তাহাদের বাড়ী যায়।

বেলা সাড়ে-নটার সময় নিধু মঞ্জুদের বাড়ী গেল। ওই সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটা যে বিচিত্র অনুষ্ঠান, আমোদ ও পান-ভোজনের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল—নিধু বা তাহাদের বাড়ীর কেহই জীবনে ওরকম কিছু কখনো দেখে নাই। মঞ্জুর বিশেষ অনুরোধে নিধু ছোট একটি কবিতাও লিখিয়া দিল মঞ্জুর বাবার জন্মদিন উপলক্ষে। তাহাতে তাঁহাকে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হইল, যুগপ্রবর্ত্তক ঋষিদের সঙ্গে তুলনা করা হইল, মহামানব বলা হইল—বলিবার বিশেষ কিছু বাদ রহিল না। মঞ্জু নিজের একটি সুর রচনা

পাঠ করিল, কয়েকটি গান গাহিল, একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। সে যেন এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, সে যেখানে থাকে তাহাই মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তোলে—সে যেখানে নাই—তাহা হইয়া উঠে প্রাণহীন—অন্তত নিধুর তাহাই মনে হইল।

মঞ্জুর বাবাকে মঞ্জু নিজের হাতে স্নান করাইয়া শুভ্র গরদ পরাইয়া পিঁড়িতে বসাইল। গলায় নিজের হাতে তৈরি ফুলের মালা দিয়া কপালে নিজের হাতে চন্দন লেপন করিল। তাহার পর যাহা কিছু অনুষ্ঠান হইল, সবই তাঁহাকে ঘিরিয়া।

নিধুর মা এমন ধরনের উৎসব কখনো দেখেন নাই—দেখিয়া-শুনিয়া তাঁহার মুখে কথা সরে না এমন অবস্থা। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর নিমন্ত্রিতের দল চলিয়া গেল—নিধুকে কিন্তু মঞ্জু যাইতে দিল না। বৈকালে তাহারা ছোট একটি মূক অভিনয় করিবে, নিধুর বসিয়া এখনই দেখিতে হইবে তাহাদের তালিম দেওয়া। কোথায় কি খুঁত হইতেছে তাহা দেখিবার ভার পড়িল নিধুর উপর।

মঞ্জুর অভিনয় দেখিয়া নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল। সুঠাম দেহযষ্টির কি লীলা, হাত-পা নাড়ার কি সুললিত ভঙ্গি, হাসির কি মাধুর্য্য—সামান্য একটি তক্তপোশ ও দড়ির গায়ে ঝুলানো কয়েকখানি রঙিন শাড়ী ও ফুলের মালার সাহায্যে যে এমন মায়া সৃষ্টি করা যায় দর্শকদের সামনে—তা নিধু এই প্রথম দেখিল। অবশ্য অভিনয়ের সময় নিধুর মা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিধু মঞ্জুকে বলিল—যাই তাহলে এখন—

—এখনই কেন?

—সারাদিন তো আছি—

—আরও থাকতে যদি বলি?

—থাকতে হবে তাহলে—তবে কাল সকালেই তো আবার—

—কাল ছুটি নেই?

—কিসের ছুটি কাল—না।

—সামনের শনিবার আসবেন তো?

—তা ঠিক বলা যায় না—সব শনিবার তো—

—শুনুন নিধুদা—ওসব শুনচিনে। আসতেই হবে শনিবার—আমাদের হাতের লেখা কাগজের ওই দিন একটা উৎসব করব ভাবচি।

—বেশ তাহলে আসব—

—আজ রাত্রে এখানে কেন খেয়ে যান না?

—দুপুরে ওই বিরাট খাওয়ার পরে রাত্রে কিছু চলবে না মঞ্জু, ও অনুরোধ কোরো না—

—সে হবে না। মাকে বলি—

—লক্ষীটি, ছেলেমানুষি কোরো না—বলি শোনো—

—তাহলে এখন যাবেন না বলুন—

নিধুও বোধহয় মনে-মনে তাহাই চাহিয়াছিল। সে কেবল বলিল—থাকতে পারি, কিন্তু

তোমার মূক অভিনয়টি আর একবার দেখাতে হবে—

মঞ্জু উৎসাহের সঙ্গে বলিল—বেশ দেখাব। ভালো লেগেচে আপনার?

—চমৎকার।

—সত্যি বলচেন নিধুদা?

—মন থেকে বলচি বিশ্বাস কর—

—তা যখন বললেন—তখন ওর চেয়েও ভালো একটা করি আমি। স্কুলে প্রাইজ পেয়েছিলাম করে—সেটা করব এখন।

—তাহলে রইলাম আমি। না দেখে যাচ্ছিনে—

সন্ধ্যার কিছু পরে 'কচ ও দেবযানী'র মূক অভিনয় মঞ্জু করিল। ছোট ভাইকে কচের ভূমিকায় সহযোগী করিয়াছিল। নিধুর মনে হইল মঞ্জুর ভাই জিনিসটাকে নষ্ট করিল—মঞ্জুর অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইত যদি সে ছোট ভাইয়ের কাছে বাধার পরিবর্তে সাহায্য পাইত।

অনেক রাত্রে নিধু যখন মঞ্জুদের বাড়ী হইতে ফিরিল—তখন মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছে—কিসের নেশা যেন তাহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছে, কত ধরনের চিন্তা ও অনুভূতির জটিল স্রোত তখন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কোনো কিছু ভালোভাবে ভাবিয়া ও বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ক্ষমতা নাই তখন।

নিধুর মা বলিলেন—এলি বাবা? কেমন হল বল দিকি? একেই বলে বড়লোক। বড়লোক যে হয়, তাদের সব ভালো না হয়ে পারে না। জন্মদিন যে আবার ওভাবে করা যায়—তা তুমি-আমি জানি?

নিধু হাসিয়া বলিল—জানব কোত্থেকে মা? পয়সা আছে?

—আর কি চমৎকার মঞ্জু মেয়েটা! কেমন পালা গাইলে হাত পা নেড়ে? মুখে কিছু না বললেও সব বোঝা গেল।

—সব বুঝেছিলে মা?

—ওমা, ঠাকুর-দেবতার কথা কেন বুঝব না?

—কোনটা ঠাকুর-দেবতার কথা হল মা? তুমি কিছুই বোঝনি। ও আমাদের ঠাকুর-দেবতার নয় তুমি যা ভাবচ। বুদ্ধ নাম শুনেচ? ও সেই বুদ্ধদেবের—

—তা যাক গে, দেবতা তো, তাহলেই হল। কিন্তু যাই বল, মঞ্জু চমৎকার মেয়ে। না! কি সুন্দর দেখতে?

মঞ্জুর কথায় নিধু বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখাইল না। একবার সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া নিধু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করিল। কিসের বেদনা ভালো করিয়া বোঝাও যায় না ; অথচ মনে হয় যেন সারা দুনিয়া শূন্য হইয়া গিয়াছে ; অন্য কোথাও গেলে কিছু নাই কোথাও। আছে কেবল এখানে মঞ্জুদের বাড়ী।

মঞ্জুদের বাড়ি ছাড়িয়া বিশ্বের কোথাও গিয়া সুখ নাই।

বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া নিধু উদাস মনে পথ চলিতে লাগিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, পথের ধারে ঝোপে বনকলমী ফুটিয়াছে—বাঁশঝাড়ের ও বড়-বড় বিলিতি চটকা গাছের মাথায় সকালের নীল আকাশ, পূজার আর বেশি দেরি নাই, স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে আসন্ন পূজার আভাস যেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলে নিধুর তাহাই মনে হইল।

কৃষকেরা পাট কাটিতে শুরু করিয়াছে, পথের ধারে যেখানে যত খানা ডোবা তাহাতেই পচানো পাটের আঁটি। দুর্গন্ধে এখন হইতেই পথ চলা দায়। নিধু অন্যমনস্কভাবে চলিতে-চলিতে প্রায় সোনাখালির বাঁওড়ের কাছে আসিয়া পড়িল। এখান হইতে টাউন আর মাইল দুই—নিধু বাঁওড়ের ধারে ঘাসের উপর বসিল। আজ এখনো সকাল আছে। তাড়াতাড়ি কোর্টে হাজির হইয়া কি হইবে ? মক্কেলের তো বড় ভিড় !

মহকুমা টাউনে তাহার কেহ নাই। একেবারে আত্মীয়স্বজনশূন্য মরুভূমি এটা। জগতের যাহা কিছু সে চায়, তাহার প্রিয়, তাহার কাম্য—পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের গ্রামে। মনের মধ্যে দারুণ শূন্যতা—তা কে পূরণ করিবে ? যদু-মোক্তার না তার মুহুরী বিনোদ ?

নিধু বুদ্ধিমান লোক, সে কথাটা ভালো করিয়া ভাবিল। মঞ্জুর প্রতি তাহার মনোভাব এমন হওয়ার হেতু কি ? মঞ্জু সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু সুন্দরী সে একেবারে দেখে নাই তাহা তো নয়, সেজন্য সে আকৃষ্ট হয় নাই। তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাহার প্রতি মঞ্জুর দরদ ও মধুর ব্যবহার, মঞ্জুর আদর, সৌজন্য—অত বড়লোকের মেয়ে সে, শিক্ষিতা ও রূপসী, তাহার উপর এত দরদ কেন তার ?

এ এমন একটা জিনিস—নিধুর জীবনে যাহা আর কখনো ঘটে নাই, একেবারে প্রথম। তাই মঞ্জুর কথা ভাবিলেই, তাহার মুখ মনে করিলেই নিধুর মন মাতিয়া ওঠে—তাহাকে উদাস ও অন্যমনস্ক করিয়া তোলে—

সব কিছু তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

অথচ ইহার পরিণাম কি ? শুধু কষ্ট ছাড়া ?

বুদ্ধিমান নিধু সে কথাও ভাবিয়া দেখিয়াছে।

মঞ্জুকে সে চায় কিন্তু মঞ্জুর বাবা কি কখনো তাহার সহিত মঞ্জুর বিবাহ দিবেন ? মঞ্জুকে পাইবার কোনো উপায় নাই তাহার। মঞ্জুকে আশা করা তাহার পক্ষে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার সমান।

কেন এমন হইল তাহার মনের অবস্থা ?

অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, মধুর মনের ভাব কি জানিতে। মধুও কি তাহাকে এমন করিয়া ভাবিতেছে? একথা কিন্তু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা শক্ত। কি তাহার আছে, না রূপ, না গুণ, না অর্থ—মধু তাহার কথা কেন ভাবিবে? সে গরীবের ছেলে, মোক্তারী করিতে আসিয়া পাঁচটাকা ঘরভাড়া দিয়া নিজে ছুটি রাঁধিয়া খাইয়া মক্কেল শিখাইয়া, বড়-মোক্তারের দয়ায় জামিননামা সই করিয়া গড়ে মাসে আঠারো-উনিশ টাকা রোজগার করে—কোনো সম্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে তাহার মতো লোকের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারে—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত।

নিধু বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল বিনোদ-মুহুরী তাহার অপেক্ষায় বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনোদ-মুহুরী বলিল—বাবু এলেন? বড্ড দেরী করে ফেললেন যে।

—কেন বল তো?

—ছুটো মক্কেল এসেচে—চুরির কেস। আমি ধরে রেখে দিয়েচি কত চালাকি খেলে। তারা হরিহর নন্দীর কাছে কি মোজাহার হোসেনের কাছে যাবেই। আজই এজাহার করাতে হবে—বলেচি বাবু আসচেন, বস—এই এলেন বলে। ধরে কি রাখা যায়?

—আসামী না ফরিয়াদী—

—ফরিয়াদী, বাবু। আসামী গিয়েচে যদুবাবুর কাছে। এদের অনেক করে ধরে রেখেচি, বাবু। খেতে গিয়েচে হোটেলে।

নিধু নির্বোধ নয়, বিনোদ-মুহুরীর চালাকি বুঝিতে পারিল। বিনোদ-মুহুরী টাউটগিরি করিয়া কিছু কমিশন আদায় করিবে, এই তাহার আসল উদ্দেশ্য। নতুবা আসামী পক্ষ যখনই বড়-মোক্তারের কাছে গিয়াছে, অপরপক্ষ নিধুর কাছে আসিবেই—তাহাই আসিতেছে আজ দুমাস ধরিয়া। বিনোদের টাউটগিরি না করিলেও তাহারা এখানে আসিত। বিনোদের খোশামোদ করা ইত্যাদি সব বাজে কথা।

নিধু বলিল—টাকার কথা কিছু বলেছিলে?

বিনোদ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—না বাবু, আপনি এসে যা বলবেন ওদের বলুন—আমি টাকার কথা বলবার কে?

—আচ্ছা, আমি কোর্টে চললাম। তুমি ওদের নিয়ে এস—

—বাবু, ওদের এজাহারটা একটু শিখিয়ে দেবেন কখন?

—কোর্টেই নিয়ে এস—যা হয় হবে।

বার-লাইব্রেরীতে ঢুকিতে প্রথমেই সাধন-মোক্তারের সঙ্গে দেখা। সাধন তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আরে এই যে। আমি ভাবচি, আজ কি আর এলে না? দেরি হচ্চে যখন, তখন বোধ হয়—শরীর বেশ ভালো? বাড়ীর সব ভালো?

তাহার স্বাস্থ্য ও তাহার পরিবারের কুশল সম্বন্ধে সাধন-মোক্তারের এ অকারণ ঔৎসুক্য নিধুকে বিরক্ত করিয়াই তুলিল। সে বিরস মুখে বলিল—আজ্ঞে হাঁ, সব মন্দ নয়।

সাধন ভট্চাজ বলিলেন—ভালো কথা, একটা জামিননামায় সই করিতে হবে তোমায়।

মক্কেল পাঠিয়ে দেব এখন—

নিধু ইহার ভিতর সাধন ভট্টচাযের স্বার্থসিদ্ধির গন্ধ পাইয়া আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল—কিন্তু বিরক্ত হইলে ব্যবসা চলে না অন্তত একটা টাকা তো ফি পাওয়া যাইবে জামিননামায় সই করিয়া, সুতরাং সে বিনীতভাবে বলিল—দেবেন পাঠিয়ে।

—আজ একবার নতুন সাবডেপুটির কোর্টে তোমায় নিয়ে যাই চল—আলাপ হয়নি বুঝি?

—না, উনি তো শুক্রবারে এসেচেন, সেদিন আমার কেস ছিল না, ওঁকে চক্ষেও দেখিনি—

—হাকিমদের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো। চল যাই—

নবাগত সবডেপুটির নাম সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স বেশি নয়। লম্বা ধরনের গড়ন, চোখে চশমা, গায়ের রঙ বেশ ফরসা। এজলাসে কোনো কাজ ছিল না, সুনীলবাবু একা বসিয়া নথির পাতা উল্টাইতেছিলেন, সাধন ভট্টচাজ ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে বলিলেন—হুজুরের এজলাস যে আজ ফাঁকা?

—আসুন সাধনবাবু, আসুন। এ মহকুমায় দেখচি কেস বড় কম—ভাবচি দাবা খেলা শিখব না ছবি আঁকা শিখব—সময় কাটা তো চাই? ইনি কে?

হুজুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে নিয়ে এলাম, এঁর নাম নিধিরাম রায় চৌধুরী—মোক্তার। এই সবে মাস দুই হল—

—বেশ, বেশ। বসুন নিধিরামবাবু, কেস নেই, বসে একটু গল্পগুজব করা যাক—

নিধিরাম নমস্কার করিয়া বসিল। এজলাসে হাকিমদের সামনে বসিতে এখনো যেন তাহার ভয়-ভয় করে। কথা বলিতে তো পারেই না।

সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবুর বাড়ী কি এই সবডিভিসনেই?

নিধিরাম গলা ঝাড়িয়া লইয়া সসম্ভ্রমে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—এখান থেকে ছ ক্রোশ, কুড়ুলগাছি—

সুনীলবাবু চোখ কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া কথা মনে-আনিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—কুড়ুলগাছি? কুড়ুলগাছি? আচ্ছা, আপনাদের গ্রামেই কি লালবিহারীবাবুর বাড়ী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বুঝি আজকাল কন্টাইয়ের মুন্সেফ—না?

—কন্টাই থেকে বদলি হয়েছেন মেদিনীপুর সদরে। দেশে এসেছেন তিন মাসের ছুটি নিয়ে—

—ছুটিতে আছেন? কেন অসুখ-বিসুখ নাকি?

—না শরীর বেশ ভালোই। বাড়ীতে এবার পুজো করবেন শুনচি—আর বোধ হয় বাড়ীঘর সারাবেন—

—তাই নাকি? বেশ, বেশ। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব কিনা। কলকাতায় আমাদের বাড়ীর পাশেই ওঁর শ্বশুরবাড়ী। সিমলে স্ট্রীটে—আমাদের সঙ্গে খুব জানাশোনা—ওঁরা ভালো আছেন সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—ভালোই দেখে এসেছি।

—আমার নাম করবেন তো লালবিহারীবাবুর কাছে।

—নিশ্চয়ই করব—এ শনিবারে গিয়েই করব—

—বলবেন একবার সময় পেলে আমি যাব—কি গাঁয়ের নামটা বললেন? কুসুমগাছি—হ্যাঁ, কুসুমগাছিতে।

—সে তো আমাদের সৌভাগ্য, হুজুরের মতো লোক যাবেন আমাদের গ্রামে।

নিধুর বিনয়ে সুনীলবাবু পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল তাঁহার মুখ দেখিয়া। নিধুর দিকে তাকাইয়া খুশির সুরে বলিলেন—আজ আসবেন আমার ওখানে? আসুন না—একটু চা খাবেন বিকেলে? সাধনবাবু আপনিও আসুন না?

নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল হাকিমের শিষ্টতায় ও সৌজন্যে। সাধনবাবুর তো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তিনি বিনয়ে সহর্ষে বিগলিত হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে, নিশ্চয়ই যাব। হুজুর যখন বলছেন—নিশ্চয়ই যাব—

—হ্যাঁ আসুন—এই ধরুন—ছ-টার সময়—

এই সময় হরিবাবু মোক্তার দুজন মক্কেল লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—হুজুর, কি ব্যস্ত আছেন? একটা এজাহার করতে হবে আমার মক্কেলের—

নিধু ও সাধন ভট্টাচার্য নমস্কার করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইলে সাবডেপুটিবাবু বলিলেন—তা হলে মনে থাকে যেন নিধুবাবু—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

বাহিরে আসিয়া সাধন ভট্টাচার্য বলিলেন—সব হুজুরের সঙ্গে আমার খাতির—বুঝলে? তোমায় সব এজলাসে একে-একে নিয়ে যাব। তবে কি জানো—এস. ডি. ও. আর সবডেপুটি—এঁদের নিয়েই আমাদের কারবার। দেওয়ানী কোর্টে আমাদের তত তো হয় না, ফৌজদারী হাকিমদের সঙ্গে তাব রাখলেই চলে যায়—

বার-লাইব্রেরীতে আসিবার পূর্বে সাধন ভট্টাচার্য নিম্ন সুরে বলিলেন—ভালো কথা, আমার সেই প্রস্তাবটার কি হল হে?

নিধুর গা জ্বলিয়া গেল। সে এতক্ষণ ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। ইতস্তত করিয়া বলিল—এখনো তো ভেবে দেখিনি—

—বাড়ীতে কিছু বল নি?

—আজ্ঞে না—

—তোমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না বলো—আসল কথা সেটা।

নিধু ভদ্রতার খাতিরে বলিল—আজ্ঞে না, মেয়ে ভালোই।

—তোমার সঙ্গে সামনের শনিবারে তোমাদের বাড়ী যাই না কেন?

—আপনি যাবেন আমার বাড়ীতে সে তো ভাগ্যের কথা। যে আমি বলছি কি এ শনিবারে না হয় আমি একবার জিগ্যেস করেই আসি বাবাকে—

—খুব ভালো। তাই কোরো। সোমবারে যেন আমি নিশ্চয়ই জানতে পারি—

বিকালে সুনীলবাবুর বাসায় নিধু গিয়া দেখিল সাধন ভট্টচাজ পূর্ব্ব হইতেই সেখানে বসিয়া আছেন। সুনীলবাবু তখনো কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফেরেন নাই। চাকরে তাহাকে অভ্যর্থনা করাইয়া বসাইল।

সাধন বলিলেন—এ. ডি. ও. নেই কিনা—সুনীলবাবু ট্রেজারীর কাজ শেষ করে আসবেন বোধ হয়।

আরও ঘণ্টাখানেক বসিবার পরে সুনীলবাবুকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিতে দেখা গেল।

উঁহাদের বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—বড্ড দেরি হয়ে গেল—সো সরি! আজ আবার বড় কর্ত্তা নেই—টুরে বেরিয়েচেন মফঃস্বলে—ট্রেজারির কাজ দেখে আসতে হল কিনা। বসুন—আসচি—

বাইরের ঘরটিতে দুখানা বেতের কৌচ, দুখানা টেবিল, খান চার-পাঁচ চেয়ার পাতা। একটা ছোট আলমারিতে অনেকগুলি বাংলা ও ইংরাজি বই—দেওয়ালে কয়েকখানি ফটো, কয়েকখানি ছবি। তাহার মধ্যে একখানি ছবি নিধুর বেশ ভালো লাগিল। একটা গাছের তলায় দুটি হরিণ ক্রীড়ারত—দূরে কোনো স্রোতস্বিনী, অপর পারে কাননভূমি, আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি মারিতেছে।

সে সাধন ভট্টচাজকে ছবিখানি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কি চমৎকার না?

সাধন ভট্টচাজ মোক্তারী করিয়া ও মক্কেল শিখাইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন জিনিস দেখিতে ভালো, কোনটা মন্দ, ইহা লইয়া কখনো মাথা ঘামান নাই। সুতরাং তিনি অনাসক্ত ও উদাসীন দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—কোনটা? ও-খানা? হ্যাঁ তা বেশ।

এমন সময় সুনীলবাবু একটা সিগারেটের টিন লইয়া ঘরে ঢুকিয়া নিধুর সামনের টেবিলে টিনটি রাখিয়া বলিলেন—খান—

নিধু তো এমনি কখনো ধূমপান করে না, সাধন ভট্টচাজ করেন বটে কিন্তু হাকিমের সামনে কি করিয়া সিগারেট টানিবেন? সে ভরসা তাঁহার হয় না। সুতরাং যেখানকার সিগারেটের টিন সেখানেই পড়িয়া রহিল। সাধন ভট্টচাজ কৃত্রিম খুশির ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন—চমৎকার ছবিগুলো আপনার ঘরে—

সুনীলবাবু বলিলেন—এখানে ভালো ছবি কিছু আনিনি। হয়েচে কি, ভালো ছবি কিনবার রেওয়াজ আমাদের বাঙালীর মধ্যে নেই বললেই হয়। আমরা ছবির ভালোমন্দ প্রায়ই বুঝিনে। অনেক সময় নিকৃষ্ট বিলিতি ওলিওগ্রাফ কিনে এনে বৈঠকখানায় জাঁক করে বাঁধিয়ে রাখি—সাধনবাবু যেখানা দেখালেন, ওখানা সত্যিই ভালো ছবি। নন্দলাল বসুর আঁকা একখানা ছবির প্রিন্ট। নন্দলাল বসুর নাম নিশ্চয়ই—

কে নন্দলাল বসু, সাধন ভট্টচাজ জীবনে কখনো শোনেন নাই, হাকিম খুশি করিবার জন্য সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব—খুব—আমাদের বাড়ীর মা-বাবা সবাই

নন্দলাল বসুর ছবির ভক্ত—

—আজ্ঞে তা হবেই তো! কত বড় শিক্ষিত বংশ আপনাদের—

নিধু আলমারির বই দেখিতেছে দেখিয়া সুনীলবাবু বলিলেন—বই প্রায় সব এখানে পাবেন, আজকাল যা-যা বেরুচ্ছে—বই পড়তে ভালোবাসেন দেখচি আপনি—

নিধু বলিল—বই ভালোবাসি, কিন্তু এসব জায়গায় ভালো বই মেলেই না।

—কেন আপনাদের বার-লাইব্রেরীতে?

—মোক্তার বারে দু-দশখানা বাঁধানো ল' রিপোর্ট আর উইক্‌লি নোটস্‌ ছাড়া আর তো বই দেখিনে।

—আপনি আমার কাছ থেকে বই নিয়ে যাবেন, আবার পড়া হলে ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে যাবেন।

—তাহলে তো বেঁচে যাই—

—আচ্ছা, কুড়ুলগাছি এখান থেকে ক-মাইল হবে বললেন?

—দু-ক্রোশ রাস্তা হবে—

—যাবার কি উপায় আছে?

—গরুর গাড়ী করে যাওয়া যায়—নয় তো হেঁটে—

—সাইকেলে যাওয়া যায় তো? আমাকে নিয়ে যাবেন?

—সে তো আমাদের ভাগ্য, কবে যাবেন বলুন?

—লালবিহারীবাবুদের সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির খুব আনাশোনা—আমি এখানে নতুন এসেচি, উনি জানেন না, জানলে এতদিন ডেকে নিয়ে যেতেন।

—বেশ, বেশ। আমি গিয়ে বলব এ শনিবারেই।

এই সময় ভৃত্য চা ও খাবার আনিয়া সামনের টেবিলে রাখিয়া দিল।

সুনীলবাবু বলিলেন—আসুন, চা খেয়ে নিন—চাকরে-বাকরে যা করে, তেমন কিছু ভালো হয় নি। বাসায় আমি একা, মেয়েমানুষ কেউ নেই তো। সাধন ভট্চাজ সম্ভ্রমের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর কি আপাতত এখানে একা আছেন?

—একাই থাকি বই কি।

—কেন আপনার স্ত্রীকে বুঝি নিয়ে আসেননি?

সুনীলবাবু হাসিয়া বলিলেন—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। স্ত্রী কোথায়? এখনো বিয়ে করিনি—

সাধন ভট্চাজ অপ্রতিভের সুরে বলিলেন—ও, তা তো বুঝতে পারিনি। তা হুজুরের আর বয়েস কি? আপনি তো ছেলেমানুষ—করে ফেলুন এইবারে বিয়ে। এই আমাদের এখানে থাকতে-থাকতেই—

—ভালোই তো। দিন না একটা যোগাড় করে—

সাধন ভট্চাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—যোগাড় করার ভাবনা? হুজুরের মুখ থেকে কথা

বেরুলে একটা ছেড়ে দশটা পাত্রী কালই যোগাড় করে দেব।

—নিধিরামবাবু আপনি বিবাহিত?

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—আজ্ঞে না, এখনো করি নি—

—আপনি তো আমাদের চেয়েও বয়সে ছোট—আপনার যথেষ্ট সময় আছে এখনো।

সাধন ভট্টচাজ ব্যগ্রভাবে নিধুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—আর হুজুরেরই কি সময় গিয়েচে নাকি। বলুন তো দেখি চেষ্টা কাল থেকেই—

সুনীলবাবু হাসিয়া বলিলেন—হবে, হবে, ঠিক সময়ে বলব বইকি।

লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া চা-মজলিস শেষ হইলে উভয়ে সুনীলবাবুর বাসা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। পথে সাধন ভট্টচাজকে একটু অন্যমনস্ক মনে হইল। নিধুর কথার উপরে সাধন দু-একটা অসংলগ্ন উত্তর দিলেন। নিধুর বাসার কাছে আসিয়া সাধন একবার মাত্র বলিলেন—তাহলে নিধু তুমি এ শনিবার বাড়ি যাচ্ছ নাকি?

নিধু বলিল—আজ্ঞে হাঁ—যাব বই কি—

—আচ্ছা তা হলে সোমবার দেখা হবে। আমি আজ—

নিধু মনে-মনে হাসিল। সাধন-মোক্তারকে সে ইতিমধ্যে বেশ চিনিয়া ফেলিয়াছে। স্বার্থ ছাড়া তিনি এক পাও চলেন না। আশ্চর্য! ওই মেয়েকে সাবডেপুটি সুনীলবাবুর হাতে গছাইবার দুরাশা সাধনের মনে স্থান পাইল কি করিয়া? যাক, পরের কথায় থাকিবার তাহার দরকার নাই। সে নিজে আপাতত সাধন-মোক্তারের তাগিদের দায় হইতে রেহাই পাইয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

ভাদ্রমাসের দিন ছোট হইয়া আসিতেছে ক্রমশ—নিধুর সকল ব্যস্ততাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কামারগাছির দীঘির পাড়ে আসিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ী পৌঁছিল সে সন্ধ্যার প্রায় আধঘণ্টা পরে। আজ মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোনো উপায় নাই। এত রাত্রে সে কোন ছুতায় মঞ্জুদের বাড়ী যাইবে?

বাড়ীতে সে পা দিতেই তাহার মা বলিলেন—তুই এলি? জজবাবুর ছেলে তোকে বিকেল থেকে তিনবার খোঁজ করে গিয়েচে। এই তো খানিক আগেও এসেছিল—বলে গিয়েচে এলেই পাঠিয়ে দিতে—মঞ্জু কি দরকারে তোর খোঁজ করেচে—

নিধু উদাসীন ভাবে বলিল—ও। আচ্ছা দেখি—আবার রাত হয়ে গেল এদিকে—

—রাত তাই কি! মন্টুর তাই বলে গেল, যত রাত হয় জ্যাঠাইমা, নিধুদা এলে পাঠিয়ে দেবেনই—

—বেশ যাব এখন। হাত মুখ ধুই—

ঘরে ছোট্ট একখানা আরশি ছিল। নিজের মুখ তাহাতে দেখিয়া নিধু বিশেষ খুশি হইল না। পথশ্রমে ও ধুলায় মুখের চেহারা—নাঃ, হোপলেস্। জজবিলাসের সামনে

এ চেহারা লইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব।

কিছুক্ষণ পরে নিধুর মা ছেলেকে গামছা কাঁধে ভিজা কাপড়ে পুকুরের ঘাট হইতে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—হ্যারে, ওকি, তুই নেয়ে এলি নাকি এই সন্দেবেলা?

—হ্যাঁ মা, বড্ড ধুলো আর গরম—তাই নেয়ে সাবান দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলাম—

—অসুখ-বিসুখ না করলে বাঁচি এখন! কক্ষনো তো সন্দেবেলা নাইতে দেখিনে তোকে—কাপড় ছেড়ে এসে জল খেয়ে নে। চা খাবি?

নিধু জানে মা চা করিতে জানে না। তাছাড়া ভালো চা বাড়ীতে নাইও, কারণ তাহাদের বাড়ীতে কখনো কালে-ভদ্রে কেহ শখ করিয়া হয়তো চা খায়—তাহাও ঔষধ হিসাবে; সর্দি টর্দি লাগিলে তবে।

সে বলিল—না মা চা থাক—তুমি খাবার দাও বরং—

নিধুর মা ছেলেকে রেকাবিতে করিয়া তালের ফুলুরি ও গুড় আনিয়া দিলেন। নিধু খাইতে ভালোবাসে বলিয়া দ্বিপ্রহরে রন্ধন সারিয়া এগুলি নিজ হস্তে করিয়া রাখিয়াছেন। বলিলেন—খা তুই—আর লাগে আরও দেব, আছে।

এমন এক সময় আসে জীবনে, আসল মাতৃস্নেহও মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না, বরং উত্ত্যক্ত করিয়া তোলে। নিধুর জীবনে সেই সময় সমাগত। সে এতগুলি তেলে-ভাজা তালের বড়া এখন বসিয়া-বসিয়া খাইতে রাজী নয়। তাহাতে প্রথমত তো সময় যাইবে, তারপর যদি মঞ্জুরা জল খাবার খাইবার জন্ত বলে—কিছুই খাওয়া যাইবে না।

গ্রোগ্রাসে কতক বড়া খাইয়া কতক বা ফেলিয়া নিধু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মুখ ধুইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

নিধুর মা ডাকিয়া বলিলেন—হ্যারে, ওমা এ কি করে খেলি তুই? সবই যে ফেলে গেলি? ভালোবাসিস বলে বসে-বসে করলাম—তা পান খাবি নে?

উত্তরে দরজার বাহির হইতে নিধু কি-যে বলিল—ভালো বোঝা গেল না।

মঞ্জুদের বাড়ীর দরজাতে পা দিতেই নৃপেনের সঙ্গে দেখা।

—ও দিদি, নিধুদা এসেচে—এই যে—ওমা—বলিতে-বলিতে সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতেই বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

মঞ্জু হাসিমুখে ঘর হইতে রোয়াকে আসিয়া বলিল—এই যে আসুন নিধুদা, আমি আজ তিনবার নৃপেনকে পাঠিয়েচি আপনার খোঁজে। এই মাত্তর বলছিলাম ওকে আর একবার গিয়ে দেখে আসতে এলেন কিনা। কতক্ষণ এসেচেন?

—এই ঘণ্টাখানেক। সন্দের পর এসেচি—এসে নেয়ে এলাম পুকুরে—

—আসুন বসুন। কিছু মুখে দিন—

—সব খেয়ে এসেচি বাড়ী থেকে—

—ওটাও তো বাড়ী নিধুদা। খেয়ে এসেচেন বলে কি রেহাই পাবেন? বসুন—

মঞ্জুকে নিধুর আজ বড় ভালো লাগিল। সে একখানা ফিকে ধূসর রঙের জরির কাজ করা ঢাকাই শাড়ী ও ঘন-বেগুনি রঙের সাটিনের ব্লাউজ পরিয়াছে, পিঠে লম্বা চুলের বিনুনির অগ্রভাগে বড়-বড় টাসেল দোলানো, খালি পায়ে আলতা, সুন্দর করসা মুখে ঈষৎ পাউডারের আমেজ—বড়-বড় চোখে প্রসন্ন কৌতুকের হাসি।

নৃপেন বলিল—কাল আপনি আছেন তো? আমাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা জানেন না?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায়, কে করবে—

—বাবা এখানকার পাঠশালায় ছেলেদের আর মেয়েদের মেডেল দিচ্ছেন। আবৃত্তি যে ফার্স্ট হবে তাকে দেবেন। বাবা সভাপতি, স্কুল সাব-ইনস্পেক্টার বিচার করবেন। বাবা মেডেল দেবেন, বাবা তো বিচার করতে পারেন না?

—কাল কখন হবে?

—এই বেলা দুটো থেকে আরম্ভ হবে, আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানাতেই হবে। বেশি তো ছেলে নয়, ত্রিশ না বত্রিশটি ছেলেতে মেয়েতে—

এই সময় মঞ্জু খাবারের প্লেট হাতে ধরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—অমনি সব ফাঁস করে দেওয়া হচ্ছে! কোথায় আমি ভাবচি খাবার খাইয়ে সুস্থ করে নিধুদাকে সব বলব—না উনি অমনি—

নৃপেন অভিমানের সুরে বলিল—বাঃ, তুমি কি আমায় বারণ করে দিয়েছিলে? তাছাড়া আসল কথাটা তো এখনো বলি নি, সেটা তুমিই বল!

নিধু মঞ্জুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—অন্য কিছু নয়, আপনাকেও একজন জজ হতে হবে, বাবাকে আমি বলেচি বিশেষ করে। আপনাকে নিতেই হবে। কেমন রাজী?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—তুমি কি যে বল মঞ্জু! আমি ভালো আবৃত্তি করেচি কোনো কালে যে জজ হতে যাব! সব বাজে।

—ওসব বললে আমি শুনচিনে—হতেই হবে আপনাকে!

—কি রকম কি করতে হবে তাই জানিনে!

—সব বলে দেব, তা হলেই হল তো?

মঞ্জুদের বাড়ী আসিলেই তাহার ভালো লাগে। সপ্তাহের সমস্ত পরিশ্রম, মক্কেল-মোক্তারের পেছনে-পেছনে জামিননামার উমেদারী করা, মক্কেলদের মিথ্যা কথা শেখানো—সব শ্রমের সার্থকতা হয় এখানে। সারা সপ্তাহের দুঃখ, একঘেয়েমি কাটিয়ে যায় যেন। ইহাদের বাড়ীতে সব সময় যেন একটা আনন্দের স্রোত বহিতেছে—যে আনন্দের স্বাদ সে সারাজীবনে কোনোদিন পায় নাই—এখানে আসিয়াই তাহার প্রথম সন্ধান পাইল। কিন্তু মঞ্জু আছে বলিয়াই এই বাড়ীটি সজীব হইয়া আছে, মঞ্জু যেন ইহার অধিষ্ঠাত্রী।

নিধু বলিল—কি কবিতা আবৃত্তি হবে শুনি।

—রবীন্দ্রনাথের 'দুইবিঘা জমি' আর মাইকেল মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'—

—আমি নিজে কখনোই ও দুটো ভালো করে আবৃত্তি করতে পারিনে—

—তাহলেই তো আপনি সব চেয়ে ভালো জজ হতে পারবেন—

—আমি কেন তবে ? আমাদের গাঁয়ের হরি কলুকে জজ কর না কেন তবে ?

মঞ্জু হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিধুর মনে হয় এমন বীণার ঝঙ্কারের মতো মিষ্টি হাসি সে কখনো শোনে নাই।

নৃপেন বলিল—নিধুদা, দিদিকে একবার বলুন না ও দুটো আবৃত্তি করতে ?

নিধু বলিল—কর না মঞ্জু, কখনো শুনিনি তোমার মুখে—

মঞ্জুর একটা গুণ, বেশিক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কোনো বিষয়ের জন্যই সাধিতে হয় না—যদি তাহার অভ্যাস থাকে, সেটা সে তখনি করে। মঞ্জুর চরিত্রের এ দিকটা নিধুর সব চেয়ে ভালো লাগে—এমন সপ্রতিভ মেয়ে সে কখনো দেখে নাই।

মঞ্জু দুটি কবিতাই আবৃত্তি করিল। নিধু মুগ্ধ হইয়া শুনিল—এমন গলার সুর, এমন হাত নাড়িবার সুকুমার ভঙ্গি এসব পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে কল্পনা করাও কঠিন।

মঞ্জু বলিল—নিধুদা, আমরা একটা অভিনয় করব সেদিন বলে[illegible]ম—থাকবেন আপনি ?

—নিশ্চয়ই থাকব—

—কি বই প্লে করা যায় বলুন না ?

—আমি কি বইয়ের কথা বলব বল ? আমি কখনো কিছু দেখিনি—

নিধুর এই সরলতা মঞ্জুর বড় ভালো লাগে। চাল-দেওয়া ছোকরা সে তাহার মামার বাড়ীর আশে-পাশে অনেক দেখিল, কিন্তু নিধুদার মধ্যে বাজে চাল এতটুকু নাই, মঞ্জু ভাবে।

নৃপেন বলিল—রবীন্দ্রনাথের একটা বই করা যাক—ধর 'মুক্তধারা'—

মঞ্জু বলিল—বড় শক্ত হবে—সে আমাদের স্কুলে মেয়েরা করেছিল সেবার, অনেক লোক দরকার—বড্ড শক্ত। নিধুদা একটা লিখুন—

নিধু এ ধরনের কথায় বড় লজ্জা পায়। তাহাকে ইহারা ভাবিয়াছে কি ? কোন কালে সে বাংলা লিখিল ?

সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—আমাকে কেন মিথ্যে বলা ? আমি লিখতে জানি ?

মঞ্জু বলিল—আপনার কবিতা তো দেখেচি—দেখি নি ?

—সে ঝোঁকের মাথায় লেখা বাজে কবিতা—তাকে লেখা বলে না।

—তাই আমাদের লিখে দিন, সেই বাজে বই-ই আমরা প্লে করব।

—তার চেয়ে তুমি কেন লেখ না মঞ্জু ?

—আমি ! তাহলেই হয়েচে ! আমি এইবার কলম ধরে অনুরূপা দেবী হব আর কি !

—ভালো কথা, মঞ্জু, আমি বই পড়তে পাই নে—আমায় খান-দুই বই দিয়ো—এবার যাবার সময় নিয়ে যাব।

—এতদিন বলেননি কেন ? বই অনেক আছে। দিয়ে দিতাম—যখন যা দরকার হবে

নিয়ে যাবেন।

—কি-কি বই আছে?

—অনেক, অনেক—কত নাম করব? রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ বারো ভল্যুম আছে—মাইকেল আছে—

—কবিতা নয়, উপন্যাস আছে?

—তাও আছে। মা'র কাছ থেকে চাবি আনব? দেখবেন?

—না এখন থাক, রাত হয়ে গিয়েচে। কাল সকালে আসব—

—আচ্ছা, নিধুদা আপনি কেন ছুটি নিন না দিন-কতক?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বল তো?

—আপনি থাকলে বেশ লাগে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে মিশবার লোক নেই আর কেউ। আপনি আসেন তবু দুদিন বেশ আনন্দে কাটে।

—আমার আবার ছুটি কি? আমি তো কারো চাকরি করি না?

—তবে ভালোই তো। এ হপ্তায় আর যাবেন না—কেমন?

—না গেলে পসার নষ্ট হয়ে যাবে যে! নতুন প্র্যাকটিসে বসে কামাই করা চলে না।

সেদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া নিধুর আর ঘুমই হয় না।

মঞ্জু তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। সে থাকিলে নাকি মঞ্জুর ভালো লাগে—মঞ্জুর মুখে এ কথা সে কোনোদিন শুনিবে, ইহা বহুদূর নীল সমুদ্রের পারে স্বপ্নদ্বীপের মতো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব। তবুও সে নিজের কানে শুনিয়াছে মঞ্জুই একথা বলিয়াছে।

ভোরে উঠিয়া সে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। গ্রামের পথে-পথে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া পুকুরে স্নান করিয়া আসিল।

নিধুর মা বলিলেন—না খেয়ে বেরিও না যেন—

—মা, ধোপার-বাড়ী থেকে কাপড় এসেচে?

—কই না বাবা, বিষ্টির জন্যে ধোপা তো আসেনি এ কদিন।

—আমার ফরসা কাপড় তোমার বাক্সে আছে?

—ছেলের আমার সব বিদঘুটে। কাপড় সব নিয়ে গেলি রামনগরের বাসায়। আমার বাক্সে তোর কাপড় থাকবে কোথা থেকে? তোর কিছু খেয়াল যদি থাকে! নিজের কাপড়-চোপড়ের পর্য্যন্ত খেয়াল নেই। একটি বৌমা বাড়ীতে না আনলে—

নিধু ঘরের মধ্যে পালাইবার উপক্রম করিতে মা বলিলেন—দাঁড়া,—খাসনে কোথাও যেন। একটু মিছরি ভিজিয়ে রেখেচি, আর শশা কেটে—

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিধু দেখিল তাহার ফরসা কাপড় নিজের কাছেও কিছু নাই। আজ সভায় মোক্তারগিরি করিবে কি করিয়া তবে? মাকে সেকথা জানাইল। নিধুর মা বলিলেন—তা আমি এখন কি করি বাপু! এ যে অন্যায় কথা হল! কর্ত্তার একটা সেকেলে পাঞ্জাবী আছে—সেটা তোর গায়ে হয়?

—তা বোধ হয় হতে পারে। বাবা তো মোটামানুষ নন, আমারই মতো—দেখি কেমন ?

কিন্তু শেষে দেখা গেল সে পাঞ্জাবীর গলার কাছে পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে অনেকখানি। তাহা পরিয়া কোথাও যাওয়া চলে না।

নিধুর মা স্মৃতিবিহ্বল দৃষ্টিতে পাঞ্জাবীটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—উনি তৈরি করিয়েছিলেন তখন এই তিন-চার মাস আমাদের বিয়ে হয়েচে। তখন কি চেহারা ছিল কর্তার! চুয়োডাঙার জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করতেন। তোর মত শনিবার-শনিবার বাড়ী আসতেন—

মায়ের চোখে এমন অতীতের স্বপ্নভরা দৃষ্টি নিধু আরও দু-একবার দেখিয়াছে। তখন সে নিজে চুপ করিয়া থাকে, কোনো কথা বলে না। তাহার মন কেমন করে মায়ের জন্য। বড় ভালোমানুষ। সৎমা বলিয়া নিধু বাল্যকাল হইতেই কখনো ভাবে নাই—তিনিও সৎছেলে বলিয়া দেখেন নাই। নিজের মায়ের কথা নিধুর মনেই হয় না। মা বলিতে সে ইহাকেই বোঝে।

—চারুর জামা তোর গায়ে হয় না ? দেখি গিয়ে না হয় চারুর মা'র কাছে চেয়ে ?

—থাক মা, তোমার এখানে-ওখানে বেড়াতে হবে না জামার জন্যে। আমি যা আছে তাই গায়ে দিয়ে যাব এখন। কি খেতে দেবে দাও—

হঠাৎ মা ও ছেলে যেন কি দেখিয়া যুগপৎ আড়ষ্ট হইয়া গেল। ভূত নয় অবিশ্যি—সকালবেলা। মঞ্জু সদর দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিয়াছে—সঙ্গে কেহ নাই। সদ্য স্নান করিয়া ভিজে চুল পিঠে এলাইয়া দিয়াছে, চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল রঙের শাড়ী পরনে, তার সঙ্গে ঘোর বেগুনি রঙের ব্লাউজ, খালি পা, হাতে খানকতক বই, মুখে হাসি।

—এস মা-মণি এস, এস—

—কই, সকালে এলুম ঝ্যাঁটাইয়া, খাবার কই! খিদে পেয়েচে—নিধুদা কোথায় ?

—এই তো এখানে—বোধ হয় ঘরের মধ্যে—বস মা বস।

—নিধুদা কাল বই পড়তে চেয়েছিলেন তাই নিয়ে এলাম।

—তুমি আমাদের লক্ষ্মী মা-টি। বোস আমি আসচি—

ইতিমধ্যে নিধু চুল আঁচড়াইয়া ফিটফাট হইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

তাহার পালানোর কারণ তাহার অসংবৃত বেশ। বলিল—এই যে মঞ্জু! কখন এলে ? ওগুলো কি ?

—এগুলো আপনার জন্যে এনেছি—বই—

—দেখি কি-কি বই—

—এখন থাক। আপনি জজ হবেন আবৃত্তি কমপিটিশনে, তা গাঁ সুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েচে জানেন ?

—কি রকম ?

—বাবার কাছে সব এসে জিগ্যেস করছিল সে আজ সকালে।

নিধুর মা এই সময় এক বাটি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া মঞ্জুর হাতে দিয়া বলিলেন—খেতে চাইলে, কিন্তু তোমার গরীব জ্যাঠাইমার আর কিছু দেওয়ার—

মঞ্জু কথা শেষ করিতে না দিয়াই প্রতিবাদের সুরে বলিল—অমন যদি বলবেন জ্যাঠাইমা, তাহলে আপনাদের বাড়ী কক্ষনো আসবো না—তাহলে ভাববো পর ভাবেন তাই ভদ্রতা করচেন। বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে আবার ভদ্রতা কেন? সে যা জুটবে তাই খাবে—কি বলেন নিধুদা? কই নিধুদার কই?

—এই যে ওকেও দিই—দ্বিতীয় খোলাটা আগে—

—খেয়ে নিধুদা চলুন আমাদের বাড়ী—আবৃত্তির কবিতাগুলো একবার পড়ে নেবেন তো?

—হ্যাঁ ভালোই তো, চল।

নিধুর মা বলিলেন—যাবে এখন মা, এখানে একটু বস। ও পুঁটি, মঞ্জুকে জল দিয়ে যা মা। পান খাবে?

—না জ্যাঠাইমা—পান খেলেও আমি সকালবেলা খাইনে। একটা পান খাই দুপুরে খাওয়ার পর, আর বিকেলে একটা। রাত্রে খাইনে—আমার বড় মামীমার দাঁত খারাপ হয়ে গিয়েচে অতিরিক্ত পান দোক্তা খাওয়ার দরুন। আমি দেখে-শুনে ভয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

মঞ্জু আরও আধঘণ্টা বসিয়া নিধুর মা ও বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করিল। সে যে নিধুকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিল উঠিবার কিছু পূর্ব্বে।

মঞ্জু চলিয়া গেলে নিধুর মা বলিলেন—সামনের রবিবারে ওদের দুই ভাই-বোনকে খাওয়াতে হবে নেমন্তন্ন করে। রোজ-রোজ ওদের বাড়ী খাওয়া হচ্চে—মান থাকে না নইলে—

—বেশ তো মা, তাই কোরো। আমি আসবার সময় রামনগর থেকে কিছু ভালো সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে আসব—কি বল?

—তাই আনিস বাবা। যা ভালো বুঝিস।

সারাদিন হৈ-হৈ করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। নিমন্ত্রণ খাওয়া, মঞ্জুর হাসি, আলাপ, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় সমগ্র গ্রামবাসীর ঈর্ষা-প্রশংসা-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুর বাবার ও স্কুল ইনস্পেক্টরের পাশে চেয়ারে বসিয়া আবৃত্তির ভালোমন্দ বিচার করা, আবার সন্ধ্যায় মঞ্জুদের বাড়ী জলখাবার খাওয়া, আবার আড্ডা, গল্প, মঞ্জুর গান, মঞ্জুর হাসি, মঞ্জুর স্নেহবর্ষী-দৃষ্টির প্রসন্ন আলো।

নিধুর মা রাত্রে বলিলেন—হ্যাঁরে তুই নাকি জজবাবুর পাশে বসে কি করেছিলি স্কুলে?

—কে বললে?

—পালিতদের বাড়ী শুনে এলাম। তোর বড্ড সুখ্যাতি করছিল সেখানে সবাই।

বললে···হীরের টুকরো ছেলে হয়েচে নিধু, অত বড়-বড় লোকের পাশে বসে ঐটুকু ছেলে—

—তা তোমার ছেলে কম কেন হবে বল না?

—আমার বুকখানা শুনে বাবা দশ হাত হল।

নিধুর বাবা বাড়ীতে থাকিয়াও বড় কাহারো একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। তিনি পর্যন্ত ডাকিয়া নিধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন সভা সম্বন্ধে।

তিনি লোকের মুখে শুনিয়াছেন। সভায় যান নাই—কোথাও বড় যান না।

সোমবার সকাল। সপ্তাহে এমন দিন কেন আসে?

অত ভোরে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। নিধুর মা রাত্রি থাকিতে উঠিয়া ভাত চড়াইয়াছিলেন। স্নান করিয়া দুটি ভাত মুখে দিয়া নিধু পথে বাহির হইল।

কি আশ্চর্য্য! চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। অত সকালে গ্রামের বাহিরের পাকা রাস্তা দিয়া নৃপেন, বীরেন ও মঞ্জু বেড়াইয়া ফিরিতেছে।

নিধু বলিল—বীরেন যে! কখন এলে?

—কাল অনেক রাত্রে। রাত দশটার ট্রেনে স্টেশনে নেমে বাড়ী পৌঁছতে একটা হয়ে গেল।

—তারপর মঞ্জু যে বড় বেড়াতে বেরিয়েচে? কখনো তো—

—বেড়াতে বেরুই নি। মেজদা কাল রাত্রে ফাউন্টেন পেন হারিয়ে এসেচে—তাই ভোরে কেউ উঠবার আগে আমরা তিনজনে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। পাওয়া গেল না।

—স্টেশন পর্য্যন্ত সারা পথ না খুঁজলে—

বীরেন বলিল—তা নয়, পুব-পাড়ার শাম বাগ্দীর বাড়ী পর্য্যন্ত ফাউন্টেন পেন পকেটে ছিল। শাম বাগ্দী রামনগরের হাটে গিয়েছিল, তার গাড়ী ফিরছিল—সেই গাড়ীতে এলাম। তাকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেচি পেনটা তখনও পকেটে আছে। বাড়ী এসে আর দেখলাম না।

মঞ্জু বলিল—চলো মেজদা, নিধুদাকে একটু এগিয়ে দিই।

নিধু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে চাহিল। মঞ্জু বলিল—খেয়ে যাবেন না নিধুদা?—

মা কি না খাইয়ে ছেড়েছেন? সেটি হবার যো নেই তাঁর কাছে। সেই কোন ভোরে উঠে—

—চমৎকার মানুষ বটে জ্যাঠাইমা। সামনের শনিবারে আসা চাই নিধুদা।

—আসব বই কি—

—পুজো তো এসে গেল, পুজোর সময় আমরা সবাই মিলে একটা ছোটখাটো প্লে করব—আপনি আসুন, সামনের রবিবারে তার পরামর্শ করা যাবে। মেজদা এসেচে, বড়দাও সামনের হপ্তায় আসবে। বেশ মজা হবে।

—কে অরুণবাবু? তাঁকে কখনো দেখিনি।

—দেখবেন এখন সামনের রবিবারে।

—তোমরা যাও মঞ্জু, আর আসতে হবে না।

—আর একটু যাই—ওই সাঁকোটা পর্যন্ত—ভারি ভালো লাগে শরতের সকালে বেড়াতে। কি সবুজ গাছপালা! চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার কাছে এসব নতুন।

—তুমি এর আগে পাড়াগাঁ দেখ নি বুঝি মঞ্জু?

—মধুপুর দেখেছি দুমকা দেখেছি। বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম—

সাঁকোর কাছে গিয়া সকলে সাঁকোর উপর কিছুক্ষণ বসিল। বীরেন বলিল—মঞ্জু একটা গান কর তো? বেশ লাগছে সকালটা। নিধুও সে অনুরোধে যোগ দিল। মঞ্জু দু-তিনটি গান গাহিল। ক্রমে বেলা উঠিয়া গেল। দুধারের গাছপালার মাথায় শরতের রৌদ্র ঝলমল করিতে লাগিল। নিধু উহাদের কাছে বিদায় লইয়া জোর পায়ে পথ হাঁটিতে লাগিল।

সেদিন এজলাসে ঢুকিতেই সাবডেপুটি সুনীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি নিধিরামবাবু, লালবিহারীবাবুকে আমার খবরটা দিয়েছিলেন তো? সর্বনাশ! নিধু তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সে কথা একেবারেই তাহার মনে ছিল না? মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হইলে তাহার কোনো কথাই ছাই মনে থাকে না।

সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—হুজুর—খবরটা দেওয়া হয় নি। আমার বাড়ীতে অসুখবিসুখ—উনিও স্কুলে কি সব কাজে বড় ব্যস্ত—বড়ই দুঃখিত—

—না, না, সেজন্যে কি? সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। দেখি যদি সুবিধে পাই—সামনের রবিবারে আমি নিজেই সাইকেল করে যাব। সামনের শনিবারে আপনি শুধু জানিয়ে দেবেন দয়া করে যে আমি রবিবারে যেতেও পারি। তাহলেই হল।

সাধন-মোক্তার ফৌজদারী কোর্টের বটতলা হইতে নিধুকে দেখিতে পাইয়া তাহার দিকে আসিতেছিলেন, সাবডেপুটির এজলাসের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিধু একেবারে সাধনের সামনে গিয়া পড়িল।

—আরে এই যে নিধিরাম, আজ এলে সকালে? বেশ, বেশ। চল একটা জামিননামা আছে, বড়দা তোমায় খুঁজছিলেন যে, দেখা হয়েচে?

—আজ্ঞে না—এই তো আমি পা দিয়েছি কোর্টে। কারো সঙ্গে এখনো—

—সুনীলের এজলাসে কি কেস ছিল?

সাধন-মোক্তার প্রবীণ লোক—সাবডেপুটির সামনাসামনি যদিও কখনো 'হুজুর' ছাড়া সম্বোধন করেন না কিন্তু সেই সাবডেপুটি বা অন্য জুনিয়ার হাকিমদের প্রথম পুরুষে উল্লেখ করিবার সময় তাহাদের নামের শেষে 'বাবু' পর্যন্ত যোগ করেন না—ইহাতে সাধন ভাবেন তাঁহার চরিত্রের নির্ভীকতা প্রকাশ পায়।

নিধু তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিয়া বন্ধু-মোক্তারের খোঁজে গেল। বার লাইব্রেরীতে যদু বাঁড়ুয্যে, ধরণী পাল ও হরিবাবু বসিয়া কি লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন—এমন সময় নিধুকে

ঢুকিতে দেখিয়া যদু বলিলেন—আরে নিধিরাম যে, এস! সেদিনের রূপনারাণপুরের মারামারির কেসের রায় আজ বেরুবে—আসামী দুজন এখনো এসে পৌঁছল না। ওদের টাকা আগে হাত করতে হবে—নয়তো কিছু দেবে না—তুমি এখানে বসে থাক। তুমিও তো কেসে ছিলে, তোমারও পাওনা আছে। ওরা এলে কোর্ট-মুখো যেন না হয়।

—কেন?

—আসামী সব বেকসুর খালাস হয়েচে রায়ে। আমি খবর নিয়েচি।

—এ তো ভালো কথা। তবে তারা এলে—যা টাকা বাকি আছে—

ধরণী ও হরি-মোক্তার নিধুর কথা শুনিয়া হাসিলেন। যদু বাঁড়ুয্যে মুখে হতাশার ভাব আনিয়া বলিলেন—জুনিয়ার মোক্তার কিনা, এখনো গায়ে ইস্কুল কলেজের বেঞ্চির গন্ধ! বুঝতে তোমার এখনো অনেক দেরি, বাবা।

নিধু জিনিসটা এখনো ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই দেখিয়া প্রবীণ হরি-মোক্তার বলিলেন—নিধিরামবাবু, বুঝলেন না? আসামী যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে সে খালাস পাবে, তবে সে আপনাকে বা যদুদাকে আর সিকি পয়সাও ঠ্যাকাবে না। কোর্টের ওদিকে গেলে ওই পেস্কার-টেস্কার পয়সা আদায় করার জন্যে খবরটা শুনিয়ে দেবে—কারণ সবাই তো ওৎ পেতে আছে পরের ঘাড় ভাঙবার—

—আজ্ঞে বুঝেচি হরিদা—এই যে এরা এসেচে। রূপনারাণপুরের সেই মক্কেল দুজন—

যদুবাবু অমনি তাহাদের উপর যেন ছোঁ মারিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই যে, এলে? এস বস বাবা। খবর তো বড় খারাপ।

আগন্তুক মক্কেল দুটি পল্লীগ্রামের লোক, পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা ময়লা কাপড়, পায়ে কাদা, গায়ে ময়লা আকার-প্রকার-হীন পিরাণ বা ফতুয়ার উপর গামছা ফেলা—বগলে ছোট পুঁটুলি। ইহাদের মধ্যে একজনের চেহারা খুব লম্বা-চওড়া, একমুখ দাড়ি, গোল-গোল ভাঁটার মতো চোখ—দেখিলে মনে হয় বেশ বলবান, তবে নিরীহ ও নির্ব্বোধ ধরনের।

দুজনেই উৎসুক ভাবে বলিল—কি খবর বাবু?

—খবর খারাপ। হাকিম খুব চটেচেন—

—কার ওপর চটলেন বাবু?

—তোমাদের দুজনের ওপর। জেলে যেতে হবে। রায়ের গতিক ভালো নয়। আজ একবার হদ্দমুদ্দ শেষ চেষ্টা করে দেখি যদি খালাস করতে পারি—কিন্তু—

এই সময় যদু বাঁড়ুয্যে নিধুর হাতে একটা স্লিপে কি লিখিয়া দিলেন।

নিধু স্লিপটা পড়িয়া বলিল—বাবু আজ বিশেষ চেষ্টা করবেন তোমাদের জন্যে, তিন টাকা তেরো আনা ন' পাই প্রত্যেকের খরচ চাই—

—বাবু, ট্যাকা তো অত মোরা আনি নি? মোরা জানি রায় বেরুবে—

যদু বাঁড়ুয্যে মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—রায় বেরুবে? রায়ে তোমাকে একেবারে বেকসুর খালাস দিয়ে দেবে যে! যাও গিয়ে এখন দুটি বছর ঘানি টানো গে যাও জেলে—তবে

তোমাদের চৈতন্ত হবে। সেদিন কি বলে দিয়েছিলাম?

—তা বাবু, বলে তো দেলেন—কিন্তু ইদিকি যে মোদের দিন চলে না এমনতা হয়েচে। এই মোকর্দমায় এপর্য্যন্ত বাইশ-তেইশ টাকা উকীল-মোক্তারের দেনা, আর পুলিশ—

—ওসব প্যানপ্যানানি রাখ্‌গে বা তুলে। টাকা না আনিস, এক পা নড়ব না এখান থেকে—দেখি কি হয়—ক-বছর ঘানি টানতে হয় দেখি একবার—

—না বাবু আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন—আমি ট্যাকার সন্ধান করে আসচি—বাজারের দিকি যাই—আমাদের গাঁয়ের ছুটো লোক এসেচে—তাদের কাছে—

—তা যা শিগগির যা—আর শোন্, একটা কথা—কাছে আয়—

তাহারা কাছে সরিয়া আসিলে যদু-মোক্তার গলার স্বর নিচু করিয়া বলিলেন—খবরদার যেন কোর্টের দিকে যাবিনে—তোদের দেখলে হাকিমের রাগ হবে—শেষকালে বাঁচাতে পারব না তোদের—টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে চুপটি করে এই বার লাইব্রেরীতে বারান্দায় বসে থাকবি, বুঝলি?

—বেশ বাবু, যা বলবেন।

লোক দুটি চলিয়া গেলে হরি ও ধরণী-মোক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইবার উপক্রম করিলেন। হরি-মোক্তার বলিলেন—বাবা, পাকা-লোক যদু-দা। ওঁর কাছে মক্কেলের চালাকি? না কোর্টের আমলাদের চালাকি?

যদু সগর্ব্বে বলিলেন—আরে ভায়া, টাকা রয়েচে ওদের কাছে। দেবে না—দিতে চায় না! এই কাজ করচি এই রামনগরের কোর্টে আজ চল্লিশ বছর প্রায়। দেখে-দেখে ঘুণ হয়ে গেলাম। এখুনি দেখ এসে টাকা দিয়ে যাবে। বাইরে দুজনে পরামর্শ করতে গেল আর কাছা থেকে টাকা খুলতে গেল। আমি জ্ঞান হয়ে অবধি এই দেখে আসচি—কত হাকিম এল, কত হাকিম গেল! রমেশ দত্তকে এই কোর্টে দেখেচি—তখন তিনি জয়েণ্ট ম্যাজেস্ট্রেট—সিভিলিয়ান রমেশ দত্ত—আমি আজকের লোক নই!

নিধুকে তাকিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বলিলেন—তুমি বস এখানে। আমি এজলাসে যাব একবার। কোথাও যেও না টাকা আদায় না করে।

আজ বারো মাসের মোক্তারী জীবনে নিধু এরকম অনেক দেখিল। এক-একবার তাহার মনে হয় এর চেয়ে স্কুল-মাস্টারি করা অনেক ভালো ছিল। এ দুঃখের কথা—পলে-পলে মনুষ্যত্বের এই মরণ—কাহার কাছে এসব কথা ব্যক্ত করিবে সে?

একজন মাত্র মানুষ আছে। সে মঞ্জু। মঞ্জুর কাছে সামনের শনিবারে সব সে খুলিয়া বলিবে। এ জীবন আর ভালো লাগে না।

কোর্টের কাজ সারিয়া বাহির হইতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। সাধন-মোক্তার তাহাকে বাসায় যাইবার পথে ধরিয়া বলিলেন—ওহে নিধিরাম শোনো শোনো। আমার সে ব্যাপারটা—

—আজ্ঞে, বুঝেচি। সে এখন হবে না।

—কেন বল তো? জিগ্‌গেস করেছিলে বাড়ীতে?

—বাড়ীতে আর জিগগেস করব? এখন নিজেরই মন নেই। এই তো রোজগারের দশা—দেখচেন তো সব।

—ওসব কথা কাজের নয় হে। তুমি ছেলেমানুষ এখুনি কি রোজগার করতে চাও? দিন যাক, সিনিয়র মোক্তারগুলো আগে পটল তুলুক।

—ততদিনে আমাকেও পটল তুলতে হবে দাদা।

—তুমি ভুল করচো ভায়া। ভেবে দেখ আগে। তোমাকে এ কাজ করতেই হবে—বাড়ীতে এরা তোমাকে পছন্দ—

নিধু বাসায় আসিয়া দোর খুলিল। এখানে নিজেরই রাঁধিতে হয়, একটা ছোকরা চাকর কাজকর্ম করে। ঘর-দোর বড় অপরিষ্কার দেখিয়া সে চাকরটিকে ডাকিয়া ধমক দিল। বলিল—উনুনে আঁচ দে, রান্না চড়িয়ে দেব। ভালো বিপদে ফেলিয়াছে সাধন-মোক্তার! বাড়ীতে পছন্দ করিয়াছে তো তাহার কি? কাল সকালে স্পষ্ট জবাব দিয়া দিবে।

হাত-মুখ ধুইয়া রান্না চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাবডেপুটির আরদালি আসিয়া একখানা পত্র তার হাতে দিল।

সুনীলবাবু তাহাকে একবার এখনি দেখা করিতে লিখিয়াছেন। সেখানেই সে চা খাইবে।

সন্ধ্যা তখনো হয় নাই। সুনীলবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া মুন্সেফবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছেন।

—আসুন নিধিরামবাবু, বসুন। আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করচি, কেউ চা খাই নি—

—আজ্ঞে, আমি তো চা খাইনে—আপনারা খান। নমস্কার মুন্সেফবাবু, বেশ ভালো আছেন?

মুন্সেফবাবুটি নবাগত। সুনীলবাবু নিধুর পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন—এঁর কথাই বলছিলাম। বেশ প্রমিসিং মুকটিয়ার, যদিও এই সবে—

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনার নাম শুনেচি এঁর মুখে নিধিরামবাবু। আপনার বাড়ী বুঝি লালবিহারীবাবুর গ্রামে?

—আজ্ঞে। আপনি তাঁকে চেনেন?

—হ্যাঁ—আলাপ নেই—তবে একই সার্ভিসের লোক, যদিও তিনি আমাদের চেয়ে সিনিয়র। নাম খুব জানি। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগগেস করব—

—আজ্ঞে বলুন—

—লালবিহারীবাবুর বড় ছেলে অরুণকে আপনি জানেন?

—দেখি নি তবে নাম শুনেচি—তিনি এখানে আসেন নি—তবে শুনচি সামনের রবিবার নাকি আসবেন।

সুনীলবাবু বলিলেন—তবে তো ভালো হল অমরবাবু, চলুন আপনিও সামনের রবিবারে

ওঁদের ওখানে। অরুণবাবুকে দেখে আসবেন—কি বলেন নিধিরামবাবু?

—আজ্ঞে এ তো খুব ভালো কথা।

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনাকে বলি, আমার একটি ভাগ্নীর সঙ্গে অরুণবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হয়েচে—মানে এখনোও কনফার্ম্ড করা হয়নি ওঁদের সঙ্গে—আমরা দেখে এলে—

—আজ্ঞে খুব ভালো কথা।

সুনীলবাবু বলিলেন—আমরা রবিবারে যাব দুজনে। আপনি দয়া করে শুধু লালবিহারীবাবুকে যদি জানিয়ে রাখেন—

—এ আর বেশি কথা কি বলুন—আমি নিশ্চয়ই বলব এখন। আজ্ঞে না, আমি তো চা খাইনে—এ কাপ নিয়ে যাও—

—আচ্ছা বাড়তি কাপ আমাদের এখানে দিয়ে যা, চা ফেলা যাবে না আমাদের কাছে—কি বলেন অমরবাবু—আপনাকে কি ওভালটিন দেবে?

—আজ্ঞে না, আমি শুধু এই খাবার— একগ্লাস জল দিলেই—

—ওরে বাবুকে একগ্লাস জল—আর পান নিয়ে আয় তিন খিলি—

আরও আধঘণ্টা কথাবার্তার পরে নিধিরাম বিদায় লইয়া বাসায় আসিল। তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল। এত বড়-বড় অফিসারের সঙ্গে বসিয়া চা খাইয়া আড্ডা দিবে—সে কখনো ভাবিয়াছিল? গ্রামে তাহারা অত্যন্ত গরীব—তাহার বাবা তো কোথাও মুখ পান না গরিব বলিয়া। কাছারীর নায়েব দুবেলা ডাকিয়া শাসন করে। আর আজ সে কি না মহকুমার হর্ত্তাকর্ত্তাদের সঙ্গে সমানে-সমানে বসিয়া জলখাবার খাইল, গল্পগুজব করিল। গ্রামে গিয়া একটা গল্প করিবার জিনিস হইয়াছে বটে! কিন্তু তাহার চেয়েও—এ সবের চেয়েও গর্ব্বের বিষয় তাহার জীবনে—মঞ্জুর সঙ্গে আলাপ, মঞ্জুর মতো শিক্ষিতা, সুন্দরী, বড় ঘরের গভর্ণমেন্ট অফিসারের মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ, তাহার বন্ধুত্ব।

তাহার এ সৌভাগ্যের তুলনা হয়? কজনের ভাগ্যে এমন ঘটে?

কিন্তু মুশকিল ঘটিয়া গেল। সামনের রবিবারে যদি ইহারা গিয়া উপস্থিত হন, তবে গোলমালে এমন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে যে মঞ্জুর সহিত দেখা-শোনা হয়তো ঘটিয়াই উঠিবে না। তাহাদের গ্রামে যখন ইহারা যাইতেছেন—তখন তাহাকে ইহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে—মঞ্জুর সহিত সে দেখা করিবে কখন? মঞ্জু যে বলিয়াছিল আগামী রবিবারে অভিনয়ের সম্বন্ধে পরামর্শ করিবে—সে সব গেল উল্টাইয়া। তাহার সময় কই? সামনের রবিবার একেবারে মাটি।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যে কতকটা অবিশ্বাস, কতকটা আগ্রহের সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ হে নিধু, সুনীলবাবু আর মুন্সেফবাবু নাকি সামনের হপ্তায় তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ী যাচ্ছেন?

নিধু হাসিয়া বলিল—কে বললে?

—সব শুনতে পাই হে, সব কানে আসে। পেশকারবাবুর মুখে শুনলাম। সুনীলবাবুর

চাপরাশি বলেচে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ কাকা, তবে আমাদের বাড়ী তো নয়—আমাদের প্রতিবেশী লালবিহারীবাবু মুন্সেফ—তাঁদেরই বাড়ী।

—সে যাই হোক, তুমিও একটু তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেও, খাতির-যত্ন কোরো হে। হাকিমদের বাড়ী যাতায়াত করলে বা হাকিম বাড়ীতে যাতায়াত করলে মক্কেলের চোখে উকীল-মোক্তারের কদর বেড়ে যায়—ও একটা মস্ত খাতির হে!

বড়-মোক্তার যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল।

তিনি এতকাল রামনগরে মোক্তারি করিতেছেন—তাঁহার এখানে শহরের বাসায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেকবার হাকিমদের পদধূলি যে না পড়িয়াছে তাহা নয়—কিন্তু কই, কোনো হাকিম তো তাঁহার পৈতৃক গ্রামের বাঁশবনের অন্ধকারে কখনো যান নাই? এ মান অনেক বড়, এর মূল্য অনেক বেশি। এই অর্বাচীন জুনিয়ার মোক্তারটার অদৃষ্টে কিনা শেষে এই সম্মান জুটিল!

শনিবার সুনীলবাবু নিধুকে এজলাসে বলিলেন—লালবিহারীবাবুর নামে চিঠি আর দিলাম না, বুঝলেন? যদি না যাওয়া হয়? আপনি মুখেই বলবেন—

বাড়ী যাইবার পথে নিধু কতবার ভাবিল—তাই যেন হয় হে ভগবান! ওদের যাওয়া যেন না ঘটে!

বড় মোক্তারের বর্ণিত মান খাতির বা মক্কেলের চোখে মূল্যবৃদ্ধি সে চায় না বর্তমানে—শনি-রবিবারগুলি যেন এ ভাবে নষ্ট না হয়—ভগবানের কাছে এই তাহার প্রার্থনা। মক্কেলের মান খাতিরে কি হইবে?

বাড়ী পৌঁছিয়া বিপদের উপর বিপদ—তাহার এক বৃদ্ধ মেসোমশাই আসিয়াছেন, তাঁহার বকুনিরও বিরাম নাই, তামাক খাওয়ারও বিরাম নাই। নিধুকে দেখিয়া তিনি যেন তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন, বাজে বকুনিতে নিধুর কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল। নিধুর মাকে দেখাইয়া বলিলেন—চিনু তো কালকের মেয়ে। আমি যখন ওর জ্যাঠতুতো দিদিকে বিয়ে করি, তখন চিনুর বয়স কত—এতটুকু মেয়ে। রাঙা ছোট্ট শাড়ী পরে গুটগুট করে হাঁটত! বল হে নিধুবাবু, তোমরা হলে আমার নাতির বয়সী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। মেসোমশায় তাহাকে আর ছাড়েন না। তিনি কোন্ কালে চা-বাগানে কাজ করিতেন সেই আমলের সব গল্প। নিধুর মা তাহার পিতার বয়সী ভগ্নীপতির ঘন-ঘন তামাক করিতেছেন—বাড়ীসুদ্ধ সরগরম। আজ কি মঞ্জুও একবার খোঁজ লইল না?

নিধুর মন রীতিমতো দমিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে নিধু একবার বাড়ীর বাহির হইল। লালবিহারীবাবুর বাড়ীতে যাইবার খুব ভালো অজুহাত তাহার রহিয়াছে। হাকিমবাবুদের আসিবার সংবাদটা দেওয়া। সে চাহিয়া দেখিল উঁহাদের বৈঠকখানায় তাহার বাবা বসিয়া আছেন- পাড়ার আরও দু-একটি

বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত। দাবা খেলা চলিতেছে।

নিধু ঘরে ঢুকিতেই লালবিহারীবাবু বলিলেন—আরে নিধু যে! এখন এলে? এস-এস—

—আজ্ঞে কাকাবাবু, একটা কথা বলতে এলাম। আমাদের সাবডেপুটি সুনীলবাবু আর মুন্সেফ অমরবাবু কাল আপনার বাড়ী বেড়াতে আসবেন বলে দিয়েছেন—

—ওঃ! সুনীল। সিমলে তাঁতিপাড়ার সুনীল—বুঝেচি! জগৎতারণের ছেলে সুনীল।—তবে অমরবাবুকে তো আমি ঠিক চিনি নে। নাম শুনেচি বটে। ছোকরা মতো—না? হ্যাঁ তাই হবে—আমাদের সার্ভিসের সিনিয়ার লোকদের অনেককেই জানি কিনা! অমরবাবু ছোকরাই হবে—

আজ্ঞে হ্যাঁ, বয়েস বেশি নয়—নতুনও খুব নয়, পাঁচ-ছ বছরের সার্ভিস।

—ওই হল—আমাদের সার্ভিসে ওসব জুনিয়ারের দল। তা তুমি একবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে তোমার কাকীমাকে কথাটা বোলো হে—

নিধু দুরু-দুরু বক্ষে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঝি বসিয়া কি করিতেছে, দু-একটা চাকর ঘুরিতেছে—আর কেহ নাই। নিধু ঝিকে বলিল—কাকীমা কোথায়?

—এই তো এখানে ছিলেন—দেখুন বোধ হয় ঘরের মধ্যে কি দোতলায়—

—ও কাকীমা—

দোতলার জানালায় মুখ বাড়াইয়া মঞ্জুই জিজ্ঞাসা করিল—কে?

নিধুর বুকে কিসের ঢেউ হঠাৎ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল—বুক হইতে গলা পর্যন্ত যেন অবশ হইয়া গেল। সে দিশাহারা ভাবে উত্তর দিতে গেল—এই যে আমি-- আমি নিধু?

—নিধুদা? বেশ, বেশ লোক যা হোক— দাঁড়ান যাচ্ছি—

মঞ্জু জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল। চক্ষের পলকে সে একেবারে নিচের বারান্দার দোরের কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—বা রে, আপনি কেমন লোক বলুন তো নিধুদা? কখন এলেন বাড়ী?

—সন্ধের আগে এসেচি তো—

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি আপনার জন্যে কতক্ষণ বসে। নিজে চপ করলাম বাবা খেতে চেয়েছিলেন বলে—আপনার জন্যে রেখে বসে-বসে এই আসেন, এই আসেন—ও মা, একেবারে রাত নটার সময় এলেন?

নিধু অভিমানের সুরে বলিল—তা তুমিও তো খোঁজ কর নি মঞ্জু?

—আমি দুবার নৃপেনকে পাঠিয়েচি যে—কেন জ্যাঠাইমা বলেন নি?

—কৈ, না তো?

—বাঃ, সন্ধের আগে বিকেলের দিকে দুবার নৃপেন গিয়েচে—আপনাদের বাড়ী কে এক ভদ্রলোক এসেচেন, তিনি ওকে ডেকে গল্প করলেন—কাছে বসালেন—ও বলছিল

আমায়—তাহলে জ্যাঠাইমা বলতে ভুলে গিয়েচেন। ব্যস্ত আছেন কিনা অতিথি নিয়ে। আসুন বসুন—দালানের মধ্যে বসবেন না রোয়াকে? আজ বড্ড গরম—ভাদ্র মাসের গুমট—

—রোয়াকেই বসি, বেশ হাওয়া আছে—

মঞ্জু যেন খানিকটা আপন মনেই বলিল—দেখুন তো চপগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এখন কি খেতে ভালো লাগে? বিকেলে বেশ গরম ছিল—খেয়ে কিন্তু নিন্দে করতে পারবেন না।

নিধু হাসিয়া বলিল—কেন, নিন্দেই তো করব, খারাপ হলেও ভালো বলতে হবে?

—খারাপ কক্ষনো হয় নি। রান্নায় আমি স্কুলে সার্টিফিকেট পেয়েছি—জানেন তা? তবে জুড়িয়ে গেল—আপনি বসুন, আমি ওগুলো গরম করে নিয়ে আসি—

আধঘণ্টা পরে মঞ্জু, নৃপেন, বীরেন ও নিধু বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ মঞ্জু বলিল—চলুন ছাদে যাই নিধুদা, বড় গরম এখানে—চল মেজদা—

সবাই মিলিয়া খোলা ছাদে শতরঞ্জি পাতিয়া আসর জমাইল। নানা ভূতের গল্প, শহরের গল্প, বীরেনের মুখে উৎসাহের সহিত বর্ণিত গত সপ্তাহে কলিকাতায় ফুটবল খেলার গল্প ইত্যাদিতে আড্ডা মুখর হইয়া উঠিল। ছাদের উপরে ঝুঁকিয়া পড়া বাঁশঝাড়ে রাতচরা কোনো পাখির ডানা-ঝটাপটি। পরিষ্কার শরতের আকাশে সুস্পষ্ট জলজলে নক্ষত্ররাজি ও টের্চা ছায়াপথ।

নিধু যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। জীবনে যেন সে এই প্রথম আনন্দ কাহাকে বলে জানিয়াছে। এরা কত ভালো-ভালো জায়গার গল্প বলিতেছে, কখনো নিধু সে সব দেশে যায়ও নাই—কলিকাতায় গেলেও সেখানকার শিক্ষিত বড়লোকদের সঙ্গে এদের মতো মেশেও নাই—জজ-মুন্সেফের বাড়ীতে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া গল্পগুজব করিবে—আর বছর এমন সময় সে-ই কি সে কথা ভাবিতে পারিত?

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—যেজন্য সে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল—সুনীলবাবু ও মুন্সেফ্ বাবুর আসার কথা বলিতে—সেকথা এখনো বলা হয় নাই। মঞ্জুকে দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। কথাটা সে এ আসরেই বলিল। বীরেন বলিল—ও! সুনীলবাবু এখানে এসেচেন নাকি সাবডেপুটি হয়ে? তা তো জানিনে।

—তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?

—খুব। শিমলেতে আমাদের মামার বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই—

মঞ্জু বলিল—ওঁর বোন আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত—গত বছর বিয়ে হয়ে গেল। খুব জাঁকের বিয়ে। সুনীলবাবুর বাবা বেশ বড়লোক—তিনিও রিটায়ার্ড সাবজজ—

—কাল এসে কখন আসবেন?

—বোধহয় সকালের দিকেই—কাকীমাকে বোলো বীরেন। আমি বলতে ভুলেই গিয়েচি—

রাত্রে নিধুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে কাল বলব নাকি খেতে মঞ্জুদের? বীরেনও যে এসেচে—তাকেও বলতে হয়।

—কিন্তু মা, কাল একটু গোলমাল আছে। সাবজেপুটি আর মুন্সেফবাবু আসবেন বেড়াতে ওদের বাড়ী। কাল রবিবার নেই—সেই সব নিয়ে ওরা কাল ব্যস্ত থাকবে।

সকালে উঠিয়া নিধু রায়নগরের পাকা রাস্তার উপর পায়চারি করিল বেলা আটটা পর্য্যন্ত। তখনো পর্য্যন্ত কাহাকেও আসিতে দেখা গেল না। না আসিলেই ভালো। দিনটা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে উহারা আসিলে। এত বেলা যখন হইয়া গেল—হয়তো আর আসিবে না। সাড়ে-আটটা পর্য্যন্ত রাস্তার উপর অপেক্ষা করিয়া নিধু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে নৃপেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—বা রে, কোথায় গিয়েছিলেন বেড়াতে? আপনার বাড়ী বসে-বসে—

—কেন?

—দিদি সেই সাড়ে-সাতটার সময় আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েচে—জলখাবার খাবেন বলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে—

—আচ্ছা, তুমি যাও নৃপেন। আমি নেয়ে নিই পুকুরে—তারপর যাচ্ছি—স্নান সারিয়া ফিটফাট হইয়া মঞ্জুদের বাড়ী যাইতে নটা বাজিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর পা না দিতেই মঞ্জু রান্নাঘরের দাওয়া হইতে বলিল—আজকাল আপনার হয়েচে কি? লুচি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কখন ডাকতে পাঠিয়েচি নৃপেনকে—বেশ লোক যা হোক!

মঞ্জুর মা বসিয়া নিজের হাতেই ওল কুটিতেছেন, তিনিও বলিলেন—এস বাবা। মঞ্জু এখনো খায় নি, বলে—অতিথিকে না খাইয়ে আগে খেতে নেই। আমি বললাম, ও তো ঘরের ছেলে, ও আবার অতিথি কোথায় মা, তুই খেয়ে নে। মেয়ের সবই বাড়াবাড়ি।

নিধু অপ্রতিভ হইল। সঙ্গে-সঙ্গে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও আনন্দে তাহার সারা শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। মঞ্জু না খাইয়া আছে সে খায় নাই বলিয়া—কেন? কই, কোনো মেয়ে তো এ পর্য্যন্ত তাহার না খাওয়ার জন্য নিজেকে অভুক্ত রাখে নাই! অন্তত কোনো শিক্ষিতা তরুণী বড়লোকের মেয়ে তো নয়ই। নিজের সৌভাগ্যকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারে না। মঞ্জু তাহাকে ভিতরের ঘরের বারান্দায় খাইতে দিয়া কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আজ যে সেই প্লে সিলেক্ট করার দিন—তাও আপনি ভুলে বসে আছেন নিধুদা?

—কেন ভুলব? তবে আজ অরুণবাবুর আসার কথা ছিল না?

—বড়দা বেলা বারোটার কম কি পৌঁছবেন এখানে? যদি আসেন তো ওবেলা সবাই মিলে বসে—

—আচ্ছা, মঞ্জু একটা কথা বলব?

—কি?

তুমি না খেয়ে রইলে কেন এত বেলা পর্য্যন্ত ? অন্যায় নয় তোমার ? কাকীমা কি ভাবলেন ?

—মা আবার কি ভাববেন—যা রে !

নিধুর একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি আসিয়া জুটিল—কেউ কোনো দিকে নাই দেখিয়া সে সুর নামাইয়া বলিল—ভাবচেন কি জানো ? ভাবচেন মঞ্জুর সঙ্গে নিধুর খুব ভাবসাব হয়েচে কিনা, তাই ও না খেলে মেয়েও খায় না—

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসে ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে এ সব কি কথাবার্ত্তা হচ্চে ?

নিধু হাসিমুখে বলিল—বেশ করচি যাও। কাকীমা ভাবতে পারেন কিনা বল ?

—পাড়াগাঁয়ের ভূত কি আর সাধে বলে ?

—আর তোমার পৈতৃক ভিটেও তো এই পাড়াগাঁয়েই—বিলেত থেকে তো আস নি ?

—না এসেচি তো না এসেচি—যান্—কি হবে তায় ?

—পাড়াগাঁয়ের ভূত বলে তাহলে আমায় গালাগাল দেওয়াটা কি ভালো তবে ?

এমন সময় হঠাৎ বীরেন ও নৃপেন এক সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ও নিধুদা, ও দিদি—ওঁরা সব এসেচেন—মুন্সেফ অমরবাবু আর সাবডেপুটি—বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে—আসুন শিগগির—

—আমার কথা ওঁরা জিগগেস করলেন নাকি ?

—না তা কিছু বলেন নি, তবে বলছিলেন আপনাকে দিয়ে খবর দেওয়া ছিল—

মঞ্জু বলিল—অত তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে গিলতে হবে না। এমন তো লাটসাহেব কেউ আসে নি—ও লুচি দুখানা খেয়ে নিয়েই—একটু পরেই না হয়—আপনাকে তো তাঁরা ডেকে পাঠান নি—

কিন্তু নিধুর পক্ষে ধীরে সুস্থে বসিয়া-বসিয়া লুচি খাওয়া আর সম্ভব নয়। যাহারা আসিয়াছেন—তাঁহারা তাহার পক্ষে লাটসাহেবই বটে। এ অবস্থায় আর থাকা চলে না।

নিধু একপ্রকার ছুটিতে-ছুটিতে বাহিরে আসিল।

বৈঠকখানায় অনেক লোক। লালবিহারীবাবু, নিধুর বাবা, সাবডেপুটি ও মুন্সেফবাবু, উপেন হালদার ও স্থানীয় স্কুলের পণ্ডিত উমাপদ ভট্টাচার্য্য সকলে মিলিয়া বসিয়া পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিতেছেন।

সুনীলবাবু নিধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে এই যে নিধিরামবাবু। মশাই, রাস্তা বড় ভয়ানক, জায়গায়-জায়গায় এমন কাদা যে সাইকেল চলে না—কাঁধে তুলে আনতে হয়েচে—বসুন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনাদের বাড়ীটা কোন দিকে ? আমরা সেখানেও যাব—

নিধুর বাবা রামতারণ বিনয়ে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিলেন—যাবেন বই কি! গরীবের কুঁড়েতে আপনাদের মতো মহৎ লোকের পায়ের ধুলো পড়বে এ আমরা আশা করতে পারিনে—লালবিহারী ভায়া আমাদের গ্রামের চুড়ো—উনি আজ এসেচেন বলেই আপনাদের মতো লোকের—

সকলে মিলিয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। গ্রামে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটা ভাঙা শিবমন্দির ছাড়া অন্য কিছুই নাই। উমাপদ পণ্ডিত সেটির মধ্যে নিজে ঢুকিয়া সকলকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। সাপের ভয়ে কেহই ভিতরে গেল না—কবাটহীন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

নিধুর বাড়ীর বাহিরের ঘরেও সকলে একবার আসিয়া বসিলেন। নিধু চা ও খাবারের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল—সকলকে রেকাবি করিয়া খাবার দেওয়া হইল—সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু ছাড়া আর কেহ খাইতে চাহিলেন না। কারণ বাকি সকলে বৃদ্ধ—উঁহারা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া খাইবেন না। সকলে মিলিয়া আবার মঞ্জুদের বাড়ী ফিরিল। সুনীলবাবুকে মঞ্জুর মা বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বীরেন তাঁহাকে লইয়া গেল। নিধু সদরেই দাঁড়াইয়া ছিল—কিন্তু তাহাকে বীরেন যেন দেখিতেই পাইল না আজ।

নিধু বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই তাহার মা বলিলেন—হ্যাঁরে, মোহনভোগ খারাপ হয় নি তো?

—কেন খারাপ হবে? বেশ হয়েছিল—

—ওঁরা খেয়েছিলেন তো? হাকিমবাবুরা?

—সবটা খেয়েছিল। ভালো হলে খাবে না কেন?

—হ্যাঁ রে তুই এখানে খাবি, না জজবাবুদের বাড়ী খেতে বলেচে?

এ ধরনের সোজা প্রশ্নের উত্তরে নিধু প্রথমটা কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। পরে বলিল—না—বাড়ীতেই খাব। ওরা খেতে বলেছিল, কিন্তু আমার লজ্জা করে মা রোজ-রোজ ওদের বাড়ী—

নিধুর মা স্নেহস্বরে বলিলেন—তা আজকের দিনটা কেন খেলি নে—ভালোটা-মন্দটা হত—বড়-বড় বাবুরা এসেছে বাড়ীতে—

—তা হোক মা—কি রবিবারেই তো ওখানে খাচ্ছি। তোমার হাতের রান্না খাওয়া বরং হয়েই ওঠে না আজকাল।

নিধুর মা মনে-মনে খুশি হইলেন। ছেলের মতো ছেলে নিধু। এখন বাঁচিয়া থাকিলে হয়। আজ তাহার দৌলতেই তো তাঁহাদের খড়ের ঘরে হাকিম-হুজুরের পায়ের ধুলো পড়িল! বংশের মুখ উজ্জ্বল-করা ছেলে বটে।

দুপুরের পরেই তিনি পুকুরের ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া বুঝিলেন কথাটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছে।

তিনুর মা বুড়ো রায়গিন্নি বলিলেন—হ্যাঁরে ও নতুন বৌ, তোদের বাড়ী নাকি রাজনগর

থেকে ডিপ্‌টিবাবু আর মন্‌সববাবু এসেছিল?

—হাাঁ দিদি—কার মুখে শুনলে?

—ওমা এই দক্ষ পিসি বললে—জগোঠাকরুণ তাকে বলেছে। সকলেই তো বলচে। তা বেশ, ভালো-ভালো।

—অজবাবুদের বাড়ী এসেছিলেন। তা নিধুকে খুব ভালোবাসেন কিনা তাই এখানেও এলেন। বড় ভালো লোক—

ইতিমধ্যে আরও দু-তিনটি পাড়ার ঝি-বৌ পুকুরের ঘাটে বাসন হাতে আসিলেন। সকলের মুখেই ওই এক প্রশ্ন। হাকিমদের বয়স কত? নিধুর মা কি খাইতে দিল তাহাদের?

বুড়ো রায়গিন্নি বলিলেন—তা বেঁচে থাক নিধু। ওকে সবাই ভালোবাসে—অমন ছেলে গাঁয়ে নেই—

—তাই এখন বল দিদি—তোমাদের আশীর্ব্বাদে, তোমাদের মা-বাপের আশীর্ব্বাদে নিধু এখন—

নিধুকে কিন্তু সারাদিনের মধ্যে ও-বাড়ী হইতে কেহই ডাকিতে আসিল না। বৈকালের দিকে সে নিজেই একবার মজুদের বৈঠকখানায় গিয়া খোঁজ লইয়া জানিল সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু বাড়ীর মধ্যে জলযোগ করিতেছেন—এখনি রামনগরে ফিরিবেন। লালবিহারী-বাবুকেও বাহিরে দেখা গেল না—সম্ভবত অন্তঃপুরে অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত আছেন।

কিছু ভালো লাগিল না। পৃথিবীটা হঠাৎ যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

রামনগরের পাকা রাস্তার উপরে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পায়চারি করিতে-করিতে সে একটা সাঁকোর উপরে আসিয়া বসিল। হঠাৎ সে দেখিল দূরে দুখানা সাইকেলে সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু আসিতেছেন।

তাঁহারাও তাহাকে দেখিয়াছেন মনে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—নতুবা হয়তো গাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়িত।

সুনীলবাবু কাছে আসিয়া বলিলেন—নিধিরামবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? খুঁজলাম আপনাকে আসবার সময়, পেলাম না। আপনি কাল সকালে যাবেন?

দুজনেই সাইকেল হইতে নামিয়াছিলেন। নিধু কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে হাঁটিয়া আগাইয়া দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে সে বাড়ী ফিরিল। নিধুর মা বলিলেন—বিকেলবেলা কিছু খেলিনে—অজবাবুদের বাড়ী খাবার খেয়েছিস বুঝি?

—হাাঁ।

—সে আমি তখনই বুঝেচি—তোকে না খাইয়ে কি ওরা ছাড়ে কখনো? হাকিমবাবুরা চলে গেল বুঝি?

—গেল।

এমন সময় একটা লণ্ঠনের আলো তাহাদের উঠানে পড়িল—এবং আলোর পিছনে লণ্ঠন ধরিয়া যে দুজন মেটে পাঁচিলের ছোট্ট দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল—তাহাদের দেখিয়া নিধু বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জু আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও জ্যাঠাইমা, কি করচেন? নিধুদা কোথায়? ওমা এই যে নিধুদা!

হতভম্ব নিধু কিছু জবাব দিবার পূর্ব্বেই মঞ্জু বলিল—বড়দা এসেছেন, আপনাকে খুঁজচেন কখন থেকে। জ্যাঠাইমা, নিধুদা আজ রাত্রে ওখানে খাবে কিন্তু—চলুন নিধুদা—আসুন—বলিয়া নিধুকে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই মঞ্জু ও নৃপেন তাহাকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নৃপেন আগে, মঞ্জু ও নিধু পিছনে। পথে মঞ্জু বলিল—কি হয়েচে আপনার? সারাদিন দেখি নি কেন? ছিলেন কোথায়?

—বাড়িতেই ছিলাম—যাব আবার কোথায়?

—আমাদের ওখানে যাননি যে বড়?

—সব সময়েই যে যেতে হবে তার মানে কি?

মঞ্জু নিধুর উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কি হয়েচে আপনার?

—কিছুই না। আমরা গরীব মানুষ আমাদের আবার হবে কি?

—কেন, রাগ হল কেন হঠাৎ শুনি? কি হয়েচে?

—কিছুই না। কি আবার হবে?

—রাগ হয়েচে তা বুঝতে আমার বাকি নেই। কিন্তু আমি কি করব নিধুদা, বাড়ীতে আজ সবাই ওদের নিয়ে ব্যস্ত। আমি ওদের সামনে কবার বেরিয়েচি? ডাকবার সুবিধে থাকলে ডাকতাম।

নিধুর রাগ নিবিয়া জল হইয়া গেল। বেচারী মঞ্জু! সে কি করিবে?

বাড়ী ঢুকিয়া মঞ্জু মাকে ডাকিয়া বলিল—নিধুদা রাত্রে আমাদের এখানে খাবে বলে এনেছি মা—আজ সারাদিন আমাদের বাড়ীতে আসে নি মা—এখন গিয়ে ধরে আনলাম—আসুন বড়দার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই—

পাশের ঘরে মঞ্জুর বড়দা অরুণের সঙ্গে আলাপ হইল। অরুণকে নিধুর তেমন ভালো লাগিল না। কথার মধ্যে বেশির ভাগ বাঁকা সুরে ইংরাজি বলে, ঘনঘন সিগারেট খায়—একটু নাক সিঁটকানো গর্ব্বের ভাব কথা-বার্ত্তার মধ্যে।' অরুণের প্রতি কথায় পাড়াগাঁয়ের সব কিছুর উপর একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব বেশ স্পষ্ট।

—উঃ, কাল কি সোজা কষ্ট গিয়েচে এখানে পৌঁছতে! বাবারও যেমন কাণ্ড। বলেছিলুম দেশে পুজো করে কি হবে? ছুটি নিয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে আছেন—তারপর যখন ম্যালেরিয়াতে ধরবে তখন বুঝবেন। বাঃ বাঃ—এই জঙ্গলে মানুষ থাকে?

—তা বটে। আমরা উপায় নেই বলে পড়ে আছি—

—আপনি বুঝি রাণাঘাটে প্র্যাকটিস্ করেন? কিন্তু কি রকম?

—আগে ভালোই ছিল। এখন দেশে নেই পয়সা—আপনিও 'তো ল' পড়চেন শুনলাম—

—আমি যদি বলি, আলিপুরে বেরুব। এ সব জায়গায় লাইফটা নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। পয়সা পেলেও না—

—না, আপনাদের মতো লোক কেন এখানে থাকতে যাবেন?

আর আধঘণ্টা পরে মঞ্জুকে সে কিছুক্ষণের জন্ত একা পাইল।

মঞ্জু বলিল—বড়দার সঙ্গে আলাপ হল? বেশ লোক বড়দা। কাল সকালে যাবেন নাকি আপনি?

—যাব না তো কি? এখানে থাকলে তো চলবে না—

—এখনো আপনার রাগ যায়নি নিধুদা—

—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের আবার রাগ—

—ও রকম বলবেন না নিধুদা—আমার মনে কষ্ট হয় না শুতে?

—হলে কি সারাদিন না ডেকে থাকতে পারতে?

—কিছু লাভ ছিল না ডেকে। সামনে বেরুতে পারতাম না তো?

—কেন?

—ওঁরা সব সময় ঘরের মধ্যে। অমরবাবুর সামনে আমি বেরুই নি—ওঁর সঙ্গে আলাপ নেই আমার।

—আমি ভাবলুম আমাকে ওদের সামনে কি করে বার করবে ভেবে আর ডাকলে না—

—দুষ্টু বুদ্ধি আপনার হাড়ে-হাড়ে। কুটিল মন কিনা।

—সে তো জানোই—পাড়াগাঁয়ের মানুষের মন কখনো সরল হয়?

—হয়ই না তো। সেটা মিথ্যে কথা নাকি?

—তার প্রমাণ পেয়েই গেলে। হাতে-হাতেই পেলে—

—এমন আড়ি দেব আপনার সঙ্গে যে আর কখনো কথা বলব না—

—না তা করো না লক্ষীটি—তাহলে থাকতে পারব না—

—তবে! তবে ও রকম করেন কেন? এখন বলুন, আর ওসব কথা বলবেন না?

—কক্ষনো না।

—পুজোর সময় প্লে করায় কি হবে?

—ঠিক করে ফেল—অরুণবাবু তো আছেন—

—বড়দা বলছিলেন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' প্লে করতে—কলকাতায় সম্প্রতি হয়েচে—উনি দেখে এসেচেন—

—উনি যা বলেন। বইখানা আনতে বোলো—

—আপনি কি বলেন?

—আমি ওসবের কি জানি ? আমরা জানি যাত্রার দল—রায়নগরের উকীল-মোক্তারদের একটা থিয়েটার আছে—তারা পুজোর সময় গিরিশ ঘোষের 'জনা' করবে। আমাকে পার্ট নিতে বলেচে—

—কি পার্ট নেবেন ?

—তা এখনো ঠিক হয়নি—

—ভালো পার্ট করতে পারেন ?

—কখনো করি নি, কি করে বলি ? তবে চেষ্টা করলে মন্দ হবে না—

—আমার মনে হয় খুব ভালোই হবে।

—তুমি পার্ট করবে তো ?

—আমি তো স্কুলে পার্ট করে এসেছি কি বছর। আমার অভ্যেস আছে। গান যাতে আছে এমন পার্ট আমায় দিত।

—এখানেও তাই নিতে হবে আমায়, গান তুমি ছাড়া কে গাইবে ?

—আচ্ছা, একটা কথা। পাড়াগাঁয়ে কেউ কিছু বলবে না তো ?

—তোমরা করলে কেউ বলবে না। কাকাবাবুর নামে সবাই তটস্থ, অন্য কেউ হলে রক্ষে রাখত না—

—সে আমি জানি। আচ্ছা, গাঁয়ের আর কোনো মেয়ে পার্ট নিতে পারে ?

—আমার তো মনে হয় না—তবে ভুবন গাঙ্গুলির এক মেয়ে এসেচে বাপের বাড়ী। বিয়ে হয়েচে, জামাই রেলের আফিসে ভালো চাকরি করে—তুমি তাকিয়ে জিগগেস কোরো—ও বিয়ের আগে গোয়াড়ী গার্লস্ স্কুলে পড়ত মামারবাড়ী থেকে—সেখানে পার্ট করত—

—কি নাম ? আমি তো জানিনে—কালই আলাপ করব—

—নাম হৈমবতী। এখন শুনচি নাম হয়েচে হেমপ্রভা—ও চিরকাল মামারবাড়ীতে মানুষ, এখানে বড় একটা আসত না। তা ছাড়া ওর বাবাও নাকি এখানে থাকত না। যাক—সে কথা বাদ দাও মঞ্জু। ডেকে নিয়ে আসতে পার তো এস—

—তারপর সেই কাগজ বার করার কথা মনে আছে তো ?

—সে তো পুজোর পর ?

—না, পুজোর সময় প্রথম সংখ্যা বার করব।

—যা তোমার ইচ্ছা। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

—মনের কথা বলচেন নিধুদা ?

—মনের কথা নিশ্চয়ই। বিশ্বাস কর মঞ্জু।

রাত্রে আহারাদির পরে নিধু চলিয়া আসিল।

আসিবার সময় মঞ্জু দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—সামনের শনিবারে আসবেন তো ?

—কেন আসব না ?

—না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি দেব—

—দেখ আসি কিনা।

সারা সপ্তাহ ধরিয়া নিধু একটি পয়সা রোজগার করিতে পারিল না। মক্কেলের যেন দুর্ভিক্ষ লাগিয়া গিয়াছে—সকাল হইতে তীর্থের কাকের মতন বাসায় বসিয়া ঘন-ঘন হাই তুলিয়া ও বাহিরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া নিধুর মোক্তারী ব্যবসাটার উপরই অশ্রদ্ধা ধরিয়া গেল। নিধুর মুহুরী বলে—বাবু, এ হপ্তাটায় হল কি? মক্কেলের যেন আকাল পড়েচে দেখচি—

—চল, কোর্টে আসতে পারে।

কিন্তু কোর্টেও কেহ আসে না। যদু-মোক্তার একদিন বলিলেন—ওহে সুনীলবাবুর কোর্টে তো তোমার খাতির আছে—এই জামিনের জন্তে মুভ্ করে জামিনটা করিয়ে দাও না?

নিধু কেস শুনিয়া বুঝিল এ ক্ষেত্রে জামিন হওয়া অসম্ভব। বাড়ীতে চোরাই মাল পাওয়া গিয়াছে—পুলিশ যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে—তাহার গতিকও খুব খারাপ। যদু-মোক্তার নিজের নাম খারাপ করিতে রাজী নন, তিনি খুব ভালোই জানেন কোর্ট জামিন দিতে রাজী হইবে না। খাতিরে পড়িয়া যদি সুনীলবাবু জামিন মঞ্জুর করেন—ইহাই যদুবাবুর ভরসা।

সে বলিল—কাকাবাবু, এ আমার দ্বারা সুবিধে হবে না—

—কেন হবে না? যাও না একবার—

—মাপ করুন কাকাবাবু, সুনীলবাবু কি মনে করবেন?

—চেষ্টা করতে দোষ কি? যাও একবার—

যদুবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিধু গিয়া জামিনের দরখাস্ত দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিল।

সুনীলবাবু জামিন মঞ্জুর করিলেন।

মক্কেল নিধুকে দুইটি টাকা দিল। নিধু সে দুটি টাকা লইয়া গিয়া যদুবাবুর হাতে দিতে তিনি কোনো কথা না বলিয়া তাহা পকেটস্থ করিলেন—কারণ মক্কেল আসলে তাঁহার। অবশ্য জামিননামার টাকাটা নিধু পাইল।

বাসায় আসিয়া সে দেখিল সাধন-মোক্তার তাহার জন্তে রোয়াকে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সাধন বলিলেন—তোমার জন্তে বসে আছি হে নিধিরাম—

—আজ্ঞে, বসুন-বসুন। বড় কষ্ট হয়েছে?

—কিছু কষ্ট নয়। তুমি জামা কাপড় ছেড়ে সুস্থ হও—আমি একটা বিশেষ দরকারে এসেচি। ওবেলা তোমার কেসটা বেশ ভালো হয়েচে—কিন্তু যদু-দা নাকি তোমায় টাকা দেয়নি?

—কে বলল আপনাকে?

—আমি সব জানি হে—আমার কাছে কি লুকোনো থাকে কিছু? তাই কিনা?

—আজ্ঞে না, তা নয়। তবে ওঁরই মক্কেল—

—কিসে ওঁর মক্কেল? তুমি জামিনের দরখাস্ত দিয়ে জামিন মুক্ত করে নিতলে—তবে ওঁর মক্কেল হল কি করে? মক্কেলের গায়ে লেখা আছে নাকি কার মক্কেল?

—আজ্ঞে ওঁর কাছেই প্রথম তারা গিয়েছিল, আমার কাছে তো আসে নি? তাই—

—তবেই ওঁর মক্কেল হয়ে গেল? অত সূক্ষ্ম ওজন-জ্ঞান করে মোক্তারী ব্যবসা চলে না তায়া! হরি আমায় বলছিল, যদুদার আক্কেলটা দেখলে? ছোকরা জামিন মঞ্জুর করিয়ে দিলে—আর যদুদা দিব্যি টাকাটা গাপ করে ফেললে বেমালুম। ঘোর কলি! আমার পরামর্শ শোনো আমি বলি—

—আজ্ঞে কি?

—সুনীলবাবুর কোর্টে তোমার খাতির হয়ে গিয়েচে সবাই জানে। ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গিয়েচে। তুমি এখন যদুদার হাত থেকে কেস পেলেও ফি-এর টাকা তাঁকে দিও না। যদুদা চিরকাল ওই করে এলেন—যার সঙ্গে যার খাতির, তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে নাম কেনেন নিজে।

নিধিরাম দেখিল সাধন-মোক্তারের কথায় সামান্য মাত্র সায় দিলেও আর রক্ষা নাই—ইনি গিয়া এ কথা অন্য কোথাও গল্প করিবেন। সে ব্যক্তি যদুবাবুর কানে কথা উঠাইলে তাহার উপর যদুবাবু চটিয়া যাইবেন। তাহার ব্যবসার প্রথম দিকে তাঁহার মতো প্রধান মোক্তারের সাহায্য ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলে নিজের সমূহ ক্ষতি। সে একটু বেশ জোরের সঙ্গেই বলিল—না সাধনবাবু—আমি তা মনে করি না। যদুবাবু খুব বিচক্ষণ মোক্তার—সত্যিকার কাজের লোক। আমার তিনি পিতৃবন্ধু—আমায় ছেলের মতো দেখেন।

সাধন বিদ্রূপের সুরে বলিলেন—ছেলের মতন দেখেন—তা তো বেশ বোঝাই গেল। মুখে ছেলের মতন দেখি বললেই তো হয় না—সে রকম দেখাতে হয়—দুটো টাকার লোভ ছাড়তে পারলেন না—ছেলের মতো দেখেন!

—যাক ও নিয়ে আর—

—তুমি আমার দুটো মক্কেলের কেস কাল নাও না? আমার প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক তোমায় দেব। করবে?

—কেন করব না বলুন! দেবেন আপনি—

নিধু একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে সাধন এবার তাহাকে বিবাহ সংক্রান্ত কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হঠাৎ সাধন বলিলেন—হ্যাঁ হে, সেদিন ওঁরা বুঝি তোমার বাড়ীতে—

—আমার বাড়ী কোথায়? লালবিহারীবাবু মুন্সেফ আছেন আমার প্রতিবেশী—তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

—তুমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাতির করেছিলে তো?

—হ্যাঁ তা অবিশ্যি সামান্য—আমার আর কি ক্ষমতা—

—বেশ! বেশ! সেই কথাই বলচি—ভালো কথাই তো। তোমার সঙ্গে সুনীলবাবুর

বেশ আলাপ হয়ে গিয়েচে, একথা শুনে অনেকেরই খুব হিংসে তোমার ওপর জানো তো ?

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কি ! এর জন্তে কিসের হিংসে ?

—তুমি কেন হাকিমদের সঙ্গে আলাপ করবে, বাড়ী নিয়ে যাবে—যখন বারে এত প্রবীণ মোক্তার রয়েচে—কই আর কারো বাড়ী তো হাকিম যায় নি ?

—এসব নিয়ে কথাবার্ত্তা হয় নাকি ?

—তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে বারের প্রবীণ মোক্তারেরা পর্য্যন্ত এই নিয়ে বলাবলি করচে। সবারই হিংসে।

—করুক গিয়ে। ভালোই তো, আমার একটু পসার হবে হয়তো ওতে।

—না ভায়া—মক্কেল ভাঙিয়ে নিতেও পারে। হিংসে করে যদি তোমার পেছনে সবাই লাগে—তবে তোমার মক্কেল পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। আমি তোমার হিতৈষী বলেই তোমায় বলে গেলাম।

সাধন কি মতলবে আসিয়াছিল নিধু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল সাধনের কথার মূলে হয়তো সত্য আছে। বার-লাইব্রেরী সুদ্ধ সব মোক্তার তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল নাকি ? নতুবা সারা সপ্তাহে সে একটি পয়সা পাইল না কেন ?

শনিবার দিন সকালে বাড়ীওয়ালার লোক ও গোয়ালা আসিয়া তাগাদা দিল। নিধু তাহাদের বুঝাইয়া দিল এ চাকুরি নয় যে মাসকাবারে মাহিনা হাতে আসে—টাকা দিতে দু-চার দিন বিলম্ব হইবে। কিন্তু বাড়ীওয়ালার লোক যেন তাড়াইল—বাড়ীতে আজ যাইবার সময় জিনিসপত্র সওদা করিয়া লইয়া যাইতে হইবে—হাতে এদিকে একটি পয়সা নাই। তাহার আয়ের উপরই আজকাল সংসার চলে—খরচ দিয়া না আসিলে পরবর্ত্তী সপ্তাহে সংসার অচল।

নিধুর মুহুরী এই সময় আসিয়া বলিল—বাবু আজ বাড়ী যাবেন ?

—তাই ভাবচি। কি নিয়ে যাই, একটা পয়সা তো নেই হাতে—

—মোক্তারী ব্যবসার এই মজা। মাঝে-মাঝে এমন হবেই বাবু। মক্কেল কি সব সময়ে জোটে। যদুবাবুর কাছে একবার যান না ?

—কোথাও যাব না। ওতে আরো ছোট হয়ে যেতে হয়। না হয় আজ বাড়ী যাব না, সেও ভালো।

শুধু সে শনিবার নয়, পরের শনিবারেও নিধুর বাড়ী যাওয়া হইল না। মক্কেলের দেখা নাই আদৌ, মুদী ধারে জিনিসপত্র দেয়, তাই বাসা খরচ একরূপ চলিল, কিন্তু অন্যান্য পাওনাদারের তাগাদায় নিধু অস্থির হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সে বাড়ী হইতে বাবার চিঠি পাইল—শনিবার বাড়ী কেন আসে নাই—সংসারে খুব কষ্ট যাইতেছে—বাড়ী সুদ্ধ লোককে অনাহারে থাকিতে হইবে যদি সে সামনের শনিবারে না আসে—আসিবার সময় যেন যেন আনে তেন আনে—জিনিসপত্রের একটা লম্বা ফর্দ্দ পত্রের শেষে জুড়িয়া দেওয়া আছে। চিঠিখানা ছাড়া হইয়াছে শুক্রবার—রবিবার সকালে সে চিঠি পাইল। সে সম্পূর্ণ নিরুপায়—হাতে পয়সা না আসিলে বাড়ী গিয়া লাভ কি ?

সোমবার সে কি কাজে একবার সুনীলবাবুর কোর্টে গিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া সুনীলবাবু বলিলেন—নিখিরামবাবু, আপনি এ শনিবারে বাড়ী যান নি তো?

—না, একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—আমি গিয়ে আপনাকে কত খুঁজলাম, তা সবাই বললে আপনি যান নি।

—ও! আপনি গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—আমি গিয়েছিলাম মানে যাবার জন্যে বিশেষ করে পত্র দিয়েছিলেন পিসিমা—মানে লালবিহারীবাবুর স্ত্রী—আমাদের এক পাড়ায় মেয়ে কিনা।

—ও! আপনি একা গিয়েছিলেন?

—এবার একাই। সেই জন্যেই তো বিশেষ করে আপনার খোঁজ করলাম। কার সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলি। লালবিহারীবাবু প্রবীণ লোক—তাঁর সঙ্গে কতক্ষণ গল্প বলা যাবে—আপনি যে যাবেন না—আমার সে কথা মনেই হয় নি। আপনিও তো গত সপ্তাহে আমার কোর্টে একদিনও আসেন নি কিনা।

নিধু মনে-মনে ভাবিল—কেস থাকিলে তো কোর্টে আসিবে। মক্কেল নামক জীব হঠাৎ পৃথিবীতে যে কত দুর্লভ-দর্শন হইয়া উঠিয়াছে—তাহার খবর হাকিমের চেয়ারে বসিয়া কি করিয়া রাখিবেন আপনি?

মুখে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি যদি জানতাম আপনি যাচ্ছেন, তাহলে নিশ্চয়ই যেতাম। তা তো জানি না—

সন্ধ্যার সময় সুনীলবাবুর আরদালি আসিয়া নিধুর হাতে একখানি চিঠি দিল—বিশেষ দরকার, নিধিরামবাবু কি দয়া করিয়া একবার তাঁহার বাসায় দিকে আসিতে পারেন?

নিধু গিয়া দেখিল বাহিরের ঘরে একা সুনীলবাবুই বসিয়া আছেন—মুন্সেফবাবু এ সময় এখানে বসিয়া আড্ডা দেন, আজ তিনি আসেন নাই। নিধুকে দেখিয়া সুনীলবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—আসুন আসুন—সেদিন আপনাদের বাড়ী গিয়ে আদর-যত্নে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। বসুন—

নিধু লজ্জিত মুখে বলিল—আমাদের আবার আদর যত্ন! আপনাদের মতো লোককে কি আমরা উপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করতে পারি? সামান্য অবস্থার মানুষ আমরা—

—ও সব বলবেন না নিধিরামবাবু। ওতে মনে কষ্ট পাই—বসুন, আমি দেখি চায়ের কি হল—আপনার সঙ্গে খাব বলে বসে আছি—আপনি চা খান না বুঝি আবার? একটু মিষ্টিমুখ করে—

চা ও জলযোগ পর্ব চুকিয়া গেলে সুনীলবাবু বলিলেন—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

নিধু একটু বিস্মিত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। তাহার মতো লোকের সঙ্গে কি কথা আছে একটা মহকুমার সেকেণ্ড অফিসারের, সে ভাবিয়াই পাইল না।

লালবিহারীবাবুকে আপনি তো ভালো করেই জানেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি বৈকি ! এক গাঁয়ের লোক। তবে উনি এবার অনেকদিন পরে গাঁয়ে এলেন। একবার দেখেছিলাম ছেলেবেলায়—আর এই দেখলাম এবার—বাবার সঙ্গে খুব আলাপ—

—তা তো হবেই। আপনার বাবাকে এ রবিবারেও দেখলাম লালবিহারীবাবুর বৈঠকখানাতেই। ওঁরা সমবয়সী প্রায়—

—ঠিক সমবয়সী নয়, বাবার বয়েস বেশি।

—আচ্ছা, আপনি লালবিহারীবাবুর মেয়ে মঞ্জরীকে দেখেছেন তো ?

নিধু প্রায় চমকাইয়া উঠিয়া সুনীলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

—মঞ্জরী ?—ও মঞ্জু ? আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে দেখেছি বই কি, তা—

সুনীলবাবু সম্ভবত নিধুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না। তিনি সহজ সুরেই বলিলেন—তাকে দেখেছেন তাহলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—দেখেছি বই কি। কেন বলুন তো ?

সুনীলবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—সেদিন লালবিহারীবাবু ওর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলেন কিনা। তাই বলচি।

—কার বিবাহ ?

—মানে আমার সঙ্গেই।

—ও।

—আপনি কি রকম মনে করেন ? মেয়েটি ভালোই—কি বলেন ? আপনার গাঁয়ের মেয়ে তাই জিগগেস কচ্চি।

—ইয়ে—হ্যাঁ—ভালো বৈকি ! বেশ ভালো।

—অবিশ্যি আমার মতে হবে না। আমার বাবা কর্তা, তাঁকে জিগগেস না করে কোনো কাজ হতে পারে না। তাঁরা মেয়েটি দেখেছেন কারণ একই পাড়ায় ওর মামারবাড়ী, সেখানে থেকে স্কুলে পড়ে। আমাদের বাড়ীও ওদের যাতায়াত আছে—তবে আমি কখনো দেখি নি—কারণ আমি থাকি বিদেশে। কলকাতায় থাকি আর কদিন ?

—কেন রবিবারে তাকে দেখলেন না ?

—ঠিক মেয়ে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া বাবা মেয়ে না দেখে গেলে আমার দেখায় কিছু হবেও না। তবুও ওঁরা একবার মেয়েটিকে দেখাতে চাইলেন তাই দেখলাম। দেখতে ভালোই অবিশ্যি—সে আমি আগেও শুনেছিলুম। কিন্তু শুধু বাইরে দেখে—

নিধুর মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, একথার উত্তর তাহার দেওয়া উচিত। মঞ্জুকে সে সব সময় সর্ব্বত্র বড় করিয়াই রাখিতে চায়। কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে ছোট ধারণা না হয়, এটা দেখা তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সুতরাং সে বলিল—আজ্ঞে না শুধু বাইরে নয়—মেয়েটি সত্যিই ভালো।

সুনীলবাবু একটু আগ্রহের সুরে বলিলেন—আপনার তাই মনে হয় ?

—আমার কেন শুধু, আমাদের গ্রামের সকলেরই তাই মত। সত্যিই ওরকম মেয়ে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না—

—বেশ, বেশ। আপনার মুখে একথা শুনে খুব খুশি হলাম। দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না—যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে—তাকে অন্তত একটু যাচাই না করে নিয়ে—আমার অন্তত তাই মত। বাবা যা দেখবেন, সে তো দেখবেনই।

নিধু একথায় বিশেষ কোনো জবাব দিল না।

নিধুর মনের মধ্যে কেমন এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা। সুনীলবাবুর শেষ কথাটা তাহার কানে যেন অনবরত বাজিতেছিল—সারাজীবন মঞ্জুর সঙ্গে থাকিবেন কে ? না সুনীলবাবু।

মঞ্জু সুনীলবাবুর জীবনসঙ্গিনী ?

বাসায় ফিরিবার পথে সুনীলবাবু তাহার সহিত গল্প করিতে-করিতে খানিক দূর পথ আসিলেন। শুধু মঞ্জুর সম্বন্ধেই কথা। নানা ধরনের আগ্রহভরা প্রশ্ন, কখনো খোলাখুলি, কখনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য নিধুর কাছে ঠিক বোধগম্য হইল না।

—আচ্ছা, নিধিরামবাবু, মঞ্জু কিরকম লেখাপড়া জানে বলে আপনার মনে হয় ?

—বেশ জানে। এবার তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠবে—

—আমি তা বলচি নে—পড়াশুনোতে কেমন বলে মনে হয় আপনার ? বেশ কালচার্ড ?

—নিশ্চয়ই। হাতের লেখা কাগজ বার করবে শিগগির। লেখাটেখার ঝোঁক আছে, গান করে ভালো—

—গান শুনেচেন আপনি ?

এখানে কি ভাবিয়া নিধু সত্যকথা বলিল না। তাহার সামনে বসিয়া মঞ্জু গান গাহিয়াছে, এ কথা এখানে বলিবার আবশ্যক নাই, না বলাই ভালো। সে বলিল—কেন শুনব না। দেখেচেন তো আমাদের বাড়ীর সামনেই ওদের বাড়ী। মাঝে-মাঝে গান করে ওদের বাড়ীতে, আমাদের বাড়ী থেকে শোনা যায় বই কি।

মোটের উপর নিধুর মনে হইল মঞ্জুকে দেখিয়া সুনীলবাবু মুগ্ধ হইয়াছেন। মঞ্জুর চিন্তাই এখন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান—ইহার প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা সবই এখন রূপমুগ্ধ তরুণ প্রেমিকের প্রলাপের পর্য্যায়ভুক্ত।

বাসায় আসিয়া নিধু মোটেই স্থির হইতে পারিল না। মনের সেই যন্ত্রণাটা যেন বড় বাড়িয়াছে। মঞ্জু সুনীলবাবুর সারাজীবনের সাথী হইবে—একথা যেন সে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

সেদিন আর রাঁধিল না। চাকর জিজ্ঞাসা করিল—কি খাওয়ার যোগাড় করে দেব বাবু ?

—তুই দুটো পয়সা নিয়ে গিয়ে বরং চিঁড়ে কিনে আন—তাই খাব এখন। শরীর ভালো নয়, রান্না আজ পারব না।

—সে কি বাবু ? চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাবেন কেন ? আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—

—না, না—তুই যা এখন। আমার শরীর ভালো না—আর কিছু খাব না।

আহারাদির পরে তিনঘণ্টা কাটিয়ে গেল। রাত প্রায় একটা। নিধু দেখিল সে যাথামুণ্ড কি যে ভাবিতেছে! নানা অদ্ভুত চিন্তা। জীবনে সে কখনো এমন ভাবে নাই।

গভীর রাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল হইল। আচ্ছা, সে এত রাত পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া মরিতেছে? কেন তাহার চক্ষে ঘুম নাই? মঞ্জু যাহারই জীবনের সাথী হউক—তাহার তাহাতে আসে-যায় কি?

আজ একটি সপ্তাহের মধ্যে যে একটি পয়সা আয় করিতে পারে নাই—তাহার পক্ষে মঞ্জুর চিন্তা করাও অন্যায়। কখনো কি সম্ভব হইবে মঞ্জুকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করা?

আকাশকুসুমের আশা ত্যাগ করাই ভালো।

মঞ্জুর বাপ-মা তাহার সঙ্গে কখনো কি মঞ্জুর বিবাহ দিবেন বলিয়া সে ভাবিয়াছিল? সে নিজের মনের মধ্যে ডুবিয়া দেখিল এমন কোনো দুরাশা তাহার মনে কোনোদিনই জাগে নাই। তবে আজ কেন সে সুনীলবাবুর কথায় এত বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে? মঞ্জুর সঙ্গে মুখের আলাপ আছে মাত্র। ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়।

অপর পক্ষে মঞ্জু বড়মানুষের মেয়ে—সে লালিত হইয়াছে সচ্ছলতার মধ্যে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে, অন্য ধরনের জীবনের মধ্যে! সুনীলবাবুর সঙ্গে বিবাহ হইলে মঞ্জু খাপ হইতে ডাঙায় পড়িবে না—নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই সে থাকিতে পারিবে: চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রায় জোর করিয়া পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িবে না।

সুনীলবাবুর ঘরে সে মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী রূপে—

না, কথাটা ভাবিতে গেলে আবার যেন বুকের মধ্যে খচ করিয়া বাজে।

পরদিন সকালে জন দুই মক্কেল আসিল। ধানের জমি লইয়া মারপিটের মোকর্দ্দমা, তবে নিধুর মনে হইল ইহারা যাচাই করিয়া বেড়াইতেছে কোন মোক্তারের কত দর—শেষ পর্য্যন্ত যদুবাবুর কাছে গিয়াই ভিড়িবে।

নিধু নিজের দর কিছুমাত্র কমাইল না—কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিল লোক দুটি তাহাকেই মোক্তার নিযুক্ত করিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তাহাদের লইয়া ব্যস্ত থাকিবার পর নিধু বলিল—তোমরা যাও বাজার থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে এস—প্রথম কাছারীতেই তোমাদের মোকর্দ্দমা রুজু করে দেব—আমার টাকা আর কোর্টের খরচটা দিয়ে যাও—

—কত ট্যাকা বাবু?

—এই যে বললাম সবসুদ্ধ চারটাকা সাড়ে ন' আনা—

—বাবু, ট্যাকা কাছারীতেই দেবানি—

—না বাপু, ও সব দেবানি-টেবানি শুনচিনে—টাকা দিয়ে যাও—ফেরি কিনতে হবে, আর্জির স্ট্যাম্প কিনতে হবে—সে সব কে কিনবে ঘরের পয়সা দিয়ে?

—বাবু, এখন তো মোদের কাছে নেই—

—কাছে নেই তো মোকর্দ্দমা করতে এসেচ কেন মরতে? জানো না যে বামনগরে

এলেই পয়সা সঙ্গে করে আনতে হয় ?

—তবে বাবু যদি আপনি একটা ঘন্টা সময় দেন—প্রথম কাছারীতেই মোরা ট্যাকা দেবানু—ট্যাকা না পেলে আপনি মোদের মোকর্দ্দমা করবেন না—

ইহারা চলিয়া কিছুদূর যাইবার পরেই আরও জন চারেক মক্কেল আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের সহিত কথা কহিয়া নিধু বুঝিল—ইহারা পূর্ব্বের মারপিটের মোকর্দ্দমারই ফরিয়াদী পক্ষ। ইহারাই মার খাইয়াছে। একজন প্রহৃত ব্যক্তি মাথায় লাঠির দাগ সমেত আসিয়াছে।

ইহাদের মোড়ল বলিল—বাবু, আমাদের হক মোকর্দ্দমা—মাথায় এই দেখুন লাঠির দাগ —ট্যাকা যা লাগে আপনাকে দেবানু—এখুনি এই পাঁচটা টাকা রাখুন আপনি—মোকর্দ্দমার এজাহারটা করিয়ে দিন—

যদিও ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিধুর মনে হইল ইহারাই ঠিক কথা বলিতেছে—টাকাও দিতে এখুনি প্রস্তুত—তবুও নিধু দুঃখিতচিত্তে বলিল—বাপু আমি অপর পক্ষের কেস নিয়ে ফেলেচি—তোমাদেরটা নিতে পারব না—

—বাবু, আপনি যা লাগে নেন মোদের কাছ থে। ক-ট্যাকা দিতে হবে বলুন আপনারে মোরা দিয়ে যাই। মোদের গাঁয়ের একটা মোকর্দ্দমায় আপনি জামিন করিয়ে দিয়েছিলেন— বড্ড সুখ্যাতি পড়ে গিয়েচে। মোক্তার যদি দিতে হয় তবে আপনারেই দেব—

—না, সে হবে না! আমি তাদের কথা দিয়েচি—

নিধুর মুহুরী আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিল—নিয়ে ফেলুন ওদের কেস বাবু, মনে হল পয়সা দেবে—পয়সা হাতে আছে এদের। অপরপক্ষ তো আপনাকে টাকা দেয়নি তবে কিসের বাধ্য-বাধকতা তাদের সঙ্গে ?

—না হে, যখন কথা দিয়ে ফেলেচি, কেস নেব বলেচি—তখন কি আর টাকার লোভে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ানো চলে ?

—টাকা পেলে না হয় সে কথা বলতে পারতেন বাবু—কিন্তু টাকা তো আপনি হাত পেতে নেননি তাদের কাছে ?

—ও একটা কথা হে। মুখের কথা টাকার চেয়েও বড়—

—বাবু, এ মহকুমায় এমন কোনো উকিল-মোক্তার নেই যিনি এমনধারা করেন। মক্কেল টাকা দিলে না তো কিসের মক্কেল ?

—না সে আমার দ্বারা হবে না। অপরে যা করেন, তাঁদের খুশি। আমি তা করতে পারব না—

অগত্যা ইহারা চলিয়া গেল। কিন্তু কোর্টে গিয়া নিধু সবিস্ময়ে শুনিল ধরণী-মোক্তার পূর্ব্ব-পক্ষের মোকর্দ্দমা রুজু করিতে সুনীল বাবুর কোর্টে ছুটিতেছেন।

নিধুর মুহুরীই বলিল—দেখলেন বাবু, বললাম তখন আপনাকে। ধরণীবাবুকে ওরা মোক্তার দিয়েচে—আপনার কাছে যাচাই করতে এসেছিল—টাকার কথা বলতেই পিছিয়ে পড়েচে—

—এ তো ভারি অন্যায় কথা। ধরণীবাবুই বা আমার কেস নিতে গেলেন কেন ?

—ওরা তো ধরণীবাবুকে আপনার কথা কিছু বলে নি ? তিনি হয়তো কম টাকাতে রাজী হয়েচেন—

—ওদের একজনকে আমার কাছে ডেকে আনতে পার ?

—তারা বাবু আসবে না। আমি কত খোশামোদ করলাম ওদের। ধরণীবাবু মোক্তার-নামায় সই করেছেন—তাঁর মুহুরী ফেমি লিখে ফেলেচে—

—এ পক্ষ ?

—তারা যত্নবাবুকে মোক্তার দিয়েচে। যত্নবাবু সাবডেপুটি বাবুর এজলাসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মক্কেল নিয়ে—

—এ কিরকম ব্যাপার হল হে ?

—এই রকমই হয় এখানে। আপুনি নতুন লোক, এসব জানবেন কোথা থেকে ? তাইতো তখন আপনাকে বললাম ওদের টাকা নিয়ে ফেলুন—

—টাকার জন্যে একটা অন্যায় কাজ আমি তো করতে পারিনে ? তাহলেও ধরণীবাবুকে আমি একবার বলব—

—বলবেন না বাবু, তাতে উল্টে ধরণীবাবু ভাববেন মক্কেলের জন্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে। সেটা বড় খারাপ দেখাবে। ধরণীবাবুর তো কোনো দোষ নেই—তিনি না জেনেই কেস নিয়েচেন। আমার কথাটা শুনবেন বাবু, এই কাজ করে-করে আমার মাথার চুল পেকে গেল—এখানে মোক্তারে-মোক্তারে কম্‌পিটিশন্—উকিলে-উকিলে কম্‌পিটিশন্—যিনি যত কম হাঁকবেন, টাকা বাকি রাখবেন, তাঁর কাছে তত মক্কেল যাবে।

—তাহলে তুমি কি ভাব না যে ধরণীবাবু আমার মক্কেল ভাঙিয়ে নিয়েচেন ?

—মোক্তারনামায় সই যখন করেন নি, টাকা তারা যখন দেয় নি—শুধু মুখের কথায় কি কেউ কারো মক্কেল হয় বাবু ? আপনি মুখের কথায় দাম দিলেন, আর কেউ যদি না দেয় ? সবাই কি আপনার মতো ? সত্যি কথায় এসব লাইনে কাজ হবে না বাবু সে আপনাকে আমি আগেই বলেচি। মফস্বলে সর্ব্বত্রই এই অবস্থা দেখবেন।

বারের মধ্যে নিধুর বয়সী আর একজন ছোকরা মোক্তার ছিল। তাহার নাম নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—সেও নিধুর মতোই গরীব গৃহস্থ পরিবারের ছেলে—নিধু তবুও কিছু-কিছু উপার্জ্জন করিত—সে বেচারীর অদৃষ্টে তাহাও জুটিত না—বেচারী তাহার মামীমার বাড়ী থাকিয়া মোক্তারী করে বলিয়া অনাহারের কষ্টটা ভোগ করিতে হয় না—কিন্তু কিছু করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার মন বড় খারাপ। নিধুর কাছে মাঝে-মাঝে সে মনের কথা বলিত। নিধুর মনে খুব দুঃখ হইয়াছিল এই ব্যাপারে—সে নিরঞ্জনের কাছে ঘটনাটি সব বলিল।

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—তোমার মতো লোকের মোক্তারী করতে আসা উচিত হয়নি নিধিরাম—

—কেন হে? কি দেখলে আমার অক্ষমতা?

—এত সরল হলে এ ব্যবসা চলে? যে কোনো ঘুঘু মোক্তার হলে কৌশলে তার কাছে টাকা বার করে নিতো।

—আমি ভেবেছি যদুকাকাকে কথাটা বলব। তিনি কেন আমার মক্কেল নিলেন?

—তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্চে হে! ছেলেমানুষের মতো কথা বলচ যে। একথার মানে হয়? মক্কেলের গায়ে কি নামের ছাপ আছে নাকি? শোনো আমার পরামর্শ। যদুবাবু তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁকে মিথ্যে চটিও না। তুমি তবুও কিছু-কিছু পাও—আমার অবস্থাটা ভেবে দেখো তো? মাসীমার বাড়ী না থাকলে না খেয়ে মরতে হত—

—আর ব্যবসা চলে না—অচল হয়েচে ভাই। এক পয়সা আয় নেই আজ দু-হপ্তা—

—দু-হপ্তা তো ভালো। আমি তোমার এক বছর আগে বসেচি, এ পর্য্যন্ত তেত্রিশ টাকা মোট উপার্জ্জন হয়েচে। তবুও ভাবচি, ভবিষ্যতে হতে পারে—নইলে কোথায় যাব?

—বুড়োগুলো না ম'লে আমাদের কিছু হবে না। যদুবাবু, ধরণীবাবু, শিব ভট্‌চাজ, হরিহর নন্দী—এগুলো পলাশীর যুদ্ধের বছর জন্মে আজও বার জুড়ে বসে আছে। এরা মরলে তবে যদি আমাদের—তা সবাই অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে এসেচে—

—সেই ভরসাতেই থাক—ওহে, একটা কথা শুনেছ?

—কি?

—সাধনবাবু নাকি ওর ভাইঝির সঙ্গে সাবডেপুটিবাবুর বিয়ের চেষ্টা করচে—

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কি!

নিরঞ্জন হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—সে বড় মজা। সাধন-মোক্তার আর তার মামা দুর্গাপদ ডাক্তার দুজনে গিয়ে আজ সকালে সুনীলবাবুর বাসায় খুব ধরাধরি করেচে—আজ ওবেলা বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন করেচে—উদ্দেশ্য মেয়ে দেখানো।

—তুমি জানলে কি করে?

—দুর্গাপদ ডাক্তারের ছেলে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, সে বলছিল—সে আবার একটু বোকা মতো, তার বিশ্বাস এ বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়ে নাকি ভালো।

নিধু আপন মনেই বলিল—ও তাই!

—তাই কি?

—কিছু না এমনি বলচি—

—আমি একটা কথা বলি শোনো। সিরিয়াসলি বলচি। তুমি বার ছেড়ো না, তোমার হবে। তোমার মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তোমার বয়েসের মোক্তার বারে নেই। বুড়োগুলো সব বদমাইস, স্বার্থপর। তোমার অনেষ্টি আছে, বুদ্ধিও আছে, তুমি এরপরে নাম করবে, তোমার গুণ বেশিদিন চাপা থাকবে না।

—বই নেই যে?

—বরাত ভাই, সব বরাত—নইলে সি. ডবলিউ. এন. আর. সি. এল. জে-র লাইব্রেরী নিয়ে বসে থাকলেও কিছু হয় না। যদুবাবু বা হরিহর নন্দী এরা ইংরিজি পড়ে বুঝতে পারে না, সেকালের ছাত্রবৃত্তি পাশ মোক্তার—ওদের হচ্চে কি করে? তবে আমাকে বোধ হয় শিগগির ছাড়তে হবে—

—ছাড়বে কেন? বুড়োগুলো মরুক—অপেক্ষা কর—

—ততদিনে আমার বাড়ীর সব না খেয়ে মরে যাবে—বিষয় সম্পত্তি বেচে চলচে এখন—

—যদুকাকাকে বলে তোমায় দুচারটে জামিননামা দেব—জামিনের ফি'টা পাবে এখন।

—তোমার নিজের পেলে তাতে উপকার হবে—তুমি আমায় দেবে কেন?

—যদি আমি দিই—

—সেই জন্যেই তো বলচি। তোমার মতো অনেস্ট লোক বারে আসে নি—অন্তত রামনগরের বারে। তুমি অনেক দূর যাবে—

নিধু বাসায় আসিবার পথে সাধন-মোক্তারের কাণ্ডটা ভাবিয়া আপন মনেই হাসিল। তাই আজকাল তাহার সঙ্গে এতবার দেখা হওয়া-সত্ত্বেও বিবাহের কথা একবারও মুখে আনে না—এমন বড় গাছে বাসা বাঁধিবার দুরাশায় তাহার মতো নগণ্য জুনিয়ার মোক্তারের কথা ভুলিয়াই গেল বেমালুম। ভালোই হইয়াছে—নতুবা একে পয়সার টানাটানি—তাহার উপর সাধন-বুড়োর বিবাহের ঘটকালির উৎপীড়নে ও তাগাদায় তাহাকে রামনগর ছাড়িয়া পলাইতে হইত এতদিন। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিও ক্রমে কাটিয়া আসিল। একটি মক্কেলও আসিল না।

আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ। পূজা আসিয়া পড়িল। রামনগরে পূজাকমিটি দুদিন মিটিং করিল, তাহার পাঁচ টাকা চাঁদা ধরিয়াছে—তাহার নামেও চিঠিও আসিয়াছে। এদিকে বাড়ীওয়ালা তাগাদার উপর তাগাদা করিয়া হয়রান হইয়া গেল—এখনও ভদ্রতা দেখাইয়া চলিতেছে বটে—কিন্তু পূজার ছুটির আগেও যদি টাকা না দিতে পারে—তবে হয়তো বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ আসিয়া হাজির হইবে একদিন।

শনিবার।

আগের দিন যদু-মোক্তারের অনুগ্রহে একটা জামিনের ফি পাওয়া গিয়াছে—আরও অন্তত দুটি টাকা হইলে আজ বাড়ী যাওয়া চলে। নইলে শুধুহাতে বাড়ী গিয়ে লাভ কি?

বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া-বসিয়া নিধু ফন্দি আঁটিতেছে—কি উপায়ে তাহার মুহুরীর কাছে দুটি টাকা ধার লওয়া যায়—কারণ নিধুর অপেক্ষা তাহার মুহুরীর অবস্থা ভালো—বাড়ীতে জায়গা জমি, চাষবাস—এখানেও তাহার দাদা স্ট্যাম্পভেণ্ডারি করিয়া এই কোর্টের প্রাঙ্গন হইতেই মাসে দেড়শো-দুশো টাকা রোজগার করে—দুটি টাকা দিতে তাহার কষ্ট হইবার কথা নয়—কিন্তু বাবু হইয়া ভৃত্যের কাছে সোজাসুজি টাকা ধার করা চলিবে না—কোনো একটা কৌশল খাটাইতে হইবে।

এমন সময় সাধন-মোক্তার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন—এই যে নিধু বসে আছ। ওহে একটা জামিনের দরখাস্ত মুভ করবে? তিনটে টাকা পাবে যদি মঞ্জুর করে দিতে পার। মক্কেলের সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেচি। ছেলে আসামী, বাপ টাকা দিয়ে কেস চালাচ্ছে, টাকা নির্ঘাত আদায় হবে।

নিধু নির্বোধ নয়—সাধন-মোক্তারের আসল উদ্দেশ্য সে বুঝিয়া ফেলিল। বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কার কোর্টের কেস?

—সাবডেপুটির কোর্টে।

এই কথাই নিধু ভাবিয়াছিল। শক্ত কেসের আসামী, জামিন সহজে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা কম, সুনীলবাবুর সঙ্গে আজকাল নিধুর খাতির জমিতেছে একথা বারে রাষ্ট্র হইতে দেরি হয় নাই। তাহার খাতিরের চাপে যদি জামিন মঞ্জুর হইয়া যায়—জামিননামা সই করিয়া শতকরা সাড়ে বারোটাকা জামিনের ফি মারিবেন সাধন-মোক্তার।

সে বলিল—কত টাকার জামিন হবে মনে হয়?

—যা মঞ্জুর করাতে পার—পাঁচশো টাকার কম হবে বলে মনে হয় না।

অনেকগুলি টাকা জামিনের ফি। সাধন-মোক্তার তাহাকে ভাগ দিবে না বা তাহার চাওয়াও উচিত নয়—তবে সে যদি জামিন মঞ্জুর করাইতে পারে—সে নিজেই জামিন দাঁড়াইবে না কেন? কথাটা সে বলিয়া ফেলিল। সাধন বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—তুমি জামিন দাঁড়াবে অত টাকায়? বড্ড রিস্ক। তারপর ধর যদি পালিয়ে-টালিয়ে যায়—বেলবণ্ড বাজেয়াপ্ত হলে অতগুলো টাকা গুনোগার দিতে হবে—

—তা সে তখন পরে দেখা যাবে—

—না হে না—আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি তোমায় সে রিস্কের মধ্যে যেতে দিতে পারি নে—এ লোকটা বদমাইশ, যদি পালিয়ে যায় তোমাদের মতো জুনিয়ার মোক্তারের এখন এ সব বিপদের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়।

নিধু আর বেশি কিছু বলিতে পারিল না—টাকার ভাগ লইয়া প্রবীণ সাধন-মোক্তারের সঙ্গে ইতরের মতো তর্কাতর্কি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে শুধু বলিল—বেশ, তাই হবে। তবে জামিন মুভ করার ফি আমায় কিছু বেশি করিয়ে দেন, তিন টাকায় পারব না—

সাধন নিধুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—বল কি হে? জুনিয়র মোক্তারেরা কেন, অনেক সিনিয়র মোক্তার দু-টাকায় এ কেস করবে—তুমি বেশি পাচ্ছ শুধু আমার বলা কওয়ায়, নইলে বঙ্কু বা হরিবাবু রয়েচেন কি জন্যে? তোমায় স্নেহ করি বলে আমি ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে তোমার কাছে নিয়ে আসচি—ভাবলাম—যদি পায় তো, আমাদের আপনার লোকেই টাকাটা পাক—

নিধুর রাগ হইল। সাধন সবদিক হইতেই তাহাকে ফাঁকি দিতে চাহিবেন—এ তাহার পক্ষে অসহ্য। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—আজ্ঞে না, আমি পাঁচ টাকার কমে পারব না—আপনি

আসামীদের বলে দেবেন—

—সে কি হে! তুমি আবার কি ডিকটেট্ করতে আরম্ভ করলে নাকি?

—আজ্ঞে মাপ করবেন। আমি ওর করে পারব না—আর একটা কথা, ফিয়ের টাকা আগাম দিতে হবে—

—নাঃ, তোমাদের মতো ছোকরাদের নিয়ে দেখচি মহাবিপদ। তোমরা বুঝলেও বুঝবে না। তা নিও, তাই নিও। কি আর করব? আপনার লোকের মধ্যে দেখি তোমাকে—

সুনীলবাবুর এজলাসে জামিন মঞ্জুর করাইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

তাহার সাফল্য দেখিয়া হয়তো বা কোনো-কোনো প্রবীণ মোক্তার কিছু ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন ভাবিয়া নিধু এজলাসে উপস্থিত হরিহর নন্দীর কাছে গিয়া বলিল—হরিবাবু, কোনো ভুল করি নি তো?

হরিহর মোক্তার বলিলেন—কেন ভুল করবে? চমৎকার সওয়াল জবাব—

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আপনাদের কাছেই শিখেছি হরিদা। আপনাদের দেখে-দেখেই শেখা—এখন আশীর্বাদ করুন—

হরিহর নন্দী অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—না, না, আশীর্বাদ তোমায় কি করব—তুমি ব্রাহ্মণ, ওকথা বলতে নেই। তোমরা ছেলে-ছোকরা তাই বোঝ না। তোমরা আমাদের প্রণম্য—তবে তোমার কল্যাণ কামনা করচি, উন্নতি তুমি একদিন করবে—

কোর্ট হইতে চলিয়া আসিবার সময় সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবু আজ দেশে যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আমার খাসকামরায় একবারটি আসেন যদি, একটা কথা আছে—

কোর্টে উপবিষ্ট অনেকগুলি তরুণ ও প্রবীণ মোক্তারের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সম্মুখে নিধু অজপদে সুনীলবাবুর খাসকামরায় প্রবেশ করিল।

সুনীলবাবু বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটা চিঠি দেব।

—বেশ, দিন না—আমি দেব এখন।

—আর একটা কথা—আপনি লাখনবাবুকে কতটা জানেন?

—ভালোই জানি। কেন বলুন তো স্যর?

—উনি লোক কেমন?

—লোক মন্দ নয়।

সুনীলবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—তাই জিগ্‌গেস করচি। আচ্ছা, আপনি সোমবারে আসুন, একটা কথা বলব আপনাকে।

—বেশ, স্যর।

—লালবিহারীবাবুকে আমার প্রণাম জানাবেন—আর আপনি তো বাড়ীর মধ্যে যান,

পিসিমাকে বলবেন সামনের শনিবারে আমায় নেমন্তন্ন করেছেন, কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন সেদিন—দুদিন থাকবেন—সুতরাং কোথাও যাওয়া-আসা যাবে না। আপনারও যাওয়া হবে না।

—আমার? কেন?

—আপনার সঙ্গে ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব ম্যাজিস্ট্রেটের।

—আমার মতো লোকের সঙ্গে ইণ্টারভিউ?

—এসব ভালো। আপনার পসারের পক্ষে এগুলো বড় কাজের হবে।

—আপনার যা ইচ্ছে, স্তর।

শনিবারে কোর্ট বন্ধ হইতে চারিটা বাজিল। নিধু সঙ্গে-সঙ্গে বাসায় আসিয়া কোর্টের পোশাক ছাড়িয়া সাধারণ পোশাক পরিয়া কিছু খাইয়া লইল। পরে বাসার চাবি চাকরের হাত দিয়া কুড়ুলগাছি রওনা হইল।

এতদিন সে ভাবিবার অবসর পায় নাই। নানা গোলমালে দিন কাটিয়াছে। আজিন মুক্ত করিবার কি না পাইলে আজ বাড়ী যাওয়াই ঘটিয়া উঠিত না। এতদূর রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। তা হইলেই বা কি? মঞ্জুর সঙ্গে সে আর দেখা করিবে না। তাহার সঙ্গে মঞ্জুর আর দেখাশোনা হওয়া ভুল। দুদিন পরে সে পরস্ত্রী হইতে চলিয়াছে—এখন তাহার সঙ্গে মেলামেশা মানে কষ্ট ডাকিয়া আনা। অতএব আর গিয়া সে মঞ্জুর সহিত দেখা করিবে না। মিটিয়া গেল। কিন্তু সে যতই গ্রামের নিকট আসিতেছিল—তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিজের মনেই সন্দেহ জাগিল। মঞ্জুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে তো? কেন পারিবে না? কতদিনেরই বা আলাপ? খুব পারিবে এখন। পারিতেই হইবে।

নিধুর মা বলিলেন—বাবা! কি ছেলে তুমি! এতদিন পরে মনে পড়ল?

—কি করি বল। এক পয়সা রোজগার নেই, এসে কি করব?

—না-ই বা থাকলে রোজগার। তোকে দেখতে ইচ্ছে করে না আমাদের? কালী, জল নিয়ে আয়।

নিধু হাত ধুইয়া খাবার খাইয়া মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। হঠাৎ নিধুর মা মনে পড়িয়া যাওয়ার সুরে বলিয়া উঠিলেন—ভালো কথা! তোকে যে মঞ্জু কতবার আজ ডেকে পাঠিয়েছিল! আগের দু শনিবারও ঠিক সন্ধের আগে লোক পাঠিয়েচে খোঁজ নিতে তুই এসেচিস কিনা। একবার গিয়ে দেখা করিস্ সকালে। আজ বড্ড রাত হয়ে গেল।

কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় বাহির হইতে নৃপেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ও কালী, ও পুঁটি-দিদি, নিধুদা আসে নি? নিধু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিল—এই তো এলায়। এস, এস, ভালো আছ নৃপেন?

—আমি আসব না, আপনি আসুন নিধুদা। বাবাঃ, আপনাকে খুঁজে খুঁজে—

—এতরাত্রে যাব? নটা সাড়ে-নটা হবে যে।

—দিদি পাঠিয়ে দিলে দেখতে আপনি এসেচেন কিনা—

—কিন্তু নিয়ে যেতে তো বলে নি ? কাল সকালে যাব—

—আসুন আপনি—কিছু ম্লান হয় নি। আমাদের বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া মিটতে রাত বারোটা বাজে রোজ। এখন আমাদের সঙ্গে।

মঞ্জু অনেক অনুযোগ করিল। এতদিন কি হইয়াছিল—গ্রামের কথা কি এমন করিয়া ভুলিতে হয় ? কি হইয়াছিল তাহার ?

নিধু বলিল—পয়সার অভাব মঞ্জু। বাড়ীভাড়া দিতে পারি নি বলে দুবেলা তাগাদা সইচি। কি করে বাড়ী আসি বল। কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিয়াই নিধু ভাবিল টাকা-পয়সা বা নিজের কষ্ট-দুঃখের কথা মঞ্জুর কাছে বলা উচিত হয় নাই। কিন্তু নিধুর উক্তি মঞ্জুর মুখে কেমন এক পরিবর্ত্তন আনিল। সে সহানুভূতির সুরে বলিল—সত্যি নিধুদা ?

—মিথ্যে বলব কেন ?

—আপনি চলে এলেন না কেন ? টাকা আমি দিতাম—আমায় বললেন না কেন এসে, মঞ্জু আমার টাকার দরকার, দাও।

সেখানে অন্য কেহ তখন ছিল না—থাকিলে মঞ্জু একথা বলিতে পারিত না। নিধু বলিল—কেন তোমাকে অনর্থক বিরক্ত করব ?

মঞ্জু তীব্রকণ্ঠে বলিল—অনর্থক বিরক্ত করা ভাবেন এতে নিধুদা ? বেশ তো আপনি ?

মঞ্জুর রাগ দেখিয়া নিধু অপ্রতিভ হইল—কিন্তু পরক্ষণেই তাহার কথার মধ্যে একটা অভিমানের সুর আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। সে বলিল—সে জন্যে না মঞ্জু। তোমার টাকা নেব—তারপর পুজোর পর এখান থেকে চলে যাবে তোমরা, টাকাটা শোধ দিতে হয়তো দেরি হবে—

—এ ধরনের কথা আপনি বললেন আমায় ! বলতে পারলেন আপনি ?

—কেন পারব না ? তোমার সঙ্গে আর দেখা করা উচিত নয় আমার—জানো মঞ্জু ?

মঞ্জু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন ?

—জানো না কেন ? আর দুদিন পরে তোমরা চলে যাবে এখান থেকে। আবার হয়তো আসবে না কতদিন। হয়তো দু-দশ বছর। আমরা সামান্য অবস্থার মানুষ—বিদেশে যাওয়ার পয়সা নেই—দেখাই হবে না আর।

—ওঃ এই ! নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমরা আসব মাঝে-মাঝে।

—তাতে কি ? তোমার আর কতদিন ? দুদিন পরে পরের ঘরে চলে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

—কেন নিধুদা, এসব কথা আপনার মাথায় মধ্যে আজ এল কেন শুনি ?

—কারণ না থাকলে কার্য্য হয় না। ভেবে ভাখ—

মঞ্জু ব্যস্তসমস্ত আগ্রহে বলিল—কি হয়েচে নিধুদা ? কি অন্যায় করে ফেলেচি আমি ? এমন কি কথা—

—আমি কিছু বলতে চাইনে। তুমি বুদ্ধিমতী—বুঝে দেখ—

মঞ্জু অল্প কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—বুঝেচি নিধুদা।

—ঠিক বুঝেচ ?

—হ্যাঁ।

—তবেই ভেবে ভাখ তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হওয়া উচিত মঞ্জু ? তুমি বড়লোকের মেয়ে—ভুলে যাবে। কিন্তু আমি গরীব দুনিয়ার মোক্তার—আমার প্রথম জীবনে যদি উৎসাহ ভেঙে যায়—উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়—আর কিছু করতে পারব না বাব-এ। সব জিনিশ—

মঞ্জু নিরুত্তর রহিল। নিধু চাহিয়া দেখিল তাহার বড়-বড় চোখ দুটি জলে টলটল করিয়া আসিতেছে—এখনি বুঝি বা গড়াইয়া পড়িবে।

নিধু বলিল—রাগ আমি করি নি, তোমার কোনো দোষ নেই তাও আমি জানি। দোষ আমারই, আমারই বোঝা উচিত ছিল। ভুল আমার।

মঞ্জু এবারও কিছু বলিল না, নতমুখে সিমেন্টের মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধু বলিল —ও কথা আর তুলব না, থাক গে। তোমাদের প্রতিমা কই মঞ্জু ? পুজো তো এসে গেল।

মঞ্জু জলভরা চোখে নিধুর দিকে চাহিল। কোনো একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে ছোট মেয়ে বকুনি খাইবার ভয়ে যেমন ভাবে গুরুজনের দিকে চায়—মঞ্জুর চোখে তেমনি মিনতি মাখানো ভয়ের দৃষ্টি। যেন সে এখনি বলিয়া ফেলিবে—যা হয়ে গিয়েচে, হয়ে গিয়েচে—আমায় আর বকো না তুমি।

নিধুর মন এক অপরূপ দয়া ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

তাহার কপালে যাহাই থাক—এই সরলা করুণাময়ী বালিকাকে সকল প্রকার ব্যথা ও লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইয়া লইয়া চলাই যেন তাহার জীবনের কাজ।

সে বলিল—বললে না প্রতিমা হচ্চে না কেন ? পুজো হবে না ?

—প্রতিমা এখানে হচ্চে ন' তো। রেউলে-নবাবপুরের কুমোরবাড়ী ঠাকুর গড়া হচ্চে—সেখান থেকে দিয়ে যাবে।

—তোমরা সেই প্লে করবে তো ?

—আপনি যে রকম বলেন—

মঞ্জু যেন হঠাৎ ভরসাহারা ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। যে মঞ্জু চিরকাল হুকুম করিতে অভ্যস্ত, নিজের ইচ্ছার পথে কোনো বাধা যে কোনোদিন পায় নাই, বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে বলিয়াও বটে, সচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত বলিয়াও বটে—আজ যেন সে তাহার সমস্ত কাজের জন্যে নিধুর পরামর্শ খুঁজিতেছে। নিধু মঞ্জুর করিলে তবে যেন সে কাজে উৎসাহ পাইবে। একথা ভাবিতেই নিধুর মন আবার যেন সতেজ হইয়া উঠিল, মধ্যের দুঃখ ও অবসাদের ভাবটা কাটিয়া গেল।

—তা তুমি কর না মঞ্জু, আমি পেছনে আছি—

—পেছনে থাকলে চলবে না, আপনাকে পার্ট নিতে হবে—

—যদি বল, তাও নেব।

—আপনি পার্ট নেবেন না, প্লে-র মধ্যে থাকবেন না শুনলে আমার ওতে আর মন যায় না। উৎসাহ চলে যায়।

—কেন এরকম হল মন্জু? কোথায় তোমরা ছিলে, কোথায় আমরা ছিলাম ভাব তো।

—সে তো সব জানি। কিন্তু তা বললে মন কি বোঝে নিধুদা? মনে যা হয়, তাই হয়। বোঝালে কি কিছু বোঝে?

—কি বই করবে ঠিক করলে।

—বড়দা বলে গিয়েছেন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' করতে—ওঁদের কলেজে এবার করবে। উনি শিখিয়ে দেবেন। পড়েছেন আপনি?

—পাগল তুমি মন্জু? আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি জানতে তোমার আর বাকি নেই। নাম শুনেছি, এই পর্যন্ত।

—কবিতা পড়েন নি তাঁর?

—খুব কম।

—আমার কাছে, 'চয়নিকা' আছে—নিয়ে যাবেন। ভালো বই—

—সে তো জানি। তাই থেকে সেবার 'কচ ও দেবযানী' করেছিলে—চমৎকার হয়েছিল, এখনো যেন দেখতে পাই চোখের সামনে।

—আর লজ্জা দেবেন না নিধুদা। ওকথা থাক। আপনাকে পার্ট নিতে হবে—নেবেন তো?

—তুমি বললেই নেব। কবে থেকে মহলা দেবে?

—কি দেব?

—তোমরা যাকে বল রিহার্স্যাল—কবে থেকে শুরু করবে?

—আপনার কথা শুনে এমন হাসি পায় আমার নিধুদা। দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। আমার মনে হয় আপনি সব সময় আমাদের মধ্যে থাকুন—আপনি যখন নিজের বাড়ী চলে যান জ্যাঠাইমার কাছে খেতে—আমি তখন কতদিন মাকে বলেচি, নিধুদা এখানেই তো দুপুরবেলা পর্যন্ত থাকে, বাড়ী যাবে কেন খেতে, তার চেয়ে এখানে কেন খেতে বললে না? মা বলতেন—দূর, রোজ-রোজ ও যদি তোদের বাড়ী না খায়? আমার কিন্তু মনে হত, বা রে, আমরা নিধুদার পর হলাম কি করে? তা কেন লজ্জা করবে নিধুদার?

—আমিও তাই ভাবতাম কিন্তু। যদি খেতে না হয়, যদি সব সময় তোমাদের বাড়ীর আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে থাকি—

—আচ্ছা, রামনগরে থাকবার সময়ে আমাদের বাড়ীর কথা আপনার মনে পড়ে না?

—পড়ে।

—কার-কার কথা মনে পড়ে?

—কাকাবাবুর কথা, কাকীমার কথা, বীরেনের কথা, নৃপেনের কথা, বুড়ো ঝিটার কথা, কুকুরটার কথা, বেড়ালটার কথা।

মঞ্জু মুখে আঁচল দিয়া ছেলেমানুষের মতো খুশিতে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—উঃ, মোক্তারী আপনি করতে পারবেন বটে নিধুদা। কথার ঝুড়ি সাজিয়ে ফেললেন যে! এদের সকলের কথা মনে পড়ে—না?

—যা পড়ে, তাই বলেচি।

—ভালোই তো। আমি কি বলেচি আপনি তা না বলেচেন? আমি আর কে, যে আমার কথা মনে পড়বে?

—তা, পড়লেই বা কি?

—আপনি মনে ব্যথা দিয়ে বড্ড কথা বলেন কিন্তু—সত্যি বলচি নিধুদা—কেন ওরকম করেন? আমার মন তো পাথরে তৈরি নয়?

মঞ্জু এইমাত্র হাসিবার সময় সে আঁচল মুখে দিয়াছিল—তাহাই তুলিয়া চোখে দিল। নিধু দেখিল সত্যই তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছে। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, শিক্ষিতা মেয়ে—অথচ কি ছেলেমানুষ মেয়ে মঞ্জু! আর কি অদ্ভুত লীলাময়ী। হাসি অশ্রু একই সময়ে মুখে চোখে বিরাজমান।

নিধু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, সত্যি মঞ্জু তুমি ভাবলে এসব সত্যি? আর সকলের কথা মনে পড়েচে—আর তোমার কথাই পড়ল না? এ তুমি বিশ্বাস কর?

—দেখুন মন যা বলে, মাঝে-মাঝে মানুষের কাছ থেকে তার জন্তে উৎসাহ পাওয়া চাই। তবেই মন খুশি হয়ে ওঠে। মুখে শোনা এজন্তে বড় দরকার। বলুন এবার?

—না, যা বলেচি, তার বেশি আর কিছু শুনতে পাবে না আমার কাছে মঞ্জু।

নিধু সে রাত্রে বাড়ী আসিয়া একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

কোথায় যেন সে একটা পথ বাহিয়া চলিয়াছে—তাহার সামনে একটা বড় পুকুর—পুকুরে একরাশ পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, পুকুরের পাড়ের ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর হইতে হাস্যমুখী মঞ্জু বাহির হইয়া আসিল, অথচ দুজনেই দুজনকে জানে ও চিনিতে পারিয়াছে। মঞ্জু যেন দুলে-বাড়ীর মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়, দুজনে অবাধে অসঙ্কোচে পুকুরপাড়ে বসিয়া জলে ঢিল ফেলিতেছে ও অনর্গল বকিয়া যাইতেছে—মঞ্জু জজের মেয়ে নয়, তাহার সঙ্গে মেশায় কোনো বাধা নাই যেন।

স্বপ্নের মধ্যেই নিধুর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে যখন, ঠিক সেই সময় শাঁখের আওয়াজে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে বাহিরের রোয়াকে কালীকে দেখিয়া বলিল—কি রে কালী, শাঁখ বাজে কোথায়?

—পুকুরঘাটে। আজ যে ওদের ঠাকুর-পুজোর ঘট পাতা হচ্চে—মা গেল—

—কাদের ঘট পাতা হচ্চে?

—জজবাবুদের বাড়ীর দুর্গাপুজোর ঘট আজ পাততে হবে না? এয়োস্ত্রী মেয়ে চাই, মা

গিয়েচে অনেকক্ষণ—

—আর কে-কে এসেচে ?

—কাকীমা তো আছেন, ওপাড়া থেকে হৈম-দিদি এসেচে—

পুকুরঘাট হইতে শাঁখের আওয়াজ যখন আবার পথের দিকে আসিল, তখন নিধু কিসের টানে উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল আগে-আগে মঞ্জুর মা, তাহার পিছনে মঞ্জু, তাহার মা, হৈম, ভুবন গাঙ্গুলির স্ত্রী আরও পাড়ার দু-চারজন ঝি-বৌ জল লইয়া ফিরিতেছে। মঞ্জুর পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি, অনাড়ম্বর সাজগোজ—এতগুলি মেয়ের মধ্যে তাহার দিকে চোখ পড়ে আগে, কি চমৎকার গতিভঙ্গি, কি সুন্দর মুখশ্রী, সারাদেহের কি অনবদ্য লাবণ্য—

নিধুর মনটা হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

কেন এমন হয় ? কোনদিন কি সে ভাবিয়াছিল মুক্তেফবাবু তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন ? তাহার মতো দুনিয়ার মোক্তারের সঙ্গে ? গ্রামের মধ্যে যাহারা সব চেয়ে দরিদ্র, যাহার বাবা সর্ব্বদা মুন্সেফবাবুদের বৈঠকখানায় বসিয়া তোষামোদ বর্ষণ করিয়া বড়লোকের মন রাখিতে চেষ্টা করেন—যাহার মা জজগিন্নি বলিতে ভয়ে সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া যায়—মুখ তুলিয়া সমানে-সমানে কথা বলিতে ভরসা পায় না—এই বাড়ী, এই ঘর চোখে দেখিয়াও উহারা সে বাড়ীর ছেলের সঙ্গে অমন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ দিবে—এ কি কখনো সে ভাবিয়াছিল ?

যদি এ আশা সে না করিয়া থাকে, তবে আজ তাহার দুঃখ পাইবার কি কারণ আছে ?

মঞ্জু দুদিনের জন্তে এ গ্রামে আসিয়াছে—বড়লোক পিতার খেয়াল এবার গ্রামে তিনি পূজা করিবেন, খেয়াল মিটিয়া গেলে হয়তো আর দশ বৎসর তিনি এদিক মাড়াইবেন না—ততদিনে মঞ্জু কোথায়। তাহার বিবাহ হইয়া ছেলেপুলে বড় হইয়া স্কুলে পড়িবে। মিথ্যা আশার কুহক।

সে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কালীকে বলিল—কালী, একটু তেল দে, নেয়ে আসি পুকুর থেকে—

—এত সকালে দাদা ?

—তা হোক—দে তুই—

এমন সময় নিধুর মা বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন—নিধু, ওদের বাড়ী যা—দুজন ব্রাহ্মণকে জল খাইয়ে দিতে হয় দুর্গাপুজোর পিঁড়ি পাতবার পরে। জজগিন্নি তোকে এখুনি যেতে বলে দিলেন।

নিধু স্নান সারিয়া আসিয়া ওবাড়ী গেল। মঞ্জুও ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে—একজন ব্রাহ্মণ সে, অপর জন ভুবন গাঙ্গুলি।

ভুবন গাঙ্গুলি বলিলেন—এস বাবা, তোমার জন্তে বসে আছি—এঁরা ব্রাহ্মণকে না খাইয়ে কেউ জল খাবেন না কিনা।

—কাকা বেশ ভালো আছেন? হৈম এসেচে দেখলাম না?

—হৈম তো এ বাড়ীতেই আছে, বোধ হয়—

মন্টু বলিল—হৈমদি তো রান্নাঘরে, ডাকব নাকি? কাকাবাবুকে বলছিলাম হৈমদি আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবে—

ভুবন গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—করবে না কেন? আমি তো বলেচি। শ্যামবিহারী-দাদার বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার করবে, এ তো ওর ভাগ্যি। আমার আপত্তি নেই—ও হৈম, হৈম—

হৈম আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। কুড়ি-একুশ বছর বয়েস, রঙ তত ফরসা না হইলেও দেহের গড়ন ও মুখশ্রী ভালো। সে যে বেশ সচ্ছল ঘরে পড়িয়াছে তাহার সিঁদুরে শাড়ি, দুহাতে মোটা সোনার বালা ও বাহুতে আড়াই পেঁচের তাগা দেখিলে তাহা বোঝা যায়—এ ছাড়া আছে কানে ইয়ারিং, গলায় মোটা শিকলি হার।

নিধু বলিল—চিনতে পার হৈম?

হৈম হাসিয়া বলিল—কেন পারব না? এ গাঁয়ের মেয়ে নই?

—কবে এলে?

—মাসখানেক হল এসেচি। তুমি ভালো আছ নিধুদা?

—হ্যাঁ, এক রকম মন্দ নয়।

মন্টু বলিল—আমি হৈমদিকে বলেচি আমাদের সঙ্গে থিয়েটার করতে।

হৈম হাসিয়া বলিল—তা করব না কেন? বাবা তো বলেচেনই। নিধুদা, বই ঠিক করেচ?

—সে করবে মন্টু।

মন্টু তাড়াতাড়ি বলিল—আমি পারব না নিধুদা, আপনি ঠিক করে দিন না। রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী'র কথা বড়দা বলেছিলেন—

হৈম দেখা গেল 'ফাল্গুনী'র নামও শোনে নাই, সে বলিল—সে কি ভালো বই?

—সে খুব ভালো বই। এবার কলকাতায় হৈ-হৈ করে প্লে হয়ে গিয়েচে।

—তা তোমরা যেমন বল। নিধুদা আমাদের শিখিয়ে দেবেন—

—আমি আর কদিন আছি? কাল তো সকালেই—

—দুদিন কেন ছুটি নাও না?

মন্টুও সঙ্গে-সঙ্গে বলিয়া উঠিল—তাই কেন করুন না নিধুদা?

—সে কি করে হয়? তোমরা বোঝ না। এ কি কারো চাকুরি যে ছুটি নিতে হবে? না গেলে আমারই লোকসান—

হৈম বলিল—তাহলে আজ ওবেলা বইটা দেখিয়ে একটু পড়ে দিয়ে যাও—

—মন্টু তো রয়েচে। ও সব পারে। ওর 'কচ ও দেবযানী' সেদিন শোনো নি হৈম, সে একটা শোনবার জিনিস!

মধু সলজ্জ সুরে বলিল—ছাই! নিধুদার যেমন কথা! না ভাই হৈমদি—

ভুবন গাঙ্গুলি জলযোগান্তে উঠিয়া বিদায় লইলেন। হৈম বলিল—বাবা, তুমি যাও—আমি এর পরে যাব। নিধুদা না হয় দিয়ে আসবে এখন।

মধু বলিল—হৈমদি, আমার ভাইয়েরা আর নিধুদা কিন্তু পার্ট নেবে—

হৈম চিন্তিত মুখে বলিল—তাই তো ভাই, এ শুনলে আমায় কি বাড়ীতে প্লে করতে দেবে ভাই?

—কেন দেবে না?

—পাড়াগাঁয়ের গতিক তো জানো না—কে কি বলবে সেই ভয়ে বাড়ীর লোক যদি আপত্তি করে, তাই ভাবচি।

নিধু বলিল—তাতে কি? আমি না হয় না-ই করলাম—

মধু বলিল—তবে হবে কি করে? পুরুষমানুষের পার্ট মেয়েরা করতে গেলে অত মেয়ে কোথায় পাব এখানে!

—কেন, তোমাদের বাড়ীতে তো অনেকে আসবেন পুজোর সময়—

—তাদের সকলকে দিয়ে এ কাজ হবে না—দু-একজনকে দিয়ে হতে পারে। তাছাড়া রিহার্স্যাল দেওয়া না থাকলে তারা প্লে করবে কি করে? এ তো ছেলে খেলা নয়! তুমি ভাই হৈমদি, বাড়ীতে বলে এস ওবেলা—জিগগেস করে দেখ—

হৈম বলিল—এতে আমার ওপর যেন রাগ কোরো না নিধুদা, হয়তো ভাববে—

—আমি কিছু ভাবব না হৈম—মধু শহরে থাকে, ও পাড়াগাঁয়ের অনেক খবরই রাখে না—ওকে বরং বল—

মধু বলিল—চা হয়ে গিয়েচে—বসো হৈমদি—নিয়ে আসি—

মধুর কথা শেষ হইতেই মধুর বিধবা খুড়ীমা ট্রে-র উপর চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এই নে চা, ওদের দে—মধু—

—তিন পেয়ালা কেন কাকীমা, নিধুদা তো চা খায় না—

—নিধু তুমি চা খাও না? আমি তা জানিনে বাবা—গরম দুধ খাবে? এখনি দুধ দিয়ে গেল—

—না কাকীমা—দুধ চুমুক দিয়ে খাব, ছেলেমানুষ নাকি? আমার দরকার নেই—ব্যস্ত হবেন না মিছিমিছি—

নৃপেন আসিয়া বলিল—বাবা একবার নিধুদাকে বাইরে ডাকচেন দিদি—

বাইরের বৈঠকখানায় লালবিহারীবাবু ও ভুবন গাঙ্গুলি বসিয়া। লালবিহারীবাবু প্রকাণ্ড গড়গড়াতে তামাক টানিয়া বৈঠকখানা প্রায় অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সনাতনপন্থী লোক—বাড়ীতে ন-হাত কাপড় পরিয়া থাকেন—গায়ে সব সময় জামা বা ফতুয়া থাকেও না। কোনো প্রকার বড়লোকী চালচলন বা সাহেবিয়ানা এ গ্রামের লোক দেখে নাই তাঁহার। সাধারণ লোকের সঙ্গে গ্রামের পাঁচজনের মতোই মেশেন।

নিধু বলিল—আমায় ডাকচেন কাকাবাবু?

—হাাঁ হে, সুনীল কি সামনের শনিবারে আসবে না?

—আজ্ঞে না—চিঠি লিখেচেন তো সেই বলেই বোধহয়—পরের শনিবারে আসবার চেষ্টা করবেন—

—তুমি কি কাল যাচ্ছ?

—আজ্ঞে হাাঁ—

—তাহলে একবার বিশেষ করে অনুরোধ কোরো ওকে এখানে আসবার জন্যে—

—নিশ্চয়ই বলব—

—তুমি সুনীলের সঙ্গে মেশো তো?

—আজ্ঞে মিশি—তবে আমরা হলাম জুনিয়ার মোক্তার—আর তিনি হলেন আমাদের হাকিম—বুঝতেই তো পারেন—

—একখানা চিঠি দেব নিয়ে গিয়ে ওর হাতে দিও—

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই দেব—

নিধু পুনরায় বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া দেখিল হৈম ওরফে হেমপ্রভা দালানে বসিয়া নাই। মঞ্জু একা বসিয়া অনেকগুলো শিশিবোতল জড়ো করিয়া কি করিতেছে। মুখ তুলিয়া বলিল—আসুন নিধুদা, হৈমদি ওপরে গিয়েচে কাকীমার সঙ্গে কথা বলতে—বসুন—

—ওসব কি?

—মা'র কাণ্ড। আসবার সময় আচার এনেছিলেন, জ্যাম, জেলি—বর্ষায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েচে—দু-একটা যা ভালো আছে দেখে-দেখে তুলচি—বাকি ফেলে দিতে হবে—খাবেন নিধুদা? এই একরকম জিনিস আছে—মাদ্রাজি জিনিস—একে বলে ম্যাংগো পার্ল—চিনির মতো দেখতে। একটু খেয়ে দেখুন, ন্যাংড়া আমের গন্ধ—আম খাচ্চি মনে হবে—

নিধু একটু চিনির মতো গুঁড়া হাতে লইয়া মুখে ফেলিয়া বলিল—বাঃ, সত্যিই তো আমের গন্ধ! আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, এসব কোথায় পাব বল।

মঞ্জুর বড়-বড় চোখে যেন বেদনার ছায়া পড়িল—সে নিধুর দিকে চাহিয়া বলিল—ওসব বলতে আছে—ছিঃ—কষ্ট হয় না?

মঞ্জুর সুর হঠাৎ এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় মাখানো, এমন স্নেহপূর্ণ মনে হইল নিধুর—যে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যে কথা—তাহার জন্ত সে সারাদিন অনুতাপ করিয়াছিল মনে-মনে। দোষও নাই—নিধু তরুণ যুবক, এই তাহার জীবনে অনাত্মীয়া প্রথম নারী, যে তাহাকে স্নেহের ও প্রীতির চোখে দেখিয়াছে। জীবনের এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা তাহার। নিধু বলিয়া ফেলিল—আর আমার কষ্ট হয় না মঞ্জু? তোমার জন্তে আমার মন কাঁদে না বুঝি?

মঞ্জু পাথরের মূর্ত্তির মতো অবাক ও নিশ্চেষ্ট ভাবে নিধুর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। নিধু আবার বলিল—আমি এখন দু-শনিবার আসব না—

—কেন নিধুদা ?

—সামনের শনিবারে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন—তার পরের শনিবারে তোমাদের এখানে সুনীলবাবু আসবেন—এই মাত্র কাকাবাবু ডেকে বললেন—

—কি বললেন ?

—সেই শনিবারে আসবার জন্যে বললেন—আমি আর কক্ষনো আসব না মঞ্জু! আমার বুঝি মন বলে জিনিস নেই, না? আমি আসতে পারব না—তুমি কিছু মনে কোরো না।

মঞ্জু অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিধুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার পদ্মের পাপড়ির মতো ডাগর চোখ দুটি বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। নিধুর কথার সে কোনো জবাব দিল না—হঠাৎ যেন সব কাজে সে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিল—জ্যাম জেলির শিশি-বোতল অগোছালো ভাবে ইতস্তত পড়িয়াই রহিল—তাহার মধ্যে অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকার মতো মঞ্জু বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছে—ছবিটা চিরকাল নিধুর মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

নিধু বলিল—ওঠ মঞ্জু, আমার ভুল হয়ে গিয়েচে—আর কিছু বলব না।

মঞ্জু জলভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আসবেন তো ওবেলা—এখানে কিন্তু খাবেন।

—খাওয়ানোর লোভে তোমার নিধুদা ভুলবে ভেবেচ তুমি? অমন লোক পাও নি—

—আমি কি তাই ভাবচি? গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধান আপনি—

—আমি এখন আসি; ওবেলা আবার আসব—

—না বসুন, এখুনি গিয়ে কি করবেন? আপনাদের বন্ধ হবে কবে?

—এখনো চোদ্দ-দিন বাকি, মহালয়ার দিন থেকে বন্ধ হবে শুনচি—

—কোর্ট বন্ধ হলে এখানে চলে আসবেন তো?

—ঐ যে বললাম, নয় তো আর যাব কোথায়! বড়লোক নই যে দিল্লি-দিল্লি-মক্কা যাব। এই বাঁশবনেই কাটল চিরকাল, এই বাঁশবনেই আসতে হবে।

—এক কালে বড়লোক হবেন তো, তখন কোথায় যাবেন?

—আমি হব বড়লোক! তবেই হয়েচে! তুমি হাসালে দেখচি মঞ্জু!

মঞ্জু গম্ভীর ভাবে বলিল—কে বলেচে আপনি বড়লোক হবেন না? আমি বলচি দেখবেন আপনি খু—উ—ব বড়লোক হবেন।

—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মঞ্জু—

—তা যদি হয়, আজকের দিনের কথা আপনার মনে থাকবে? দাঁড়ান আজ কি তারিখ, ক্যালেণ্ডারটা দেখে আসি ওঘর থেকে—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্জু লঘুগতি হরিণীর মতো ত্রস্তভঙ্গিতে ছুটিয়া গেল পাশের ঘরে—এবং তখনি হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আপনার ডায়েরী আছে? লিখে রাখবেন গিয়ে সতেরোই সেপ্টেম্বর—আমি বলেছিলুম আপনি বড়লোক হবেন—আমি, মঞ্জরী দেবী—

নিধু হাসিতে-হাসিতে বলিল—বয়েস ষোলো, সাকিন কুড়ুলগাছি মহকুমা রামনগর—থানা—ওই—পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী—

মঞ্জু খিল-খিল করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল—থাক, থাক—ওকি কাণ্ড! বাবাকে আপনি এতও জানেন! আমি ভাবি নিধুদা বড় ভালোমানুষ, নিধুদা আমাদের মোটে কথা বলতে জানে না। নিধুদা দেখচি কথার ঝুড়ি।—

—কথার ঝুড়ি না হলে কি মোক্তার হয় মঞ্জু? তবে আর ব্যবসাতে উন্নতি করব কি করে বড়লোকই বা হব কি করে বল!

—আচ্ছা, যদি বড়লোক হন, আমার কথা মনে থাকবে?

হঠাৎ তাহার মুখ হইতে তরল কৌতুকের হাসি অপসৃত হইল—চোখের কোণে বেদনার ছায়াপাতে মুখখানি অপরূপ ব্যথাভরা লাবণ্যে ও শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল—এক মুহূর্তে যেন মনে হইল এ মঞ্জু ষোড়শী বালিকা নয়, বহুযুগের প্রৌঢ়া জ্ঞানময়ী, বহু অভিজ্ঞতা ও বহু-ক্ষয়-ক্ষতি-ধারা লব্ধশক্তি পুরাতন নারী—বালিকা হইয়া আজ আসিয়াছে যে, সে ইহার নিতান্তই লীলা—আরও কতবার এইভাবে আসিয়াছে।

নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। মঞ্জুকে সে আর খোঁচা দিয়া কথা বলিবে না, বালিকার মনে কেন সে মিছামিছি কষ্ট দিতে গিয়াছিল? মঞ্জু চপলা বটে, কিন্তু সে গভীর, সে ধীর বুদ্ধিমতী, অতলস্পর্শ তাহার মনের রহস্য। এতদিন সে মঞ্জুকে ঠিক চিনতে পারে নাই। নিধু কোনো কথা বলিতে পারিল না, কথার সে উত্তর দিতে পারিল না। জীবনে এমন সময় আসে, এমন মুহূর্তের সন্ধান মেলে—যখন কথা মুখ দিয়া বাহির হইলেই মনে হয় এই অপরূপ মুহূর্তটির জাদু কাটিয়া যাইবে, ইহার পবিত্রতায় ব্যাঘাত ঘটিবে। তাহার বুকের মধ্যে কিসের যেন ঢেউ উপরের দিকে ধাক্কা দিতেছিল—সেটাকে আর একটু প্রশ্রয় দিলেই সেটা কান্নারূপে চোখ দিয়া গড়াইয়া সব ভাসাইয়া ছুটিবে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ—নিস্তব্ধতা যে একটা মনোরম মায়া সৃষ্টি করিয়াছে এই ঘরের মধ্যে—তা যত কম সময়ের জন্যেই হোক না কেন, কেহ চাহে না যে আগে কথা বলিবার রূঢ় আঘাতে তাহা ভাঙিয়া দেয়।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকিলেন নিধুর মা।

—হ্যাঁরে, ও নিধু—এখানে বসে? মঞ্জু মা কি করচ শিশি-বোতল নিয়ে? ওগুলো কি মা?

—আসুন, আসুন, জ্যাঠাইমা—সকালে যে!

—তোমাদের পুজোর পাটাপাতা দেখতে এলাম—তা এত সকালে পাটা পাতলে যে

তোমরা। এখনো তো পুজোর সতেরো দিন বাকি—

—তা তো জানিনে জ্যাঠাইমা, পুরুতমশাই কাল নাকি কাকাকে বলে গিয়েছেন—

—দিদি কোথায় দেখছিনে যে ?

—মা ? ওপরের ঘরে পুজো করছেন বোধ হয়—ডাকব ?

—না, না, মা পুজো করছেন, ডাকতে হবে কেন—থাক। আমি এমনি দেখতে এলাম—

—জ্যাঠাইমা, একটু চা খাবেন না ?

—না মা, আমি এখনো নাই নি-ধুই নি—বেলা হয়ে গেল। এইবার নাইতে যাব গিয়ে। নিধু থাকবি নাকি না আসবি ?

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা, নিধুদা যেন আপনার ছোট্ট খোকাটি, ওকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা থাকতে পারেন না, বাইরে কোথাও দেখলে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে !

নিধু সলজ্জমুখে বলিল—তুমি যাও না মা, আমি যাব এখন। নিধুর মা কিন্তু তখনি চলিয়া গেলেন না, তিনি আরও আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—ওগুলো কিসের শিশি-বোতল মা ? খালি আছে ?

—এগুলো জ্যাম-জেলি—ইয়ে—আচারের-মোরোব্বার শিশি—জ্যাঠাইমা, বর্ষায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই বেছে রাখছিলাম—

—আমি ভাবলাম বুঝি খালি আছে।

—কি হবে খালি শিশি ? দরকার জ্যাঠাইমা ?

—এই জিনিসটা পত্তরটা রাখতে—এসব জায়গায় তো পাওয়া যায় না—বেশ শিশিগুলো—

নিধু সংকোচে এতটুকু হইয়া গেল। সে বুঝিল রঙচঙ্‌ওয়ালা শিশিগুলি দেখিয়া মা'র লোভ হইয়াছে—মেয়েমানুষের কাণ্ড! তা দরকার থাকে, এখানে চাহিবার দরকার কি ? মাকে লইয়া আর পারা যায় না! ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে এদের !

মঞ্জু শশব্যস্ত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা—শিশির দরকার ? আমি ভালো শিশি এনে দিচ্ছি। বিলিতি জেলির খালি বোতল আছে মা'র ঘরে দোতলায়। আমি আসচি এখুনি—বসুন জ্যাঠাইমা।

মঞ্জু ঘর হইতে অল্পক্ষণে বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দুটি সুদৃশ্য লেবেলমারা খালি বোতল আনিয়া নিধুর মা'র হাতে দিয়া বলিল—এতে হবে জ্যাঠাইমা ?

নিধুর মা বোতল দুটি হাতে পাইয়া যেন স্বর্গ পাইলেন এমন ভাব দেখাইয়া বলিলেন—খুব হবে মা, খুব হবে। আশীর্বাদ করি বেঁচে-বর্তে থাক—রাজরানী হও মা—আমি আসি তাহলে এবেলা—

নিধুও মায়ের পিছু-পিছু বাড়ী আসিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া মাকে বলিল—আচ্ছা, মা, তোমার কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই ? কি বলে দুটো

খালি বোতল ভিক্ষে করতে গেলে ও-বাড়ী থেকে ? তোমার এই হাভাতুড়ে স্বভাবের জন্তে আমার মাথা হেঁট হয় তোমার সে জ্ঞান আছে ? ছিঃ-ছিঃ—এতটুকু কি কাণ্ডজ্ঞান ভগবান দেন নি ?

নিধুর মা বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—ওমা, তা তুই আবার বকিস কেন ? কি করেচি আমি !

—তোমার মুণ্ডু করেচ, নেও—এখন শিশিবোতল সাজিয়ে রেখে ঘরে ধুনো দেও। ওতে তোমার কি মালমশলা, অপরূপ সম্পত্তি থাকবে শুনি ?

—তুই তার কিছু বুঝবি ? লবঙ্গ, ধনের চাল, হল গিয়ে গোটার গুঁড়ো কত কি রাখা যায় ! কেমন চমৎকার বোতল ছুটো ! এখানে কোথায় পাবি ওরকম ?

নিধু আর কিছু বলিল না। মাকে বুঝাইয়া পারা যাইবে না—নিতান্ত সরলা, নিধুর লজ্জা যে কোথায়—তাহা তিনি বুঝিবেন না।

জগোঠাকরুণ পুকুরঘাটে নিধুর মাকে বলিলেন—বলি বড় বাড়ীর পুজোর কতদূর, ও নিধুর মা ?

—পিরতিমে গড়ানো হচ্ছে—আজ পাটা পাতা হল ওবেলা—

—পাটা এখন আবার কে পাতে ? বিধেন দিলে কে গা ?

—কি জানি—তবে মঞ্জু বলছিল ওদের ভটচাজ্জি দিয়েচেন। আমিও ওকথা বলেছিলাম ওবেলা।

—হ্যাগা নিধুর মা, একটা কথা শুনলাম, কি সত্যি ? নাকি মেয়ে-পুরুষে মিলে থিয়েটার করবে ? ওদের বাড়ীর মেয়েরা আর ওই ভুবন গাঙ্গুলির মেয়ে হৈম, তোমাদের নিধু—আরও নাকি কে-কে ?

—তা তো দিদি বলতে পারলাম না—আমি কিছু শুনি নি—

বাস্তবিকই নিধুর মা একথার কিছুই জানিতেন না।

জগোঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন—আর কি সেদিন আছে গাঁয়ের ! ছোটঠাকুরের প্রতাপে এক সময়ে এ গাঁয়ে যা খুশি করে পার পাবার উপায় ছিল না—তা সবাই গেল মরে হেজে—এখন টাকা যার, সমাজ তার। নইলে এ সব খিরিস্টানি কাণ্ড কি হতে পারত কখনে এখানে ? আমি ভুবনকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিইচি ওবেলা। বললাম—মেয়েকে যে থিয়েটার করতে দিচ্চ ওরা না হয় জজ মেজেস্টার লোক, টাকার জোরে তরে যাবে—তোমার মেয়ের কুচ্ছো রটলে যদি শ্বশুরবাড়ী থেকে না নেয় ?

—ভুবন ঠাকুরপোকে বললেন ?

—কেন বলব না শুনি ? জগোঠাকরুণ—কারো এক চালে বাসও করে না, কাউকে কুকুরের মতো খোসামোদও করে বেড়ায় না—কারো কাছে কোনো পিত্যেশ রাখি নে কোনোদিন—

শেষের কথাটা নিধুর মাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলা—কিন্তু নিধুর মা তাহা বুঝিতে

পারিলেন না—খুব সূক্ষ্ম উক্তি বা একটু বাঁকা ধরনের কথাবার্তা হইলে নিধুর মা তাহা আর বুঝিতে পারেন না।

কথাটা তিনি নিধুকে আসিয়া বলিলেন। নিধু বৈকালের দিকে মঞ্জুদের বাড়ী গেল মঞ্জুর বাবাকে দেখিতে—কারণ তাঁহার রক্তের চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়ায় দুপুরের পর হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—সেখানে গিয়া দেখিল মঞ্জু বাবার ঘরের বাহিরে দোতলার বারান্দাতে বসিয়া সেলাই করিতেছে। নিধুকে দেখিয়া বলিল—আস্তে-আস্তে নিধুদা, বাবা এবার একটু ঘুমিয়েচেন। চলুন আমরা নিচে যাই বরং—

—একবার ওঁকে দেখে যাব না?

—এখন থাক। ঘুম যদি সন্ধের আগে ভাঙে, তবে দেখতে আসবেন এখন। সিঁড়িতে নামিবার সময় নিধু মায়ের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সব বলিল। মঞ্জু শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না, বলিল—হৈমদি নিজেই একথা তো ওবেলা বলে গেল। আমরা যদি পুরুষ না নিই—তবুও তাঁরা বাড়ীতে করতে দেবেন না?

—তাও বলতে পারি নে—আপত্তি যদি করে তাতেও করতে পারে—

বলিতে-বলিতে হৈমের গলা শোনা গেল, বাহির হইতে ডাকিতেছে—ও মঞ্জু ও নৃপেন—

মঞ্জু ছুটিয়া আগাইয়া লইয়া আসিতে গেল। এবেলাও হৈম খুব সাজগোজ করিয়া মুখে ঘন করিয়া পাউডার মাখিয়া, চুলে ফ্যান্সি খোপা বাঁধিয়া ও ফুল গুঁজিয়া আসিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই সে বলিল—নিধুদা আসে নি?

—এসে বসে আছেন। এস দালানে হৈমদি—

—আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রিহার্স্যাল দিতে হবে কিন্তু—

—শোনেন নি হৈমদি, বাবার বড় অসুখ যে—

হৈম বিস্ময়ের সুরে বলিল—জ্যাঠামশায়ের অসুখ? কি অসুখ?

—ব্লাড প্রেসার বেড়েচে—ওই নিয়েই তো ভুগচেন। তাই আজ আর রিহার্স্যাল হবে না।

—না, তা আর কি করে হবে! এখন কেমন আছেন উনি?

—এখন একটু ভালো। এসব কলকাতার রোগ হৈমদি, পাড়াগাঁয়ে এসব নেই বলে মনে হয় আবার।

হৈম একটু পরেই বলিল—তাহলে আজ যাই মঞ্জু—আসি—

হঠাৎ মঞ্জুর মনে পড়িয়া গেল কথাটা। বলিল—হৈমদি, তোমার বাবা কিছু বলেচেন নাকি তোমায় এ বিষয়ে?

—কি বিষয়ে?

—এই থিয়েটার কথা নিয়ে।

—তা তিনি বলতে পারেন না। আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে আপত্তি না করলেই হল। আমি ওসব মানিনে—

—সে কথা নয় হৈমদি—গাঁয়ের কে এক বুড়ি (নিধু নাম বলিয়া দিল)—হ্যাঁ সেই

জগোঠাকরুণ আপনার বাবাকে কি সব বলেছেন। পুরুষের সঙ্গে মিশে থিয়েটার করলে বা এমনিই থিয়েটার করলে তোমার মেয়ের বদনাম রটবে।

হৈম তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ওঃ, এই কথা! ও আমি গ্রাহ্যি করি নে। আমি যা খুশি করব—তাতে বাবা পর্য্যন্ত কি বললে শুনচি নে তো জগোঠাকরুণ! আচ্ছা এখন তাহলে আসি—

—না রে, চা খেয়ে যান হৈমদি—

—না ভাই, আর একদিন এসে খাব। নিধুদা আমায় একটু এগিয়ে দাও না? নিধু মঞ্জুকে বলিল—বস মঞ্জু, আমি ওই তেঁতুল-তলার মোড় পর্য্যন্ত হৈমকে এগিয়ে দিয়ে আসচি—

পথে পড়িয়া হৈম বলিল—তুমি থিয়েটার করবে তো নিধুদা?

—আমার আর কথা হয় হৈম? গাঁয়ের মধ্যে যদি কথা ওঠে এ নিয়ে—

—ওঃ, ভারি কথা। তুমি না করলে আমিও করব না নিধুদা, তুমি আছ তাই করচি।

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া হৈমর মুখের দিকে চাহিল। হৈম বলে কি!

হৈম পুনরায় বলিল—আমার কথা মনে হয় নিধুদা? বল না নিধুদা—

নিধু একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। হৈমর এ সব কথায় সে কি উত্তর দিবে?

হৈম একটু গায়ে-পড়া ধরনের মেয়ে তাহা সে পূর্ব্বেই জানিত। ভাবিয়াছিল, আজকাল বিবাহ হইয়া ও বয়স হইয়া বোধ হয় সারিয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে তা নয়।

পরে মুখে বলিল—হ্যাঁ—তা মনে হত না কি আর? গাঁয়ের মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসচি—

—আজ সন্দেবেলা আমাদের বাড়ী এস না কেন নিধুদা—ওখানে চা খাবে—বেশ গল্প করা যাবে এখন—

—আমি চা তো খাইনে হৈম—তা ছাড়া সন্দেবেলা মঞ্জুদের বাড়ী থিয়েটার সম্বন্ধে হেস্ত-নেস্ত একটা করে ফেলতে হবে, যাই কি করে?

—কাল আসবে? না—ও, কাল তো তুমি চলেই যাবে। কাল দিনটা নাই বা গেলে নিধুদা?

কি বিপদ! ইহার এত জোর আসিল কোথা হইতে? নিধু বলিল—না গেলে চলে হৈম? কত দরকারি কেস সব হাতে রয়েচে। যেতেই হবে।

হৈম অভিমানের সুরে বলিল—আমার কথা রাখবে কেন? মঞ্জুর কথা হত তো রাখতে—

আচ্ছা, সামনের শনিবার এসে তোমাদের ওখানে যাব, হৈম।

হৈম হাসিয়া নিধুর দিকে চাহিয়া বলিল—ঠিক যাবে তো? তাহলে কথা রইল কিন্তু। এ গাঁয়ে এসে আমার মন মোটে টেকে না নিধুদা—মোটে মিশবার মানুষ নেই—আমি চিরকাল গোয়াড়ী স্কুলে থেকে পড়েচি—জানো তো? আমি গাঁয়ে এলে যেন হাঁপিয়ে উঠি—একটু আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই—এমন একটা লোক নেই, যার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে সুখ হয়। তবুও মঞ্জুরা এসেছিল, ওরা শহরের মেয়ে, আমোদ করতে জানে। ও-ই বলচে থিয়েটার

করবে—আমার ওতে ভারি উৎসাহ। সময়টা তো বেশ কাটবে? তাই আমি—তুমি থাক—আমার বেশ ভালো লাগে—হৈম নিধুর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—সত্যি কিন্তু আসবে সামনের শনিবারে নিধুদা, আমার মাথার দিব্যি—সেদিন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে চা খাবে—

—চা আমি খাই নে হৈম—

—চা না খাও, খাবার খেও। আর আমরা গল্প করব, ঠিক রইল কিন্তু—

—থিয়েটার তাহলে তুমি করবে। কিন্তু জগোঠাকরুণ কি বলেচে আজ মা'র কাছে শুনেচ তো?

—বলুক গে। আমি ওসব মানি নে। আমার শ্বশুরবাড়ী তেমন নয়—কেউ কিছু বলবে না।

—সে তুমি বোঝ, আমার সামনে কথাটা উঠেচে যখন তোমাদের কাছে বলা আমার উচিত। মঞ্জুদের কেউ কোনো দোষ ধরবে না, কেন না ওরা হল বড়লোক—ওরা এখানে থাকবেও না। ওদের কে কি করবে?

—আমারও কেউ কিছু করতে পারবে না। জীবনে ফু[illegible] [illegible]মোদ করব না, আহ্লাদ করব না—মুখ বুজিয়ে বসে থাকব এই অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, সে আমার দ্বারা হবে না।

—আচ্ছা, তুমি এস হৈম—

—কোথায় যাবে এখন? মঞ্জুদের বাড়ী?

—না বেলা হয়েচে—এখন বাড়ী যাব।

—ওবেলা যাবে ওখানে—তাহলে আমিও আসি।

নিধু মনে-মনে বিরক্ত হইলেও বলিল—তার এখন কিছু ঠিক নেই—আসতেও পারি। এখন বলতে পারি নে—

বৈকালের দিকে নিধু ভাবিল সে মঞ্জুদের বাড়ী যাইবে কিনা। মন সেখানে যাইবার জন্যই উন্মুখ হইয়া আছে যেন। অথচ বেশ বোঝা যাইতেছে সেখানে আর তাহার যাওয়া উচিত নয়। বেলা পড়িয়া আসিল—তবুও নিধু ইতস্তত করিতে লাগিল—এবং তারপরই সে হঠাৎ কিসের টানে সব কিছু দ্বিধা ভুলিয়া কখন উহাদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

মঞ্জুদের বৈঠকখানার কাছে গিয়া মনে হইল—আজ মঞ্জু তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই তো! অথচ রোজই ডাকিয়া পাঠায়। মনের মধ্যে কোথা হইতে অভিমান আসিয়া জুটিল। নিধু আর মঞ্জুদের বাড়ী না ঢুকিয়া গ্রামের বাহির রাস্তার দিকে বেড়াইতে গেল।

পূজার আর বেশি দেরি নাই। আকাশে বাতাসে যেন আসন্ন শারদীয়া পূজার আভাস, আকাশ মেঘমুক্ত, সুনীল—পাকা রাস্তার ধারে ঝোপে-ঝোপে মটরলতায় থোকা-থোকা ফুল ধরিয়াছে—আউশ ধান কাটা হইয়া গিয়াছে—আমন ধানের নারাণ খেত ভিন্ন মাঠ প্রায় শূন্য। পনেরোদিন বৃষ্টি হয় নাই—শুধুই গরম, কোনোদিকে একটু হাওয়া নাই।

একটা সাঁকোর উপর বসিয়া নিধু ভাবিতে লাগিল—মঞ্জু আজ তাহাকে কেন ডাকিল না?

ওবেলা তাহার কথাবার্তায় হয়তো মনে দুঃখ পাইয়াছে। শিশিবোতলের মাঝখানে উপবিষ্ট মঞ্জুর ভগ্নসাহায্য করুণ মুখের ছবি মনে আসিল। মঞ্জুকে সে কোনো দুঃখ দিবে না। এ ব্যাপার লইয়া আর কোনো কথা সে মঞ্জুকে বলিবে না।

কিন্তু রবিবার তো ফুরাইয়া আসিল। সন্ধ্যার দেরি নাই। আর কতক্ষণ? সত্যিই কি সে মঞ্জুদের বাড়ী দেখা করিতে যাইবে না? তাহা হয় না। এখন গেলে তবুও রাত্রে নটা পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে। নয় তো আবার সাতদিন অদর্শন। থাকা অসম্ভব তাহার পক্ষে।

নিজের বাড়ীর সামনে আসিয়া নিধু ইতস্তত করিতেছে—এমন সময় সে দেখিল মঞ্জু এবং তাহার পিসতুতো বৌদিদি ওদিকের পথ দিয়া আসিতেছে। নিধুকে দূর হইতে দেখিয়া মঞ্জু বলিল—ও নিধুদা, দাঁড়ান—

নিধু বলিল—তোমরা কোথাও গিয়েছিলে নাকি, মঞ্জু?

—আমি আর বৌদি হৈমদির বাড়ী, আর ওদের পাশে পরেশকাকাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম যে। সেই কখন বেলা দুটোর সময় গিয়েচি—আসব-আসব করচি—কিন্তু হৈমদি'র মা চা খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না—তাই একেবারে সন্দে হয়ে গেল।

—তা তো জানি নে—ও!

—আপনি গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ী?

—আমি একটু বেড়িয়ে ফিরচি—তোমাদের ওখানে যাওয়া হয় নি—

—আমিও ভাবচি নিধুদা এসে কি বসে আছে? আরও তাড়াতাড়ি করচি। জিগ্যেস করুন বৌদিকে—না বৌদি?

মঞ্জুর বৌদিদি বলিলেন—হ্যাঁ, ও তো অনেকক্ষণ থেকে আসবার ঝোঁক করচে—তা একজনের বাড়ী গেলে কি শুক্‌নি আসা ঘটে? বিশেষ কখনো যখন যাই নে—

মঞ্জু বলিল—আসুন নিধুদা, চলুন আমাদের বাড়ী—

নিধুর অভিমান অনেক আগেই কাটিয়া গিয়াছিল। মঞ্জু যে আজ তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, তাহার সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান।

বাড়ীতে পৌছিয়া মঞ্জু বলিল—কি খাবেন বলুন নিধুদা—

মঞ্জুকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছে। নিজের বাড়ীতে বসিয়া থাকে বলিয়া মঞ্জু কখনো সাজগোজ করে না—আজ পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া সে চওড়া শাদা জরির পাড় বসানো চাঁপা রঙের ভালো সিল্কের শাড়ী ও ফিকে গোলাপী রঙের ব্লাউজ পরিয়াছে—কপালে টিপ, চমৎকার ঢিলে খোঁপা বাঁধিয়াছে—পায়ে মাদ্রাজি স্যাণ্ডেল—খুব মৃদু এসেন্সের সৌরভ তাহার চারিপাশের বাতাসে। মুখশ্রীতে প্রগলভতা নাই, অথচ বুদ্ধি ও আনন্দের দীপ্ত সজীব ভঙ্গি তাহার মুখে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে, কথা বলিবার ধরনে।

নিধু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—তা—যা খাওয়াবে—

—আপনার জন্যে কি খাবার করে রেখেছিলাম জানেন? বলুন তো?

নিধু বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, আপনার জন্যেই। নিমকি ভেজেছিলুম নিজে বসে, দুপুরের পর একঘণ্টা ধরে। বৌদি বেলে দিলে আমি ভাজলাম—গরম গরম দেব বলে আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি নৃপেনকে—এমন সময় হৈমদির মা, হৈমদি সবাই এলেন ওঁদের বাড়ী নিয়ে যেতে—

—ও, ওঁরা এসেছিলেন বুঝি?

—তবে আর বলচি কি? এসে কিছুতেই ছাড়লেন না—যেতে হবে। মা বললেন—তবে তুই যা, আমি নিধুকে ডেকে খাওয়াব এখন। আমি বললাম—তা হবে না মা। আমি ফিরে এসে ডেকে পাঠাব।

—এত কথা কিছুই জানি নে আমি।

—কি করে জানবেন? একবার ভাবলাম আপনাদের বাড়ী হয়ে যাই—কিন্তু ওঁরা সব ছিলেন—হৈমদি কিন্তু বলেছিল—

—কি বলেছিল হৈম?

—হৈমদি বললে নিধুদাকে ডেকে নিয়ে গেলে হত। ওর মা বারণ করলেন।

—হৈমর মা বারণ করে ঠিকই করেচেন। হৈম শহরে-বাজারে কাটিয়েচে, পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার ও কিছু বোঝে না। মেয়েরা যাচ্ছে বেড়াতে, তার মধ্যে একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে যাওয়া—লোকে কি বলবে?

মঞ্জুর উপর অভিমানের বিন্দুমাত্রও এখন আর নিধুর মনে নাই বরং মঞ্জুর স্নেহে ও প্রীতিতে অযথা সন্দেহ করার দরুন নিধু মনে-মনে যথেষ্ট লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। মঞ্জু বলিল—বসুন, নিমকি নিয়ে আসি গরম করে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেতে পারবেন না।

—শোনো-শোনো, অত-শত করে কাজ নেই—যা আছে তাই ভালো।

মঞ্জু কিন্তু কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়াই গরম-গরম নিমকি আনিয়া দিল নিধুকে। বলিল—আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিধুদা, আপনাকে না খাওয়াতে পেরে। ভাবলাম সন্ধ্যে হয়ে গেল—আপনার সঙ্গে আর কখনই বা দেখা হবে! সকালে উঠে তো চলেই যাবেন—

নিধু হাসিয়া বলিল—সত্যি বলতে গেলে আমার রাগ হয়েছিল তোমার ওপর—

—কেন, কি অপরাধ হল?

—রোজ বিকেলে ডাকতে পাঠাও, আজ কেউ গেল না ডাকতে। আমি বড় রাস্তার দিকে বেড়াতে বার হলাম—

মঞ্জু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—ওইখানে আপনার দোষ। আমাদের পর ভাবেন কিনা তাই না ডাকলে আসেন না—

—সে জন্যে নয় মঞ্জু, তোমরা বড়লোক, যখন তখন ঢুকতে ভয় করে—

—ওই ধরনের কথা শুনলে আমার কষ্ট হয় বলেচি না?

—মঞ্জু, তুমি আমায় ক্ষমা কর। ওবেলা তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েচি চোখের জল ফেলিয়েচি। সেই থেকে আমার মন মোটেই ভালো নেই। তুমি ছিলে কোথায় আর

আমি ছিলাম কোথায়, এতদিন তোমার নামও জানতাম না। কিন্তু আলাপ হয়ে পর্যন্ত তোমাকে আর পর বলে মনে হয় না। তাই এমন কথা বলে ফেলি যা হয়তো পরকে বলা যায় না। তুমি জজবাবুর মেয়ে বলে তোমার সবাই সমীহ করে চলবে—কিন্তু আমি ভাবি ও তো মঞ্জু।

মঞ্জু চুপ করিয়া রহিল।

সে কিছুক্ষণ যেন আপন মনে কি ভাবিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—কিছু মনে করি নি নিধুদা, আপনিও কিছু মনে করবেন না। ও কথা আর তুলবেন না।

তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ বেদনাক্লিষ্ট। অল্পক্ষণ পূর্বের সে হালকা সুর আর তাহার কথার মধ্যে নাই।

নিধু অন্য কথা পাড়িবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে কি প্লে করা ঠিক করলে এবার?

মঞ্জু যেন নিধুর প্রশ্ন শুনিতে পাইল না—সে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার পর হঠাৎ নিধুর মুখের দিকে ব্যথাম্লান ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—নিধুদা, আমার কথা বিশ্বাস করবেন?

—কি, বল?

—আপনার জন্যে আমার মন কেমন করে, আপনি এখান থেকে চলে গেলেই—

নিধু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মঞ্জু বাধা দিয়া বলিল—আরও জানেন, ছ-শনিবার আপনি আসেন নি, ভেবেছিলুম আপনাকে চিঠি লিখে দিই আসবার জন্যে—কিন্তু বাড়ীর কেউ সেটা পছন্দ করত না বলে কিছু করি নি—

—আমার সৌভাগ্য মঞ্জু—কিন্তু সেই জন্যেই মনে হয় আর তোমার সঙ্গে মেশা উচিত নয় আমার—

—কিছু ভাববেন না, নিধুদা। আমি ছেলেমানুষ নই—কষ্ট করতে পারব জীবনে। ও জিনিস কষ্টের জন্যেই হয়। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন সহ্য করতে পারি—

নিধুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তেঁতুলগাছে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাদুড়দল ডানা ঝটাপট করিতেছিল। সম্মুখে আঁধার রাত।

বাড়ী হইতে ফিরিতে নিধুর দেরি হইয়াছিল। বাসায় তালা খুলিতেছে, এমন সময় বিনোদ মুহুরী আসিয়া বলিল—বাবু, এত দেরি করে ফেললেন? প্রায় দশটা বাজে—কেস আছে।

—মক্কেল কোথায়?

—কোর্টের অশথতলায় বসিয়ে রেখেছি—তা আপনি এত বেলা করে ফেললেন।

—চল যাই। এজাহার করিয়ে দিতে হবে?

—হ্যাঁ, বাবু। আমি তাহলে যাই—বেহাত্তি হয়ে যাবে। হরিহর নন্দীর দালাল ঘুরচে। আমি ছুটে দেখতে এলাম আপনি এলেন কিনা বাড়ী থেকে—

—টাকা দেবে ?

—দু-টাকা দেবে কথা হয়েচে—

—তবে তো ভারি মক্কেল ধরেচ দেখচি—হরিহর নন্দী দু-টাকায় এজাহার করবে ?

—বাবু, এক টাকাতেও করবে। আপনি জানেন না—সাধনবাবু আট আনায় করবে। ওই নিরঞ্জন-মোক্তার আট আনায় করবে—আপনার একটু নাম বেরিয়ে গিয়েচে—তাই। আমি যাই বাবু, সামলাই গিয়ে আগে—

পথে নিরঞ্জন-মোক্তারের সঙ্গে দেখা। নিধু বলিল—শুনেচ হে, মক্কেল একে নেই—তার ওপর দালালে বোধ হয় ভাঙিয়ে নেয়—তাই ছুটচি—

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—ছুটো না হে, বিনোদ যতটা বলেচে অতটা নয়। কেউ কারো মক্কেল ভাঙয়ে না ওভাবে।

—কি করে জানব—বিনোদ বললে তাই শুনলাম—

—হরিহরবাবু দালাল লাগিয়ে তোমার-আমার দু-টাকার মক্কেল ভাঙিয়ে নেবেন—সে লোক তিনি নন। ছুটো না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—আস্তে আস্তে চল।

না ভাই, বিশ্বাস নেই কিছু। মক্কেল বেহাত্তি হয়ে গেলে তখন কেউ দেখবে না—আমি এগুই—

না, মক্কেল ঠিক হাতেই আছে, বিনোদ দাঁত বাহির করিয়া আসিয়া জানাইল। নিরঞ্জন অল্পক্ষণ পরে কোর্টের প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া বলিল—কি হে হাঁপাচ্ছ যে। মক্কেল পেলে ?

—হ্যা ভাই—

—ওসব মুহুরীদের চালাকি। কোথায় যাবে মক্কেল ? মুহুরীরা কাজ দেখাচ্চে তোমার কাছে। নিজের বাহাদুরী করবার সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ?

সাধন-মোক্তার দূর হইতে নিধুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ও নিধিরাম, বাড়ী থেকে এলে কখন ? ভালো সব ? শোনো—

—কি বলুন সাধনবাবু—

—ওহে ইণ্টারভিউ-লিস্টে তোমার নাম উঠেচে দেখলাম যে। কে নাম দিলে হে ?

—তা তো জানিনে। তবে আমার মনে হয় সাবডেপুটিবাবু—উনিই এস. ডি. ও.-কে বলে করিয়েছেন।

—বেশ, বেশ—দেখে খুশি হলাম।

বেলা তিনটার সময় নিরঞ্জন গোপনে নিধুকে বলিল—একটা কথা আছে, বেরুবার সময় আমার সঙ্গে একা যাবে। জরুরী কথা। কাউকে সঙ্গে নিও না।

—কি এমন জরুরী কথা হে ?

—এখন বলব না। কে শুনে ফেলবে।

আরও আধঘণ্টা পরে দুজনে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে—এমন সময় বার-লাইব্রেরীর চাকর ফিরিঙ্গি আসিয়া বলিল—বাবু, ছুটি তো এসে গেল—হামার বখশিস্ ? এবার পূজোতে

নিধিরামবাবুর কাছে ধুতি-উতি নিবো। ফিরিঙ্গির বাড়ী ছাপরা জেলায়—আজ প্রায় চল্লিশ বছর রামনগরে আছে—কথাবার্তায় ও চালচলনে যতদূর বাঙালী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব তাহা সে হইয়াছে। ফিরিঙ্গির ছেলে-মেয়েরা বড়-বড় হইয়াছে, তাহাদেরও বিবাহ হইয়া ছেলে-মেয়ে হইয়া গিয়াছে ; ফিরিঙ্গির বাড়ীর ছেলে-মেয়ে ভালো বাংলা বলে।

নিধিরাম বলিল—কেন, এত বড় বড় বাবু থাকতে আমার কাছে কেন রে ?

—আপনিও একদিন বড় হবেন বাবু। বার-লাইব্রিরিতে হামি আজ তিশ বছর নোকরি করছি, কত বাবু এল, কত বাবু গেল। ওই হরিবাবু নেংটি পিন্‌হে এসেছিল—আজকাল বড় সওয়াল-জবাব করনেওয়ালা। সব দেখছু, আপনারও হোবে নিধিরামবাবু। একটা ধূতি নিব আপনার কাছ থেকে -মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে আপনার মোলাকাৎ হবে শুনছু শনিবারে—

—তুই কোথা থেকে শুনলি রে ফিরিঙ্গি ?

—সব কানে আসে, বাবু, সব শুনতে পাই—

ফিরিঙ্গি হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। আর কিছু আগাইয়া নিরঞ্জন বলিল—তোমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের ইন্টারভিউ আছে শনিবারে। তার জন্যে অনেকে তোমার ওপর বড় চটেচে হে—বিগ ফাইভদের মধ্যেও কেউ-কেউ আছেন। ওঁদের অনেকের নাম ইন্টারভিউ লিস্টে নেই—অথচ তুমি জুনিয়ার মোক্তার তোমার নাম উঠল—ভয়ানক চটেচে অনেকে—

নিধু বিস্মিত হইয়া বলিল—তাতে আমার হাত কি হে! তা আমি কি করব!

—সবাই বলে, বড্ড হাকিমের খোশামোদ করে বেড়াও নাকি। চোখ টাটিয়েচে অনেকের। হাকিমে তোমার কথা বেশি শোনে আজকাল—এই সব। বিশেষ করে এই ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে তুমি কি কারো কারো নাম দিতে বারণ করেছিলে ? এ সম্বন্ধে কোনো কথা হয়েছিল তোমার সুনীলবাবুর সঙ্গে ?

—আমি! আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন সাবডেপুটি বাবু! আমি বারণ করেছি নাম দিতে!

—অনেকের তাই ধারণা।

—কার-কার নাম দিতে বারণ করেচি ?

—এই ধর হরিহর নন্দীর নাম নেই, শিববাবুর নাম নেই—বড়দের মধ্যে। আর ছোটদের মধ্যে তো কারো নাম নেই—এক তুমি ছাড়া।

—তুমি বিশ্বাস কর আমি বারণ করেচি ?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসবে যাবে না—কিন্তু বার-লাইব্রেরীর সবাই তোমার ওপর একজোট হলে তোমার বড্ড অসুবিধা হবে। মক্কেলের কানে মন্ত্র ঝাড়বে, জামিন পাবে না—নানাদিক থেকে গোলমাল—

—যদুকাকাও কি এর মধ্যে আছেন নাকি ?

নিরঞ্জন জিভ কাটিয়া বলিল—আরে রামোঃ—নাঃ। তা ছাড়া তিনি মানী লোক,

তিনি ইণ্টারভিউ লিস্টে প্রথম দিকে আছেন—কোনো ছ্যাচড়া কাজে তিনি নেই।

—আমি এর কিছুই জানি নে ভাই। সুনীলবাবু সেদিন বললেন, আপনার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব—আমার ইচ্ছে ছিল না। উনি হাকিম মানুষ, অনুরোধ করলেন—কি করি বল। আর আমি দিয়েছি বারণ করে তাঁকে। নিজের জন্যেই বলি নি, অপরের জন্যে বারণ করতে গেলাম?

—আমায় বলে কি হবে ভাই? আমি তো চুনো-পুঁটির দলে। কথাটা কানে গেল তোমাকে বললাম। আমি বলেচি, কারো কাছে যেন বলো না হে—

সন্ধ্যার পর তাহার বাসায় হঠাৎ সাধন-মোক্তারকে আসিতে দেখিয়া নিধু একটু আশ্চর্য্য হইল। সাধন বলিলেন—এই যে বসে আছ নিধিরাম? বেড়াতে বার হওনি যে?

নিধু বুঝিল ইহা ভূমিকা মাত্র। আসল কথা এখনও বলেন নাই সাধন। অবশ্য অল্প পরেই তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাঁহার ইণ্টারভিউ করাইয়া দিতে হইবে নিধিরামের। তাঁহার নামে যেন একখানা কার্ড আসে।

নিধু অবাক হইয়া গেল। সে সাধনকে যথেষ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে এ ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। এ কি কখনো সম্ভব—সাধনবাবুর মতো প্রবীণ মোক্তার কি একথা ভাবিতে পারেন যে এস. ডি. ও. তাহার মতো একজন জুনিয়ার মোক্তারের পরামর্শ লইয়া লিস্ট তৈরি করিবেন? এসব কথা ভিত্তিহীন। তাহার কোনো হাত নাই, সে জানেও না কিছু। একথা সাধন কতদূর বিশ্বাস করিলেন তাহা বলা যায় না—বিদায় লইবার সময় বলিলেন—আর ভালো কথা, ওহে আমি আর একটা অনুরোধ তোমায় করচি, এই অঘ্রাণে এইবার শুভ কাজটা হয়ে যাক—তোমার আশাতে বাড়ীসুদ্ধ বসে আছে। বাড়ীতে এদের তো তোমাকে বড্ড পছন্দ—আমায় কেবল খোঁচাচ্চে। কোর্ট বন্ধের দিন তোমায় যেতেই হবে।

নিধু মনে-মনে ভাবিল—বোধ হয় তাহলে বড় ডাল আঁকড়াতে গিয়ে ফসকে গিয়েচে। তাই গরীবের ওপর কৃপাদৃষ্টি পড়েচে আবার। মুখে বলিল—আপনার বাড়ী যাব, সে আর বেশি কথা কি—বলব এখন পরে। তবে ইণ্টারভিউর ব্যাপারে আপনি একেবারে সত্যি জেনে রাখুন সাধনবাবু, ধর্ম্মত বলচি, এর বিন্দুবিসর্গের মধ্যে নেই আমি। বিশ্বাস করুন আমার কথা।

সাধন-মোক্তার দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

শুক্রবার রাত্রে সাবডেপুটির চাপরাশি আসিয়া নিধুকে ডাকিয়া লইয়া গেল সকাল-সকালই।

সুনীলবাবু বলিলেন—খবর সব ভালো?

—আজ্ঞে হাঁ—

—লালবিহারীবাবুদের বাড়ীর সব—চিঠি দিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—কাল শনিবার যেতে পারব না—পরের শনিবারে যাব—আপনিও থাকবেন। এবার বোধ হয়, আপনাকে বলি—

সুনীলবাবু হঠাৎ সলজ্জকণ্ঠে বলিলেন—বাবা বোধ হয় আসবেন রবিবারে। উনিও মেয়ে দেখতে যাবেন—উনি লিখেচেন—আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

নিধু আড়ষ্ট সুরে বলিল—না, এই—আজকাল কাজের চাপ ছুটির আগে, তা ছাড়া মাঝে-মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভুগি—

—একটু গরম চা করে দেবে? ও আপনি চা খান না, ইয়ে কোকো খাবেন?

—থাক গে। বরং জল এক গ্লাস—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওরে বাবুকে এক গ্লাস জল। তারপর শুনুন একটা কথা—

—আজ্ঞে বলুন—

—ভদ্রলোকের কাণ্ড! কি করি—সাধনবাবু সেদিন এসেছিলেন ওঁর বাড়ী আমাকে নিয়ে যেতে মেয়ে দেখতে—শুনেচেন সে কথা? শোনেন নি?

—না। আপনি গিয়েছিলেন নাকি?

—যাই নি। আমি ওঁকে খুলে বললুম—কুড়ুলগাছির লালবিহারীবাবুদের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্ত্তা এগিয়েচে। বোধ হয় সেখানেই—বাবা নিজে আসচেন মেয়ে দেখতে। এ অবস্থায় অন্যত্র আর—

তাই। নিধু আগেই আন্দাজ করিয়াছিল সাধন বুড়োর দরদের আসল কারণ। কথাটা নিরঞ্জনকে বলিতে হইবে! ওই একজন সমবয়সী বন্ধু আছে রামনগরে—সুখদুঃখের কথা যাহার কাছে বলিয়া সুখ পাওয়া যায়। যে বুঝিতে পারে, দরদ দিয়া শোনে।

শনিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত ইণ্টারভিউ পর্ব্ব বেলা দেড়টার মধ্যে মিটিয়ে গেল। মহকুমার অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত। ভিড়ও খুব। এ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে—তৎকালে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে করমর্দ্দন করা সুখবিরল ও বর্ণবিরল পৃথিবীর একটা প্রধান সুখ, একটা প্রধান সম্মান। ম্যাজিস্ট্রেট আহেলা বিলাতী আই. সি. এস.। নাম রবিনসন—লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। চেহারার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

এস. ডি. ও. হাসিয়া নিধুকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন—বাবু নিধিরাম চৌধুরী—মুক্তিয়ার—

ঠিক পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছেন লোকাল বোর্ডের মেম্বর শশিপদ বাবু। সাহেব সহাস্যবদনে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—গুড্ আফটারনুন, বাবু, সো গ্ল্যাড্ টু মিট ইউ—

নিধু ঘামিয়া উঠিয়াছে। সে হাত বাড়াইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নিচু করিয়া সেলাম ঠুকিল। মুখে বলিল—গুড্ আফটারনুন, স্যর—ইয়োর অনার—

ম্যাজিস্ট্রেট তাহার দিকে চাহিয়া ভদ্রতা-সূচক হাসিলেন। ইণ্টারভিউ শেষ হইয়া গেল। আজ আর কাজকর্ম্ম নেই।

ডাক-বাংলা হইতে বাসায় আসিবার পথে নিধু ভাবিয়া ঠিক করিল আজ সে কুড়ুলগাছি

যাইবে। যদিও বলিয়া আসিয়াছিল যাইবে না, কিন্তু যখন সকাল-সকাল কাজ মিটিয়া গেল—তখন আজই এখনি বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সামনের শনিবারে বরং যাইবে না বাড়ী—সুনীলবাবু এবং তাঁহার বাবা যেদিন-মেয়ে দেখিতে যাইবেন—সেদিন তাহার না থাকিলেও কোনো পক্ষের ক্ষতি নাই।

আজ শরীরটা কিন্তু সকাল হইতেই ভালো নয়। জ্বরজাড়ি হইতে পারে। সারা গায়ে যেন বেদনা। তবুও বাড়ী আজ তাহার যাওয়া চাই-ই। আজ মধুকে সে পাইবে পুরানো দিনের মতো। বাড়ীতে ভাবী আত্মীয়-কুটুম্বেরা ভিড় করিবে না আজ।

শরতের রৌদ্র নীল আকাশের পেয়ালা বাহিয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে। পথের ধারে ছায়া, কোণে সেই দিনের মতো মটরলতার দুলুনি। ছোট গোয়ালে লতায় ফুল ধরিয়াছে। শালিক ও ছাতারে পাখির কলরব মাথার উপরে।

পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াই নিধু দেখিল তাহার শরীর যেন ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। শরতের ছায়াভরা বাতাস গায়ে লাগিলে যেন গা শিরশির করে। নিধু মাঝে মাঝে কেবলই বসিতে লাগিল—এ সাঁকোয় বসে, আবার ও সাঁকোয় বসে। সাঁকোর নিচেই গত বর্ষার বদ্ধ জল, অন্য সময় তাহার যে একটা গন্ধ আছে—ইহাই নিধুর নাকে লাগিত না—আজ গন্ধটায় তাহার শরীরের মধ্যে যেন পাক দিতেছিল। সাঁকোয় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে বাঁশবনের মাথার উপরে মেঘমুক্ত নীল আকাশে শরতের শুভ্র মেঘের খেলা লক্ষ্য করিতেছিল। মেঘের দল লঘুগতিতে উড়িয়া চলিতে-চলিতে কত কি জিনিস তৈরি করিতেছে—কখনো দুর্গ, কখনো পাহাড়, কখনো সিংহ, কখনো বহুদূরের কোন অজানা দেশ—উপরের বায়ুস্রোত আবার পর-মুহূর্তে সেগুলাকে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিতেছে—এই আছে, এই নাই—আবার নব-নব শুভ্র মেঘসজ্জা, আবার কল্পনার কত কি নতুনের সৃষ্টি। শুভ্র মেঘের সৃষ্টি—সে আবার টেকে কতক্ষণ?

কে একজন ডাকিয়া বলিল—বাবু, আপনি এখানে শুয়ে আছেন সাঁকোর ওপর? কনে যাবেন?

পথ-চলতি চাষা লোক। নিধু বলিল—যাব কুড়ুলগাছি। জ্বর এসেচে ভাই একটু শুয়ে আছি।

—আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবাহ্, উঠুন আনি—কতক্ষণ শুয়ে থাকবেন?

—না বাপু। আমি একটু জিরিয়ে নিলেই আবার ঠিক হাঁটব—তুমি যাও।

লোকটা চলিয়া গেল—কিন্তু যাইবার সময় বার-বার পিছনে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে গেল। লোকটা ভালো। শরীর ভালো না থাকিলে কিছুই ভালো লাগে না। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ইন্টারভিউ হইল—কোথায় মন বেশ খুশি হইবে, গাঁয়ে গিয়া গল্প করিবার মতো একটা জিনিস হইল—তা না, সে যেন মনে কোনো দাগই দেয় নাই। কিন্তু এই জ্বরের ঘোরে মধু যেন কোন অপার্থিব দেশের দেবী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিতেছে। মধুকে একদিন খাওয়ানো হইল না—পয়সা জমে না হাতে তা কি করা যায়? সামনের শনিবারে তো বাড়ী

যাইবে না—পরের শনিবারে হইবে। আচ্ছা, বার-লাইব্রেরীর সকলে কি তাহাকে বয়কট করিবে? যদি করে সে তো নিরুপায়। তাহার কোনো দোষ নাই, আর কেউ না জানে, সে তো জানে! সে স্বেচ্ছায় কাহারো অনিষ্ট করিতে যাইবে না।

অতি কষ্টে আরও কয়েক মাইল পথ সে অতিক্রম করিল।

পথ তাহাকে যে করিয়াই হোক, অতিক্রম করিতেই হইবে। এই দীর্ঘ, ক্লান্ত পথের ওপ্রান্তে হাস্যমুখী মঞ্জু যেন কোথায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আজ না গেলে আর তাহার সহিত যেন দেখাই হইবে না। দুদিনের জন্য আসিয়াছিল—আবার বহু, বহু দূরে চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার আর দেরি নাই। ওই সন্দেশপুর—সেই মৌলবীসাহেবের পাঠশালা সন্দেশপুর বাঁওড়ের ধারে। বাঁওড়ের বর্ষার জল রাস্তার কিনারা ছুঁইয়াছে—ওদিকে গাছের গুঁড়ির সাঁকোর উপর দিয়া ধান বোঝাই মহিষের গাড়ী পার হইতেছে।

আর এইটুকু গেলেই তাহাদের গ্রাম। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিবার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রামের পথে সে পা দিবে।

অমনি মা আগাইয়া আসিয়া বলিবে—এই যে নিধু এলি বাবা! বলেছিলি আজ যে আসবি নে?

হয়তো বা বাড়ী পৌঁছিলে একথা তাহার মা তাহাকে বলিয়াও থাকিবেন—কিন্তু আচ্ছন্ন ঘোর-ঘোর ভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে কখন সে বাড়ী ঢুকিয়াছিল টলিতে-টলিতে—কখন বাড়ীর লোকে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছিল—এ সকল কথা বলিয়া তাহার মনে নাই।

দুইমাস রোগের ঘোরে কখনও চেতন, কখনও অচেতন বা অর্দ্ধচেতন ভাবে কাটিবার পর নিধুর জীবনের আশা হইল। ক্রমে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে পারিল। ডাক্তার গিয়াছে আর ভয় নাই।

নিধুর মা পুত্রের সেবা করিতে-করিতে রোগা হইয়া পড়িয়াছেন। সে চেহারা আর নাই মায়ের।

নিধুর সামনে সাবুর বাটি রাখিয়া বলিলেন—আঃ বাবা, রামগড় থেকে শশধরবাবু ডাক্তার পর্য্যন্ত এসেছিলেন দুদিন—

নিধু ক্ষীণ স্বরে বলিল—শশধরবাবু! সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!

—টাকা কি লেগেছে আমাদের? আহা, আর জন্মে পেটের মেয়ে ছিল ওই মঞ্জু—দিন-রাতের মধ্যে যে কতবার আসত, বসে থাকত—সে-ই তো সব যোগাড়যন্ত্র করে দিলে জজবাবুকে বলে—জজবাবুও হামেশা আসতেন—গাঁয়ের সবাই আসত-যেত। সেদিনও জজগিন্নি বলে গেলেন—টাকা খরচ সার্থক হয়েচে, প্রাণ পাওয়া গেল এই বড় কথা। মিথ্যে কথা বলব কেন, সবাই দেখেচে, শুনেচে, করেচে। ভুবন গাঙ্গুলির মেয়ে হৈম পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার আগে রোজ একবার করে আসত। মা সিদ্ধেশ্বরী কালী মুখ তুলে চেয়েচেন।

সকলে তো বলেছিল এই বয়সে টাইফয়েড—

মধু! অনেক দিন পরে নিধুর রোগক্ষীণ স্মৃতিপটে একখানি আনন্দময়ী বালিকামূর্তি অস্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন এ নাম কানে যায় নাই। কঠিন রোগ তাহাকে মৃত্যুর যে ঘনান্ধকার রহস্যের পথে বহুদূর টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, হয়তো সে পথের কোথাও কোনোদিন চেতনাহীন মুহূর্তে সে একটি বালিকা-কণ্ঠের সহানুভূতিমাখা উৎসুক স্বর শুনিয়া থাকিবে, হয়তো তাহার দয়ালু হস্তের মৃদু পরশ অঙ্গে লাগিয়া থাকিবে—নিধু তাহা চিনিতে পারে নাই—ধারণাও করিতে পারে নাই।

সে কিছু বলিবার আগেই তাহার মা বলিলেন—ও শনিবারে যাবার দিনটাতেও মধু এসে কতক্ষণ বসে রইল। বললে, বাবার ছুটি ফুরিয়ে গেল তাই যেতে হচ্ছে জ্যাঠাইমা, নইলে নিধুদাকে এ ভাবে রেখে যেতে কি মন সরে! বাবার কোর্ট খুলবে জগদ্ধাত্রী পূজোর পরে, আর থাকবার যো নেই। চোখের জল ফেললে সেদিন বাছা আমার! একেবারে যেন আমার পেটের মেয়ে—বললাম যে। অমন মেয়ে কি হয় আজকালকার বাজারে! তাই তো বলি—

মায়ের বাকি কথা নিধুর কানে গেল না।

আরও দিন পনরো কাটিয়া গিয়াছে।

নিধু এখন লাঠি ধরিয়া সকালে-বিকালে একটু করিয়া বাড়ীর কাছের পথে বেড়ায়।

মধুদের বাড়ী তালাবন্ধ। কেহ কোথাও নাই।

আগেও তো কেহ ছিল না এ বাড়ীতে, কখনো কেহ থাকিত না, এখনো কেহ নাই, ইহাতে নতুন কি আছে?

এই শেষ হেমন্তের ঈষৎ শীতল অপরাহ্ণগুলিতে আগে-আগে ঘন ছোট গোয়ালে-লতার জঙ্গলে জজবাবুদের বাড়ীর সদর-দরজা ঢাকিয়া থাকিত—সে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে—বছরের পর বছর কাটিবার সঙ্গে-সঙ্গে সে বন আবার গজাইবে। মধ্যে যে আসিয়াছিল, সে তো দুদিনের স্বপ্ন।

দুদুজেলে মাছের ডালা মাথায় করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল—এই যে দাদাঠাকুর, আজকাল একটু বল পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ দুদু, ডাক্তার বলেচে একটু বেড়াতে সকাল-বিকেল।

—তা যান, বেলা গিয়েচে, আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না—কার্তিকে হিম—আপনার তো পুনর্জন্ম গেল এবার।

—কপালে ভোগ থাকলে—

—তাই দাদাঠাকুর তাই। কপালই সব। এইন পুজোতা গেল জজবাবুদের বাড়ী। কি খাওয়ান-দাওয়ান, আমাদের একক রেল চেল। জজবাবু নিজে সামনে দাঁড়িয়ে—দুদু,

ভাল করে খাও বাবা, যা ভালো লাগে মুখে চেয়ে নিও। এমন মানুষ আর হয় না।

নিধু বাড়ীর দিকে ফিরিবার আগে কেহ কোনোদিকে নাই দেখিয়া বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া জজবাবুর বাড়ীর মধ্যে একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

ভালো দেখা গেল না। হেমন্ত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে গাছপালায়।

মুখোশ ও মুখশ্রী

বিকেল হয়নি ভাল করে।

তরলা লাইলাক রংয়ের জর্জেট শাড়ী পরে টেনিস কোর্টে বসে প্রতীক্ষা করছে মিঃ বাসুর। মিঃ বাসুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? বিখ্যাত টেনিস-খেলোয়াড় মিঃ বাসুর কৃশ, দীর্ঘ, সুন্দর, যৌবনশ্রী-মণ্ডিত চেহারা আলিপুর অঞ্চলের ও বালিগঞ্জ অভিজাত-পল্লীর প্রত্যেক টেনিস কোর্টকে অলঙ্কৃত করেছে—তাঁর নিখুঁত সাহেবী পোশাক ও নিখুঁততম আদবকায়দা অনেক ঈর্ষাপরায়ণ তরুণের অনুসরণ-কেন্দ্র।

সেদিন বইয়ের এজেন্ট মিঃ সেনকে দেখে এরা বুঝেছিল এ তাদের সেটের লোক নয়।

অণিমা নাক সিঁটকে বলেছিল—ও, মি! টাইটার রং এমন বিশ্রী! টেস্ট বলিহারি ভদ্রলোকের। ওই টাই পরে—ইট্ ইজ বিজও, মি! হুওয়েলি ওয়ান শুড্ নো হাউ টু ড্রেস প্রপারলি!

তরলা মুখে রুমাল দিয়ে বলেছিল—স্-স্-স্। নো ব্যাড্ রিমার্কস ডিয়ারি—যার যা তার তা।

—জানি। তবুও ওয়ান শুড্—

—হি-হি-হি-হি—

—তবে! তুমি নাকি বড়—হঠাৎ এত খুশী যে? ব্যাপার কি?

—জানি নে।

—আমি জানি। মিঃ বাসু আজ টেনিসে আসছেন। না?

—(সুরে) দেয়ার আর ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স দ্যাট্ রোম্ দি
গড্স-রোড্, গ্রীন্ সাইড্—এ্যাণ্ড্ অ্যাফ্রেড্ অফ্ নান্—

—থাক্—থাক্—বুঝেচি। ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স দেয়ার আর এনাফ অ্যাণ্ড টু স্পেয়ার—বাট্—

—চুপ্।

—সত্যি, কিছু হবে না কি?

—কি হবে? (কৃত্রিম কোপে)

—বাঃ, রাগ কর। সুন্দর মানায়।

—নো ফ্ল্যাটারিং প্লিজ্—

—অ্যাট্ লিস্ট্ নট্ ফ্রম্ মি, কেন না তার চেয়েও ভাল লোক রয়েছে। না?

—চুপ।

—বাস, চুপ করলাম। তরলা, সরলা কোথায়?

—ওপরে আছে বোধ হয়।

—তার সেই হাঁদামুখো ভবঘুরেটা আজ নাকি কলকাতায় এসেচে শুনলাম। এখানে আসবে নাকি?

—বোধ হয়। সরলা তো কাল রাত্রে ঘুমোয় নি তার কথা ভেবে।

—পোশাক পরা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ভদ্রলোকের। যে তা না জানে—

একে একে মেয়েরা এল, সঙ্গে সঙ্গে এলেন মিঃ দাস, মিঃ সেন, মিঃ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি। এঁদের কাজ হচ্ছে শুধু একটি আমোদের স্থান থেকে আর একটি আমোদের স্থানে যাতায়াত করা। এঁদের প্রত্যেকের নিজের মোটর আছে, এসেচেনও সেই মোটরে। জীবনে এঁদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে ভাল টেনিস খেলা যায়। বিদেশের টেনিস-বিজয়ীদের নাম এঁদের মুখস্থ।

মিঃ সেন এদের মধ্যে এসেচেন বেশি দিন নয়, নিজের মোটর আছে, বিলিতি বই-বিক্রেতাদের এজেন্ট। অর্থের দিক থেকে ভালই উপার্জ্জন, তবে সংসারও ছোট নয়, অনেক বুঝে চলতে হয়। ইনি স্ত্রীকে আনতে সঙ্কোচ বোধ করেন এখানে, কারণ তিনি একেবারে গ্রাম্য মেয়ে। এ দলে মেশবার উপযুক্ত নন।

সরলা নেমে এল ওপর থেকে। বেশ মেয়েটি, একটা সাদা সিল্কের শাড়ী, হাতে রিস্টওয়াচ, চোখে চশমা, বেশ সাদাসিধে চালচলন। মুখের ভাব দেখে মনে হয় কি একটা চিন্তা করচে অনেকক্ষণ থেকে।

অণিমা বল্লে—এসো সরলা। এত দেরি?

—মাথা ধরেছিল।

—অসময়ে?

—এই সময়েই তো ধরে। একটা এ্যাসপিরিন খেলাম—

—হার্ট ডিপ্রেসান্ট—বড়—

—হলে কি করবো?

—খেলবে না?

সরলা উত্তর দেবার আগেই দুটি ভৃত্য ট্রে হাতে ঢুকে সকলকে বরফ দেওয়া পানীয়, বরফশীতল ক্ষীর ইত্যাদি পরিবেশন করতে লাগলো। তরলা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—মিঃ দাসকে দাও। ও, আপনার চলবে না? কি দেবে? আচ্ছা চা-ই নিয়ে এসো। আর কেউ চা? সরলা, একটু ভাখ্ না ভাই।

এমন সময়ে মিঃ বাসু লনে এসে ঢুকলেন। লম্বা, একহারা চেহারা, নিখুঁত পোশাক, নিখুঁত আদব-কায়দা, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই। চালচলনের কায়দা ছায়াচিত্র-অভিনেতা মরিস শিভ্যালিয়রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যদিও মরিস শিভ্যালিয়রের দিন ফুরিয়ে গেছে অনেক কাল। সকলে চেয়ে দেখলে মিঃ বাসুর দিকে। তরলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—কিন্তু সে অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। মিঃ বাসু হচ্ছেন মল্লিক-বাড়ীর এ টেনিস ময়দানের সিংহ। নামকরা খেলোয়াড়। কি করে টেনিস খেলতে হয় স্টাইলের সঙ্গে তা এখানকার অনেকেই এঁর কাছে শিখেছেন, যদিও মুখে স্বীকার করেন না।

মিঃ দাস বল্লেন—দেরি যে! উই আর অল্ অ্যাওয়েটিং ইওর ভেরি প্রেশাস প্রেজেন্স্।

মিঃ বাসু বল্লেন—রি-ঢ্যা-লি!

—আহ্ নেভ্—আহ্ ফি লেডিজ্—

মিঃ রায় বিলিতি কায়দায় মাথা থেকে হুয়ে পড়ে অভিবাদন করলেন। মুখে কোনো কথা বল্লেন না। অতি চমৎকার দেখালো জিনিসটা কায়দার দিক থেকে। অণিমা শীলা সেনের কানে কানে বল্লে—হাই কল্ ছাট্ স্মার্টনেস, না ?

শীলা সেন মিঃ সেনের ভাগিনেয়ী, সুন্দরী ও সুগায়িকা, টেনিস খেলায় হাত ভাল। মেয়েপুরুষের সম্মিলিত ক্রীড়ায় অনেক টেনিস ময়দানে দেখা যায়—ফিরিঙ্গি পাড়ার এবং আলিপুরে বালিগঞ্জে।

খেলা আরম্ভ হবার আর বেশি দেরি নেই। সবাই সবাইকার সঙ্গে কথা-বার্তায় মত্ত, সরলা ছাড়া। সে বিমর্ষভাবে একটা পাম গাছের ছায়ায় বসে আছে তৃণভূমির কোণে। হঠাৎ কাকে দেখে সে যেন খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অণিমা চেয়ে দেখলে মিঃ সুর ওদিকের গেট দিয়ে ময়দানে ঢুকচেন! মোটা সোটা লোক, একটু বেঁটে অথচ থলথলে নয়, বেশ আঁটসাঁট গড়নের চেহারা। মুখে চোখে উদার হাসি। নস্যি রংয়ের সুট পরনে—ভাল মানায় নি—যেন বালিশের-খোল-পরা গোছের দেখাচ্ছে।

অণিমা নাক সিঁটকে জনান্তিকে বল্লে—বাব্বাঃ—কি লাউড কলার।

তরলা কৌতুকের স্বরে বল্লে—আবার পরচর্চ্চা! তোমাকে তো বলেচি, যার যা তার তা।

অণিমা চুপি চুপি বল্লে—সরলা বেচারীর জন্যে দুঃখু হয়! আই ডু পিটি হার—

—তোমার কিছু করবার আছে ?

—কিছু না।

—তা হলে সেকথা ছেড়ে দাও। সরলাকে হিণ্ট দিয়েচি কতবার। ও বোঝে না। এই সময়ে মিঃ সেন বলে উঠলেন—ওয়েক আপ, লেডিজ—

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। মেয়েরা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। উঠলো না কেবল সরলা আর উঠলেন না মিঃ সুর। মিঃ সুরকে দু-একজন কৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গে অনুরোধও করলে, তিনি বল্লেন, খেলা তিনি জানেন না ভালো। তিনি শুধু দেখতে এসেচেন।

কিছু পরে খেলোয়াড় দল বিশ্রাম করতে এল। অমনি গৃহভৃত্য ছুটে এসে সকলের হাতে হাতে ঠাণ্ডা বার্লির জল, চা, বরফ-মিশ্রিত পানীয় বা কফি পরিবেশন করতে লাগলো। মিঃ রায়ের নৈপুণ্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো চারিদিক। সকলে ঘিরে দাঁড়ালো মিঃ রায়ের চারিদিকে।

মিঃ সেন বল্লেন—মিঃ রায়, ভাবচি আপনার শিষ্য হবো। আই উড বি প্রাউড টু বি ইওর ডিসাইপ্‌ল্।

মিঃ রায় বার্লির জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কায়দার সঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে বল্লেন—গুরু হবার কৃতিত্ব দাবী করতে পারি নে।

অণিমা বল্লে—কি যে বলেন—

—কেন ? মিথ্যে বললাম ?

—অতিশয় বিনয়ের কথা হোল। আপনার যা হয়েচে, ক'জনের ও রকম সৌভাগ্য ঘটে? আপনার খেলা দুচোখ ভরে দেখলেও আই উড্ থার্স্ট ফর মোর—

—ধন্যবাদ।

—না, সত্যি বলচি, আমাকেও আপনি শিষ্য করে নিন না!

—শিষ্য? ব্যাকরণ ভুল হ'ল, শিষ্যা হবে কথাটা।

—যা বলেন। না সত্যি, করে নিন না শিষ্যা!

—তথাস্তু।

সকলে হেসে উঠলো। তরলা বল্লে—কথা বলবার কি সুন্দর ভঙ্গি! ও ও শিখতে হয় আপনার কাছে।

অণিমা বল্লে—একশো বার।

মিঃ সেন বল্লেন—বাঃ, আমি কথাটা তুললাম, আর আপনি ও তরলা দেবী কথাটা একচেটে করে নিলেন দেখচি।

মিঃ বাসু হেসে বল্লেন—লেডিজ প্রিভিলেজ—

এই সময়ে পুনরায় খেলা আরম্ভ হওয়ার সময় হোল। সবাই যে যার জায়গায় খেলতে উঠে চলে গেল। মিঃ বাসু নিজের র‍্যাকেটের তাঁতগুলোতে হাত দিয়ে বল্লেন—একখানা ভালো র‍্যাকেট দিতে পারেন কেউ! পাটগুলো ঢিলে হয়ে পড়েচে। দুটো ছিঁড়ে গিয়েছে—বড্ড অসুবিধে হচ্ছে—

তরলা বল্লে—এই নিন আপনি আমার-খানা।

—আপনি?

—আমি আনিয়ে নিচ্ছি—

অণিমা বল্লে—না হয় আমারটা নিন—

—না থাক। দুজনকেই ধন্যবাদ। এবারটা আমি এতেই চালিয়ে নেবো। তারপর মিঃ সুরকে দেখিয়ে চুপি চুপি বল্লেন—ও ভদ্রলোকটি কে?

অণিমা চুপি চুপি উত্তর দিলে—একটি নিরীহ ভদ্রলোক।

—পরিচয় কি?

—মিঃ সুর না সোম, কি জানি!

—ও, কি করেন?

—ভবঘুরে। এ জেন্টলম্যান উইদাউট এনি ডিনোমিনেশন্।

—এখানে আগে কখনো তো দেখিনি?

—অনেকবার এসেচেন। মাঝে মাঝে আসেন। সরলা ওঁকে পছন্দ করে।

—রি-য়্যা-লি?

—ভনুচি। আসুন, ইণ্ট্রোডিউস করে দিই, না?

ওরা সকলে আবার খেলতে গেল। এরা নিজের ভাবেই নিজে বিভোর হয়ে আছে,

তরলা একটা নীল রংয়ের স্কার্ফ-রিক নষ্ট করে বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে র‍্যাকেট হাতে। মিঃ বাসু খেলার বিষয়ে কি একটা কথা তাঁর পার্টনার অণিমাকে বলচেন। অণিমার চোখে সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টি। এখানে সে ক'টি মেয়ে আছে, এদিকে এরা, ওদিকে মিঃ সেনের বড় মেয়ে মৃদুলা, শ্যালিকা মঞ্জুশ্রী—সুনিপুণ খেলোয়াড় মিঃ বাসুকে এরা ইষ্টদেবের আসনে বসিয়েচে। একটুখানি খেলা বন্ধ হোলেই মিঃ বাসুর চতুর্দ্দিকে তরুণীরা মুগ্ধনেত্রে ভিড় করে দাঁড়াবে এবং ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠের কলধ্বনি শুরু হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। মিঃ সুর একটি সিগারেট নিয়ে সবে ধরিয়েচেন, এমন সময় সরলা এসে ওঁর কাছে বসলো। বল্লে—কি ভাবচেন?

—ভাবচি মিস মিত্র, আমি খেলতে পারি নে কেন?

—শেখেন নি কেন?

—সময় পাইনি। সত্যি বলচি। এক সময় ভেবেছিলাম ক্যামেট্-পর্ব্বতচূড়ায় উঠবো। চেষ্টা করেছিলাম সেদিকে। একবার ভেবেছিলাম নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠবো—এশেন্ ব্রেনার যে বছর মারা গেল নাঙ্গা পর্ব্বতের চার নম্বর ক্যাম্পে, আমি তখন সেই ভীষণ স্নো-স্টর্মের মধ্যে তিন নম্বর ক্যাম্পে আছি। আমার মাথার ওপর বিরাট নাঙ্গা-পর্ব্বতের খাড়া ঢালু—চারিপাশ গুঁড়ো বরফে আচ্ছন্ন, কিছু দেখা যায় না।

—বলুন, বলুন—কি ভালোই লাগচে—

—এমন সময় নেপালী ক্যাম্প-ফলোয়ার টুটি থাপা এসে বল্লে—সব খতম্ হো গিয়া হুজুর—আমি আর একজন জার্মান—ওটা ছিল জার্মানদের অভিযান—আবার উঠতে লাগলাম চার নম্বর ক্যাম্পে—

—সেই বরফের ঝড়ের মধ্যে?

—না। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে যখন বরফের ঝড় কমলো, তখন।

—আপনার কথা শুনে মনে হয় এরা কি সব ছোট জিনিস নিয়ে থাকে। এদের এই খেলা, লো-কল্‌ড্ স্মার্টনেস, এদের ইংরিজি বুলি আমার এত খারাপ লাগে। বড় জিনিসকে নিয়ে, বড় কল্পনাকে নিয়ে যদি না থাকতে পারা গেল তবে মানুষ হয়ে জীবনের সার্থকতা কি?

মিঃ সুর হেসে বল্লেন—আমাকে ঘরছাড়া করেচে আজ কিসে? কবে হয়তো ওই বিরাটের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তারপর থেকে শুধু মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, বনে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি, কিসের যে নেশায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়! কতবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেচি। মরুভূমিতে দিক্‌হারা হয়ে জলের অভাবে মরণের অর্দ্ধেক পথে পৌঁছে ফিরে এসেচি। সে সব গল্প একদিন করবো মিঃ মিত্র—নিরিবিলি বসে। আজ এই টেনিস খেলার মাঠ তার উপযুক্ত স্থান নয়।

—শুধু আমাকেই বলবেন কিন্তু।

—আর তো কেউ শুনতে চায় না। এখানকার আর তো কারো শোনবার আগ্রহ নেই,

আপনাকেই বলবো।

—বসুন। আপনার জন্যে কি আনবো?

—কিছু না।

—আইসক্রিম খান একটু।

—ধন্যবাদ। আপনি বসুন, ব্যস্ত হবেন না।

এই সময় খেলা ভাঙলো। তরলা, অণিমা ও মিঃ বাসু একসঙ্গে এসে ওদের ডান পাশের চেয়ারগুলো দখল করলে। মঞ্জুশ্রী ও খুকী সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

অণিমা মিঃ বাসুকে বল্লে—বার্লি-ওয়াটার?

—থ্যাঙ্ক্‌স্। আধ গ্লাস।

সরলা এই সময় অণিমাকে বল্লে—অনি, মিঃ সুরের জন্যে একটা আইসক্রিমের কথা অমনি বলে দাও না—

মিঃ বাসু গলার সুর নীচু করে বল্লেন অণিমাকে—আইসক্রিম! মেয়েদের খাদ্য বলেই ওটাকে আমার জানা আছে।

অণিমা বল্লে—সবাই সমান পুরুষ মানুষ হয় কি?

—কি নাম বল্লেন সরলা দেবী? আমি শুনিনি ঠিক। অন্যমনস্ক ছিলাম।

তরলা বল্লে—মিঃ সুর। আসুন, ইন্ট্রোডিউস করে দিই?

অণিমা চোখ টিপে বারণ করে বল্লে—থাক।

মঞ্জুশ্রী হেসে বল্লে—কেন?

অণিমা বল্লে—সকলের সঙ্গে সকলের মিশবার যোগ্যতা থাকে কি? আমাকে তুমি যাই বলো মঞ্জু হয়তো তুমি দোষ দিতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষ যদি পুরুষের মতো না হয়, তেমনি স্মার্ট না হয়, তাহোলে অবুঝবু অবড়জঙ্গ ধরণের—

তরলা হি-হি করে হেসে বল্লে—আর একটা বিশেষণ বাদ দিলে, সেটা হোল—

মঞ্জু অমনি টপ করে বলে ফেললে—অ-র-স-গ-ব—

তরলা মুখে আঙুল দিয়ে বললে—স্-স্-স্—

এই সময়ে ভৃত্য বার্লির জল, আইসক্রিম প্রভৃতি ট্রে ভর্ত্তি করে নিয়ে এসে তরলার সামনে ধরলে। তরলা ও অণিমা ট্রে থেকে খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিয়ে যার যার হাতে পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সকলের আগে মিঃ বাসুকে ও সর্ব্বশেষে মিঃ সুরকে দেওয়া হোল।

ঠিক এই সময়ে একখানা টু-সিটার অস্টিন্ ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো; তা থেকে নেমে মিঃ দে আর তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে দেখা গেল টেনিস কোর্টে ঢুকচেন।

মিঃ দে এ-সমাজের চূড়ামণি, পৌরসভার ডেপুটি মেয়র, কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার, বড় কংগ্রেসী পাণ্ডা, সাহিত্যিক ও বক্তা। এদের দলে যখন মেশেন, তখন এরা বিনয়ে বিগলিত হয়ে থাকে সর্ব্বদা। ওঁরা টেনিস কোর্টে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে মিঃ দে, এই যে মিস্ দে, আসুন, আসুন, সো গুড্ অফ্ ইউ টু।

—মিস্ দে-কে যে বড্ড টায়ার্ড দেখাচ্ছে—বসুন—বসুন, ইত্যাদি।

তরলা বল্লে—শকু দিদি—সেই হাজারিবাগ আর এই। কতদিন—

হঠাৎ মিঃ সুরের দিকে চোখ পড়াতে মিঃ দে যেন অবাক হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আপনি!

শকুন্তলাও এগিয়ে এসে বল্লে—মিঃ সুর! সত্যি আপনি!

মিঃ সুর দাঁড়িয়ে উঠে ওঁদের অভিবাদন করলেন। বল্লেন—আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি। তবে মধ্যে পাঁচ ছ'মাস আসি নি।

মিঃ দে বল্লেন—আসবেন কেমন করে? আপনার কথা যে কাগজে বেরিয়েচে আজ, আপনার ছবি পর্য্যন্ত বেরিয়েচে। শকুন্তলা কাগজখানা গাড়ি থেকে নিয়ে এসো তো মা, সিন্ধুনদীর গর্জ আর কেউ বিজয় করে নি এক ক্লাফ নর্টন বাদে। বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করেচেন আপনি।

মিঃ সেন বল্লেন—ইনি কি করেচেন বল্লেন?

মিঃ দে বল্লেন—ইনি হোলেন বিখ্যাত পর্যটক ব্যোমকেশ সুর। এঁর কথা 'ইউ পি'র সমস্ত কাগজে। আমি পরশু লক্ষ্নৌ থেকে আসচি। সিন্ধু নদীর বিরাট খাত ইনি একা বেড়িয়ে এসেচেন। কি দুর্গম পদযাত্রা সে! শকু মা কাগজ এনেচো? এই দেখুন এঁর ছবি। পড়ে দেখুন সবটা। বাঙ্গালীর মুখ একেবারে উজ্জল করেচেন আপনি। ক্লাফ নর্টনের পর এ দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করে নি—সকলে বুঝতে পারবে না ইনি কি করেচেন—বাঙ্গালীর মধ্যে এত বড়—

মিঃ সেন বল্লেন—কবে গিয়েছিলেন?

মিঃ দে কাগজখানা খুলে সকলের দিকে ফিরিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—দেখুন। এই তো সেদিন ফিরেচেন, আজ দিন দশ-পনেরো হোল, এই দেখুন এঁর ফটো। মিঃ সুর, আমাদের কাগজে ধারাবাহিক ভাবে আপনি সিন্ধু অভিযান লিখুন! পাঁচহাজার টাকা অফার রইল আমার। স্টেট্সম্যান জানে না যে আপনি কলকাতায়। তা হোলে এখুনি লুফে নেবে। আমার অফার রইল কিন্তু মিঃ সুর।

শকুন্তলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ সুরের দিকে চেয়ে বল্লে—কাল আমাদের বাড়ি আসুন মিঃ সুর। গল্প শুনবো আপনার মুখে। কেমন তো?

অণিমা ও তরলা হাঁ করে এদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় মিঃ বাসু এসে ওদের দুজনকে চুপিচুপি বল্লেন, আমি আসি। একটা এনগেজমেন্ট আছে এখুনি, আচ্ছা গুড নাইট।

রাসু হাড়ি

সে বার আষাঢ় মাসে আমাদের বাড়ী একজন লোক এসে জুটলো। গরীব লোক খেতে পায় না, তার নাম রাসু হাড়ি। আমরা তাকে সাত টাকা মাইনে মাসে ঠিক করে বাড়ীর চাকর হিসেবে রেখে দিলাম। প্রধানতঃ সে গরু বাছুর দেখাশুনো করতো, ঘাস কেটে আনত নদীর চর থেকে, সানি মেখে দিত খোল জল দিয়ে।

বাবা মারা গিয়েছিলেন আমাদের অল্প বয়সে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই বড়, লেখাপড়া আমার গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত। ছোট ভাই দুটি ডাণ্ডাগুলি খেলে বেড়াতো, এখন চাষের কাজে আমাকে সাহায্য করে।

রাসু বছরখানেক কাজ করার পরে একদিন রাত্রে আমাদের বড় বলদজোড়া নিয়ে অন্তর্দ্ধান হ'ল। আমাদের চক্ষুস্থির, তখনকার সস্তার দিনেও সে গরুজোড়ার দাম দু'শো টাকা। আমার ছোট ভাই সত্যচরণের (ডাক নাম নেণ্ট্) বড় সাধের বলদ, সে ভালো গাড়ী চালাতে পারতো বলে শখ করে জঙ্গিপুরের গোহাটা থেকে ওই গরুজোড়া কিনে এনেছিল।

ভোরবেলা মা ওঠেন সকলের আগে। সেদিন উঠে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখেন রাসু নেই, যে কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুতো সেখানাও নেই। গোয়ালে দেখেন বলদজোড়াও নেই।

আমাকে উঠিয়ে বল্লেন, হ্যাঁরে নীলে, রাসু গেল কোথায় জানিস?

আমার তখন বিয়ে হয়নি, সত্য আর আমি এক ঘরে শুই। আমি উঠে চোখ মুছতে মুছতে বলাম, তা কি জানি? মাঠের দিকে গেল না তো?

—এত ভোরে সে কোনদিন মাঠে যায় না, আজ গেল কেন? বড় গরুজোড়াও তো দেখচি নে।

—গরুকে কি মাঠে খাওয়াতে নিয়ে গেল?

—এত সকালে আর এই শীতে? কখনো তো যায় না।

—তাই তো। দাঁড়াও উঠি আগে।

বহু খোঁজাখুঁজি হ'ল সারাদিন ধরে।

রাসু-হাড়ি না-পাত্তা। নির্ঘাত ভেগেছে গরুজোড়া নিয়ে। অমন গরুজোড়া!

সত্য তো পাগলের মত হয়ে গেল। ওর গায়ে খুব জোর, খুব সাহসী আর তেজী ছোকরা। বল্লে, দাদা, চল, ওর বাড়ী সেই বেলডাঙ্গা যাবো।

—কে যাবে?

—তুমি আর আমি।

—জানিস ওর বাড়ীর ঠিকানা?

—বেলডাঙ্গা থানা, মাঠডা-বেনাদহ গ্রাম। ও দুবার চিঠি পাঠিয়েছে ওই ঠিকানায়।

—ডাকঘর?

—ওই বেলডাঙা, জেলা মুর্শিদাবাদ।

—বাবাঃ, সে কদ্দুর এখেন থেকে! ও থাকগে।

সত্য কিছুতেই শুনলো না। তার পীড়াপীড়িতে দুই ভাই পুঁটুলি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। বত্রিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে।

সোজা গিয়ে বেলডাঙ্গা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠডা-বেনাদহ এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে। বেলডাঙার থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে সব খুলে বল্লাম। তাঁর নাম পঞ্চানন রায়, বাড়ী হুগলী জেলা। আমাদের মুখে সব শুনে তাঁর দয়া হ'ল। আমাদের বল্লেন, সেখানে কিছুদিন থাকতে, অন্ততঃ এক সপ্তাহ। সাধারণ পোশাকে তিনি দু'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে নিজে বেনাদহ গ্রামে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন, সে বাড়ী নেই।

আমাদের বল্লেন, থানায় রাত্রে শুয়ে থাকবেন, কোন অসুবিধে হবে না। রেঁধে খেতে পারেন। কিম্বা যদি না রেঁধে খেতে চান, আমার এক ছত্রি কনস্টেবল আছে—

সত্য বললে, কিছু না দারোগাবাবু, আমরা রান্না করেই নেবো।

থানার উত্তরে বড় এক পুকুর, পুকুরের পাড়ে উলুটি বাচড়া ও তাল গাছ। আমাদের যশোরের ভাষায় উলুটি বাচড়া বলে উলুঘাসে ঢাকা মাঠকে। দেখে সত্য খুব খুশী। বলে, দাদা ওই তাল গাছের তলায় আধ-ছায়া আধ-রৌদ্রে বসে রাঁধবো।

দিন কয়েক সেখানে থাকা হ'ল, বেনাদহ গিয়ে রাসু হাড়ির সন্ধান সব সময়ে নেওয়া হচ্ছে। কখনো রাত দুপুরে, কখনো দিন দুপুরে, কখনো খুব ভোর বেলায়। গাঁয়ের লোকে বলে সে যশোর জেলায় ব্রাহ্মণদের বাড়ী চাকরি করে। এখানে থাকে না তো। আজ এক বছরের মধ্যে তাকে গাঁয়ে দেখা যায় নি।

সুতরাং সাত দিন পরে আমরা রাসু হাড়িকে অপ্রকট অবস্থায় রেখেই বেলডাঙা থেকে রওনা হলাম বাড়ীর দিকে।

সত্য বললে, দাদা পয়সা নেই হাতে, তা ছাড়া রাস্তা দেখে যেতে হবে। যদি এমন হয় পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে বাড়ীর দিকে আসচে। চলো হেঁটে বাড়ী ফিরি।

—সে কি রে, এখান থেকে যশোর জেলা, পথটি যে সোজা নয়। পারবি হাটতে?

—গরুজোড়া ফেরত পাওয়ার জন্যে সব করতে পারি দাদা। আমার গাড়ী চালানো একদম বন্ধ হয়ে গেল ওই গরুজোড়ার অভাবে।

অতএব নামলাম দুই ভাই পথে।

বেলডাঙার বাজার থেকে চালডাল কিনে নিই। হাঁড়ি-সরা কিনে বোঁচকায় বেঁধে নিলাম। প্রথম দিন রাস্তার ধারে এক আমতলায় রান্না করে খেলাম। বেশ লাগে কিন্তু এভাবে পথ চলতে। ঘর থেকে কখনো বেরুই নি, এতদূরেও জীবনে কখনো আসি নি, রাসু হাড়ির দৌলতে অনেক দেশ দেখলাম।

সত্য বললে, দাদা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে কাজ নেই। বজ্জ দাম হাঁড়ির। বয়ে নিয়ে আসি,

পুকুর থেকে, বোঁচকায় বেঁধে নিই। নইলে কত পয়সা লেগে যাবে রোজ হাঁড়ি কিনতে।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয় নেবার জন্যে একটা কি গ্রামে ঢুকে সামনের একটা বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীর লোকেরা ঘুঁটের আগুন পোয়াচ্চে উঠোনে। আমাদের কথা শুনে বললে, এখানে জায়গা হবে না। আমাদের তাই থাকবার জায়গা নেই। এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ভাখো গে।

কিছুদূর গিয়ে আর একটি বাড়ী পেলাম রাস্তার বাঁ-ধারে। বাড়ীর সামনে গোয়ালঘর, প্রথম শীতে লাউ গাছে মাচাভরা লাউ ঝুলচে। মেটে ঘর দু'তিনখানা, উঠোনের পেছন দিকে এক ঝাড় তলদা বাঁশ। বুড়ো-মত একটা লোক তামাক খাচ্ছিল দাওয়ায় বসে। আমাদের দেখে বললে—কে তোমরা ?

আমি বললাম, পথ-চলতি লোক।

—এখানে কি মনে করে ?

—একটু থাকবার জায়গা তাও কর্তা। অনেক দূর থেকে আসচি, বড় কষ্ট হয়েচে।

—তোমরা ?

—আমরা ব্রাহ্মণ।

—গিয়েছিলে কোথায় ?

তখন সব কথা খুলে ওকে বললাম। রাস্থ হাড়ির আনুপূর্বিক ঘটনা। লোকটা নির্বিকার ভাবে তামাক টানতে টানতে সব শুনলে। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেলে হুঁকোর শেষ টান দিয়ে পিচ্ করে থুতু ফেলে শান্ত ও ধীরভাবে বললে, এখানে থাকার অসুবিধে। আগে ভাখো—

—এই দাওয়াটায় না হয় শুয়ে থাকবো। এই শীতে—

—এখানে সুবিধে হবে না।

সত্য বললে, এগিয়ে চলো দাদা। এখানে দরকার নেই।

কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা বাড়ীর পেছন দিকটাতে পৌঁছলাম। বাড়ীর মধ্যে মুড়ি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে এবং খোলা হাঁড়িতে মুড়ি ভাজার চড়বড় শব্দ হচ্চে। আমরা ঘুরে গিয়ে বাড়ীর উঠানে ঢুকলাম। একটা কালোমত বেঁটে লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে কটমট করে চেয়ে বললে, কে তোমরা ? কি চাই ?

—আমরা বিদেশী পথিক, বেলডাঙা থেকে আসচি। একটু থাকবার জায়গা হবে রাত্তিরে ?

—কি জাত তোমরা ?

—ব্রাহ্মণ। আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে, নিজেরা রেঁধে খাবো।

লোকটা যেন একটু নরম হয়ে বললে, দাঁড়াও জিগ্যেস করে আসি।

বাড়ীর মধ্যে থেকে এবার বেরিয়ে এল একটি মেয়েমানুষ, কালো, চেঙা, হাতে খুঁচিকাঠি। ইনিই মুড়ি ভাজছিলেন তা হ'লে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে, কে গা তোমরা ?

—আমরা ব্রাহ্মণ, একটু থাকবার জায়গা চাই।

—এখানে জায়গা হবে না। আগে ভাখো।

—আগে কোথায় দেখবো ?

—ওমা, তোমরা জানো না নাকি ? আগে কত লোক আছে—ভাখো গে যাও।

—আমরা নতুন লোক। কি ক'রে জানবো লোক আছে কি না।

—সামনে এগিয়ে দেখ না।

—জায়গা একটু হবে না ? আমরা নিজেরা বেঁধে খেতাম।

—বার বার বলছি হবে না, তুমি বাপু কি রকম লোক ?

বলেই মেয়েমানুষটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে একপাক ঘুরে চলে গেল বিরক্তভাবে।

সত্য বললে—দাদা উপায় ? কেউ তো জায়গা দেয় না দেখচি। রাত বেশ হ'ল।

—চ'ল দেখি এগিয়ে ?

—আমাদের কি চোর-ডাকাত ভাবচে নাকি ?

—কি ক'রে বলবো, চল্ দেখি এগিয়ে।

এবার একটা পাকা দালান-বাড়ীর বাইরের রোয়াকে আমরা ক্লান্তভাবে এসে বসে পড়লাম বোঁচকা নামিয়ে। অনেকক্ষণ পরে একজন লোক বাড়ী থেকে বের হয়ে কোথায় যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে, আমাদের দেখে বিস্ময়ের ভাবে বললে—কে তোমরা ?

আমি বললাম—একটুখানি শুয়ে থাকবার জায়গা দেবেন বাত্তিরে ? আমরা ব্রাহ্মণ, বাড়ী যশোর জেলা, বেলডাঙা থেকে আসচি।

—হেঁটে আসচো ?

—হ্যাঁ।

—তা থাকো শুয়ে।

ব্যাস, এই পর্য্যন্ত। বললে না উঠে বৈঠকখানার মধ্যে গিয়ে শোও, কিম্বা তোমরা খাবে কি, কিছু না। সেই যে গেল, আর তাকে দেখলামও না। আর কোন খোঁজখবরও ও নিলে না আমাদের।

সেই শীতের রাত্রে খোলা রোয়াকে কাপড় পেতে দুই ভাই শুয়ে রইলাম—কি করি।

সত্য বললে—বাবু হাড়ির সঙ্গে একবার দেখা হ'ত, তার মুণ্ডটা ভেঙে দিতাম এক ঘুষিতে।

সত্য বেশ জোয়ান ছোকরা, খেতেও পারতো অসম্ভব। একসের রান্না-করা মাংস আর আধসের চালের ভাত একা খেতে পারতো।

বেলডাঙার বাজারে সস্তা ডিম দেখে ও বলতো—দাদা, রোজ চারটে ডিম এক একবারে ভাতে দিও আমার জন্যে। খুব করে ডিম খেয়ে নিই।

আরও বেশী করে তার কথা মনে পড়চে কারণ—

কিন্তু থাক সে সব এখন।

আরও একদিন কাটল পথে।

বেথুয়াডহরি ছাড়ালাম। আরও এগিয়ে যাই দুজনে। জগদানন্দপুর বলে গ্রামের হাটে বড় একটা মাছ কিনলাম, বেলা দশটার পরে। খিদেও পেয়েচে বেশ। একটা বড় পুকুরের ধারে আম গাছের ছায়ায় সত্য উনুন খুঁড়তে লাগলো, আমি মাছ কুটবার ছাই কি ক'রে জোগাড় করি তাই ভাবচি, এমন সময় সত্য বললে—ওই ভাখো দাদা—

যা দেখলাম তা এখনো মনে আছে। আজ এই চোদ্দ পনেরো বছর পরেও—

একটি সুন্দরী বৌ গামছা কাঁধে নিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে পথের অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থমকে। আমরা রান্না করতে বসেছি পথের ধারেই। এই পথটা নিশ্চয়ই পুকুরঘাটে যাওয়ার পথ। বৌটি অপরিচিত লোকদের দেখে ঘাটে যেতে পারচেন না। ভদ্রলোকের মেয়েদের স্নানের ঘাটে যাবার পথের ধারে আমাদের রান্না করতে বসা উচিত হয় নি।

সত্য বললে—দাদা, ঘাটের পথে বসেচি, কি করি উঠে যাবো?

হঠাৎ দেখি বৌটি যেন আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ফিরে গেলেন। অমন রূপসী বৌ এমন পাড়াগাঁয়ে দেখবো আশা করি নি। আমাদের ভয়ও হ'ল। সত্য বললে—যাঃ, ফিরে চলে গেল বৌটি। আমরা না বুঝে অন্যায় করে ফেলেচি—চলো সরে যাই।

পরক্ষণেই ভয়ের সুরে বললে—দাদা লোক আসচে এদিকে, বৌটি গিয়ে বাড়ীতে বলে দিয়েচে—চলো পালাই—মারবে—

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম—কেন পালাতে হবে কেন? কি করেচি আমরা? মার বুঝি সস্তা?

দুটি ছোকরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো,—আপনারা আসচেন কোথা থেকে?

আমি বললাম, বেলডাঙা।

—যাবেন কোথায়?

—যশোর জেলা।

—আপনারা ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু মনে করবেন না। আমাদের খুড়ীমা (আমরা ভাবচি, এই রে! এইবার আসল কথা বলবে) এসেছিলেন ঘাটে নাইতে। তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, দুটি ব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের বাড়ীর সামনে উনুন খুঁড়ে রেঁধে খেতে যাচ্চে এই দুপুর বেলা। ওঁদের গিয়ে বাড়ীতে ডেকে আনো। তা আপনারা দয়া ক'রে চলুন আমাদের ওখানে। আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি।

আমরা তো অবাক। এমন কথা বিদেশে কখনো শুনি নি। লোকে একটু শোবার জায়গাই দিতে চায় না, আর কি না রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইচে। সত্য বললে, ও দাদা।

—কি?

—যাবে নাকি ?

ছোকরা দুটি বলে—যেতেই হবে। খুড়ীমা নইলে ছাড়বেন না। আমাদের হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে আপনাদের। সে বলাই, ওঁদের বোঁচকা দুটো তোল—

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, সত্য আর আমি। আমাদের কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলে না ওরা, নিয়েই গেল। একতলা কোঠা বাড়ী, বাড়ীর উঠানে ডান দিকে দুটো বড় গোলা, তার পাশেই গোয়ালবাড়ী, সামনে ছোট বৈঠকখানা। আমরা বাড়ীর উঠানে পা দিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্লেন—আসুন আসুন—আপনারা ব্রাহ্মণের ছেলে, এই দুপুর বেলা বাড়ীর সামনে বেঁধে খাবেন, এ কখনো হয় ? বড় বৌমা দেখে এসে বললেন, ওঁদের নিয়ে এসো বাড়ীতে। আসুন, বসুন—

আমরা তত লেখাপড়া জানিনে, চাষবাস করে খাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের মিশতে ভয় হয়। বিশেষ করে তো সত্যর। সে গরুর গাড়ী চালায়, সে বললে—দাদা, এগিয়ে যাও—

এগিয়ে গেলাম আমিই।

ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। পা ধোয়ার জল এনে দিলে। তারপর এল চা আর জলখাবার। ফলমূল আর ঘরের তৈরী ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেল নাড়ু।

কর্তার নাম হরিচরণ সেন; ওঁরা জাতে বৈদ্য। আমাকে বললেন—রান্না অবিশ্যি আপনাদেরই করতে হবে। স্নান করে নিন আগে।

সত্য বললে, তুমি রান্না কর গিয়ে দাদা। ওঁদের বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘর, আমার লজ্জা করে—

স্নান সেরে অগত্যা আমাকেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে।

সেই সুন্দরী বৌটি দেখি সেখানে উপস্থিত। মুখের ঘোমটা খুলেছেন। সুন্দর মুখ। তেমনি কাঁচা হলুদের মত রং। আমার দিদির বয়সী হবেন, আমার ইচ্ছে হতে লাগলো প্রণাম করবার। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, ওঁরা বৈদ্য, কি মনে করবেন।

আমি বল্লাম, দিদি, আপনার বড় দয়া।

দিদি মুখের ঘোমটা আরও খুলে বল্লেন, দয়া কিসের ? ওকথা বল্লে আমাদের পাপ হয় না ? বলতে আছে ? ছিঃ—

—না বলেও তো পারছি নে দিদি।

—না, বলতে হবে না। রান্না করতে জানেন ?

আমি হেসে বল্লাম, পারি নে তো ক'রে খাচ্ছি কি ক'রে, হ্যাঁ দিদি ? আমার ভাই বাইরে বসে আছে, সে আরো ভালো রান্না করতে পারে।

—কই তিনি বাইরে বসে আছেন কেন ? ডেকে আসুন গিয়ে, দেখি কেমন রাঁধেন।

—সে আসবে না, বড় লাজুক।

—আপনার ছোট ?

—পাঁচ সাত বছরের ছোট।

—ডেকে আনুন। আমি রান্নার জিনিসপত্তর আনি। ভাল রান্না করতে পারবেন তো?

—খুব।

জিনিসপত্র যা তিনি আনলেন, তা অনেক রকম। চাল, ডাল, ঘি, দুধ, আলু, বেগুন, কইমাছ। বল্লেন, সরুন, আমি কুটে বেছে দিই। ভালো কথা, আপনারা যে মাছ কিনেছিলেন, সে মাছটা ভালো না, পচা। সেটা কুটে ঝাল দিয়ে রান্না করতে দিয়েছি। ও মাছ আপনাদের খেতে দেবো না। বিদেশী লোক, পচা মাছ খেয়ে অসুখ-বিসুখে পড়বেন শেষকালটাতে। সে হবে না বাপু।

—একদম পচা? আমি কিনি নি, সত্য কিনেচে।

—ছেলেমানুষ, ঠকেছে। কই তাকে ডাকুন না।

—সে আসবে না দিদি। সে থাকুক বসে বাইরে। বড্ড লাজুক। খেয়ে উঠবে এখানে এসে। তা ছাড়া, আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যসুখ্য বামুন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে মিশতে আমাদের লজ্জা হয়। আপনাকে দিদির মতো দেখছি বলে কোনো লজ্জা হচ্ছে না, কিন্তু অন্য জায়গা হোলে—

—সে কথা থাক। আপনি কি রকম রাঁধেন দেখবো—মাছের ঝোলে কি বাটনা দিতে হবে বলুন তো?

—জানি নে। কখনো তো রাঁধি নি।

—বিদ্যে বুঝেচি। আচ্ছা, আমি সব বলে দিচ্চি, আপনি রেঁধে যান। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েচে আপনাদের।

দু'ঘন্টা ধরে তিনি বসে বসে আমাকে দিয়ে রাঁধালেন। কখন মাছ ভাজতে হবে, কখন কি বাটনা কিসে দিতে হবে, সাঁতলাবার সময় কি ফোড়ন দিতে হবে। দুধ নিয়ে এলেন প্রায় দেড়সের। পায়েস করতে হবে নাকি। আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম—আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

তিনি বল্লেন—তা ভালো, থাক, খিদেও পেয়েছে আপনাদের, বুঝতে পারচি। ওবেলা হবে।

আমি একটু আধটু গান করতে পারতাম। বিকাল বেলা আমার সে বিদ্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো আমার ভাইয়ের মুখ থেকে। সন্ধ্যার পরে এল হারমোনিয়ম ও ডুগি-তবলা। আমার গান শুনে অনেকে সুখ্যাতি করতো তখন। গান ভালই গাইতাম। রাত্রে রান্না করবার সময় দিদি বল্লেন—আপনি এমন চমৎকার গান গাইতে পারেন ভাইটি?

সলজ্জ সুরে বল্লাম, কি এমন গান?

—আপনাকে এখন ছাড়চি নে। থাকুন দিন কতক এখানে। রোজ গান শুনবো।

—সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু দিদি আমার যে থাকবার জো নেই, পড়ে গিয়েছি এক ফেরে।

—কি কেন ?

আমি রাম্‌হ হাড়ির গরু চুরির বৃত্তান্ত আগাগোড়া বল্লাম।

দিদি সব শুনে গালে হাত দিয়ে কি চমৎকার সুশ্রী ভঙ্গী ক'রে বল্লেন, ওমা আমি যাবো কোথায় !

সুন্দরী মেয়ে, কি অপূর্ব্ব সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওই মুহূর্ত্তটিতে !

বল্লাম—আপনি তো দেবীর মত। কেউ জায়গা দিতে চায় না বিদেশী দেখে। তিন রাত কি কষ্ট পেয়েছি দিদি ! আপনার মত মানুষ ক'জন, যে রাস্তা থেকে লোক ধরে বাড়ী নিয়ে এসে খাওয়ায় ? আপনি বুঝতে পারবেন না মানুষ কত দুষ্টু হতে পারে।

দিদি হেসে বল্লেন—আমার একটা সাধ ছিল—আপনি দিদি বলে ডেকে সে সাধ আমার পূরতে দিলেন কই ?

—কেন ? কি সাধ ?

—জানেন, আমার অনেক দিনের সাধ ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের বাড়ী আসবেন, আমি তাঁর পা ধুয়ে দেবো নিজের হাতে—কিন্তু আপনার বেলা তা করতে পারলাম না। দিদি বলে ডাকলেন।

—সে আমাদের মত ব্রাহ্মণ নয় দিদি। আমরা চাষবাস ক'রে খাই। লেখাপড়া জানিনে। আমাদের কথা বাদ দিন।

—তাতে আমার কি ? আপনি কি করেন আমাদের দেখবার দরকার কি ? যাক গে। এখন বলুন ক'দিন থাকতে পারবেন ?

—কালই যাবো।

—কাল যাবার কথা ভুলতে হচ্চে। পরশু বিবেচনা করে দেখা যাবে। এখন বলুন তো, মাংস খান তো ?

—খাই।

—শুনুন, কাল রাত্রে লুচি মাংস করবো। লুচি আমি ভাজবো, তাতে কোনো দোষ নেই—আপনি শুধু মাংসটা রেঁধে নেবেন।

—আপনি যখন দিদি, মাংস রাঁধলেনই বা—

—সে হবে না। ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাওয়াতে পারবো না এ বাড়ীতে—

—বড্ড সেকেলে আপনি। ঠাকুমা দিদিমাদের মত সেকেলে। বলুন ঠিক কি না ?

দিদি শুধু হাসলেন, কথার উত্তর দিলেন না।

পরদিনও পরম যত্নে-আদরে কাটলো ওঁদের বাড়ী। সন্ধ্যার আগেই গানের ব্যবস্থা হ'ল। বাড়ীর মেয়েরা আড়াল থেকে গান শুনলেন। আমি অনেকগুলো গান গাইলাম। রান্নাঘরে যেতেই দেখি দিদি গরম চা নিয়ে বসে আছেন। বল্লেন—বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মাংসটা চড়িয়ে দিন। মেখে চুকে ঠিক ক'রে রেখেছি। করে নিন আগে। শুনুন, পেঁয়াজ দিই নি কিন্তু।

—কেন, আপনাদের পেঁয়াজ চলে না ?

—আমাদের চলে। আপনাদের চলবে কি না—

—খুব চলে। দিন পেঁয়াজ বাটা—

—কি সুন্দর গান গাইলেন আপনি! সত্যিই চাষবাস করেন ?

—সত্যি। গান গাইলে চাষবাস করা যায় না, হাঁ৷ দিদি ?

দিদি হেসে চুপ করে রইলেন। অনেক সময় কথার উত্তর না দেওয়া ওঁর একটা স্বভাব। পরদিন সকালেই আমরা দু'জন ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম।

দিদি ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে আর সত্যকে বসিয়ে শশাকাটা, কলা, শাঁকআলু, ক্ষীরের ছাঁচ ইত্যাদি রেকাবিতে সাজিয়ে সামনে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে সত্যি জল এল আমার। বার বার বলে দিলে—আবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি! বেনুর বিয়ে হবে বোশেখ মাসে, সেসময় চিঠি যাবে। ভুলবেন না দিদির কথা।

আসবার সময় কর্তাকে বল্লাম—দিদির মত মানুষ দেখিনি কর্তামশায়—

বৃদ্ধ বল্লেন—বড় বৌমা তো ? এ বাড়ীর লক্ষ্মী। ওঁর থেকেই সংসারের উন্নতি। উনি আসার পর থেকে সংসার যেন উথলে পড়লো। আর মা'র আমার কি দয়া! পাড়ার কেউ অভুক্ত থাকবে না। সব খবর নিজে নেবেন। দু'তিনটি স্কুলের ছেলেকে মাইনে দিচ্ছেন এই পাড়ার। যে এসে ধরবে, 'না' বলতে জানেন না। মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। রূপে গুণে লক্ষ্মী।

ভুলি নি তাঁর কথা।

আজ চোদ্দ বছর হয়ে গেল। এখনো মনে জল জল করচে সে মূর্ত্তি।

আর সেখানে যাওয়া হয় নি। কোন খোঁজখবরও নেওয়া হয় নি।

আজ কেন একথা মনে উঠলো এতদিন পরে, বলি সে উপসংহারটি।

দিন পাঁচ-ছয় আগে আমার ভগ্নিপতি মনোমোহন রায় দফাদার সেই রামু হাড়িকে গ্রেপ্তার ক'রে বিকেলবেলা আমার বাড়ীতে নিয়ে হাজির। রামু হাড়ি জয়দিয়ার বাঁওড়ের ধারে শুওরের পাল চরাচ্ছিল—এখান থেকে এগার মাইল দূরে। মনোমোহন থানায় হাজিরা দিতে যায় রোজ বৃহস্পতিবারে এই পথ দিয়ে। রামু হাড়িকে দেখে চিনতে পেরেচে এবং চৌকিদার দিয়ে তক্ষুনি গ্রেপ্তার করিয়ে আমার এখানে নিয়ে এসেছে। রামু এসে বসে চারিদিকে চেয়ে বল্লে—এঃ, বাবুদের বাড়ী এ কি হয়ে গিয়েচে ? চণ্ডীমণ্ডপ নেই, গোলা নেই—কোঠা ভেঙে গিয়েচে। লাঙ্গল-গরুও নেই দেখচি।

আমার মাকে দেখে বল্লে—মা ঠাকরুন এত বুড়ো হয়ে গিয়েচেন ? আপনাকে যে আর চেনাই যায় না। ছোটবাবু কই ?

মা বললেন—সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে আজ আট বছর—সে চলে যাওয়াতেই তো

সংসার একেবারে গেল। কিছু নেই আর সে সংসারের।

আমি বললাম—রাসু, গরুজোড়া চুরি করিছিলি তুই ?

রাসুও বুড়ো হয়ে পড়েচে। মাথার চুল বিশেষ কাঁচা নেই। গোঁপ সম্পূর্ণ পাকা। একটু কুঁজোমত হয়ে পড়েচে।

একটু চুপ করে থেকে বললে—হ্যাঁ বাবু। মিথ্যে বলে আর কি হবে ? গরু নিয়ে গিয়ে একটা গাঁয়ের হাটে বিক্রি করি।

—দেশে যাস্ নি ?

—না বাবু, সেই টাকা নিয়ে সোজা রাজসাহী চলে যাই। ভয়ে দেশে ফিরি নি।

—কেন চুরি করলি ?

—অদেষ্ট বাবু। সবই অদেষ্টের লিখন। তখন বয়েস কাঁচা ছিল, বুদ্ধি ছিল না। দুঃখু তো ঘুচলো না, সব রকমই ক'রে দেখলাম, বাবু। এখন রাতুলপুরের হরিপদ সর্দারের শুওর চরাই। বোল টাকা মাইনে আর খাতি দ্যায়। বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কনে যাবো এ বয়েসে—চকি ভালো দেখতি পাইনে—

মা বললেন—রাসু দুটো খাবি ? হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে ওবেলার। দুটো খা—বোধ হয় আজ তোর খাওয়া হয় নি ?

জগদানন্দপুরের সেই দিদির কথা অনেকদিন পরে আবার মনে এল। ভুলেই গিয়েছিলাম বটে। এখন মা'র ওই কথায় জগদানন্দপুরের দিদির সেই দেবীর মত মূর্তিখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভুলি নি দেখলাম, এতটুকু ভুলি নি। বাইরে ভুলেছিলাম মাত্র। কি জানি, এতদিন পরে বেঁচে আছেন কি না।

মনোমোহনকে বললাম—ভায়া, আর চোদ্দ বছর পরে ওকে গ্রেপ্তার করে কি করবে ? ছেড়ে দাও ওকে। এখন ও যেমন গরীব, আমিও তেমনি গরীব। ওকে জেলে দিয়ে আমার কি আর দুঃখু ঘুচবে ?

রাসু হাউ হাউ কেঁদে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আয় বাবা রাসু, ভাত দিইগে—রান্নাঘরের উঠোনে চল্—তোমারও অদেষ্ট—আমাদেরও অদেষ্ট—চল বাবা—

দৈব ঔষধ

আজ আর তরঙ্গিণী দেবীর কিছুই নেই।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এই গ্রামের শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন তরঙ্গিণী দেবী। শুধু রূপসী নয়, বড় ঘরের বউও ছিলেন, এখন আর কিছুই নেই। এই গ্রামের বড় গাঁতিদার—ঘনশ্যাম রায়চৌধুরী তাঁর স্বামী। অলস্ত রূপ নিয়ে প্রথম যখন তিনি শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে আসেন, তখন তাঁর বয়েস পনেরো। সেকালে এতবছর বয়েসে বিবাহ হোতো না মেয়েদের,

কিন্তু তাঁর পিতামহ ৺রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ খুব ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। কন্যার চৌদ্দ বৎসর বয়েসে বৈধব্যযোগ থাকায় স্নেহময় বৃদ্ধ ওই বয়েসটি পার করেই পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া ধার্য্য করেন।

যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসেন তিনি, ঘনরাম রায়চৌধুরীর পিতা দয়ারাম রায়চৌধুরী জীবিত। নামে দয়ারাম হোলে কি হবে, ইনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক, কঠোর শাসক ও মামলাবাজ। আবার খুব উদারও যে ছিলেন, তার পরিচয় এই রাজীবপুরের অনেকে আজও মনে রেখেচেন। বাড়ীতে কুড়ি-বাইশটা ধানের গোলাতে ধান বোঝাই, অথচ প্রজার কর্জ্জ-নেওয়া সামান্য ধানের জন্যে তাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে (গ্রামের লোকে বলতো 'কাছারী-বাড়ী'), এনে খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিতেন, মারধোর করতেন, মোকদ্দমা মামলা ক'রে তাকে ভিটেচ্যুত করতে চাইতেন।

তরঙ্গিণী এসে দেখলেন তিনি মস্ত-বড় প্রতাপশালী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ। শাশুড়িটি লোক ভাল নন, প্রতি কাজে সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা, সবসময় কাজের খুঁত-কাটা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। তরঙ্গিণী খুব শান্ত মেজাজের বধূ ছিলেন, শাশুড়ির সমস্ত তিরস্কার বিনা-প্রতিবাদে শুনে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করতেন—একথা বলতে পারলেই বেশ শোনাতো বা মানাতো বটে, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হোলো যে, তরঙ্গিণী আদৌ তা ছিলেন না। তিনিও ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, সমানে-সমানে তর্ক-ঝগড়া করতেন। সেকালে এতে লোকে ভালো বলতো না।

স্নেহময় শ্বশুর পুত্রবধূকে কাছে ডেকে বলতেন—শোনো বউমা, ইদিকি এসো। পয়সা খাবা ?

—না।

—কি খাবা ?

—কিচ্ছু খাবো না।

—বোসো এখানে।

—কি বলুন ?

—তোমার শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করচো কেন সকালবেলা ?

—উনি আমার বল্লেন, আমি বাটনা বাটতে জানিনে।

—বলচেন-বলচেন। উনি তোমার গুরুজন। তোমার কি তর্ক করা উচিত ?

—না, উচিত না! আমি ছাড়বো কেন ?

—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। কথাবার্ত্তা বলতি নেই গুরুজনের সঙ্গে, ওতে লোকে নিন্দে করে।

তারপর আরম্ভ হোতো সদুপদেশ—মহাভারতের দু'একটি সতীলক্ষ্মী স্ত্রীলোকের কাহিনী। ওঁর ছেলেবেলায়, একজন বড় ভালো গৃহিণী এ-গ্রামে বাস করতেন, তাঁরও পুণ্য-কথা। সবই মুখে-মুখে। দয়ারাম রায়চৌধুরী বই-টই পড়তে ভালবাসতেন না। বাড়ীতে পাঁজি ছাড়া

অত বইও ছিল না।

এই সময়ে দয়ারামের স্ত্রী জগদম্বা এসে বললেন—আমি বাপের বাড়ী যাবো, গাড়ী তৈরী করে দাও।

—কি হোলো?

—কিছু হয় নি। তোমার আদরের বৌমা নিয়ে তুমি থাকো, আমার এ-সংসারে আর পোষাবে না। অকমান হতি এ-বাড়ী আমি থাকতি পারবো না।

এই সময়ে তরঙ্গিণী মুখে কাপড় দিয়ে খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠতেই জগদম্বা দেবী তেলে-বেগুনে জলে উঠে বললেন—ওই ভাখো…দেখচো? আমার কথায় হেসে হেনস্থা। আমি মানুষ নই! শুনলে?

তরঙ্গিণী তখনও মুখে কাপড়-গোঁজা অবস্থায় বললেন—'অকমান' কি কথা বাবা? 'অকমান' মানে কি?

জগদম্বা দেবী অমনি আঁচলের চাবির গোছা খুলে ঝড়াৎ ক'রে স্বামীর সামনে ছুঁড়ে দিলেন—এই রইলো তোমার চাবি, তোমার সংসার তুমি দেখে নাও—তোমার সোহাগের বৌমাকে নিয়ে তুমি থাকো—আমিও সব্বো চক্কত্তির মেয়ে জেনে রেখো। আমি এ-সংসারে অকমান হতি আসিনি—আসিনি—আসিনি…

গৃহিণী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দয়ারাম বিব্রত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—আরে, শোনো—শোনো—সবাই হয়েছে আমার সমান। কি গেরোতেই পড়েচি বাপু—আচ্ছা বৌমা, আবার তুমি হাসচো! আবার হাসি কিসের? না, এরকম করলে আমাকে সব বেচে কিনে কাশী রওনা হতি হবে দেখচি—

এইভাবেই তরঙ্গিণীর কৈশোর কেটে গেল। তারপর বৃদ্ধ দয়ারাম রায়চৌধুরী একদিন শ্বাসরোগে দেহত্যাগ করলেন। ধনরাম নিলেন বড় গাঁতি ও প্রজাপত্রের ভার। কিন্তু সংসারে শান্তি ছিল না। জগদম্বা দেবী সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক হতে চাইলেই প্রবল বাধা আসতো পুত্রবধূ তরঙ্গিণীর দিক থেকে। ধনরাম রায়চৌধুরী নিজে পিতার মতই দুর্দান্ত শাসক ও মামলাবাজ গাঁতিদার ছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রী বা মা কাউকে পেরে উঠতেন না। সেখানে নিত্য দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তরঙ্গিণী গ্রামের লোককে জিনিসপত্র দিতে ভালবাসেন, যার চাল অভাব তাকে ভাঁড়ার থেকে শাশুড়ীর অজ্ঞাতসারে চাল বার ক'রে দেন। যার কাপড় নেই তাকে নিজের বা শাশুড়ীর পুরানো কাপড় বার ক'রে দিয়ে দেন—এসব আবার জগদম্বা পছন্দ করেন না। গ্রামের অভাবী-লোকেরা বধূকে ভালোবাসে, তার কাছে নিজেদের দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত ক'রে আনন্দ পায়। কিন্তু তারা আবার জগদম্বাকে দেখতে পারে না।

গ্রামে একঘর জেলে আছে, অতি গরীব, নাম মধু জেলে। সে-বার ভীষণ বাদলাবৃষ্টি ভাদ্রমাসে। মধু জেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে অসুখে প'ড়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। একদিন তরঙ্গিণীকে তেঁতুলতলায় ডেকে মধুর মেয়ে কমলি বললে—কাকীমা, বাবা আপনাকে একবার যেতে বলেচে, খোকার বড্ড কষ্ট। বাবা অসুখে প'ড়ে আছে, আমরা খেতে পাইনে—

—কি হয়েচে তোর বাবার ?

—জ্বর হয়েচে।

—ডাক্তার দেখচে ?

কমলা হেসে বল্লে, খেতি পাইনে তার ডাক্তার। আজ চাল নেই ঘরে।

—চল্ আমি দিচ্চি। চুপি-চুপি পেয়ারাতলার জানলায় গিয়ে দাঁড়া। মা বাড়ী আছেন কি না দেখি।

তারপর উঁকি মেরে দেখলেন, শাশুড়ি ঘাটে গিয়েচেন নাইতে, অমনি ভাঁড়ার থেকে চার কাঠা চাল-পূর্ণ একটি ধামা এনে পেয়ারাতলায় এসে কম্‌লির হাতে দিয়ে বললেন—পালা!

কম্‌লি বাঁশবাগান ভেঙে ধামা-হাতে দৌড়েই পালালো।

ঝগড়াতে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সব-সময়েই তাঁর শাশুড়ি পরাজয় স্বীকার করতেন। অমন চোখা-চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগের সাধ্য জগদম্বা দেবীর ছিল না। ছেলে মায়ের দিকে থাকতো ব'লেই জগদম্বা চোখ রাঙিয়ে না হোক, কেঁদেও জিতে যেতেন।

সে-বার ঘনরাম রায়চৌধুরী শান্তিপুরের কাছে এক জমিদারের অধীনে নায়েবী কর্ম গ্রহণ ক'রে সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন।

জগদম্বা বললেন—না। বাড়ী ছেড়ে বৌ নিয়ে যাওয়া চলবে না।

ঘনরাম রায়চৌধুরী আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন—না নিয়ে গেলে, এখানেও তো তোমাদের—

জগদম্বা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—নিজে গিয়ে শাসন করো গে নিজের বউকে। নয়তো নিজে চ'লে যাও—সংসার কি ক'রে শায়েস্তা রাখতি হয়, তা আমি জানি।

তা সত্ত্বেও ঘনরাম বললেন—নিয়েই যাই না হয় এ-বারটা। অনেকদিন এক জায়গায় রয়েচে—

মা বললেন—আমি মরবার আগে তো নয়! সে সুবিধে এখন হবে না।

অগত্যা ঘনরামকে একাই চাকুরীস্থানে চ'লে যেতে হোল।

সে-বার শীতকালে দেশে চারিধারে বড্ড অসুখ-বিসুখ দেখা দিল। শীতের সন্ধ্যায় জগদম্বা অন্যমনস্কভাবে ব'সে আছেন দেখে তরঙ্গিণীর বড় ছেলে প্রতুল জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুমা, এমন ক'রে ব'সে আছো কেন ?

—কিছু না। শরীরটা ভালো না—

—মাকে ডাকবো ?

না, ডাকতি হবে না। হেঁসেল ছেড়ে এখন এলি রান্না-বান্না হবে না।

—দেখি তোমার গা ? একি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে—

—ও কিছু না, পিত্তির ধাত তাই। তুই গিয়ে প'ড়গে যা।

সেইরাত্রেই জগদম্বা দেবী বিষম অসুখে পড়লেন। সংসারের অবস্থা ভালো, বাড়ীর

গোমস্তা রামনাথ গাঙ্গুলী, প্রতুলের আহ্বানে অনেক রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠে এসে কর্ত্রীর হাত দেখে বললেন—জ্বর হয়েছে বেশ। নাড়ী খুব চঞ্চল। ওপী ডাক্তারকে ডাকবো ?

কর্ত্রী ধমক দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ওইটুকু এখন বাকি আছে। এই বয়েসে ডাক্তারী-ওষুধ না গিললি চলচে না। ডাক্তার বাড়ী এলে, কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেবো না ? সারকুমারী-মত করো।

অতএব সারকুমারী-মতে চিকিৎসা চললো। এদিকের পল্লী-অঞ্চলে এই একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। ননী বাগদী, নকুল মুচি প্রভৃতি সারকুমারী-মতের বড় চিকিৎসক। এরা গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে রোগী দেখে। বিনিময়ে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এরা অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ব'লে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাশ-করা ডাক্তারেরা পেরে ওঠে না।

নকুল মুচি একটা বাঁশের চোঙ্গা থেকে গোটা-দশ-বারো পুঁটুলি বার ক'রে বললে—মা ঠাকরোণের কি বড্ড জল তেষ্টা প্যাচ্চে ?

জগদম্বা বললেন—তা পায় বাবা।

—হুঁ। কি খাচ্চেন ?

—ওবেলা সাবু খেয়েছিলাম।

—সাবু খাবেন না। মোদের মতে ও চলবে না। খাবেন, পান্তা ভাত।

—কি খাবো বাবা ?

—আজ্ঞে, পান্তা ভাত।

—তারপর ?

—আগে তোবার ছেন করবেন, তারপর পান্তা ভাত খাবেন।

প্রতুল বললে—হ্যাঁ। তা না হোলে জ্বর-বিকারের সুবিধে হবে কিরকম ক'রে ?

জগদম্বা বললেন—ওকে বলতেই দাও না ভাই।

—আজ্ঞে, মোর বড়ি খেলি, তোবায় ছেন করতি হবে, পান্তা ভাতও খেতি হবে।

—তাই হবে বাবা। তুমি ওষুধ দিও।

জগদম্বার জিদ বজায় রইলো। ফল এই দাঁড়ালো, সারকুমারী-মতে চিকিৎসার তৃতীয় দিনে রোগিনীর অবস্থা দাঁড়ালো এমন খারাপ যে, সারাদিন ধ'রে গ্রামের শূদ্র-ভদ্র সবাই ভেঙে পড়লো বাড়ীতে। অনেকে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতেও লাগলো।

গভীর রাত্রি।

তরঙ্গিণী শিয়রে ব'সে শাশুড়ির সেবা করচেন। ঘনরাম রায়চৌধুরীকে কর্মস্থানে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

বড় মেয়ে রাণী বললে—মা, একটা কথা—

—কী ?

—বাইরে এসো। বলচি।

রাণী বাইরে এসে চুপি-চুপি বললে—মা, বুড়ী আর বাঁচবে না।

—তুই কি বুঝলি ?

—আমি তাই বুঝলাম। এবার সেই ওষুধটা শিখে নাও না কেন ?

জগদম্বা নাকি কোন্ সন্ন্যাসীর কথামত কাজ ক'রে রোগ-মুক্ত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে লোক আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। জীবনে কত অম্লশূলগ্রস্ত রোগীকে যে তিনি ওষুধ দিয়েচেন···কত দূর-দূরান্তর থেকে রোগীরা এসে ওষুধ খেয়ে গিয়েচে। এ ওষুধ দেওয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, রোগীকে স্বয়ং এসে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ওষুধ তুলে বেটে দেবেন, জগদম্বা দেবী স্বয়ং।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ির এ দৈব ওষুধের কথা জানতেন। তবে রোগী তো সব-সময় আসতো না, কালেভদ্রে দু'পাঁচ বছর অন্তর হয়তো কোনোদিন একজন এলো। নিতান্ত দুরারোগ্য রোগ না হোলে কেউ বিদেশে ওষুধ আনতে যেতে চায় না।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—মা।

জগদম্বা ঘুমের ঘোর থেকে সদ্য উত্থানের সুরে ব'লে উঠলেন—অ্যাঁ।

—মা, একটু কমলালেবুর রস দেবো ?

—উঁহুঁ···

—মিছরির জল ?

—উঁহুঁ···

—মা, একটা কথা। আমাকে সেই ওষুধটার কথা ব'লে দেবেন ? সেই দৈব ওষুধটা ?

জগদম্বা দেবী এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন—ঘরে আর কে ?

—রাণী।

—ওকে যেতে বলো। ঘরে কেউ না থাকে।

রাণী চ'লে গেল। জগদম্বা দেবী বললেন—এই শোনো। আমার তখন সোমত্তবয়েস। অম্লশূল রোগ হোলো। ছটফট করছি রোগের যন্ত্রণায়, এমন সময়—অনেক রাত্তিরি—দেখচি কি জানো—এক সন্নিসি এসে আমায় বলচে, তোর রোগ সেরে যাবে, তুই কাল সকালে উঠে অমুক-গাছের শেকড় তুলে এনে—

—কি গাছের শেকড় মা ?

এ-কথার উত্তর জগদম্বা আর ইহজীবনে দিতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঘনরাম রায়চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি টেলিগ্রাম পেয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন। তরঙ্গিণী দেবী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। ভোরের দিকে জগদম্বা দেবী পরলোকে প্রস্থান করলেন।

তারপর অনেকদিন হয়ে গিয়েচে। সংসারের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েচে। রাণীর বিবাহ হয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে গিয়েচে। ঘনরাম রায়চৌধুরী বৃদ্ধ-অবস্থায় বাড়ী ব'সে আছেন।

প্রফুল সামান্য মাইনের চাকুরী করে, বিদেশে থাকে। সে জৌলুস নেই সংসারের। তরঙ্গিণীও বৃদ্ধা।

এ-সময় একদিন জনৈক লোক এসে ঘোড়ার গাড়ী থেকে ওদের বাড়ীর সামনে নামলো। সঙ্গে একটি বৌ, দুটি ছেলে। লোকটি গাড়ী থেকে নেমে একহাতে বুক চেপে ধ'রে এমনভাবে আস্তে-আস্তে বৌটির কাঁধে ভর দিয়ে আসতে লাগলো, যেন সে অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর।

একটু পরেই জানা গেল, লোকটি অম্লশূলের বেদনায় কাতর হ'য়ে বহু দূর থেকে এসেচে। তরঙ্গিণী দেবী অম্লশূলের দৈব ওষুধ জানেন, সে শুনেচে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বল্লেন—মা, বড্ড দূর থেকে এসেচি আপনার নাম শুনে। আপনার এ-দয়া করতেই হবে—

লোকটিও বললে—না দয়া করলে মা, চলবে না। আমার প্রাণ বাঁচান আপনি—বড্ড আশা নিয়ে এসেছি—

তরঙ্গিণী বললেন—তোমরা জানলে কি ক'রে বাবা, যে, আমি অম্লশূলের ওষুধ জানি?

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। রাণীর বিয়ে হয়েচে তাদের দেশে। রাণীর ননদের মুখে একথা ভদ্রলোকের স্ত্রী শুনেছেন। তা-ছাড়া একথা কে না জানে, তাঁদের বাড়ীতে অম্লশূলের বিখ্যাত দৈব ওষুধ আছে?

তরঙ্গিণী সব কথা ভেবে দেখলেন। তিনি যে শাশুড়ির কাছ থেকে ওষুধ পান নি, একথা কাউকে বলেন নি। রাণীকেও কখনো বলেন নি একথা। রাণী শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নিশ্চয় মায়ের গুণের কথা অতিরঞ্জিত ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে থাকবে। খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে তরঙ্গিণী বললেন—আচ্ছা। ওষুধ দেবো বাবা, ব্যস্ত হয়ো না। সে তো কাল সকালে। আজ রাত্রে এখানে সবাই থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো। সেরে যাবে বাবা, কোনো ভয় নেই।

পরদিন খুব সকালে উঠে তরঙ্গিণী রোগীর স্ত্রীকে বললেন—আমার নাতনীকে সঙ্গে দিচ্ছি, তোমার স্বামীকে নদী থেকে নাইয়ে আনো। ওষুধ আমি বেটে রেখে দিচ্ছি।

বাড়ীর পেছনের বনের মধ্যে ঢুকে তিনি একটা কাঁটানটের শেকড় তুললেন। মনে-মনে বললেন—কোনো অপরাধ নিও না ঠাকুর। আমি কিছুই জানিনে—তোমার দয়ায় যেন ওর অসুখ সারে। এতদূর থেকে এসেচে কষ্ট ক'রে···

সেই কাঁটানটের শেকড় বেটে রোগীকে খাইয়ে দিলেন। ওরা দুজনেই চ'লে গেল।

দুমাস পরেই রাণী শ্বশুরবাড়ী থেকে এলো। কথায়-কথায় একদিন মাকে বললে—আচ্ছা মা, পাঁচঘরার ভুবন মজুমদার তোমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল?

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ ক'রে উঠলো। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন রে? হ্যাঁ, একদিন একজন লোক আর তার বৌ এসেছিল বটে। পাঁচঘরা কি ক'ঘরা তা জানিনে। সে এক মজার কথা, সে হোলো কি বাপু—আচ্ছা, তুই তোর শ্বশুরবাড়ীতে ওসব কথা এমন ক'রে—

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই রাণী বললে—ভুবন মজুমদার পরশু আমার শ্বশুরবাড়ী

এসেছিল। সে একদম সেরে গিয়েচে। দিব্যি চেহারা হয়েচে। বললে—তোমার মা আমার আর-জন্মের মা ছিলেন, আমার পুনর্জীবন দান করেচেন। সে কতো কথা। দু'খানা খেজুর গুড় দিতে এসেছিল, বলে—বৌমা, বাপের বাড়ী যাচ্চো, মাকে গিয়ে দিও। তা আমি বললাম, কোনো জিনিস নেওয়ার নিয়ম নেই, নিতে পারবো না। আমার শ্বশুরবাড়ীর দিকে তোমার খুব নাম—

তরঙ্গিণীর কণ্ঠ থেকে কৈফিয়তের সুর মিলিয়ে গেল। মেয়ের কাছে যে-কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর বললেন না।

বারিক অপেরা পার্টি

সকালবেলা।

একজন কাঁচা-পাকা দাড়ীওয়ালা মুসলমান আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—সালাম, বাবু।

—কে তুমি?

—আমার নাম বারিক মণ্ডল, বাড়ী চালকী। আপনার কাছে এট্টু আলাম—

—কেন?

—ধানী জমি কিনবেন?

পঞ্চাশের মন্বন্তর তখনো উগ্র হয়ে ওঠে নি, দিকে দিকে ওর আগমনবার্তা অল্পে অল্পে ঘোষিত হচ্ছে। একটা ব্যাপার শেষ না হয়ে গেলে বোঝা যায় না সেটা কত বড় হোল। সবাই ভাবচে, এ দুর্দিনের অভাব অনটন শীগ্‌গির কেটে যাবে। এ সময়ে ধানের জমি কেনা মন্দ নয়, সামনেই শ্রাবণ মাস, জলবৃষ্টিও বেশ হচ্ছে, কিনেই ধান রোয়া হতে পারে এবারই। চালের দাম পঁচিশ টাকা মণ, তাও সহজ প্রাপ্য নয়। কলকাতা থেকে বোমার ভয়ে পালিয়ে এসে বাড়ী বসে আছি। হয়তো কলকাতা শহর আপানী বোমার ঘায়ে ছত্রাকার হয়ে যাবে; দেশেই থাকতে হবে বরাবর। দেশে ধানী জমির নিতান্ত অভাব, যা আছে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলচে।

বল্লাম—জমি কোথায়? কতটা?

—চালকীর মাঠে। তা বলি আপনার কাছেই যাই, ওঁর জমির যদি দরকার থাকে। সাত বিঘে জমি বাবু। বিক্রি করবে আমাদের গাঁয়ের সোনাই মণ্ডল।

—তুমি তার কেউ হও?

—না বাবু। ওর মধ্যে দু'বিঘে ভিটে জমি আছে, সে জমিটুকুতে আমি খাজনা দিয়ে বাস করি। জমিটা কিনলে আমি আপনার ভিটের প্রজা হবো। দু'টাকা ক'রে খাজনা করি। ধানের জমিটা আপনাকে সস্তায় ক'রে দোবো বাবু। আমাকে ধানের জমিগুলো কিন্তু ভাগে দিতে হবে। আর যদি আপনি নিজে চাষ করেন তো আলাদা কথা—

কলকাতা থেকে নূতন এসে বহুদিন পরে দেশে বসেছি, জমিজমার ব্যাপার তত বুঝি নে। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। চালতীর বাদিক মণ্ডল আমার কাছে এসেচে কিছু জমি বেচতে। ওর জমি নয়, সোনাই মণ্ডলের জমি। ও এসেছে কেন, এতে ওর স্বার্থ কি? না, ও আগে থেকেই এই জমার অন্তর্ভুক্ত দু'বিঘে জমিতে বাস করে, জমি নিলে ও আমার প্রজা হবে এবং আমি ওকে ধানের জমির ভাগীদার করবো। বেশ কথা। বাদিকের চেষ্টায় ও আমার ইচ্ছায় তিনদিনের মধ্যে জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজেষ্ট্রি অফিসে যে দলটি জমি রেজেষ্ট্রি করতে গিয়েছিল বাদিক মুসলমান দেখলুম তার মোড়ল। মহা ফুর্তিবাজ লোক সে। আধ-বুড়ো লোক হোলে কি হয়। দাড়ি নেড়ে নেড়ে পান খাচ্চে, বিড়ি খাচ্চে, বেগুনি খাচ্চে, ফুলুরি খাচ্চে। রেজেষ্ট্রি শেষ হয়ে গেলে বাদিক আমায় ডেকে বল্লে—বাবু এট্টুখানি দোকানে চলুন।

—কোন্ দোকান?

—জল খাবেন এট্টু।

জল খাওয়ানোর প্রথা আছে এদেশে, যে জমি কেনে, সে-ই মনের ফুর্তিতে সাক্ষী ও সনাক্তকারীকে মিষ্টি মুখ করায়। যে জমি বেচে সে তো রিক্ত হয়ে গেল। সে খাওয়াবে কেন? এ কথা তো এদেশে নেই। কিন্তু বাদিকের আনাড়ি ধরণের বিনীত গ্রাম্য অনুরোধ এড়াতে না পেরে খাবারের দোকানে বসলাম।

—দাও, ও দোকানী, বাবুরি (অর্থাৎ বাবুকে) নিমকি, সেদারা, সন্দেশ দাও। আর ওই যে হাদে গোল গোল তোমার, ওকি কি বলে? ওই দাও একপোয়া—লুচি খাবেন বাবু? হাদে বাবুরি লুচি দাও আটখানা, ভাজা নেই? তা ভেজে দাও—

দেড় টাকা খরচ গেল শুধু আমার পিছু। খাবার খরচ গেল টাকা চারেক। বাদিক মহাফুর্তিতে এক টাকার খাবার নিজেই খেলে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবাই মিলে অন্ধকারে বাড়ীর দিকে রওনা হই। বাদিক অন্ধকার পথে গান জুড়ে দিলে চেঁচিয়ে।

'ওগো হরি বংশীধারী শ্যাম নটবর—'

সোনাই মণ্ডল বাজার থেকে বড় দেখে দুটো ইলিশ মাছ কিনেচে, কারণ আজ তার হাতে কড়কড়ে আড়াইশো টাকা। জমি ওরা নাকি খুব সস্তায় দিয়েচে আমাকে। দলিল-লেখক আমাকে আড়ালে বলেছিল—আড়াইশ টাকায় সাত-আট বিঘের জমি কিনেচেন, তার মধ্যে পাঁচ বিঘে আমন ধানের জমি। সাব-রেজিস্ট্রার বাবু এ দলিল এখন মঞ্জুর করলে হয়। দামটা কম বলে মনে হচ্চে কি না—

যাহোক, রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল, কোন গোলমাল হয় নি।

বাদিক মণ্ডল বল্লে—বাবু, আমাদের গাঁ আগে, তারপর আপনাদের গাঁ। এই অন্ধকারে কি ক'রে যাবেন? সোনাই ইলিশ মাছ কিনেচে, আমাদের গ্রামে আজ থাকুন। ইলিশ মাছ রান্না করুক পেঁয়াজ দিয়ে। আজ চলুন একটু ফুর্তি করা যাক—

আমি রাজি হোলাম না। বাড়ী চলে এলাম অন্ধকারে।

বাহির আমার প্রজা হোল। তখন শুনলাম বাহির অপরের জমিতে বাস করতো সে ভিটের খাজনা বহুদিন না দেওয়াতে জমিদার ওর বাড়ী (অর্থাৎ একখানা চালা ঘর) এবং এক জোড়া বলদ বিক্রি করে ক্রোক দেবার উপক্রম করেছিল। তাই ও সে জমি ছেড়ে আমার জমিতে নতুন করে চালাঘর বাঁধলো। আমার নতুন কেনা ধানের জমি ও-ই ভাগে চাষ করবার জন্যে বন্দোবস্ত করে নিলে। সে-বার ধান রোয়া শেষ করলে।

বাহির রোজ সকালে একবার ক'রে আমার বাড়ী ঠিক আসবে। এসে এ-গল্প ও-গল্প ক'রে উঠবার সময় কিছু না কিছু ছুতোয় টাকা চাইবে।

—বাবু—

—এসো বাহির। তামাক খাও।

—বাবু, বড্ড দায়ে পড়ে গ্যালাম। পাঁচটা টাকা দিতে হবে—

—কেন হঠাৎ ?

—আপনার জমিতি বায়মেসে চাষ দিয়ে রেখেচি। মুসুরি বোনতাম। যা হবে আপনার আর্দ্ধেক, আমার আর্দ্ধেক।

—বেশ নিয়ে যাও—

তারপর শুনলাম মুসুরি বুনবার টাকা দিয়ে বাহির ওর গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচে।

একদিন বললাম—মুসুরি বুনলে বাহির ?

—আজ্ঞে বাবু।

—ক'বিঘে ?

—এক বিঘে।

—আর দু' বিঘে ?

—বাবু, আর দু'টো টাকা দিতি হবে। খরচে কুলোচ্চে না।

—মিথ্যে কথা। তুমি তোমার গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচ সেই পয়সা দিয়ে। কোথায় তোমার গানের দল ?

—ওই জেলেপাড়ার জেলে ছোঁড়াদের নিয়ে বসি। রোজ আখড়াই হয়। গান-বাজনা ভালবাসি বাবু। এবার পুজোর সময় 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' নামাবো বারো-য়ারীর আসরে—দেখি যদি খোদার মর্জি হয়—আমার ছোট ছেলে দেই সাজে, তাখবেন কি গানের গলা—কি এ্যাক্‌টো—

—বেশ, বেশ—

—তান বাবু দু'টো টাকা।

—নিয়ে যাও, কিন্তু মুসুরি ঠিক বুনবে।

—তা আর বলতি ? কাল সকালেই বাকি দু'বিঘে সাফ করবো।

ধানের সময় আমার ভাগে যে ধান দেওয়ার কথা, বারিক আমাকে তা দিলে না। অনেক কম দিলে। লোকে বল্লে—বাবু, ও ওই রকম। কত লোককে ফাঁকি দিয়েচে, আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে ফাঁকি তো দেবেই।

খুব রেগে বারিকের বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখে-শুনে বেশী রাগ রইল না। কি মুশকিল, এই রকম বাড়ীঘর ওর! মাত্র একখানা চারচালা ঘর। ঘরের দরজা-জানালার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো, দোর পর্য্যন্ত নেই ঘরের। ওর দলিজে বিছানো আছে একখানা বেদে-চটা অর্থাৎ খেজুর পাতার বোনা পাটি, একটা কলক-ধরা তামার বদ্‌না, একটা হুঁকো আর তামাক, টিকে রাখবার মাটির পাত্র। একখানা অত্যন্ত ছেঁড়া ও ময়লা রাঙা নরুন-পাড় শাড়ী চালে শুকুচ্চে। চালের অগ্রভাগে একটা কুমড়ো গাছ উঠেছে। উঠোনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ী। সবশুদ্ধ মিলে অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা।

কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি রাখতে গেলে ভাব-প্রবণ হোলে চলে না। আমি কড়া সুরে বল্লাম, মোটে দু'বিশ ধান পেলাম তিন বিঘে জমিতে? আমার সবশুদ্ধ বাইশ তেইশ টাকা নিয়ে এসেচ, তার বদলে ধান দাও। আর বছরের ভিটের খাজনা দু'টাকা তাও শোধ করো। নইলে কালই নালিশ ঠুকে দেবো।

বারিকের দুটি ছেলে, বড়টির বয়স আঠারো-উনিশ, ছোটটির চোদ্দ পনেরো। তারা বাবার কাছেই দলিজে বসে গল্পগুজব করছিল। চট করে একখানা খুরসি পিঁড়ি এনে বড় ছেলেটা আমায় বসতে দিলে।

বারিক বল্লে—যা, কাঁটালপাতা কি কলার পাতা নিয়ে আয়, বাবু তামাক খাবেন। ওরে আলি শীগ্‌গির ছোট্।

—থাক আমার তামাকের দরকার নেই। ধান বের করো বাকী টাকার—

—ঠাণ্ডা হোন বাবু। তামুক খান আগে—

বারিক নিজে তামাক সেজে দিলে।

বল্লাম—তোমরা ছেলেরা কি করে?

—বড়টি গরু চরায়। ওরা দু'জনে ভালো গান গায়। শুনিয়ে দে বাবুকে একখানা গান।

—থাক, গান এখন দরকার নেই, তুমি ধান বের করো।

—দেবো, বাবু দেবো।

—আর খাজনা? আজ সব শোধ করে দিতে হবে। নইলে নালিশ হবে জান?

—দেবো বাবু, দেবো, তামাক খান।

একটু পরে বারিক ও তার দুই ছেলেতে ধরাধরি ক'রে দুবস্তা ধান বার ক'রে নিয়ে এল। বারিক বল্লে, বাবুর এই ধানগুলো ওঁর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতি হবে—গরু দু'টো খুঁজে নিয়ে এসে গাড়ী জুতে দে।

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—কত ধান?

—আড়াই বিশ।

—সাড়ে সাত মন? এতে তো শোধ হবে না দেনা।

—বাবু, আমার কিরে, ঘরে আর ধান নেই। সব দেলাম আপনাদেরে। আর কিছু নেই, আপনি দেখে আসুন ঘরে।

—তোমার ধান রইল না?

—না বাবু, সব দেলাম।

—তুমি ছেলে-পিলে নিয়ে খাবে কি?

—তা' আর কি করবো বাবু। আমি নালিশকে বড্ড ভয় করি।

ওর কথা আমার বিশ্বাস হোল না।

দুই বস্তা ধান গরুর গাড়ী ক'রে ওরা আমার বাড়ী পৌঁছে দিলে।

দু'দিন পরে বারিক তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে দেখি কোথায় যাচ্ছে। বারিকের বগলে বেহালা।

বল্লাম, ও বারিক কোথায় চল্লে?

—আজ্ঞে বাবু সালাম। মহল্লা দিতে যাচ্ছি।

—তুমি কি বেহালা বাজাও?

—ওই অমনি একটু একটু। খোদার মর্জিতে।

জেলেপাড়ায় ওদের দলের ঘরে একদিন গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হোলাম। বাঁওড়ের ধারে একটা জাম গাছের ছায়ায় লম্বা দোচালা ঘর, কঞ্চির বেড়ার দেওয়াল, বসবার জন্যে খান চারেক পুরনো মাদুর, এককোণে দু'জোড়া ডুগি-তবলা, একখানা খোল, এক জোড়া মন্দিরা, গোটা দুই খেলো হুঁকো টাঙানো বাঁশের খুঁটির গায়ে। জন-পাঁচ ছয় লোক জুটেচে, বাকি এখনও আসে নি। আমাকে ওরা সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। বটতলাতে বসলাম। সামনে বাঁওড়ের স্বচ্ছ জলে পদ্মফুল আছে। লম্বা লম্বা জলজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি বালি মাটির পথ গিয়ে জলের ঘাটে নেমেচে; পানকৌড়ি বসে আছে পাটা-শেওলার দামে। ওপারে কাজি সাহেবের দরগা, ভাঙা পাঁচিলে মস্তবড় জিউলি গাছ বেড়ে উঠে সমস্ত দরগা ঘরের ওপর ঝুপসি ছায়া পড়ে আছে, আঠা ঝরে পড়চে গাছটার কাঁধ থেকে—খানিকটা সাদা, খানিকটা লাল—আঠা ঝরে ঝরে দরগা ঘরের পশ্চিম দিকের পাঁচিলের কোণটা একেবারে ঢেকে গিয়েচে। দরগাতলার ঘাটের ওপারে আমিনপুর গ্রামের কৃষক-বধূরা মাটির কলসী কাঁখে জল নিতে যাওয়া-আসা করচে।

একজন তামাক সেজে কলকে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—তামুক সেবা করুন—একটা কলার পাঁটা কি এনে দেবো?

আমি তামাক খেতে খেতে বল্লাম—তা' একটু গান-বাজনা হোক তলি।

সে বল্লে, বারিক এখনো আসে নি। সে না এলে আরম্ভ হবে না বাবু। সে হোল বেয়ালাদার। এ দলই তার। এর নাম বারিক অপেরা পার্টি।

—বাঃ বাঃ, নাম দিয়েচে কে?

—বাবু, মোরা তো ইংরিজী জানিনে। অন্য অন্য যাত্রাদলের কাগজে যেমন লেখা থাকে, তাই দেখে মোরা একটা মিল খাটিয়ে করিচি। ভাল হয় নি?

একটু পরে বারিক এসেও সেই কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বল্লাম—নামের মত নাম একটা হয়েচে বটে। খাসা নাম।

—গান শুনিয়ে দে, বাবুরি তামুক সেজে দে।

ব্যস্তসমস্ত বারিককে ঠাণ্ডা ক'রে আমি তাকে বেহালা বাজাতে বল্লাম। ওর দুই ছেলে বেশ গান গায়। ছোট ছেলে কৃষ্ণ সাজে, বেশ কালো নধর চেহারাটি। তাকে বারিক বল্লে গান ক'রে আমায় শুনিয়ে দিতে। সে বগে হাত দিয়ে তারস্বরে শোনাই যাত্রার এক গান আরম্ভ করলে :—

ওরে ও কিছান ভাই,
আমি হেথা বলে যাই
গওয়েতে শোন সেই বাণী—

বল্লাম—বেশ, বেশ। কৃষ্ণের গান?

বারিক ধমক দিয়ে বল্লে—মানভঞ্জন পালার সেই গানখানা গা—আমার সঙ্গে ধর্।

বলে নিজেই বগে হাত দিয়ে আরম্ভ করলে—

ধনি, কি সুখে রাখিব পরাণ,
কানু হেন গুণনিধি, গেহে না আইল যদি
অঝোরে বহিল দু'নয়ান—
(ও) নয়ন যে বহে যায়
গুণমণির বিরহ-জ্বালায়
নয়ান যে বহে যায়—

বারিক গান করে মন্দ নয়। খানিকক্ষণ থেকে আমি চলে এলাম। জ্যোৎস্নারাত ছিল। বারিক কি আসতে দেয়? বসুন বসুন। চন্দ্রাবলীর গান একটা শুনে যান না? আমি নিজে শিখিয়েছি।

রাত এগারোটার সময় দেখি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বারিক বাড়ী ফিরচে বন-জঙ্গলের পথ দিয়ে। বারিকের বাড়ী চালকী গ্রামে, ওদের যেখানে বাঁওড়ের ধারে গান-বাজনা হয়, বারিকের বাড়ী থেকে সে জায়গা দেড় মাইলের ওপর। এই পথের অধিকাংশই ঘন বন-জঙ্গলে ভরা, সাপখোপের ভয় তো নিশ্চয় আছে এত রাত্রে।

বারিককে ডেকে বল্লাম—আলো নিয়ে যাও না কেন বারিক?

বারিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বল্লে—কে, বাবু? এখনো জাগন্ত আছেন? আর বাবু

আলো! কেরাচিন তেল কনে পাবো? কেরাচিন তেল অভাবে অন্ধকারে ভাত খেতে হচ্চে রোজ রোজ। গান কেমন শোনলেন? আগাগোড়া নিজে শেখানো বাবু। ওরা সব জেলে-মালো, বেতালা বেসুরো গান গাইতো। হাতে-নাতে শেখালাম বাবু—

বারিক এমন ভাব প্রকাশ করলে যেন সে স্বয়ং কৈয়াজ খাঁ।

আমি তাকে এক আঁটি পাকাটি দিয়ে মশাল জেলে নিয়ে বাড়ী যেতে বল্লাম।

হাটে ওদের গ্রামের সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা—যে সোনাই মণ্ডল তার ধানের জমি আমার কাছে বিক্রি করেছিল। বেগুন বিক্রি করছে দেখে বল্লাম—সোনা ভাল আছ?

—আজ্ঞে হাঁ, একরকম বাবু।

—বেগুন ভাও দু'সের।

—বাবু, একটা কথা আপনাকে বলতাম। বারিকের অবস্থা যে খুব খারাপ হোল, আপনি মনিব, আপনাকে না বল্লি আর কাকে বলি।

ভাবলাম, বারিকের বোধ হয় খুব অসুখ হয়েচে। কিন্তু দু'চার দিন আগে তাকে গান ক'রে বাড়ী ফিরতে দেখলাম যে। কি হয়েচে তার?

সোনাই বল্লে, তা না বাবু। ওর বড় দুর্দ্দিশা হয়েচে। আপনার কাছে এক মুঠো টাকা দেনা ছিল। আপনি ধানগুলো নিয়ে গেলেন। আর ঘরে খোরাকির ধান রইল না। ধার কাছে নেবে, তা আর ফেরত দেবে না এই ওর দোষ। নন্দে নাপিতের আর রামচরণ ময়রার গোলা থেকে আর বছর সয়ানে ধান কর্জ্জ নিয়েচে, একটি দানা শোধ করেনি। সেদিন নালিশ করে রামচরণ ময়রা ওর বলদ ক্রোক দিয়ে নিয়ে গিয়েচে গত সোমবারে। ধান কর্জ্জ পাচ্চে না কারো কাছে, একবেলা খেতে পাচ্চে একবেলা খাওয়া জোটচে না। বস্তুর আবাদে ওর ইস্তিরির ঘরের বার হওয়ার উপায় নেই। ছেলে দুটো আহম্মদ দফাদারের বাড়ী ওবেলা দুটো ভাত খেয়েছে। খামী ইস্তিরির বোধ হয় খাওয়াও হয় নি আজ।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—সে কি কথা! গত সোমবারে ওর গরু ক্রোক হয়েছে বলছো, সেই সোমবার সন্দের সময়েই যে ওকে বারিক অপেরা পার্টির ঘরে মহা আনন্দে দুই ছেলেকে নিয়ে গান করতে দেখেচি?

—তা দেখবেন বাবু। ও যে ওই রকম লোক। কাল কি খাবে সে ভাবনা নেই—দেখুন গিয়ে দুই ছেলে নিয়ে বেহালা বাজাচ্চে—

—ধান নেই ঘরে?

—এক দানা নেই বাবু।

—ওর মহাজনের কাছে কর্জ্জ করে না কেন?

—ওই যে বল্লাম বাবু, সে দিকি যাবার যো আছে? মহাজনের ঘরে সতেরো পল্লি ধান কর্জ্জ নিয়েছিল, তার এক খুঁচি ধান শোধ করে নি। দেনায় মাথার চুল বিক্কি। ধার নেবে তারে আর দেবে না। কথার একদম ঠিক নেই। কেউ বিশেস ক'রে আর দেয় না।

এর কিছুদিন পরে বারিক আমার কাছ থেকে দশটা—টাকা ধার নিয়ে গেল। কলাই

বেচে টাকা শোধ করবে এই শর্তে তাকে টাকা ধার দিলাম। ক্ষেতের কলাই, মুগ সব যে যার বিক্রী ক'রে ফেললে, বাহিক আমার সঙ্গে আর দেখাও করলে না। একদিন হাটে খবর পেলাম বাহিকের কলাই, মুগ আহম্মদ দফাদার সব কিনে নিয়েচে। শুনে আমার ভয়ানক রাগ হোল। বাহিকের বাড়ী পরের দিন সকালেই গেলাম। বাহিকের প্রতিবেশী তোফাজ্জেল বল্লে—বাবু, শীগগির যান, সে এখনো তার দলিজে বসে তামুক খাচ্ছে, আপনি যাচ্ছেন শুনলি পেলিয়ে যেতে পারে। পাওনাদার এলেই পালাবে। ওর স্বভাবই ওই।

বাহিকের ঘরদোরের অবস্থা আরও ছন্নছাড়া, চালের খড় গত বর্ষায় পচে ঝুলে পড়েচে, উঠোনের মাঝখানে মুগ কলাই মাড়বার খামার, এক পাশে ভুষি স্তূপাকার হয়ে আছে। গাড়ী-গরু নেই উঠোনে।

বাহিক আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। মুখ ওর শুকিয়ে গেল।

—আসুন, বাবু, সালাম। দলিজে'ওঠে বসুন। ওরে আলি, খুরসি পিঁড়িখানা বাবুরি পেতে দে—

—থাক গে পিঁড়ি। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে। মুগ কলাই বিক্রি হয়েচে?

—হ্যাঁ বাবু।

—আমার টাকা দাও—

—ট্যাকা এখনো মোর হাতে আসে নি বাবু।

—মিথ্যে কথা। কার কাছে বিক্রি করেচো? আহম্মদ দফাদারের কাছে তো? সে 'সংবাদ আমি রাখি। আহম্মদ কারো পয়সা বাকী রাখবার লোক নয়। টাকা বের করো—

বাহিক নির্বিকার ভাবে আমার জন্যে তামাক সাজতে লাগলো। তামাক সাজা শেষ ক'রে আমার দিকে কলকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে, তামুক সেবন করুন—

—আমার কথার উত্তর দাও।

—আপনি মেথ্যা বলেচেন। টাকা ওরা দিইছিল, তা সংসারের জ্বালা, সে টাকা মোর খরচ হয়ে গিয়েচে। তবলা ছাইতে খরচ হোল তিন টাকা। বেহালায় তার এনেলাম মুকুন্দ তেলির দোকান থেকে—

—ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনে। খেতে পাও না, মহাজনের দেনা শোধ করবার যখন ক্ষমতা নেই, তখন অত শখ কেন? বাড়ীঘরের তো এই অবস্থা। গাড়ী-গরু কি হোল?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ওর প্রতিবেশীদের মধ্যে কে একজন। আমার চড়া সুর শুনে অনেকে জড়ো হয়েছিল ওর ঘরের সামনে। বল্লে—ওরে আর কিছু বলবেন না বাবু। লোকটার আর কিছু নেই—

—গাড়ী গরু কি হোল?

—রামচরণ মন্ডল গরু ক্রোক দিয়ে নিয়ে গেল, গাড়ীও বিক্রি করে ফেলেচে আহম্মদ দফাদারের কাছে। গাড়ী গরু না থাকলে চাষার উঠোন মানায়? বলি ও চাচা, বাবুর কাছে

থেকে টাকা আনলে কেন, যদি শোধ করতে পারবা না? ভদ্রলোকের কাছে কথা ভাঙো কেন তুমি? একেবারে নেশায় ধরেচে তোমায়—ছ্যাঃ—জুয়োচুরি করা কেন?

বারিক মুখ চুন করে বসে রইল, আর সকলের হাতে হাতে কলকে পরিবেশন করতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে চলে এলাম। বারিক কোনো কথা গায়ে মাখে না, কে যেন কাকে বলচে।

বারিকের বাড়ী কিছুদিন আর গেলাম না। টাকা আদায় হবে না জানি, ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। টাকা-কড়ির সম্পর্ক ত নয়ই।

বারিকের সঙ্গে মাস দুই পরে একদিন হাটে হঠাৎ দেখা। কাঁধে একখানা ময়লা গামছা, পরণে ছেঁড়া আধময়লা ধুতি লুঙির মত ক'রে পরা। সদা-হাস্যমুখ বারিক আমাকে দেখে বল্লে, বাবু, সালাম। আমাদের ওদিকি আর যান না?

—না। আমার অন্য কাজ আছে।

—আজ একবার মহলাঘরে যাবেন বাবু ও-বেলা? দুটো গান শোনাতাম আর দেখতেন আমাদের 'সাধন সমর' পালাটা কি রকম হোলো। আজ পুরো মহলা হবে। পরশু গান হবে আরামডাঙায় বিশেষদের বাড়ী।

—আমার সময় হবে না।

—ও কথা বলি বাবু শুনচি নে। আসুন দয়া করে। আপনারে গান শোনাতে বড্ড ভাল লাগে। যাবেন বাবু।

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সন্ধ্যায় কিছু আগেই বাঁওড়ের ধারে ওদের বারিক অপেরা পার্টির মহলাঘরে গিয়ে বসলাম। বারিক ও তার দুই ছেলে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এল। তখন বাঁওড়ের দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়ায় বড্ড শীত করচে, সময়টা মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। বারিকের গায়ে একখানা বহু পুরনো ছিটের চাদর। জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি বাইরেই বসে রইলাম। বারিক মহাব্যস্ত অবস্থায় কখনো গান করে, কখনো এর গানের ভুল ধরে, ওর তালের ভুল ধরে, হাসি ঠাট্টা ও অঙ্গভঙ্গি কি ভাবে করতে হবে বিদূষকের ভূমিকায় তা শিক্ষা দেয়, ছেলেকে শিখিয়ে দেয় কৃষ্ণের ভূমিকায় কি রকম বেঁকে দাঁড়াতে হবে, এর দোষ ধরে, ওর গুণ গায়—মোট কথা এই বয়সে তার উৎসাহ, আমোদ, লম্ফঝম্প একটা দেখবার জিনিস।

আবার বাইরে এসে আমার কাছে বসে, বাবু বিড়ি খান একটা। ভাবচেন কেমন? আমার নামে যখন এ দল, তখন বারিক অপেরা পার্টির নাতে বাইরে নাম ভালো হয়, তা আমাকেই দেখতে হবে, না কি বাবু? অভ্যাসিল ক্যামন ভাবলেন! চলবে? কেই? বেশ। আপনারা ভালো বল্লিই ভালো।

কে বলবে এই সেই বারিক, যার দু'বেলা খাওয়া হয় না, যার গাড়ী-গরু পর্য্যন্ত মহাজন ক্রোক দিয়েচে, দেনায় যার মাথায় চুল বিক্রি, যার বয়েস পঞ্চান্নর কোঠা ছাড়াতে চলছে।

এই মহল্লায় ও একাই এক শ।

পরদিনই হাটে আহম্মদ দফাদার ওকে কি ক'রে অপমান করলে আমার সামনে। চেঁচামেচি শুনে গিয়ে দেখলাম, আহম্মদ ওর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করচে। আহম্মদ চালকীগ্রামের অবস্থাপন্ন লোক, লম্বা দাড়ি রাখে, বেশ একটু গর্ব্বিত, ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। এবার ধানের দাম সাড়ে ষোল টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিল, দু'টি গোলা ভর্ত্তি প্রায় হাজার মণ ধান চড়া দরে বিক্রি ক'রে আহম্মদ টিনের বাড়ী ঘুচিয়ে দোতলা কোঠা বাড়ী করেছে।

আমি গিয়ে বল্লাম—কি করো আহম্মদ? ওকে ছেড়ে দাও, ছিঃ, তোমার চেয়ে বয়েসে কত বড় না?

আহম্মদ হাতে পয়সা করেচে, কাউকে মানে না। আমার দিকে ফিরে বল্লে—আজ জুতিয়ে ওর ইয়ে দেখিয়ে দেবো বাবু, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে জুয়াচুরি কথা বলে। মুগ দেবো বলে বায়নার টাকা নিয়েচে সেই আর বছর। দু'মণ কলাই দিয়ে আর টাকাও দেয় না, কলাইও দেয় না। রোজ বলে দিচ্ছি দেবো, আজ আমি ওরে—আমার সঙ্গে কিনা ঠকামি কথা বলে বাবু? এত বড় ওর সাহস? (যেন সাক্ষাৎ ভাইসরয় কিংবা মহাত্মা গান্ধী কিংবা গৌরগোপাল ভক্তিবিনোদ গোস্বামী কিংবা বশিষ্ঠ মুনি কিংবা জুলু সর্দ্দার লোচবঙ্গুলা)।

বাদিক তখন বলচে—ছেড়ে দান বাবু, আমি ও মুখুদ্দিকে একবার দেখে নেতাম। আপনি ধরলেন কেন?

আহম্মদ আবার সবেগে ঠেলে উঠে বল্লে—তবে রে—

আবার তাকে কোনরকমে ঠাণ্ডা করি।

আহম্মদকে বল্লাম—কত টাকা পাবে?

—তা বাবু অনেক। খেতে পায় না, দু'বিশ ধান দেলাম আশ্বিন মাসে। সাতাশ টাকা নিলে মুগির দাম, মোটে দু'মণ কলাই দিলে, এখনো পনেরো টাকা তার দরুণ বাকি। ভিটের ভুঁই করে গাঙের ধারে, তার দু'বছরের খাজনা সাড়ে চার টাকা। আমার গাছ থেকে ব্যবসা করবে বলে দেড় কুড়ি নারিকেল পেড়ে আনে, তার দরুণ একটা পয়সা দেয় নি—ওর মত মিথ্যেবাদী, ফেরেব্বাজ জুয়োচোর এ দিগরে পাবেন না—আপনিও তো শুনি পাবেন—এক মুঠো টাকা—

বাদিকের প্রতিবেশী সোনাই মণ্ডল আমাকে আড়ালে বল্লে—বাবু, দু'কাঠা মুসুরী আর দু'টো মানকচু বেচতি এনলে বাদিক তা সব আহম্মদ কেড়ে নিয়েচে। হাটে ওই বেচে চাল কিনে নিয়ে যাবে তবে ওদের খাওয়া হোত। কি অন্যাই কাণ্ড দেখুন দিকি? দু'আনা পয়সা হবে আপনার কাছে? বেগুন পটলটা ওকে কিনে দি—

সেই দিনই রাত প্রায় দশটার সময় শুনলাম বাদিক উচ্চৈঃস্বরে রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বাদিক অপেরা পার্টির মহড়া দিয়ে ফিরচে—

"তুমি কোন্ অবেশে বল কোন বেশে

কারে-এ-এ করেচ সুখী—
নামটি তোমার শ্যামরায়
কথায় বটে কাজে নয়"—ইত্যাদি।

এর পরে অনেক দিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় নি।

একদিন সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে ওর দেখা। তাকে বলি—বারিক কেমন আছে?

—আর বাবু! আপনি শোনেন নি? তার যে সব্বনাশ হয়ে গিয়েচে!

—কি-কি-কি ব্যাপার? কি হোল?

—ওর সেই বড় ছেলেটা আজ সাত দিন হবে মরে গিয়েচে!

—সে কি কথা? কি হয়েছিল?

—বাবু, পুরনো জ্বরে ভুগছিল। পেটে পিলে। রোজ সন্দেবেলা জ্বর হোত। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। জ্বর সেরে গেল তো পান্তা ভাত আর পটল-পোঁড়পোড়া খেলে। সে দিন বাড়িয়ে জ্বর হয়েচে ওর সেই অপেরা পার্টি থেকে গান সেরে এসে। ভোর বেলা মারা গেল। কাফনের কাপড় জোটে না শেষে, এই তো অবস্থা। বুড়ো বয়েসে ওই ছেলেতা তবুও মাথা-ধরা হয়ে ঠেলে উঠছিল। আর একটা ছেলে, সে তো বাচ্চা, তার ভরসা কি?

অত্যন্ত মর্মাহত হলাম বলা বাহুল্য। মনের কোণে ঘোর মিথ্যেবাদী, জুয়োচোর, সদা-প্রফুল্ল, বৃদ্ধ বারিকের প্রতি একটু অনুকম্পায় ভাব সঞ্চিত ছিল। কাল সকালে একবার বারিকের বাড়ী যাবো। আগের জমি দু'বছর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে, এবার ওর সঙ্গেই আবার বন্দোবস্ত করবো। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত।

সেই দিনই রাত দশটা এগারোটা। গোসাঁই বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে যেতে যেতে শুনি কোথা থেকে বাঁশি, বেহালা, ডুগি-তবলা ও মানুষের গলায় একটা সম্মিলিত রব ভেসে আসচে। নিবারণ শাবাই বল্লে—বাবু গোঁসাই বাড়ীর নাট মন্দিরে আজ জন্মাষ্টমীর দিন বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্চে। বেশ ভালো পালা হবে, গিয়ে শুনুন।

আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

উদুম্বর

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ী আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত'খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া তাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে। গাছের তলায় বসে ছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে, বসে বসে 'মেঘদূত'খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে রকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু' চোখের পাতা কাল বুজুতে পারি নি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়ে নি আজ দশ পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো?

—থাক্, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে, নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প-প্রসবের সময় হয় নি।

—সে কি রকম? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে না কি? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্যরকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর নাকি বায়স্‌-আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্চে। এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ। সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেচে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না?

নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবুও তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তার' কথা ত সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বায়স্‌-আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে।

—আজকাল বায়স্কোপ-আলেখ্যর যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্য্যন্ত দুটি বায়স্কোপ-আলেখ্যর প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তাঁহারও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মত বক্ষদেশালম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্টি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্ত্তা বলেন, ভাস কালিদাসেরও পূর্ব্বাচার্য সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে, যাবো।

—এখন মর্ত্ত্যে কোন গোলযোগ নেই তো?

দুইজনই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুর ঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্ত্যধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্ত্যধামের শৌখীন লীলা-বিলাসের বাসনা এখনও তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত সুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু, এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আর কে পড়ে?

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্যপাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখচি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখছেন দুজনকে। আমি দেখছি তিন দিক্‌পালকে। আমি বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো। তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোন অসুবিধে হবে না?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে!

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখছি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময় আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত'খানার ওইরকম করা যায় না? কিংবা 'মালতী-মাধবে'র? সেইজন্যেই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও ক'রে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্ম্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বাসবদত্তা কাব্যখানার জন্যে তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল? বড় অসার কথা বলো ছোকরা।

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ়ল—

—সে আবার কে?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন? আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাৎলা—সোঢ়ল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য?

—আজ্ঞে উদয়সুন্দরী-কথা নামে চম্পূ কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিম্বা কালিদাস দাদার—

—থাক্ আমার কথা বাদ দাও—ওঁদের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্তি হয়েচে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমিও রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থে। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্চি

মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুল। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এই দলটি যাত্রা করলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে এক সঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বায়স্ক-আলেখ্য দর্শনে, মর্ত্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ পীতবর্ণের পট্টবাস, মাথার চুল সাদা হইলেও কুঞ্চিত, পারিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ; তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকার পুষ্পের গুল্কিকা, বেশ শৌখীন ধরনের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও!

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকেও।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। ভাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুর ঘুর ক'রে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান ক'রে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বায়স্ক-আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না, আপনার ভ্রম হয়েচে। ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের কাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ ক'রে দেখছিলাম—মর্ত্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বায়স্ক-আলেখ্য। মর্ত্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বায়স্ক-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন? কেন?

—আচার্য্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাই নে। আর কথায় কথায় গীত। নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাই নি দাদা। কালিদাস দাদাই আমাকে বল্লেন,

উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমি ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। 'চলাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতা 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভিড় খুব। ডিম ভাজা ও ঘুগ্‌নি, চানাচুর, বাদাম ভাজা, আলু-কাবলিওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া' কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—একি? এ কার মেঘদূত? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাই তো। আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এ এখানে বসে দেখে কি করবো। বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের কাথ সেবন করবে নাকি?

—আজ্ঞে না, চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন-ঘোষের।

—'ভারীকাল'?

—তা জানি নে। বই উঠেচে জানিস?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভারীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কি না।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। তাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনেচেন এ অর্ব্বাচীন বালক দুটি কি বলচে? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা নাকি এই বই। বায়স্কোপ-আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি?

সুবন্ধু বলিলেন, এই বায়স্কোপ আলেখ্যের নির্ম্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্ত্তা। মহাকবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ।

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের? বৃক্ষপত্রের কাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের কাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ ক'রে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার উত্তররামচরিতের বায়স্কোপ-আলেখ্যে কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা—বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর বাসবদত্তার ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করে নি—সেই সুধাংশু রায়কে ও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে—আপনাদের কি?..

ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আমার গৃহ পবিত্র হোলো আপনার চরণ-স্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ?

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল? ভাস, তুমি ভাল আছ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে? মর্ত্যধামে? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বায়স্কোপ-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলহকারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা?

পরে ব্যাসদেব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েছে, তার নামটি কি বল্লে? মেঘদূত? কি অবলম্বনে লেখা? কাব্যের ঘটনাটি কি?

কালিদাস লজ্জিত স্বরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই, তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝ ব্যাপার!

মাছ চুরি

সকালবেলা।

টুক ও সন্তু তেঁতুলগাছে পা ঝুলিয়ে টক টক তেঁতুলপাতা চিবুচ্ছে। টুক বল্লে—সন্তু, ওবেলা আমার সঙ্গে তেঁতুলতলার দোয়াতে যাবি তো?

—ঠিক যাবো। আর কাউকে বলিস নে।

—বলতেই হবে হাবুকে। দুজনার কাজ নয়, বড্ড সোঁত। ডুবিয়ে দিয়ে যাবে।

—যদি টের পায়?

—বেশি রাত্তিরে যেতে হবে। জ্যোৎস্না-রাত্তির, তিনজনে ভয় কি?

—ভূতের ভয়, বা-রে! আবার পাশেই চটকাতলার শ্মশান!

—দূর, ভূতটুত বাদ দে। তিন ব্রাহ্মণে আবার ভূতের ভয়?

বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। নদীতে ঢল নেমেছে; তরতর বেগে স্রোত বইছে, কুটো পড়লে দু'খানা হয়ে যায়। 'তেঁতুলতলার দোয়া গ্রামের উত্তরে, তার পাড়ে সাঁইবাবলা আর কুঁচকোপের জঙ্গল, নদীর এই বাঁকে নদীর গভীরতা খুব বেশী, তাই এর নাম তেঁতুলতলার দ'। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে মড়া বেধে থাকে ডাঙার জঙ্গলের ছায়ায়, কামট আর কচ্ছপে মড়া টেঁড়াছেঁড়ি করে, তবে এদিকে দিনমানেই কেউ আসতে চায় না, চিংড়িমাছধরা নৌকা-গুলো দোয়াড়ি ঝাড়বার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা পর্যন্ত করে না।

সন্ধ্যা পার হয়েও প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হোল।

কুঁচগাছে জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে নিবছে।

ওরা তিনটি ছেলে সন্তর্পণে চলেছে তেঁতুলতলার দ'য়ের পথে। সন্তর্পণে যাওয়ার বিশেষ কারণ আছে। এ বর্ষায় বিষাক্ত সাপেরও ভয়; বাঘেরও ভয়; হাতে ওদের দা, লাঠি, শক্ত দড়ি। কিন্তু কোন আলো নেই, যে কাজে যাচ্ছে, আলো থাকলে লোকে টের পেয়ে যাবে।

সন্তু বল্লে—ভয় করবে না তো তোদের? পাশেই শ্মশান, ডাকসাইটে ভূতের জায়গা তেঁতুলতলার দোয়া।

টুকু ও হাবু হেসে উঠলো। ভয় করলে ওরা এ কাজে আসতো না।

টুকু বল্লে—ভূতটুত রাখ এখন, গদাই জেলে কোথায় মাছটা বেঁধে রেখেচে জানিস তো?

সন্তু ওদের মধ্যে মাছ ধরা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সে বল্লে, জেলেরা ডাঙায় কোন বড় গাছের গুঁড়িতে কাছি বেঁধে জলে নামিয়ে দেয়, সেই কাছির সঙ্গে মাছ বেঁধে রাখে।

ঐ দূরে তেঁতুলতলার দোয়া দেখা যাচ্ছে। মন আনন্দে নেচে উঠলো ওদের। এবার অত বড় মাছটা ওদের হাতের মুঠোয়!

সন্তু বল্লে—আমাদের টেনে আনলি তো, মাছ যদি না থাকে?

টুকু খোঁজ না নিয়ে এখানে আসে নি। সে জানে গদাই জেলে আজ সকালে মস্ত একটা দশ বারো সেরের রুইমাছ ধ'রে তেঁতুলতলায় দোয়ার গভীর জলে জিইয়ে রেখে এসেচে, কারণ আজ হাট-বার নয়, অত বড় মাছটা বিক্রি করার সুবিধে হবে না। দিলে নেবে না কি, সবাই নেবে এখন। গাঁয়ের বামুনপাড়ায় সবাই নেবে এখন ধারে, তারপর তাগাদা দিতে দিতে পয়সা আদায় যে কোন্‌কালে হবে, তার কোন ঠিক নেই। না দিলে রাগ। জেলেপাড়ায় সবাই বামুনদের ভিটের প্রজা। 'উঠে যাও, চাই নে তোমার মত প্রজা' ইত্যাদি, তার চেয়ে হাটে মাছটা নিয়ে গিয়ে নগদ দামে কলকাতার ব্যবসায়ীদের বিক্রি করো,—নির্ঝঞ্ঝাট।

এই সব ভেবেই গদাই মাছটি জিইয়ে রেখে এসেছিল তেঁতুলতলার দোয়াতে।

টুকু তা টের পেয়েচে আজ সকালে। সে গুড় কিনতে গিয়েছিল গদাই জেলেরই বাড়ী। গদাই আখের গুড়ের পাইকিরি ব্যবসা করে এবং বাকি সময় দশ আনা সের দরে খুচরো বিক্রি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে। টুকু ওদের উঠোনে গিয়ে গুড়ের বাটি হাতে দাঁড়াতেই শুনলে গদাই ঘর থেকে বলচে, 'মাছটা কি বড় রে! দশ সেরের কম হবে না। জিইয়ে রেখে এ্যালাম তেঁতুলতার দোয়াতে। গাঁয়ে সবাই ধার নেবে, পয়সার তাগাদা দিতে দিতে পায়ের জুতো ছিঁড়ে যাবে, তবু আদায় হবে না। কাল হাট আছে, কাল তুলে নিয়ে আসবো।'

সন্তু বল্লে—এখন খুঁজে পেলে হয়, জ্যোচ্‌ছনা তো উঠলো।

তেঁতুলতলার দোয়ার ধারে ওরা পৌঁছে গিয়েচে।

আলো-আঁধারের জাল বুনেচে নদীর পাড়ের বনে বাদাড়ে। মেঘভাঙা চাঁদের আলো পড়েচে বড় বড় বনকচু আর ছোট-গোয়ালের পাতার গায়ে। ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ বার হচ্চে বর্ষাসন্ধ্যায়। নদীজলে কেমন এক ধরণের শব্দ হচ্চে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে বনের অন্ধকার গহনে।

সন্তু ভয়ের সুরে বলে উঠলো—কেউ ডাকচে চটকাতলার ওদিকে—ওই—

টুকু বল্লে—দূর, ও কেউ নয়, এমনি শেয়াল ডাকচে।

—কে জলে নামবে?

—আমি নিজে নামবো। ডাঙা দেখি কোন্ গাছে দড়ি বেঁধেচে।

টুক কথা শেষ করেই ডাঙার ধারের সব গাছ খুঁজতে লাগলো। ওরা সবাই খুঁজতে লাগলো। অন্ধকার এখনো চাঁদের আলোতে ভালো ক'রে দূর হয় নি, এ সব জায়গাতে অন্ধকার কোন দিনই বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে যায় না। নাঃ, কাছি বাঁধা নেই কোন গাছেই।

সন্তু বল্লে—টুকর বড় বাজে কথা—

টুক রাগের সুরে বল্লে—বাজে কথা তো বাজে কথা। তুমি এলে কেন ভাই? আমার কথায় যদি তোমার এত অবিশ্বাস—

—তবে মাছটা কি জলে ছেড়ে দিয়ে গেল? দড়ি কোথায়? বেঁধেছে কিসে? চল বাড়ী যাই—আর এত রাতে ভূতের জায়গায় থাকে না।

হঠাৎ টুক চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউরেকা, ইউরেকা'।

—তার মানে?

—তার মানে পেয়েছি, পেয়েছি! পড়িস নি নীতিসুধার সেই গল্পটা? আর্কিমিডিস বলে একজন সাহেব পণ্ডিত কি একটা বার করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন? গদাই চালাক লোক, কাছি গাছের সঙ্গে বাঁধে নি যে। জলের মধ্যে খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে কাছি বেঁধেছে—ঠিক একেবারে—নির্ঘাৎ—

সত্যিই তাই। খুঁজতেই পাওয়া গেল বটে। জলের ধারে মোটা বাবলাকাঠের গোঁজ। টুককে মিথ্যেবাদী বলাতে ওর রাগ হয়েছে। সে বল্লে—এই ভাখ গোঁজ—এর সোজা জলের মধ্যে বড় খোঁটা পুঁতে তাতে মাছ বেঁধেচে। আমি জলে নামবো। তোরা এখানে থাক দাঁড়িয়ে—

সন্তু মাছের ব্যাপার অনেক কিছু জানে। সে নিজে ভাল বর্শেল, অর্থাৎ ভাল মাছ ধরিয়ে। সে পরামর্শ দিলে সবাই মিলে জলে না নামলে অতবড় মাছ কিছুতেই ডাঙায় তোলা যাবে না। অন্তত দু'হাত জল থেকে মাছ ডাঙায় তুলতে হবে। গোঁজ পুঁতেচে চিনে ঠিক করবার জন্যে। ঠিক ওই সোজা জলে নামতে হবে।

সবাই মিলে জলে নামলো। খরস্রোতা নদী, তীরের মত একরোখা গতিতে ভাঁটার দিকে ছুটেছে।

সন্তু বল্লে—সাবধান, যদি বেকায়দায় স্রোতে পড়ে যাও, তবে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলবে একেবারে আঠারো-বাঁকির চরে, আস্ত কি মড়া তার ঠিক নেই।

খুঁজতে খুঁজতে একগলা জলের মধ্যে সত্যি প্রকাণ্ড বাঁশের খোঁটা পাওয়া গেল। তাতে কাছি বাঁধা। কাছিতে সন্তুর পা ঠেকতেই হাত দশ-বারো দূরে জল ঘুলিয়ে প্রকাণ্ড কি একটা জলের জীব হুড়ুম ক'রে ভেসে উঠলো!

সন্তু চমকে উঠে বললে—কি ওটা?

হাবু ও টুক একসঙ্গে বলে উঠলো—বাপরে! কি বড় মাছটা!

—মাছ?

সন্তুর গলায় সন্দেহের সুর।

টুক রাগের সুরে বললে—মাছ না ? তবে কি ? তোর সব কথাতেই এমন একটা ভাব দেখাস যে তুই খুব বুঝিস আর কেউ কিছু না—

সন্তু কিন্তু ততক্ষণ ডাঙার দিকে চলেচে। যেতে যেতে বল্লে—এত রাত্তিরে এই নির্জ্জন জায়গায় একগলা জলে—না, সবাই চলে এসো—

—কেন রে ?

—ও মাছ নয়।

—মাছ না ? তবে কি ? কুমীর ?

—কুমীর কি না জানি নে, কিন্তু যত বড়ই মাছ হোক, ওরকম শব্দ তো করবে না। চলে আয় সবাই।

টুক ততক্ষণে কিন্তু কাছিটা হাত দিয়ে ধরেচে। সে নিজে ওদের ডেকে এনেচে। মাছ চুরির জন্যেই এনেচে, এখন যদি সন্তু ক্রমাগত ওর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে, তবে ওর মান থাকে কোথায় ? প্রাণ আগে না মান আগে ?

পরক্ষণেই দেখা গেল কিসে টুককে গভীরতর জলের দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেচে। ··

সন্তু বল্লে—ধর ধর—ও হাবু, দেখিস কি হাঁ ক'রে ? ধর—

দুজনে মিলে টুকর হাত ধরে টেনে বুক-জলে নিয়ে এসে দাঁড় করালে।

টুক হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—পা জড়িয়ে গিয়েছিল কাছিতে—মাছটা এমন টান দিলে যে তোরা না ধরলে আমায় আজ জলসই করেছিল আর একটু হোলে—বড় মাছ—

সন্তু বল্লে—ও মাছ নয়।

—আবার বলে মাছ নয় ? কি তবে ওটা ?

—তা জানি নে। মাছ ওরকম শব্দ করে না। জল থেকে উঠে এসো সবাই—

টুক আবার গিয়ে কাছি ধরলো। বল্লে—শীগগির আয়, সবাই মিলে দে টান—এইবার ওঠাবো—

হাবু ওর সঙ্গে কাছিতে হাত দিলে। সন্তুও এগিয়ে গেল।

হাবু বল্লে—টান দে—দে টান—

ওরা প্রাণপণে টানতে লাগলো কাছি ধরে। সন্তু বল্লে—বাব্বাঃ—যেন একটা পাহাড় বাঁধা আছে কাছির আগায়—

টুক বল্লে—ভালো কথা, মাছ যদি না হবে, তবে গদাই জেলে ওটাকে কাছিতে যখন বাঁধল, তখন দেখতে পেলে না ওটা তিমি কি কুমীর ? এ কথার উত্তর দাও—

হঠাৎ সন্তু চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে হাবু কোথায় গেল ? হাবু কোথায় ? তলিয়ে গিয়েচে—সর্ব্বনাশ হয়েচে !

দুজনে মিলে ডুব দিতে হাবুর একখানা হাত সন্তুর হাতে ঠেকতেই সন্তু জলের ওপর হাবুকে নিয়ে ভেসে উঠলো—তারপর ওকে ডাঙার দিকে টানতে লাগলো। হাবু জল গিলতে গিলতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—ডুবিয়ে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমায়—আমি

তাই আর যাবো না—

টুকু বল্লে—কাপুরুষ কোথাকার—ফের আয়।—ধর বলচি।

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে সত্যই ওরা কাছির প্রান্তে বাঁধা মাছটাকে ডাঙার কাছে নিয়ে এল। সন্তু বল্লে—এ কিরকম মাছ? ওর গা দেখা যাচ্ছে না, টুকু ছুরি মার ওর গায়ে—ছুরি মার—

ওর কথা শেষ হয় নি এমন সময় ওর চোখের সামনে টুকু অথৈ জলের দিকে একখানা সোলার মত ভেসে চললো। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেঁচাতে লাগলো—ধর আমাকে—ধর ভাই—গেলাম—গেলাম—

আবার ওরা ওকে টেনে নিয়ে এলো।

তখন ওদের রোখ চেপে গিয়েচে। মাছটা তুলবেই। অরো আধঘণ্টা প্রাণপণে ধস্তাধস্তি চললো আবার। ছুরি চালাচ্চে টুকু যখনই সুবিধে পাচ্চে। মাছ কাবু হয়ে পড়চে ক্রমশঃ। টুকুর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপচে।

সকলে মিলে টানতে টানতে কাছি-সুদ্ধ প্রকাণ্ড মাছটা ডাঙায় টেনে তুললে। তখনও সেটা আছড়াচ্চে আর লাফাচ্চে। ভোঁস ভোঁস করে হাওয়া বেরুচ্চে ওর মুখ দিয়ে। সেখানটাতে জোৎস্না পড়েচে।

সন্তু চীৎকার ক'রে বলে উঠলো—একি সর্ব্বনাশ রে! এ তো মাছ নয়—তখনি তোদের বললাম···ভাখ্ চেয়ে জ্যোৎস্নার আলোয়—

টুকু তখনও বলচে—কি তবে? মাছ নয় তো কি?

সন্তু বল্লে—সরে পালিয়ে আয়—কাছে যাস নে, ও আস্ত যম—দেখচিস নে ওটা কি জিনিস? প্রকাণ্ড কামট! প্রাণে বেঁচে গিইচি। দেখছিস্ নে ওর মুখে বড়শি এখনো বিঁধে আছে। গদাই ভোর-রাত্তিরে মাছ ধরেছে বড়শিতে, ভেবেচে মাছ হবে, মস্ত মাছটা। তখন বড়শি বিঁধে নির্জীব হয়ে পড়েছিল বলে জোর জবরদস্তি করতে পারে নি। এখনো নিজমূর্ত্তি ধরতে পারে নি আলটাগ্‌রায় বড়শি বেঁধা রয়েচে, তাই। নইলে আজ আমাদের রক্তে জল লাল হয়ে উঠতো—

হাবু আর টুকু শিউরে উঠলো। কামট! যার নামে বুনো জেলেরা পর্য্যন্ত আঁতকে ওঠে। আস্ত যমই বটে। ভগবান খুব বাঁচিয়ে দিয়েচেন আজ!

সন্তু বলে—দড়ি কেটে দে—নইলে গদাই একা যদি কাল ওটাকে তুলতে আসে, বলা যায় না কি হয়। এখনো ওটা মরে নি।

টুকু ক্ষিপ্রহস্তে দড়ি কেটে বিশালকায় হিংস্র জলজন্তুটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিলে।

বেসাতি

ভীষণ বর্ষার দিন।

নিরুপমার জ্বর আজ ক'দিন ছাড়ে না। শিউলিপাতার রস খাওয়ালাম, দোকান থেকে পাঁচন এনে খাওয়ালাম, অসুখ কিছুতেই সারে না। স্কুলের ছুটি হওয়ার সময় রোজ ভাবি আজ বাড়ী গিয়ে দেখবো নিরুপমার জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। রাস্তা থেকে চেয়ে দেখি জানলা দিয়ে কি দেখা যাচ্চে—নিরুপমা বিছানায় উঠে বসেচে, না শুয়ে আছে।

রোজই নিরাশ হই। নিরুপমা শুয়ে আছে। ছটফট করচে, এপাশ ওপাশ করচে। মস্ত লেপমুড়ি দিয়েচে দেখলেই বুঝতে পারি ওর খুব জ্বর এসেচে।

সামান্য মাইনের মাস্টারি করি, এগারোটি টাকা মাইনে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকি বাড়ীতে। কায়ক্লেশে চলে। পৈতৃক আমলের ধানের জমিতে যদি দুটো ধান না হোত, তা' হলে সংসার একেবারেই চলতো না। নিরুপমা গোছালো গৃহিণী, যা আনি বেশ চালিয়ে দেয়। মাছ মাংস দুধের বাজারে আমাদের ঘরে আনা মুশ্‌কিল। হাট থেকে চাঁদা মাছ, চুনো পুঁটি কিনে আনি। আমাদের স্কুলের বুড়ো পণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্য্যি মাছ ভিক্ষে করে মেছো-হাটায়। দোষ দিইনে ওকে, মাইনে পায় সাড়ে তিন টাকা। হ্যাঁ, সাড়ে তিন টাকা! বিশ্বাস করা মুশ্‌কিল হয় জানি। কিন্তু এই সাড়ে তিন টাকার জন্যে বুড়ো কেশব ভট্টাচার্য্যি দু'মাইল দূরবর্ত্তী তালকোণা-নকিবপুর গ্রাম থেকে দশটায় আসে, চারটেয় ফেরে।

কেশব পণ্ডিত মেছোহাটায় গিয়ে বলে—ওগো ও অক্রূর, তোমার নাতির দিকে একটু লক্ষ্য রাখবা। বেশ নামতা পড়তো—আজ দু'দিন আবার একটু ঢিল দিয়েচে। বলি ও কি মাছ? ট্যাংরা? দাও দিকি দুটো বাপু। তোমার নাতির কল্যেণে একদিন মাছ খেয়ে নিই। ভারি বুদ্ধিমান নাতি তোমার, হীরের টুকরো—দাও ওই চিংড়ি মাছটাও দাও ওই সঙ্গে। পয়সা দিয়ে তো কিনবার ক্ষ্যামতা নেই।

আমি একদিন বলেছিলাম—পণ্ডিতমশাই, মাছ আমি কি দুটো চাইলে পাই নে? পাই। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয় না—আপনি রোজ রোজ কেন চান?

—না চেয়ে তারা করি কি। বাড়ীতে তিনটে নাতি, দুটো নাতনী। মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হোল, কেউ নেই সংসারে। আমি সব নিয়ে আগলে আছি। ওই সাড়ে তিন টাকাই আমার কাছে সাড়ে তিন মোহর—

—আপনার জামাই কতদিন মারা গিয়েচে?

—তা আজ হোল সাড়ে তিন বছর।

—সংসারে কে আছে?

—আমার মেয়ে শুদ্ধু আর তার কাচ্চা বাচ্চা। ওদের কেউ দেখবার থাকলে আমি কি আর ওদের নিয়ে বসে থাকি? আমারও বাড়ী কেউ নেই। বলি আগলে না রাখলি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মেয়েতা কি ভেসে যাবে? 'তাই পড়ে আছি।

—আর কোনো আয় নেই?

—মাঝে মাঝে পুজোটা আসটা করি, কলাটা মুলোটা সিকিটা দুয়ানীটা এই আয়। তাতে কি হয়। এক বেলা খাওয়া হয়, এক বেলা হোলই না। মাছ ওরা খেতেই পায় না। কিনবার তো পয়সা জোটে না। কোনো রকমে চালানো। আমি মাছের ভক্ত নই, ওই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যি।

পাঠশালায় মাস্টার পণ্ডিতদের অবস্থার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ত্রৈমাসিক সাহায্য আজ ছ'মাস বন্ধ। ছাত্রদত্ত বেতন সবাই মিলে ভাগযোগ ক'রে নিয়ে কোনো রকমে চলচে।

কেশব ভট্টাচায্যির মাছ ভিক্ষে করা নিতান্ত হীন কাজ। তবে বেগুনটা, থোড়টা, মোচাটা এ আমরাও নিয়ে থাকি। স্কুলে সবই চাষীগৃহস্থদের ছেলেমেয়ে। আমি জানি জেয়ালা-বল্লভপুরের পতিরাম কাপালীর মোটা চাষ আছে তরকারীর ; প্রধানতঃ বেগুনের। সেদিন তার মেয়ে লক্ষ্মী আমার হাতে একটা টাকা দিয়ে বল্লে—ও মাস্টার মশাই, আমারে কাগজ কিনে দেন না—

—কি কাগজ ?

—লেখবার কাগজ।

—টাকা কে দিয়েচে ?

—মোর কাছে ছেল। আরও আছে—

—বলিস কি ? কটা ?

মেয়েটা একটা বালির খালি টিন উপুড় ক'রে ঢাললে টেবিলের ওপর। আঠারোটা টাকার নোট, সিকি দুয়ানি, কাঁচাটাকা। টিনটা ঢেলেই বল্লে—আপনি নেন মাস্টার মশাই। এগুলো সব নেন। খাবার কেনবেন। মুই কাপড় জামা কেনবো, গজা কেনবো, মুড়কি কেনবো—

আমি ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে বল্লাম—থাম, চুপ কর। এত টাকা তুই পেলি কোথায় আগে বল্। দুটি মেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—মাস্টার মশাই, লক্ষ্মী আমাদের একটা ক'রে পয়সা দিয়েচে জল খাবার খেতে—।

আমি বল্লাম—নিয়ে আয় সে পয়সা আমার কাছে—নিয়ে আয়—অমনি মেয়েদুটি দুটি চকচকে আধুলি নিয়ে এসে আমার টেবিলে রেখে দিল।

—কি সর্ব্বনাশ, এরে পয়সা বলে ? হ্যাঁরে, এ কি জিনিস ?

মেয়ে দুটি অপ্রতিভমুখে এ ওর দিকে চাইতে লাগল।

—বল্ এ কি জিনিস ? পয়সা এর নাম ?

—ওরা নির্ব্বাক। একজন সাহস সঞ্চয় ক'রে আমার দিকে বিজ্ঞের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—মাস্টারমশাই আমি বলবো ?

—বল্ না।

—নোট মাস্টার মশাই।

—নোট। নোট মানে কি ?

—তবে সিকি ?

—না, এর নাম আধুলি—আট আনা। এক টাকার অর্ধেক।—যা বলগে যা—

পতিরামকে খবর দিয়ে আনিয়ে তার পরদিন সব টাকা তার হাতে দিয়ে দিতে, সে মহা সন্তুষ্ট হয়ে বল্লে—হতভাগা মেয়েটা আমার বালিশের তলা থেকে টাকার থলি চুরি করেছিল মাস্টার মশায়। গরীবপুরের হাটের পটল বেচার টাকা, উনিশ টাকা সাত আনা। খুঁজে আর পাই নে। পরিবার বলে আমি জানি নে। ভাইপো বলে আমি জানি নে। তবে একমুঠো টাকা নিলে কে ? এখন জানা গেল ওই হতভাগা ছুঁড়ি টাকাগুলো সব নিয়ে চলে এসেছিল—হতভাগা ছুঁড়ির হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করবো আজ বাড়ী গিয়ে।

—না বাপু, ও অবোধ মেয়ে। ওর কি সে-জ্ঞান আছে ? নইলে আধুলিকে কখনো বলে নোট, কখনো বলে সিকি। সে জ্ঞান নেই। মারধোরের দরকার নেই। মুখে শাসন ক'রে দিও—ইয়ে, পটল কি রকম হোল এবার ?

—তা মাস্টার মশাই মন্দ নয়। হাটরাহাট ছ'মণ আড়াইমণ। পাঁচ কুড়ো ভূঁই শুধুই পটল করা হয়েছিল এবার।

—একদিন ছুটো পটল খাওয়াও তোমার ক্ষেতের। শুনেছি তোমার ক্ষেতের পটল নাকি বড্ড ভালো—

পতিরাম খুশি হয়ে উৎসাহের সুরে বল্লে—হাটের সেরা পটল মাস্টারমশাই। ওই নতিডাঙা থেকে বিলের পটলের লত এনেলাম। যেমন পাতলা খোসা, তেমনি মিষ্টি। লতও খুব তেজী, এক এক লতে পাঁচপণ ক'রে উঠে সংখ্যে। ভাবুন সে জিনিসটা কি।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার ফলন!

—এক একটা লত দশহাত বারোহাত লম্বা। বল্লি ভাববেন গল্প কথা বলচে, তা নয়, পতিরাম জানে পটলের চাষ কি ক'রে কত্তি হয়। লত পুঁতলিই কি পটল ফলে ? ওর কারকিৎ চাই। কাল পাঠিয়ে দেবো ছ'সের পটল, খেয়ে ভাখবেন আপনি। না, দাম দিত্তি হবে কেন আপনার। ও কথাই তোলবেন না। কি হাটে যা পারি পটল আপনি নেবেন, দাম দিত্তি হবে না।

আমরা এই রকম করেই চালাই সংসার। একথা অস্বীকার করতে চাই নে।

কিন্তু এবার নিরুপমার অসুখ নিয়ে বড় ফেরে পড়ে গেলাম। ওর অসুখ একই রকম চলচে, বাড়েও না কমেও না। রোজ রোজ স্কুল থেকে ফিরে মনটা এমন দমে যায়।

তারপর কি, আমাদের গ্রামে পরস্পরে সহানুভূতি নেই আদৌ। আমার বাড়ী এই যে অসুখ, এই যে নিরুপমা সারাদিন বিছানায় একা পড়ে ছটফট করে (আর কোনো লোক নেই

আমার পরিবারে), কেউ উঁকি মেরেও দেখবেন না। আমি যে গরীব, যদি বক্সীদের মত, কিংবা নিতাই হালদারের মত অবস্থা হোত—আমাকে সাহায্য করবার লোকের কিছুমাত্র অভাব ঘটতো না। কিন্তু আমার স্ত্রীর অসুখে কে আসবে? স্কুলে যে ক'ঘণ্টা থাকি, ওর জন্যে মনটা এমন উতলা হয়। এমন একটা গভীর অনুকম্পা হয়, দুঃখ হয় ওর কষ্ট দেখে, নিজে খেতে ভালবাসে কিন্তু খেতে পায় না, পরতে ভালবাসে কিন্তু একখানা পরিজাত শাড়ি (তাও দু'বছরের পুরানো) ছাড়া আর কোন ভাল কাপড় নেই ওর—কোন সাধ মেটাতে পারি নি আমি।

আমায় কতদিন থেকে বলচে—আমায় একটা ব্লাউজ কিনে দেবে? আমার মোটে নেই—

সেদিন, আজ মাস দুইয়ের কথা, একদিন বল্লে—হ্যাঁগো, শোনো, একটা সাধ—একখানা ভালো শাড়ী পরি।

—কি শাড়ী?

—রঙিন শাড়ী। ওদের বাড়ী একটি বৌ, রাণাঘাটে বাড়ী; প'রে এসেছিল—ওই রকম একটা—

বলেই সে লজ্জা সঙ্কোচের হাসি হাসে। জানে সেও যে, হবে না কোনো দিনই যুদ্ধের বাজারে বিশ-ত্রিশ টাকা দামের রঙীন শাড়ী কেনা, তবুও বলে। আমার সোজাসুজি বলতে বাধে, কষ্টও হয় যে দিতে পারবো না—সুতরাং বলি—দেবো, ঠিক দেবো—

—সবুজ শাড়ী, শিউলি পাতার রং, বুঝলে?

—কার কাছে দেখলে?

—ওই রাণাঘাটের পিসিমা এসেচেন ও বাড়ীতে। তাঁর ছেলের বৌ।

—বেশ।

—দেবে তো?

—কেন দেবো না?

নিরুপমা বুঝেও অবুঝের মত অনেক সময়ে বলে ছেলেমানুষের মত (বয়েসও অবিশ্যি এই পঁচিশ) তাতে আমার বড় মায়া হয়। ভাবি, কখনো যদি হাতে একসঙ্গে কুড়িটা টাকাও পাই, তবে নিরুর রঙীন শাড়ি আগে দেবো এনে।

সে-বার বড্ড আশা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় নিরুর কাপড় একখানা দিতে পারবো।

দিগম্বর নন্দী এসে বল্লে—পণ্ডিত মশাই, একটা ছেলের হাত দেখে দেবেন?

—ঠিকুজি কুষ্ঠী না শুধু হাত?

—ঠিকুজি কুষ্ঠী ক'রে দিতি পারবেন?

—বলে ওই করতে করতে চুল পাকবো পাকবো হোল। হয় না হয় তোমাদের পাড়ার পঞ্চানন বিশ্বেসকে জিগ্যেস—

—জিগ্যেস আর করতি হবে না পণ্ডিত মশাই। কত লাগবে তাই শুনি।

—কুড়ি টাকার কমে হবে না। ছেলেটা কে?

—আমার বড় সম্বন্ধীর ছেলে। আমার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন হবে সামনের বুধবারে। তাতে ওরা সব আসচে কিনা—?

—তুমি তোমার ছোট ছেলের একখানা ঠিকুজি এই সময় তৈরী ক'রে নাও না কেন? এই সময় করাই ভালো। সস্তায় ক'রে দেবো। পাঁচটা টাকা দিও।

দিগম্বর নন্দী বড় চাষী গৃহস্থ। সে রাজি হয়েই চলে গেল, মনে মনে ভাবলাম নিরুর রঙিন শাড়ী এবার হয়েই গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওর সম্বন্ধীর সে ছেলে এলোই না। দিগম্বরের ছেলের ঠিকুজি তৈরী ক'রে পাঁচটা টাকা পেয়েছিলাম অবিশ্যি।

রহমান ডাক্তার এ অঞ্চলের মধ্যে পসারওয়ালা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ফী নেয় একটাকা ক'রে। নিরুর অসুখ কিছুতেই যখন সারে না, তখন তাকে ডাকলাম। রহমান ডাক্তার ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখে। আমার উঠোনে নেমে বল্লে—মাস্টার মশাই আছেন।

আমি সসম্ভ্রমে এগিয়ে নিয়ে এলাম।

—কি অসুখ? কার? মা ঠাকরুণের?

—হ্যাঁ, আসুন। দেখুন দিকি ভাল ক'রে।

—আপনার সংসারে আর লোক নেই?

—না, তাতেই তো—

—তাইতো। কতদিন অসুখ?

—হোল আজ দু'হপ্তা।

রহমান ডাক্তার দেখে-শুনে চব্বিশ রকমের খুঁটিনাটি প্রশ্ন ক'রে ওষুধ দিয়ে গেল। ভালো লোক, ভিজিটের টাকা নিতে চাইলে না আমার কাছে। বল্লে—ও কি? টাকা? না থাক থাক—আপনি দেবেন না—

—না নিতে হবে।

—তা কখনও হয়? আমার ছেলেটা পড়ে আপনার স্কুলে। আপনি তার মাস্টার মশায়। টাকা দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ নয় এখানে। তার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন দয়া ক'রে। ওষুধটা আনিয়ে নিন আমার ডাক্তারখানা থেকে। বেদানার রস খেতে দেবেন। গ্লুকোজ আনিয়ে নিন একটা।

স্কুল থেকে টাকা হাওলাত নিলাম পাঁচটা। ওষুধ জিনিসপত্র সব আনাই বাজার থেকে।

নিরু নাকিসুরে বলে—আমি বাঁলি খাঁবো নাঁ—

খাও লক্ষ্মীটি। খেতে হয়—

—আমি ও খেঁতে পাঁরি নে—

—না খেলে কি জ্বর ছাড়ে? খেয়ে নাও—

—আঁমাকে সন্দেশ কিঁনে দেবে? সন্দেশ খাঁবো—

—সেরে ওঠো। দেব বই কি? নিশ্চয় দোবো—

—দেবে ঠিক ?

—দেবো, ঠিক দেবো।

সব জিনিসই ওকে বলি দেবো দেবো। না পারি ভালো একখানা শাড়ী দিতে, না পারি ব্লাউজ দিতে। না কখনো পারি কিছু ভালো খাওয়াতে। মনে পড়লো একবার পাশের বাড়ীর সনাতন রায় খাসি কেটে ভাগ দিচ্ছেলেন, আড়াই টাকা সের। ওদের বাড়ীর বড় খাসিটা, চব্বিশ সের মাংস হয়েছিল। নিরু বল্লে—হ্যাগা, মাংস নেবে ? বটঠাকুরদের বাড়ী দিচ্ছে। কদ্দিন মাংস খাই নি—নিয়ে এসো না একটু। একপোয়া নিয়ে এসো গিয়ে। বেশি দামের মাংস ওর বেশী আর নিতে পারবো না। দুজনে ওই খাবো এখন—তুমি নিয়ে এসো—আমি বাটনা বেটে রাখি—

কিন্তু ওরা একপোয়া মাংসের খদ্দের শুনে নাক সেঁটকালে। অন্ততঃ এক সের নিতেই হবে। অত বড় খাসি একপোয়া আধপোয়া ক'রে ভাগ করতে হলে চলে না। দেড় সের দু'সের মাংসের খদ্দেররা সব কচুর পাতা কলার পাতা হাতে ক'রে বসে আছে।

সেবার নিরুকে এসে বলেছিলাম—তুমি ভেবো না ; ইস্কুলের ওদিক থেকে মাংসের ভাগ যদি পাই, একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবে তো ?

—ঠিক আনবো। এই মাসের মধ্যিই—

সে আজ ছ'মাস হয়ে গেল। মাংস আনাও হয় নি, ওকে খাওয়ানোও হয় নি।

রাত্রে নিরুপমা জ্বরের ঘোরে ভুল বকে যখন, তখন কেবল এই কথাই মনে হয়, ও একদিন মাংস খেতে চেয়েছিল, ওকে খাওয়ানো হয় নি, ও কতদিন একখানা রঙীন শাড়ী চেয়েছিল, ওকে কিনে দেওয়া হয় নি। যদি ও না বাঁচে ? তবে ওর এই সব কথা কোথায় লেখা থাকবে ?

রাত্রে কেউ থাকে না বাড়ীতে। আমি নিরুর বিছানার পাশে একা বসে আছি। রাত্রে অনেক সময় মানুষ চিনতে পারে না। ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় ক'রে বলে—'কে ? বসে কে ? কে গো ওখানে ?' আমি ওকে পাখার হাওয়া দিই, মাথায় জলপটি লাগাই। গ্লুকোজের জল খাওয়াই। বসে বসে ভাবি কাল জগন্নাথ বক্‌সিদের বাড়ী গিয়ে জানাব আমার দুঃখু। রাত্রে একা থাকতে পারি নে রুগী নিয়ে। কোনও একটা সাহস পাই নে। তার ওপর মন হু হু করে, যেন কান্না আসে। অনেক রাত্রে একটু ঢুলুনি এসেচে, কখন ঘুমিয়ে পড়েচি জানি না। ঘুম ভাঙলো কি একটা শব্দ শুনে। ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে দেখি নিরুপমা বিছনায় নেই। ঘরের দোর খোলা। ছুটে রোয়াকে গিয়ে দেখি নিরু টলতে টলতে রোয়াক পার হয়ে পৈঠেতে নামতে যাচ্ছে। আমি খপ ক'রে ওর হাত ধরে বল্লাম—এসো এসো—যাচ্চ কোথায় ?

নিরুপমা চীৎকার ক'রে গান জুড়ে দিল—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠোসে

তোমার শাওড়ী বলে দিয়েচে বেগুন
কোটোসে—

আমি বল্লাম—ও নিরু, ছিঃ ওরকম চেঁচিও না। চেঁচাতে নেই, ঘরের মধ্যে এসো—

নিরু ধপ ক'রে রোয়াকের ওপর বসে পড়লো। জ্ঞানকাণ্ড নেই, এলোমেলো অবস্থা কাপড়-চোপড়ের। আমি অনেক ক'রে বুঝিয়ে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। এমন দুঃখু হোলো মনে, গরীব বলে কি কেউ এতবড় বিপদে অমনি দেখে না?

কাল বক্‌সিদের বাড়ী গিয়ে সব খুলে বলবো। দেখি যদি ওদের দয়া হয়।

রাত্রি কোন রকমে কাটলো। খানিক পরে পূর্ব্বদিকে ফরসা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বক্‌সিদের বাড়ী গিয়ে বিপদ জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করার মতলব আমার কোথায় মিলিয়ে গেল। সঙ্কোচ হয় বলতে, ও আমি পারবো না। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমাদের মত গরীবের তিনিই অবলম্বন।

রহমান ডাক্তার সকালে এলে আমি রাত্রের ঘটনা বল্লাম।

ডাক্তার বল্লে—হাই ফিভার হয়েছিল—তাই অমন করছিলেন। মাথায় জল দিলেন না কেন? রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন। আর নার্সিং যেন ভাল হয়—উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবেন না। বেডপ্যান একটা পাঠিয়ে দেবো এখন আমার কমপাউণ্ডারের হাতে।

একাই ওষুধ দিই, একাই বাতাস করি, একাই বেডপ্যান ধরি।

আহা, মিথ্যে কথা বলবো না। পরদিন ঘাটে নাইতে গিয়ে মুখুয্যে পাড়ার ঘাটের পাড়ের উঁচু জঙ্গলে ওল তুলচি শাবল দিয়ে, জীবন মুখুয্যের বড় মেয়ে আশালতা বল্লে—কে, কাকাবাবু?

—হাঁ মা। ওল তুলচি একটা। পাতা বেশ হলদে হয়ে এসেচে, বড় ওলটা।

—কাকীমার অসুখ নাকি কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা, বড্ড কষ্ট হচ্চে।

—দেখাশুনা করচে কে?

—আমি। আর কে করবে?

আশা বল্লে—আহাহা, একা আপনি? রাত্রেও? আপনার তো বড্ড কষ্ট হচ্চে; মেয়েমানুষের অসুখের নার্সিং কি পুরুষ দিয়ে হয়? আমায় যে যেতে দেবে না কাকাবাবু। গেলে পাঁচটা কথা ওঠাবে। গাঁ যে কি রকম তা তো জানেন? নইলে আমি রাত্রে আপনাদের বাড়ী যেতাম কাকাবাবু—জাগতাম সারারাত—

—না মা, বেঁচে থাকো। ভাল হোক। যেতে হবে না, মুখে বল্লে এই যথেষ্ট মা। ভাল হোক তোমার, ভাল হোক।

ওল তুলে জলে নামতে নামতে বল্লাম। আশালতা সিক্ত-বস্ত্রে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। ইচ্ছা ওর, আরো কিছু বলে। আমি বল্লাম—মা, তুমি যাও—

—কাকাবাবু, দিনমানে কাকীমার কাছে কে থাকে?

—কেউ না মা। তবে দিনমানে সে ভালো থাকে এক রকম। জ্বরের বাড় রাত্তিরে—

সেই দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আশা নিরুপমার বিছানায় বসে বাতাস করচে ওকে। বড় ভাল লেগেছিল আমার। বড় লোক না হলেও এর বাবা জীবন মুখুয্যে গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তাঁর মেয়ে এসেচে আমার মত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। বেশ লাগলো। তার পর আশা আমায় চা ক'রে দিলে নিজে রান্নাঘরে গিয়ে।

—খাবার কিছু নেই কাকাবাবু?

—খাবার? আমি তো কিছু খাই নে মা এসময়—

—দাঁড়ান, আসচি—

বলেই ও চলে গেল এবং একটু পরেই একবাটি মুড়ি ও আটখানা কাটা-শসার ফালি আঁচলে ঢেকে নিয়ে এসে বাড়ী ঢুকলো।

—খান কাকাবাবু।

—এ মা তোমার অন্যেয় ব্যাপার—

—কিছু অন্যেয় না। জল খান আপনি।

—ভালো হোক মা, তোমার ভাল হোক। তুমি চলে যাও এখন, মা, আমি এসেচি, আমি দেখাশুনো করবো এখন।

গাঁ ভালো না। কে কি বলবে, সোমত্ত মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, আশা। তারপর আর ও আসেও নি। বোধ হয় আর ওকে আসতে দেয় নি ওর বাড়ীর লোকে।

নিরুপমা সেরে উঠলো দিন দশেক পরে। ওকে ভাত রেঁধে খাইয়ে তবে ইস্কুলে যাই। আর এত লোভ বেড়ে গিয়েচে ওর, সারাদিন কেবল এটা খাবো, ওটা খাবো করে। অধিকাংশই কুপথ্য। কুপথ্যের মধ্যে দু-একটা যার নাম করে, তা কিনে দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত। আটা ময়দা কিছু নেই। মহকুমার সাপ্লাই অফিসারের কাছে একদিন গেলাম—নইলে ওকে কি খেতে দেবো রাত্রে। নিবারণ ময়রার দোকানে গেলুম কিছু খাবার কিনতে। এ অঞ্চলের ওস্তাদ কারিগর নিবারণ। রসগোল্লা, পানতুয়া, বরফি, সন্দেশ, জিলিপি যা তৈরী করে! আমি শহরে আসবো শুনে নিরুপমা বলে দিয়েচে চুপি-চুপি—খাবার এনো, বুঝলে? খাবার আনবে ভাল দেখে।

—কি খাবার খেতে ইচ্ছে হয়?

—যা তুমি ভাল বোঝো।

আমি সাজানো খাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখলাম বড় কড়া থেকে নিবারণ তাল সন্দেশ গড়চে। নিবারণের বিখ্যাত জোড়া সন্দেশ। বড্ড ইচ্ছে হোল নিরুপমার জন্যে জোড়া সন্দেশ নিয়ে যেতে। ও কখনো খায় নি সে। কি খুশিই হবে জোড়া সন্দেশ কিনে নিয়ে গেলে।

পকেট খুঁজে দেখলাম। হাতে চার আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে খাবার কিনবার। তাতে মোটে হবে একখানা জোড়া সন্দেশ—আর বাকি থাকবে এক আনা।

দু-তিনবার খেয়েছিলাম। কি সুন্দর জোড়া সন্দেশগুলো।

নিরুপমার হাতে যদি দিতে পারতাম।

কিন্তু একখানা সন্দেশ নিয়ে যাওয়ার চাইতে এক পোয়া কুঁচো গজা নিয়ে যাওয়া ভালো। অনেকগুলো পাওয়া যাবে। মনের সাধ মনেই চেপে বল্লাম—কুঁচো গজা আছে? কত ক'রে সের? দাও তিন ছটাক—বেশ টাটকা?

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতেই নিরুপমা জিজ্ঞেস করলে—খাবার এনেচ? কি দেখি?

আমি হাসিমুখে পুঁটুলিটি দেখিয়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন অনেকখানি গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার এই পুঁটুলির মধ্যে সঞ্চিত।

নিরুপমা কৌতূহলের সঙ্গে বলে—ওর কি নাম?

নিবারণ ময়রার কুঁচো গজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লাম আমি। এমন দেখি নি, এ জেলায় আর হয় না। বিখ্যাত কুঁচো গজা। নিবারণের কুঁচো গজা কলকাতা পর্য্যন্ত যায়। বড় বড় লোকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে বড্ড দাম। পাওয়াই যায় না। যেমন কড়া থেকে নামে, অমনি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। অতি কষ্টে আধপোয়া সংগ্রহ করে এনেচি। খেয়ে দেখো।

নিরুপমা বলে—না। তুমি আগে দু'খানা খাও—আরও দু'খানা নাও না?

তারপর মহাখুশির সঙ্গে খেতে খেতে বলে—বাঃ সত্যি! কি চমৎকার জিনিস।··· না?···

কলহান্তরিতা

শ্যাম সরকার আমাকে ডেকে বল্লে—শোনো বাবা, একটু বোসো।

হাট-বাজার ক'রে ফিরছিলাম, বেলা হয়েচে, বেশি বলবার সময়ও নেই।

শ্যাম সরকার বুড়ো হয়েচে, বড্ড বকে। আমার এখন ওর বকুনি শুনবার সময় নেই। তবুও বল্লাম—কাকা ভাল আছেন?

শ্যাম সরকার ওর দোতলা বাড়ীর সামনে বসে মালা জপ করছে। আমি ওকে মালা জপ করতে দেখচি এইভাবে বসে আজ ত্রিশ বছর। লোকটা বাস্তু বিষয়ী, টাকা ধার দিয়ে তার সুদ থেকে চালায়। আবার গীতার ব্যাখ্যাও করতে শুনেচি ওকে। এদিকে মামলা মোকদ্দমা করতে ছাড়ে না, তাও দেখতে পাই।

শ্যাম সরকার বল্লে—এসো বাবা, বোসো। চোখেও আজকাল খুব ভাল দেখি নে—একটা কথা শোনো। আমার একটা উপায় ক'রে দাও বাবা—

—কি উপায় কাকা? কিসের উপায়?

—আমার ছেলে বিষ্টু বড্ড বদ হয়ে উঠেছে। দিন রাত কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া। আমায় বলে, বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-ভাও। বসে বসে খাবে কেবল। কোন কাজ করবে না। ওবেলা তো আমায় মারতে এসেছিল। এর একটা—

—কাকীমা কিছু বলেন না?

—তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? সেও ছেলের দিকে। দু'জনে মিলে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। এর একটা বিহিত করো বাবা—

—আমি এর কি বিহিত করবো বলুন। বিষ্টু আমার কথা কি শুনবে? মিছে মিছে অপমান হওয়া।

—অপমান করলেই হোল অমনি? তোমরা হোলে সোনার চাঁদ ছেলে—তোমরা এর একটা প্রতিকার করতে পারবে না?

—মাপ করবেন কাকা। আপনাদের গৃহবিবাদের মধ্যে আমাদের থাকবার দরকারই বা কি? ও আমার দ্বারা হবে না।

এ দিনটি কোনো রকমে নিস্তার পেয়ে এলাম বটে কিন্তু পরদিন আবার শ্যাম কাকা আমায় ধরেছে রাস্তায়। বিকেলে তাস-খেলার আড্ডায় বেরুচ্ছি, শ্যাম কাকা বল্লেন—শোনো বাবা—

—এখন একটু ব্যস্ত আছি কাকা। শুনবো এখন অন্ত সময়—

—ওই বাবাজি তোমাদের দোষ। একটুখানি দাঁড়াও না? এই ভাখো তোমার খুড়ীমা আমায় আজ কি ক'রে মেরেছে—

—মেরেছেন? খুড়ীমা!

—মিথ্যে কথা বলচি বাবা? হয় না হয় তুমি ললিতকে জিজ্ঞেস ক'রে ভাখো। আমায় রক্ষে কর বাবা। আমায় আজ খেতে দেয় নি, দুটো ভাতও দেয় নি। আমায় বাঁচাও—

কথা শেষ ক'রে শ্যাম কাকা আমার হাত দুটো খপ ক'রে ধরে ফেল্লেন।

অগত্যা শ্যাম সরকারের বাড়ীর মধ্যে আমায় ঢুকতে হোল।

ঢুকে বল্লাম—ও খুড়ীমা—

শ্যাম কাকার বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলো ঘর। ওদিকে শান-বাঁধানো বড় রোয়াক, টিউবওয়েল, পাকা রান্নাঘর, গোয়াল—বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহস্থালির সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র। কিন্তু ওদের সংসারে যে শান্তি নেই, তা এ গ্রামে সকলেই জানে। এদের বাইরের ঠাট যেমনই হোক, ভিতরে অনেক পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য।

খুড়ীমা তালের বড়া ভাজবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন, কারণ হাতে তালের গাড়, হলদে রস মাখা; রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে খুড়ীমা রোয়াকে দাঁড়ালেন—যেমন লম্বা,—তেমনি চওড়া, লাল-চওড়া পাড় শাড়ী পরণে, পায়ে আলতা, মাথায় একরাশ চুল, মুখশ্রীতে প্রৌঢ়া রমণীর গম্ভীর স্থির সৌন্দর্য্য। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কে, রমেশ? কি বাবা?

আমতা আমতা ক'রে বল্লাম—এই খুড়ীমা, বলছি কি—

কথা বেধে যেতে লাগলো। খুড়ীমার ঝঙ্কার ও দাপটের খ্যাতি এ গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে জুড়ে বসেচে অনেক কাল থেকে। সকলেই জানে কি রকম চিজ্ তিনি। এই সন্ধ্যেবেলা শেষে কি গোলমাল বাধাবো? তাল হাঙ্গামাতেই পড়েছি! বেশি পরোপকারের প্রবৃত্তি থাকলেই এ রকম বিপদে পড়তে হয়, এ আমি লক্ষ্য ক'রে আসচি বরাবর থেকে।

খুড়ীমা রুক্ষ নীরস কণ্ঠে বল্লেন—আমার আবার সময় নেই। তালের গোলা মাখচি দেখতেই পাচ্চ বাপু। কি বলবে বল—

খুড়ীমা কাছ মেয়েমানুষ, নিশ্চয়ই বুঝেচেন আমি কি বলবো।

শক্তি সঞ্চয় ক'রে বল্লাম—কাকা নাকি আজ খান নি—ওঁর এ বয়সে ঠিক সময়ে খেতে না পেলে—

খুড়ীমা আমার সামনে এসে হাত নেড়ে বল্লেন—ওই বুড়ো বদমায়েশ লাগিয়েচে বুঝি? তা লাগিয়ে আমার কি করবেন শুনি? গাঁয়ের লোকে কি চাল কেটে আমায় উঠিয়ে দেবে গাঁ থেকে? হ্যাঁ, খেতে দিই নি! বুড়োর বচনে পিত্তি জলে যায়, সে বচন যদি শোনো বাবা, তখন তুমিও বলবে যে হ্যাঁ বচন বটে একখানা! আমার ওই ধুলো-গুঁড়োটুকু নিয়ে সংসার করচি বাবা, আমার শিবরাত্তিরের সল্‌তে টিম্ টিম্ ক'রে জলচে, ওই আমার বিষ্টু— ওকে বুড়ো বলে কি না, পয়সা না রোজকার করিস তো বাড়ী থেকে বেরো। তুমিই বলো দেখি বাবা বিষ্টু বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবে, আর আমি বসে থেকে ওই বুড়ো ভূতকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াবো? তাই বলি ছাই খেতে দেবো তোমাকে। তাই খেতে দিই নি—সোজা কথাই তোমাকে বল্লাম, এখন তুমি আমার কি করবে করো—

আমি জিভ কেটে বল্লাম—সে কি কথা খুড়ীমা, ছি ছি—আমি আপনার সন্তানের মত— এ সব কথা আমাকে—

খুড়ীমা বল্লেন—বোসো বাবা, তালের বড়া ভাজচি, খেয়ে যাও গরম গরম—

আমি বল্লাম—সে হবে এখন। কাকাকে আপাততঃ কিছু খেতে দিন, ওঁর খাওয়া হয় নি সারাদিন। ডেকে আনবো?

খুড়ীমা মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন—না। অত আত্যিস্যিরো তোমার করবার কোন দরকার দেখি নে তো!

—দরকার বেশ দেখা যাচ্চে, খুড়ীমা! কাকাকে ডেকে আনি, দেখুন—বুড়ো মানুষ, ও-রকম করবেন না। কিছু খেতে দিন ওঁকে।

—আচ্ছা, একটু পরে যেও। তালের বড়া একখোলা নামাই—পোড়ার মুখ না হয় গরম গরম দু'খানা দেবেন এখন বুড়ো, যমের অরুচি—

—ছি খুড়ীমা, অমন ক'রে বলা আপনার উচিত হয়? বলবেন না ওরকম।

পিছনের দিকে দোরের কাছে কখন ভাম. কাকা এসে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়েছেন, টের পাই নি। তিনি অমনি দোর থেকে বলে উঠলেন—শুনচো তো বাবাজি? শোনো, নিজের

কানে শুনে যাও তোমার খুড়ীমার বচন— মধু ঢেলে দিচ্ছে একেবারে কানে। ওই মাগী যদি এ ভাবে—সংসার উচ্ছন্ন দিলে ওই বদমাইশ মাগীই তো—

এর পর উভয়ে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। আমি কিছুক্ষণ উভয়পক্ষকে নিরস্ত করার বৃথা চেষ্টার পরে সরে পড়বার যোগাড় করছি, এমন সময় খুড়ীমা ডাকলেন—কোথায় যাও বাবা? দাঁড়াও, তালের বড়া খেয়ে যাও—

আর তালের বড়া। যে কাণ্ডটা দুজনে সন্ধ্যেবেলা বাধালেন, ভাবলাম একবার বলি।

মুখে বল্লাম—আচ্ছা, খুড়ীমা; আমি বসছি। আপনারা দয়া ক'রে একটু চুপ করবেন?

খুড়ীমা আর কোন কথাটি না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

শ্যাম কাকা আমাকে চুপি চুপি বল্লেন—তুমি একটু বলো বাবাজি, দু'খানা তালের বড়া যেন আমাকেও দেয়—বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি ততক্ষণ হরিনামটা সেরে নিই—সন্ধে হয়ে এল—

আমায় কিছু বলতে হোলো না। খুড়ীমা দুটো কাঁসার জাম-বাটিতে তালের বড়া নিয়ে এসে বল্লেন—অমুক বুড়ো (খুড়ীমার ব্যবহৃত বিশেষণটি অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না) কোথায় গেল?

—আজ্ঞে তিনি সন্ধে আহ্নিক করতে গেলেন—

—ওর মুণ্ডু আহ্নিক। ডেকে দাও, খেয়ে তিনি আমার মাথা কিনুন—

আমি ডেকে আনলাম বাইরের ঘর থেকে।

খুড়ীমা কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দিলেন শ্যাম কাকাকে ডেকে আনবার পরে। আমার অস্তিত্বই যেন তিনি ভুলে গেলেন। শ্যাম কাকাকে তালের বড়া খাওয়াতেই তাঁর সারা মন যেন ঢেলে দিলেন। তবে সম্বোধনের বাণী মধুর ছিল না, মধুর তো দূরের কথা, শিষ্ট বা ভদ্রও ছিল না।

নমুনা কিছু নীচে দেওয়া গেল:—

—গেলো—যমের অরুচি—গেলো। তা ভালো হয়ে বোসোও না হয়? কোন্ মড়ার খাটে তোমার জন্যে বাঁশ তৈরি রয়েছে যে আজ সারা দিন বাইরে বসে থাকা হয়েছিল শুনি? আমার তো বড্ড দোষ, বেশ পিরথিম তো ছেয়ে ফেললে আমার অপযশ গেয়ে। এখন তারা এসে তোমায় গিলতে দিক দেখি? বলি, মুখে বলতে সবাই আছে, দুটি বেলা পিণ্ডি সেদ্ধ করবার বেলা কোন যম তোমার আছে শুনি? দাঁড়াও আর দু'খানা গরম গরম এনে দিই—তাড়াতাড়ি কিসের শুনি? বলে সেই এক কড়ার মুরোদ নেই, নাম গঙ্গারাম—ইদিকে তেজটুকু আছে ষোল আনার ওপর সতেরো আনা। সে-বার আশ্বিন মাসে যখন দাঁত ছরকুটে বিছানায় পড়ে শুয়ে বেহুঁশ হয়েছিলে, তখন দেখে নি এসে পাড়ার লোক? এই মাগীর তো বড় দোষ, এই মাগী না থাকলে যে কোন্ কালে শ্মশানঘাট আলো করতে? শেয়াল-শকুনে হাড়-মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করতো? পেট ভরেছে? না গুড় দিয়ে দু'খানা খাবে? তাল

হয়েচে ? তবু তো নারকোল পড়ে নি। বাড়ীর লোক নারকোল এনে দেবে তবে তো হবে ? তা না সকাল থেকে শোনো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া —ধম তুলে রয়েচে কেন ? যমে তোমায় নেয় না ? পান ছেঁচে আনবো ? ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্চে—পূবে শ্যাওটা দেখা দিয়েচে—এণ্ডিখানা নিয়ে আসি, গায়ে দিয়ে গিয়ে বোসো—নইলে সর্দ্দি-কাশির থুতু-গয়েরে ঘর ভরিয়ে ফেললে সে তোমার যমকে ডেকে এনে পরিষ্কার করিয়ো বলে দিচ্চি স্পষ্ট কথা—এই ক্যাও গামছা—

খুড়ীমার স্বামী-শুশ্রূষার আতিশয্যে আমি কোথায় তলিয়ে গেলাম, একবার মাত্র আমার বাড়িতে তাদের বড়া দিয়ে আর আমার দিকে তিনি ফিরেও চাইলেন না।

উল্টোরথ

আমার ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে নতুন একঘর লোক এসে বাস করলো। আমি সে-বার মামার বাড়ী গিয়েছিলাম ছ'সাত মাসের জন্যে। এসে দেখি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীদের ভিটের পশ্চিম-পাড়ে যে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তা কারা কেটে ফেলে সেখানে দু'তিনখানা টিনের ঘর তুলেছে। কাতুকে জিজ্ঞেস করলাম—এ কি রে ? আমাদের সেই নোনা গাছ ?

কাতু ঠোঁট উল্টে বল্লে—সে হয়ে গিয়েছে—

—হয়ে গিয়েছে মানে ?

—এখানে যে নতুন লোক এসে ঘর বেঁধেছে। মামার বাড়ী ছিলে, দেশের খবরই বা কি রাখো ?

—কে রে ?

—অনেক দূরে কোথায় থাকতো, সেখান থেকে উঠে এসেছে।

—ব্রাহ্মণ ?

—হাঁ! নাম সত্য চক্রবর্ত্তী।

—চল গিয়ে দেখে আসি—ছেলেপিলে আছে আমাদের বয়সী ?

—দু'জন আছে। ভাব হয়ে গিয়েছে আমাদের সঙ্গে। নিভু আর পটল। ভারি ফর্সা দেখতে, আর ছিন্দি-মিন্দি বলে—

আমি মজা দেখতে নতুন বাড়ীর উঠোনে ঢুকলাম। আমার বড় দুঃখ হচ্ছিল, অমন নোনা গাছটা, যাতে নোনা পেকে গাছ আলো করতো, যা একটা খেলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যেতো, সেই অমন নোনা গাছটা এরা কেটে ফেলে কি কাণ্ড করেছে দেখো দিকিনি।

বাড়ীতে ঢুকতেই দেখি খুব ফরসা একটি দাড়ীওয়ালা লোক পশ্চিমদিকের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চেন। কাতু বল্লে—দাঁড়া। ওই সত্য চক্কত্তি। বড্ড রাগী লোক।

—বকবে ?

—বকে, বাড়ী ঢুকতে দেয় না।

সাহস ক'রে আর একটু এগিয়ে যেতেই সত্য চক্কত্তি আমাকে দেখতে পেয়ে বল্লে—কে ?

আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে বল্লাম—আমি।

—আমিটা কে ?

—আমার নাম তোতন। এই গাঁয়ে বাড়ী।

—ব্রাহ্মণ ?

—হাঁ।

—বাপের নাম কি ?

—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

—ও, অনাদি দাদার ছেলে তুমি। কবে এলে ? এখানে তো তোমরা ছিলে না ?

—কাল এসেছি।

—বেশ। এখন যাও, বাড়ীতে ছেলেরা কেউ নেই। সব পাঠশালায় গিয়েছে পড়তে। তোমরা পড়াশুনো কর না বুঝি ? এ-গাঁয়ে ছেলেরা সব খেলেই বেড়ায়।

আমার রাগ হলো। আমি পড়ি নে, উনি কি ক'রে জানলেন ? থাক বাবা, যাবো না ওদের বাড়ী। ওদের বাড়ী না গেলে কি ভাত হজম হবে না ?

এইভাবে প্রথম সত্য চক্কত্তিদের সঙ্গে আলাপ হোল। সত্য চক্কত্তির দুই ছেলে নিন্তু আর পটলের সঙ্গে কী ভাবই হয়ে গেল আমাদের। বেশ ছেলে ওরা, দেখতেও যেমন, লেখাপড়াতেও তেমনি। আমরা এক সঙ্গেই পাঠশালায় আর স্কুলে পড়লাম। ওদের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করি। কিন্তু সুখ ছিল না ওদের বাবা সত্য চক্কত্তির জন্য।

কি মারই ছেলেদের দিত লোকটা! সারা বাল্যকাল নিন্তুদা আর পটলের প্রাণে সুখ ছিল না, মনে সুখ ছিল না। কি কড়া শাসনের ওপরই সর্বদা রাখতো বাবা ওদের। পান থেকে চুন খসেছে কি তুলকালাম মার। সে-বার আমি, নিন্তু আর পটল খেলা করছি, এমন সময় কি নিয়ে নিন্তুদার সঙ্গে পটলের ঝগড়া বাধলো। নিন্তুদা বল্লে—তুই আমার বড় পেন্সিলটা নিলি তখন, ফেরত দে—.

পটল বল্লে—তুমি আমার খাতা ছিঁড়ে দিয়েছ দাদা, পেন্সিল দেবো না—

—আলবৎ দিবি।

—কক্ষনো দেবো না—

—এই নে, এই নে—বাঁদর কোথাকার, বলেই নিন্তু বসিয়ে দিলে—দুই চড়।

—তুমিও এই নাও—এই নাও, বলে পটলও কষিয়ে দিলে—আর দুই চড়।

এমন সময়ে ওদের বাবা সত্য চক্কত্তি অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ঢুকে বল্লেন—কি হচ্ছে ? কি হচ্ছে ? এই রকম ক'রে পড়া হচ্ছে বুঝি ? শুম্ভ নিশুম্ভর যুদ্ধ বাধিয়েচ দেখছি ? বলেই দু'জনকে সে কি দুড়দাড়িয়ে মার। গরুকেও মানুষ অমন মার মারে না। নিন্তুদা তো মার খেয়ে উঠোনে এসে ছিটকে পড়লো, পটল কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো

কাঁপতে কাঁপতে। আমি সরে পড়লাম বেগতিক বুঝে। এই রকম দেখে এসেছি সারা বাল্যকাল। নিন্তুদা আর পটল বাপের ভয়ে জুজু। কোন জায়গায় ইচ্ছামত খেলতে যাওয়ার জো নেই।

নিন্তুদার বিয়ে হলো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। ওদের সকলের ছোটভাই পিণ্টুর বয়স এই সময় বছর চারেক। আমি আই-এ পড়ি কলকাতায়। বিয়ের চিঠি পেয়ে বাড়ী এলাম। নিন্তুদার বিয়ে, আমোদ আহ্লাদ করা যাবে। নিন্তুদা ডাক্তারি পড়ে, ভালো ছেলে কলেজের।

পটল গিয়ে ওর বাবাকে বল্লে—বাবা, দাদা বলছে পকেট-ঘড়ি নেবে না।

সত্য চক্কত্তি বিস্ময়ের স্বরে বল্লেন—অ্যাঁ? কি?

—বলছে পকেট-ঘড়ি নেবে না। আজকাল রিস্ট-ওয়াচের রেওয়াজ হয়েছে, পকেট-ঘড়ি কেউ পরে না—তাই বলছিল—

—পরে না? কোথায় গেল সে হারামজাদা, ডাকো ইদিকে—

নিন্তুদা তো সঙ্কুচিত ভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখ চুন হয়ে গিয়েছে ভয়ে।

সত্য চক্কত্তি বল্লেন—তুমি পকেট ঘড়ি নেবে না? বড্ড তালেবর হয়েছ বুঝি? বাপের কথার উপর কথা? বজ্জাত পাজি, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব জানো? যাও, তোমার বিয়ে করতে হবে না। তুমি কালই কলকাতায় চলে যাও—

সেদিন বাড়ীতে লোকজনের ভিড়, শাঁখ বাজছে, নান্দীমুখের চাল কোটা হচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে ওদের—মা বার হয়ে এলেন। এসে ছেলের পক্ষ হয়ে স্বামীকে দু'কথা শোনালেন।

—তোমার না হয় তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—কিন্তু দুধের ছেলে, ওর অত হিসেবজ্ঞান এখনো হয় নি তোমার মত। আজকের দিনে বাছাকে কোনো কথা বলতে পারবে না বলে দিচ্ছি—

—অত বড় কথা বলতে ওর সাহস হয়? আজকাল কালে কালে সব হচ্ছে কি?

—অত তোমাকে দেখতে হবে না। যাও, বাইরে গিয়ে বসো খানিকক্ষণ।

নিন্তুদা সে যাত্রা রেহাই পেল।

আমাকে বিয়ের পর নিন্তুদা দুঃখু ক'রে বলেছিল—দেখলি তো ভাই বাবার রাগ। একটা হাতঘড়ির কথা বলতে গেলাম, তা বাবা—

আমি বল্লাম—যাক্ গে। গুরুজনদের কথায় দুঃখু করতে নেই।

—বাবা বোঝেন না। একটা হাতঘড়ি থাকলে আমাকে কেমন মানাতো?

—এর পর কিনে পরিস্। সে এখন।

দিন চলে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিশ বছর কেটে গেল। পঁচিশ বছর কেটে গেল। তখনকার বালক এখন যৌবনের সীমা পার হতে চলেছে।

দেশে এসেছি অনেক দিন পরে। অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে দেশের। যেখানে আগে কোঠা-বাড়ী দেখে'ছি এখন সেখানে ভাঙা ইটের স্তূপ আর জঙ্গল। বাড়ীর লোক মরে-হেজে গিয়েছে, যারা বেঁচে আছে, তারা বিদেশে চাকরি করে। দেশে যাতায়াত নেই। আগে যাদের হীন অবস্থা দেখেছি, এখন তারা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, বাড়ীতে তাদের গোলাপালা, গরুবাছুর। ভাতের অভাব নেই বাড়ীতে। এই রকম এক গৃহস্থের বাড়ীতে সকালবেলা বেড়াতে গেলাম।

এ বাড়ীর কর্ত্তাকে ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। নাম ছিল মাধব পণ্ডিত। এরা গোয়ালার বামুন, অর্থাৎ গোয়ালাদের বাড়ী দশকর্ম্ম ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন ক'রে অতি কষ্টে পরিবারের অন্নের গ্রাস সংগ্রহ করতেন পণ্ডিত মশায়। এদের একখানা চালাঘর দেখেছি ছেলেবেলায়, তখন মাধব পণ্ডিতের বড় ছেলে জয়কেষ্ট (আমার বয়েসী) খিদের জ্বালায় সকালবেলা পাকা বীচে শসা খেতো, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে, কুটনোর থালা থেকে তুলে নিয়ে। পণ্ডিত মশাই কোঁচড়ে ক'রে চাল আনতেন প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ধার ক'রে, তবে হাঁড়ি চড়তো। মাধব পণ্ডিত কুলের অম্বল বড় ভালবাসতেন। একদিন আমার বেশ মনে আছে, জয়কেষ্ট আর তার বোন নন্দি দু'জনে এক কোঁচড় কুল পেড়ে নিয়ে এল মাঠ থেকে। ওরা পা বিছিয়ে কুল খেতে বসলো রান্নাঘরের দাওয়ায়, কারণ ওদের সদাই খিদে। আমি মুখ ফুটে চাইলাম, আমার হাতে জয়কেষ্ট গোনা একটা কুল দিলে। নন্দি বল্লে—ও কি দাদা, একটা দিতে নেই, আর একটা দে?

—তোর ভাগ থেকে দে না—

নন্দি আমাকে এক মুঠো কুল দিলে। আজও তার সেই দরাজ হাতের কথা আমার মনে পড়ে বেশ।

এমন সময়ে মাধব পণ্ডিত কোথা থেকে এসে ছেলেমেয়েদের কোঁচড়ে কুল দেখে বলে উঠলেন—বেশ, বেশ। কুল কোথায় পেলি? আর খাস নে, রেখে দে। কুলের অম্বল হবে।

জয়কেষ্ট বল্লে—না বাবা, আমরা খাবো—

নন্দি বল্লে—চুপ কর দাদা। বাবা কুলের অম্বল ভালবাসে, তুমি জানো না? না, বাবা আমরা আর কুল খাব না। মাকে দিয়ে আসছি অম্বল করতে। কিন্তু গুড় নেই, বলো অম্বল হবে কি দিয়ে?

মাধব পণ্ডিত মুখ চুন ক'রে বল্লেন—ও গুড় নেই। তবে আর কি হবে।

আমি তখনি উঠলাম। আমাদের বাড়ী অনেক গুড়-পাটালি আছে, কারণ আমাদের উনিশটা খেজুর গাছ কাটা হয় প্রতি বছর। মাকে গিয়ে বলতেই মা খানিকটা পাটালি দিলেন। আমি নন্দিদের বাড়ী এসে সেই পাটালি নন্দির মা'র হাতে দিয়ে বল্লাম—পণ্ডিত কাকাকে কুলের অম্বল ক'রে দিও কাকীমা।

আর আজ তাদের পরিবর্ত্তন দেখে অবাক হতে হবে।

জয়কেষ্ট পাটের ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। একতলা কোঠা বাড়ী, টিউব

কল, শান বাঁধানো উঠান, গোয়ালে আট-দশটা ভালো ভালো গাই গরু, ধানের গোলা—আমি দেখে অবাক। জয়কেষ্ট এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, চিনি কাপড় দেওয়ার কমিটির সেক্রেটারি, শিক্ষা-কর আদায় করবার কর্ত্তা। লোকে মানে, চেনে, ভয় করে। যা করলে উপায় নেই তোমার শিক্ষাকর বাড়লো, চিনির বরাদ্দ কমলো, কাপড় দু'তিন চালান পাওয়া গেল না। জয়কেষ্টকে এখন গ্রামের লোক বলে বড়বাবু। মাধব পণ্ডিত অনেকদিন মারা গিয়েছেন শুনলাম। সংসারের সুখভোগ তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। কিন্তু সকলের চেয়ে পরিবর্ত্তন হয়েছে নিত্যদা'দের বাড়ীতে।

জয়কেষ্ট চা খাওয়াতে খাওয়াতে আমাকে সব বল্লে।

নিত্যদা এখানে থাকে না, শহরে কোথায় চাকরি করে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকে। পটল এখন রেলে কাজ করে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে লালমণির হাটে থাকে রেলের বাসায়। বাড়ীতে আছেন শুধু সত্য চকত্তি, আর ছোট ছেলে পিন্টু। এখন অবিশ্যি তার বয়স ত্রিশ বছরের ওপর।

আমি বল্লাম—পিন্টু চাকরি করে না?

—চাকরি করবে কি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে থাকে আর পাগলামি করে।

—সত্য চকত্তি কিছু বলেন না?

—সত্য চকত্তি আর সে সত্য চকত্তি নেই। এখন তিনি ছেলের ভয়ে জুজু। তাঁকে পর্য্যন্ত এক্ একদিন মারতে যায়।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—সে কি? সত্য কাকাকে?

—হ্যাঁ। জিনিসপত্র ফেলে ভেঙে চুরমার করে। চাল ডাল ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। ওই দেখো না আমার বাড়ীতে ওই কালই বন্দোবস্তো ক'রে রেখে গিয়েছেন, ওঁর ঘরে রাখলে পিন্টু বিক্রি ক'রে ফেলবে, নয়তো নষ্ট ক'রে ফেলবে।

—কেউ কিছু বলে না?

—কে বলবে? পাগলকে কে রাগাতে যাবে? গিয়ে দেখ সেখানে, তা'হলেই বুঝতে পারবে?

কিছুক্ষণ পরে গেলাম সত্য চকত্তি মশায়ের বাড়ী। তিনি দেখি চুপচাপ বসে তামাক টানছেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরে চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে দেখে বল্লেন—আর বাবা, আমার থাকা না থাকা। আমার যে কি কষ্ট বাবা। পিন্টু আমাকে কোনো জিনিস খেতে দেয় না…চালডাল দেখো ওই ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে…আমার কোন জিনিসে হাত দেবার জো নেই…আর…

—হঠাৎ সত্যকাকা চুপ ক'রে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিন্টু কোথা থেকে এসে বলে উঠলো—কি বলা হচ্ছে আমার নামে? কি বলা হচ্ছে বুড়োর? আমি খেতে দিই নে? আমি চালডাল চাবি দিয়ে রাখি? রাখিই তো! নইলে তুমি বিক্রি ক'রে মেরে দাও। তোমাকে

আর আমি জানি নে, বুড়ো ঘুঘু?

আমি বলে উঠলাম—ছি ছি, এসব কি হচ্ছে পিন্টু? উনি তোমার বাবা না? বাবাকে ওই সব বলতে তোমার মুখে বাধে না?

ও বল্লে—উনি বাবা তাই কি? আমি ও সব মানি নে। আমার যা খুশি তাই করবো।

—তা বলে ওঁকে তুমি খেতে দেবে না? ঘরে চাবি দিয়ে রাখবে?

পিন্টুর বাবা বল্লেন—আর বাবা আমাকে—

পিন্টুর ধমক খেয়ে কথা শেষ করতে পারলেন না। পিন্টু হেঁকে বলে উঠলো—চুপ—

আমি বল্লাম—ও কি পিন্টু?

—কিছু না। উনি বাজে কথা বলছেন—

—আর তুমি খুব ভালোকথা বলছো? বাবাকে এ-সব কথা বলতে হয় কোথায় শিখলে?

ওকে ধমক দিয়ে তখনকার মত চুপ করিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম এ রোগের ওষুধ এত সহজে হবে না। বৃদ্ধ সত্য চক্কত্তির জন্যে দুঃখ হোল, সেই দোর্দিণ্ডপ্রতাপ সত্য চক্কত্তি! যার ভয়ে ছেলেরা জুজু হয়ে থাকতো।

তারপর যে ক'দিন দেশে ছিলাম বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বসতাম। কি অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর দেখে অবাক হয়ে যেতাম। এদিক ওদিক চেয়ে ফিস ফিস ক'রে কথা বলেন। ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, ছেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পর্য্যন্ত করতে ভরসা পান না। আমি তাঁকে বল্লাম—নিন্তুদা কোথায় থাকে, সেখানে গিয়ে থাকেন না কেন? কিংবা পটলের কাছে লালমণির হাটে?

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সে সব জায়গায় মন টেকে না বাবা। নিন্তুর বাসায় জায়গা কম, লোকজনের ভিড়। পটলের তো রেলের কোয়ার্টার, পাখীর খাঁচা। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অভ্যেস, সে সব জায়গায় হাঁফ লাগে আমার। নইলে তাদের দোষ নেই, তারা নিয়ে যেতে চায়। তা আমার নিতান্ত খারাপ অদৃষ্ট বাবা। আমি কি ছিলাম, আজ কি হয়েছি তাই দেখো। তোমার কাকীমাও যদি আজ বেঁচে থাকতো, তা'হলে বুড়ো বয়সে আমাকে ছোট ছেলের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়?

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু কথা খুঁজে পেলাম না।

মুক্তপুরুষ হরিদাস

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্ত্তী বি এ, বি-টি এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাস্টারি করিতেছেন। সম্প্রতি মুশকিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাত্তে চোখের অসুখে তিনি রীতিমত ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেডমাস্টারের কড়া তাগাদা—হাফ-ইয়ারলির খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাস্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি ফাইভ্ উইক্‌স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন—একখানাও দেখলেন না—এতে ক'রে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্চে।

হরিদাস বাবু বিনীত ভাবে বলিলেন—চেষ্টা তো করচি স্যর, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্চি না, দিচ্চি যত শীগ্‌গির হয়—

আবার তিন দিন গেল। আবার হেডমাস্টার কড়া তাগাদা দেন—কি মশাই? এখনো আপনি খাতা দিচ্চেন না?

—দিচ্চি স্যর, আর দু-পাঁচটা দিন—

না মশাই, তা হবে না। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো স্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো আনপ্লেজ্যান্ট ব্যাপার করতে চাই নে, কিন্তু—

তার উপর বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে দিনরাত খাই খাই করিতেছে, তাহাদের খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে, ত্রিভুবনে হেন বাপ-মা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাস্টার হরিদাস বাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন?

খাতা একটি গাদা। সকালে উঠিয়া টিউশনি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটা কথাবার্ত্তা বলিবার পর্য্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশনি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়ীতে গিয়াই শুনিতে হয়, গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানা শাড়ী ছাখো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা হিম ক'রে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না?

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ীর মেয়েদের থাকিত। তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরও কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায়ও তো কিছুই দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাস্টারের কড়া কথা শুনিতে হইলে, পরীক্ষার খাতা ভাল করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুন। হেডমাস্টার বলিলেন—খাতাগুলো কি অমন ক'রে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েছেন, খাতাগুলো ফেরৎ নিয়ে যান, ওতে কাজ চলবে না।

সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাস বাবুর মনে হইল এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই বন্ধন দশা চলিতেছে কতকাল। এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন ?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য্য ঘটনা।

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি কুণ্ডু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া একখানা কি বই পড়িতেছে হরিদাস বাবু দেখিতে পাইলেন। দু'বার বারণও করিলেন—এই কি হচ্ছে ? অঙ্ক কষো—তাড়াতাড়ি কষো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কষিবে কেন, ভগবান যে অন্ত তাহাকেই দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষদের জীবনীর মধ্যে অনেক পাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানা পড়িতে লাগিল। এবার হরিদাস বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কান সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতুহলবশতঃ বইখানি খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক নভেল হইবে—অন্ততঃ ভূতের গল্প। কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'বীর-বাণী', স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। হরিদাস বাবু ধর্ম্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম ভালই জানিতেন। বইখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার। টিউশনি ছিল না। বাড়ীতে চা খাইয়া হরিদাস বইখানা লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা! আমিই সেই! আমিই ভগবান। অহং ব্রহ্মাস্মি। সোঽহং।

কি মহান, বিরাট আইডিয়া! কি হিমালয়ের মত উদার গগনচুম্বী বাণী! হরিদাস মাস্টার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল, অনংবেত অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা, ভগবান আর তিনি হাত ধরাধরি করিয়া যুগ-যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাবীর। জগতকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্ম, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্ম তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাস্টার ব্রহ্ম।

এক আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্ততঃ পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্ম ফোর্থ ক্লাসের ফুলদা হকের নিকট যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক

কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের ওপর বইখানি লইয়া মশগুল হইয়া রহিলেন।

ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বালকমাত্র, তুমি জানো না হ্যাঁন, হতভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে। এ অনেকটা সেই ঘটনার মত। হরিদাসবাবু ও তাঁহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈষ্ণবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দু'জনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধায় মুখে ভাত পাইয়া মহা খুশি, খাইতে খাইতে গদগদকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস তুমি জানো না সিস্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু তুমিও জানো না, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে।

এই সাতদিনে হরিদাস বাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এমন সব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে ও বই কোথায় পেলি?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলে রে তোর দাদা ও বই?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যর। আরও আছে ওইরকম দু'তিন খানা বই।

—আছে? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যি করে—আনবি—বুঝলি?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির 'অধ্যাত্ম-দর্শন'।

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দু'খানি পড়েন। দু'দিন টিউশনি কামাই করিলেন। হরিদাস বাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দু'দিন ছেলে পড়াতে যাও নি যে? আজও তো স্থির হয়ে বসে আছ। টিউশনি আছে তো?

—থাকবে না কেন?

—তবে যাও না কেন? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়। সকালের ছেলে পড়ানো চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম যোগাবে কোথা থেকে। আজও যাবে না নাকি?

—আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে। লালমোহন ঘোষ কড়া লোক, সে-বার সেই জানো তো? বেণুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না, যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাস বাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন। অগত্যা বই লইয়া চলেন ছাত্রের বাড়ী। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড় আড়তদার ব্যবসায়ী। ঘুঘু লোক। লালমোহন বাড়ী ছিল না তাই রক্ষা। হরিদাস বাবু আর আগের

মত অত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল, তবে জ্ঞানের মূল্য রহিল কোথায়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে, "যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সেবা-ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ অনেক রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কখনো ভিখারীকে একটা পয়সাও দেয় নাই, ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাসবাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যর?

হরিদাসবাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের? লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন, তাই বলছি স্যর।

—কি বলছিলেন?

—বকছিলেন। জানেন তো বাবাকে। ওইরকম লোক।

—তা কি হবে এখন? বাড়ীতে অন্য কাজ ছিল। পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কষিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে জগৎ ব্রহ্ম, সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।"

"যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ববিধ সংস্কার বর্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।"

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে। সব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাঁহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্মে মর্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাঁহাকে বলে নাই কেন?

পুনরায়—"মুক্ত-পুরুষসহ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।"

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয়? দিব্যজ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

"তদবস্থায় গুণাতীত আপ্তরূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা

ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।"

উঃ, এ সব কথা এতদিন কোথায় ছিল!

পুনরায়—"সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবের নিকট প্রকাশ করা হয় না। যে উপযুক্ত পাত্র, মহাপুরুষ-বাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।"

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু!

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাঁহার চোখের সামনে ভগবান মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন-দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে? হরিদাসবাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মত ভীরু তিনি আর নাই, টিউশনির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি? কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দু'দিনের জন্য লীলাখেলা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্বপ্রথমে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন ভাবিলেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। দশটার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রতিদিনের মত বাহির হইলেন কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আলতাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নীচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দু'খানা অধ্যাত্মতত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেড-মাস্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলেরই কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ না কেউ টের পাইবে। কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটি লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাসবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটি কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটি রেলিং হইতে নীচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্ছ কি? দু'পয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করচেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ী আসচে কিনা, তাই বসে আছি। কাঠ কিনবো।

লোকটি চলিয়া গেলে হরিদাসবাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ, বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন? আর বিড়ি খাইবেন না। বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই দুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকার মত।

বেলা চারটার পর হরিদাসবাবু পুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ী আসিলেন। ফিরিয়া চা খাইলেন, খাবার খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেই রকম। তবে এবার পুলের তলায় নয়, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অন্য একটি বাণ্ডিল বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ী হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটায় বাড়ী আসিয়া পৌঁছান। কোনো হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতদিনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধহয় ভগবান অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, সাধককে আরও উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েচে?

হরিদাসবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে?

—হ্যাঁ গো, মাইনে হয় নি?

—না।

—কেন হয় নি? আজ তো ইংরেজী মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদের মাইনে হয়।

—আজও হয় নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। চাকরী মেছুনি রোজ তাগাদা আরম্ভ করেচে, গায়ের মাংস খুলে খাচ্ছে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েচে—তাদের বলে রেখেচি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো?

—চালও বাড়ন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমাসে, বাড়ী থেকে আর বেরুনো যাচ্ছে না।

—না যায় বেরিও না—

এই কথায় গৃহিণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করিলেন।

বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমার বই এনে দিলে না?

—কি বই?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাস্টার রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দুবে। এখন যা।

গৃহিণী ওঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর ইস্কুলে যেতে হবে না। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন ইস্কুলে যাবি নে, খবরদার বলচি।

সংসার অসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না, স্ত্রী বকিতেছে, বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই। তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পথায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিস, তিনি এসবের ঊর্ধ্বে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সাবেক পথে ফিরাইতে পারিবে না। বকিতেছে, বকিয়া মরুক।

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাঁহার জানা ছিল না। দেবতা কে, না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম-রাজ্যের একজন বড় গাঁতিদার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন্। কিসের বলে? ব্রহ্মোপলব্ধির বলে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি দেবতা।

পর দিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মত ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছে-পাতায়। কি সুন্দর বিহঙ্গকাকলী। এসব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাসবাবু যে সে কথা বুঝিলেন না তা নয়, তবু ভাল লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিয়াছেন, এমন সময় হাজরী মেছুনি আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেছেন? দু'দিন আমি আপনার দেখাই পাই নে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও-মাসের সেই চিংড়ি মাছের দরুণ সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলি চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতি হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা এখন যা—বেলা হ'লে আসবি।

—কত বেলা হ'লি?

—আঃ, বিরক্ত করলে। এই বেলা ন'টা দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হ'লি চলে? আমরা হচ্চি গরীব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হ'লি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনি চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুশ্‌কিল এই যে, বিড়ি ফুরাইয়াছে। নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আনি দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

যাক গে। আশাতে আসক্তির বন্ধন। সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত না তিনি? তিনি না অজয়,

অমর আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুয্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, সুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকার আণ্ডিল, একটা পয়সার সদ্ব্যয় নাই। গীতা অত সহজ জিনিস নয়।

আরও একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথে ঘাটে বাহির হওয়ার জো নাই। বাড়ীতেও তিষ্ঠিবার জো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে স্কুলের, হরিদাসবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরাজি মাসের এগারো তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালীর দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়ীতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাগো, আর তো চলে না। এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরি করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো ক'রে বলো পোড়ার-মুখো হেডমাস্টারকে!

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাসবাবু আজ স্কুলে গিয়া, গুটি গুটি হাজির হইলেন।

তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাসবাবুর পা কাঁপিতেছে। জিভ্ শুকাইয়া গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? বড় কড়া হেডমাস্টার।

হেডমাস্টারের অফিসে কম্পিত পদে দুরু-দুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেডমাস্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতদিন কি হয়েছিল আপনার?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ হরিদাস সে চশমা-পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যর, ইয়ে—বাড়ীতে বড্ড অসুখ। জলপেটে যন্ত্রণা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে। তার ওপর রাত জেগে নার্স করতে হচ্চে। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যর। একে পয়সার অভাব, ডাক্তারে-ওষুধেই বিশ-পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যর—

হেডমাস্টার বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল? অসুখ বিসুখ হতে পারে, সেটা আশ্চর্য্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড্ মি—স্কুলের ইন্টারেস্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার? না, এরকম হ'লে হরিদাসবাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হ'তে হবে আপনার নামে—

—এবারটা স্যর এক্সকিউজ করুন দয়া ক'রে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ ক'দিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রণা রাত্রে, যদি দেখতেন স্যর তবে আপনারও কষ্ট হোত —এগারো দিন রাত্রে ঘুমুই নি, ঠায় শিয়রে জেগে বসে আছি স্যর—চোখে দেখা যায় না। সে যন্ত্রণা—

হরিদাসবাবু কাঁদো-কাঁদো হইলেন।

অন্তর্জলি

বাংলা ১২৭৫ সাল।

চুঁচুড়ার গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান-রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে অন্তর্জলির জন্যে আনা হয়েছে। সঙ্গে আছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রাম-প্রসাদ, ভ্রাতুষ্পুত্র রামনিধি এবং পাঁচালীর দলের পুরাতন দোহার ষষ্ঠী সামন্ত। তা ছাড়া আছে একটি চাকর, নাম যদু।

দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে চুঁচুড়া' ঘাটে অন্তর্জলির জন্যে আনা হয়েছে, এ সংবাদ লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো অতি অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চারিধার থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো সকাল থেকে। যারা আসে, তারা চক্রবর্ত্তী মশায়কে দেখে, পায়ের ধুলো নেয়, চলে যায়। কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না, তাহ'লে অল্প সময়ে বেজায় ভিড় জমে যাবে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীপ্রসাদ সকলকে হাতজোড় ক'রে বলচে, "আমার বাবার শেষকালের ক্রিয়াগুলো একটু শান্তিতে করতে দান আমাদের। ভিড় করবেন না, দয়া ক'রে চলে যান। দেখা তো হোল, আবার গাছতলায় দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? তামাক এখানে না, এগিয়ে গিয়ে খান। বাঁধানো বটতলায় চলে যান।"

সুবোধ লোকেরা চলে যাচ্ছে। বলতে বলতে যাচ্ছে, "আহা—হা! দীনদয়াল চক্কত্তি চললেন! আহা—হা!"

ওদের চোখে জল।

"অমন অনুপ্রাস আর কেউ লাগাতে পারবে না। আহা-হা!"

"বাংলা দেশের হয়ে গেল! কি লোকই চলে যাচ্ছে!"

"ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।"

"দেখলেও পুণ্যি হয়। চেহারা যেন সাক্ষাৎ শিব! চললেন!"

"বর্দ্ধমান আজ অন্ধকার হয়ে গেল!"

"বর্দ্ধমান বুঝি মশায়ের বাড়ী? উনি সারা বাংলাদেশের, শুধু বর্দ্ধমান কেন?"

"ওঁর জন্মভূমি বর্দ্ধমান তাই বলচি। বর্দ্ধমানের চাঁপা গ্রামে। কাকট পরগণা।"

দুর্বুদ্ধি-লোকেরা একবার চলে গিয়ে আবার ঘুরে ফিরে আসে।

"নাভিশ্বাস উঠেছে নাকি? ও, এখনো ওঠে নি? আহা হা!"

"যাবোই তো মশায়, থাকতে আসি নি। অমন লোকটা আহা! চলে যাচ্ছেন! আহা হা!"

"আমাদের বাঁপাই গ্রামে বড়ুদের বাড়ী পুজোর সময় বাঁধা আসর ছিল চক্রবর্ত্তী মশায়ের। লোকে বলে গান শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতো। ওঁর গান সকলের মুখে মুখে।"

নিকটেই বর্দ্ধমান রাজার কাছারী। সেখানকার নায়েব নরহরি জোয়ারদার স্বয়ং এসেছেন দেখতে। দুর্দ্ধর্ষ নরহরি জোয়ারদার, এ পরগণায় সাত সাতটা ডাকাত যিনি স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে লেঠেল-পাইক পরিচালনা করেছেন, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় যাঁর প্রতাপে। নরহরি বসে আছেন চক্রবর্ত্তী মশায়ের বিছানার কিছু দূরে, বলছেন,—"কোন ত্রুটি না হয় ব্যবস্থার। সব আমি ঠিক ক'রে দেবো। আমার পাইক এখানে বসে থাকবে সন্ধে পর্য্যন্ত। যখন যা দরকার হয়—"

দেবীপ্রসাদ বল্লে—"আপনার দয়া নায়েব মশায়। রাত্রে আজ দু'জন লেঠেল এখানে থাকা দরকার। এখনো নাভিশ্বাস ওঠে নি, রাত নেবে বলে মনে হচ্ছে।"

"এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ভেবো না বাবাজি। তুমি আর তোমার ভাই শুধু চুপ ক'রে বসে থাকো। এ আমাদের দায়।"

"আপনি আর একবার আসবেন তো?"

"আমি আসবো সন্ধ্যাহ্নিক সেরে। দপ্তরের আজ বড় ঝঞ্ঝাট। কিস্তির সময় কিনা। ওটা কি হে?"

"আজ্ঞে এখানা বাবার গানের খাতা। উনি বল্লেন, অন্তর্জ্জলি করবার সময়ে ওঁর হাতে এখানা রাখতে।"

"দেখি দেখি!"

নরহরি খাতাখানা উল্টে-পাল্টে দেখে বল্লেন, "শ্যামা সঙ্গীত। আহা কি অনুপ্রাসের ঘটা! কি বাঁধুনি—এইখানটা ভাখো—বল্ দেখি মা কোন্ রঙ্গে ত্রিবিক্রমে রক্তক্ষেত্রে রঙ্গ ভাখো—আহা হা! ক্ষণজন্মা পুরুষ! আর জন্মাবে না। হয়ে গেল! পিদিম নিভে গেল!"

দেবীপ্রসাদের চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগলো! নরহরি বল্লেন, "সংসার অনিত্য। চিরদিন বাপ মা থাকে না। কেঁদো না বাবাজী! হ্যাঁ, বাপের মত বাপ। যাকে বলে দিগ্‌বিজয়ী বাপ। চোখের জল ফেলবার বহু সময় পাবে বাবাজী, এখন যাতে ওঁর শেষ কাজ-গুলো ঠিক মত করতে পারো—"

দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীর বয়েস হয়েছে ছিয়াত্তর সাতাত্তর। দোহারা চেহারা, বেশ ফর্সা রং, এই বয়েসেও বেশ সুপুরুষ। কবির গান গেয়ে অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। স্বগ্রামে প্রায় ৫০।৬০ বিঘে জমি ও কয়েকটি আম-কাঁটাল বাগানের তিনি মালিক। এই জমির মধ্যে অর্দ্ধেক আন্দাজ বর্দ্ধমান রাজার ব্রহ্মোত্তর। বাকি তিনি কিনেছিলেন। তাঁর পসারও ছিল যথেষ্ট, বাড়ীতে দুর্গোৎসব করতেন খুব জাঁকিয়ে, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন কাঙালীভোজন যেভাবে নিষ্পন্ন হোত, এদেশের অনেকে তেমনটি চোখে দেখে নি। গত বৎসর ছিল ঘোর দুর্ভিক্ষের বছর, চালের মণ সাড়ে তিন টাকা চার টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিল, অনেককে অনাহারে থাকতে হয়েছিল, তাতেও চক্রবর্ত্তী মশায় পিতৃশ্রাদ্ধের কোন অঙ্গ বাদ দেন নি। পাঁচমণ ধানের খইমুড়কি বিলিয়ে ছিলেন কাঙালীদের মধ্যে।

দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে ওই যে রাখা হয়েছে গঙ্গার ঘাটের চালাঘরে। মাটিতেই বিছানা

পেতে দেওয়া হয়েছে। সমস্তদিন কেটে গেল, ওঁর নাভিশ্বাস উঠলো না। সন্ধ্যার সময় তিনি ক্ষীণস্বরে ছেলেদের কাছে ডাকলেন।

—"বাবা পটল, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া—"

—"বেশী কথা বলবেন না বাবা।"

—"লোকজনের ভিড় করেছে?"

—"এখন সবাই চলে গিয়েচে বাবা।"

—"বোসো এখানে।"

—"এখন কেমন আছেন?"

—"ভালো না। সংকীর্ত্তন এল না?"

—"গঙ্গাটিকুরির কীর্ত্তন আনতে লোক গিয়েচে, এলো বলে।"

—"আমায় একটু নাম শোনাও।"

—"বেশী কথা বলবেন না বাবা।"

দেবীপ্রসাদ বাবার মুখে কুষী ক'রে গঙ্গাজল দিল। বল্লে, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন বাবা।"

বাইরে এসে সে লোকজনদের বল্লে, "বাবা এখনো দিব্যি কথাবার্ত্তা কইলেন। বেশ জ্ঞান আছে এখনো।"

একজন বল্লে, "থাকবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। ওসব লোক সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে। যে'সে লোক তো নয়।"

সন্ধ্যা নেমে এল। নিস্তব্ধ তারা-ভরা রাত্রি।

শ্মশান-চালার অদূরে কয়েকজন লোক বসে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ওরা ভুমুরদ'র হাট থেকে কুমড়ো কিনে এনেচে, পটল কিনে এনেচে। ষষ্ঠী সামন্ত বসে কুমড়ো কুটচে। দেবী-প্রসাদ বল্লে, "ষষ্ঠী কাকা, বাবাকে একবার দেখতে গেলে না?"

—"দেখতে যাবো কি, কর্ত্তার মুখের দিকে তাকালে বুক ফেটে যাচ্ছে। আজ এগারো বছর কর্ত্তার সঙ্গে তেনার দলে ঘুরছি। কত বড় বড় আসর মাৎ করেছেন কর্ত্তা। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন, ছোট ভাইয়ের মত। উনি চলে যাচ্চেন, আমার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। খাবো কি তাই হয়েচে ভাবনা। তুমি দল করো বাবাঠাকুর, আমি সেই দলে আসবো। কর্ত্তার নামে দল চলবে।"

—"পাগল! আমি আর বাবা! গাইবে কে!"

—"গাইবে তুমি বাবা ঠাকুর। আমার পরামর্শ শোনো। সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো। আমার সব ঘাৎ-ঘোঁৎ জানা আছে। সোনার দলটুকু, এ ছেড়ো না বাবা ঠাকুর, এতেই তোমাদের সংসারে লক্ষ্মী।"

—"আমার ভরসা হয় না ষষ্ঠী কাকা, দেখি কি হয়। বাবা যা রেখে যাচ্চেন, দু'ভাইয়ের

অভাব হবে না। দলের কন্‌ঘাটে আর যাবো না। ও সব আমার কর্ম নয়।"

কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র ক'রে আজকার এই সব ব্যাপার, তিনি সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন, নাভি-শ্বাস ওঠা তো দূরের কথা।

চোখ বুজে আছেন যে, সে শুধু ভীষণ শারীরিক দুর্বলতার জন্তে।

এক একবার ছেলেদের ডাক দিচ্ছেন, "বাবা পটল—বাবা বাবু—এদিকে এসো—"

কিন্তু সে-ডাক ছেলেদের কানে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে না। আসলে চক্রবর্ত্তী মশায়ের মনেই সে-আহ্বানের আসন, কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হচ্ছে না সে-ইচ্ছা, অথচ চক্রবর্ত্তী মশায় ভাবছেন, তিনি ঠিকই ডেকেছেন ছেলেদের।

"ওরা কেন আসছে না? তাই তো—"

চক্রবর্ত্তী মশায় আবার চোখ বুজলেন।

আজ সারাদিন তিনি অতীত-জীবনের বহু হারানো-মুহূর্ত্ত আবার আস্বাদ করেছেন। যা ভুলে গিয়েছিলেন, তা যে এত স্পষ্ট হয়ে অঙ্কিত ছিল স্মৃতির পটে কে তা ভেবেছিল?

প্রথম যৌবনের সে-সব গৌরবময় দিন। হরু ঠাকুর তখন ছিলেন চক্রবর্ত্তী মশায়ের আদর্শ। ইলছোবা-মোল্লাই গ্রামের বারোয়ারিতে বড় আসরে হরু ঠাকুরের কবিগান যখন শোনেন, তখন কত বয়েস হবে তাঁর? বছর সতেরো-আঠারো হয়তো।

আজও মনে আছে সে-রাত্রের কথা।

ভাষার অমন ফুলঝুরি আর তিনি কখনো দেখেন নি, শোনেন নি। মনে হোল যেন দেখছেন বিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের মুখে-মুখে ভাষার সে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হরু ঠাকুর একদিকে, অন্তদিকে গদাধর মুখুয্যে—দুই বিখ্যাত কবিওয়ালা। আসরের লোকের মুখে শব্দ ছিল না। পুতুলের মত সবাই বসে আছে।

'সুধীর ধারে বহিছে এই ঘোরতর রজনী
এ সময়ে প্রাণসখী যে কোথায় গুণমণি, ঘন সঘন ঘন শুনি।
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী
ঐ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেঁউতি শেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে।
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবা জ্যোতির্ময় প্রকাশে দিনমণি
প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে সারিশুক থাকে দিবস রজনী।

সতেরো বছরের যুবকের চোখের সামনে হরু ঠাকুরের গান এক নতুন সৌন্দর্য্য-জগৎ খুলে দিয়েছিল। সেদিন থেকে তাঁর মনে মনে দুরাশা জাগলো যদি কোনোদিন কবিওয়ালা হ'তে পারেন, অমন ভাষার ফুলঝুরি ছোটাতে পারেন মুখে মুখে, তবেই জীবন সার্থক।

ভোর হয়ে গিয়েছিল আসর ভাঙতে। সঙ্গে তাঁর ছিল আর একটি লোক, তাঁরই মত অল্প বয়স। দু'জনে আসরের বাইরে এসে একটা গাছতলায় বসলেন। অন্যের সে-ছেলেটি অত কথাবার্তা পাড়লে, কিন্তু দীনদয়ালের ওসব ভালো লাগছিল না।

তিনি সঙ্গীকে বল্লেন, "হরু ঠাকুর কোথায় বাসা করেচেন ভাই ?"

সে বল্লে, "জয়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে। কেন ?"

—"দেখে আসি। অমন লোক !"

—"গদাধর মুখুয্যেও কম নয়। উনিও ওখানে আছেন।"

—"চলো যাই।"

—"সারা রাত গান ক'রে এখন ওরা ঘুমুবে, না তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করবে। এখন যেও না।"

—"তুমি বাড়ী যাও। পিসিমাকে বোলো আমি ওবেলা যাবো। ওঁদের একবার ভালো ক'রে না দেখে যাবো না। কিছু ভালো লাগচে না ভাই।"

সঙ্গী হেসে বল্লে, "পাগল হ'লে নাকি ? চলো বাড়ী যাই। কি হবে ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে ?"

কিন্তু যুবক দীনদয়াল সেদিন বাড়ী ফিরে যান নি। হরু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে তাঁর নেশার ঘোর আরও বেড়ে গেল। এরা মানুষ না দেবতা ? মানুষের মুখের ভাষা এমন সুন্দর হতে পারে ?

আজ সে-সব দিনের কথা এত মনে আসচে কেন ?

আর একজনের কথা বড্ড মনে হয়।

সে একটি নব প্রস্ফুটিত নলিনীর মত নির্মল ও পবিত্র ছিল। জাতিতে ছিল কলু, ব্রাহ্মণেরা ওদের জল স্পর্শ করে না। কিন্তু আজ এ কথা ভেবে চক্রবর্ত্তী মশায়ের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্চে না যে তিনি তার রান্না ভাত খেয়েচেন। তার হাতের জল খেয়ে তৃপ্ত হয়েচেন। আজকার দিনের সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীর সে-খবর কেউ জানে না।

আকাশে বাতাসে সে-সব দিনে কেমন মাদকতা ছিল, মনে ভাবের অক্লান্ত জোয়ার অনুকূল-বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইতো। রাম্ নৃসিংহের সে-গান তখন সব সময় মনে গুন্‌গুনিয়ে উঠতো—

সখি এ সকল প্রেম
প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি
সুখের উদয়।

অথবা—

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

মুমূর্ষু দীনদয়াল মনে মনে হাসলেন।

আজকালকার ছেলে-ছোকরা কি বুঝবে সে-সব প্রেমের কথা? ছেলে-বুড়ো নিয়েও কথা নয়, আসলে চাই প্রাণ। প্রাণের গভীরতা যদি না থাকে, অগভীর ঘোলা-জলে সাঁতার কাটলে কি মহাসমুদ্রের বাণী শোনা যায়? মনে পড়লো কানাইহাটির জমিদার-বাড়ীর নাটমন্দিরে নবাই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সে বিখ্যাত কবির লড়াই, যার ফলে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন দেশে-বিদেশে—আজও সে সাজা-আসরটি, আসরের পাশের প্রাচীন কদম-গাছটি, সেই ভাঙা জামরায়ের মন্দিরের চূড়াটি, এতকাল পরেও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নবাই ঠাকুর বিখ্যাত কবিওয়ালা। আর তিনি তখন সবে উঠচেন। লোক বলাবলি করতে লাগলো, এ ছোকরা এবার হাবুডুবু খাবে নবাই ঠাকুরের আসরে।

নবাই ঠাকুরের দোয়ারে গোপেশ্বর সাঁবুই এসে বিকেলে বল্লে, "ও ঠাকুর, তোমার পাখা উঠেচে?"

—"হ্যাঁ, এবার স্বর্গে যাবো।"

—"সাহস আছে তোমার। চলো, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

—"কোথায় যাবো? কে পাঠিয়ে দিলেন।"

—"নবাই ঠাকুর।"

—"তাঁর এত মাথাব্যথা?"

—"এন্টনি সাহেব ঘোল খেয়েছিল নবাই ঠাকুরের কাছে, জানো তো? তোমাকে আর ফুঁ খাটাতে হচ্চে না যেখানে। এসো, নবাই ঠাকুরের সঙ্গে একটা যড় করো। আসরে যাতে—"

—"তোমার নবাই ঠাকুরের যড় করবার দরকার হয়, বলে দিও, তিনি যেন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেন। আমি তাঁর সেখানে যাবো না।"

—"এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার? আচ্ছা—"

দীনদয়াল নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন নবাই ঠাকুর তাঁর সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েচেন। যত বড় এবং যত বুড়ো কবিওয়ালাই হোন না, অজ্ঞাতশক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনা-সামনি প্রকাশ্য আসরে নামতে ভয় পাবেনই। নিজের শক্তির ওপর অতটা বিশ্বাস কারো একটা থাকে না। বিশেষ ক'রে ওঁরা নাম-করা, ওঁদের সুনাম নষ্ট হবার ভয় আছে, দীনদয়াল ছোকরা-কবিওয়ালা, হেরে গেলেও লজ্জা নেই।

এই নবাই ঠাকুরই এন্টনি সাহেবকে বলেছিল—

এ নহে এন্টনি আমি একটা কথা জানতে চাই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই?

সঙ্গে সঙ্গে এন্টনি সাহেবের প্রত্যুত্তরে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল—

এই বাংলায় বাঙালীর বেশে বেশ আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুর সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

ঠাকুর সিং নবাই ঠাকুরের অন্য নাম।

সন্ধ্যার পর আসর বসলো। কানাইহাটি মস্ত গাঁ, আসর ভর্ত্তি হয়ে গেল সন্ধ্যের আগেই। চারিধারে রটে গিয়েছিল বিখ্যাত নবাই ঠাকুরের সঙ্গে আসরে নামবে একজন ছোকরা-কবিওয়ালা। সবাই মজা দেখতে জড়ো হয়ে গেল, পাঁচ ছ' ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকেও পানের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে ছোলার ছাতু আর তেঁতুল বেঁধে নিয়ে লোকে এসেচে মজা দেখতে, নবাই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরা কেমন হাবুডুবু খায় নবাই ঠাকুরের হাতে, তাই দেখতে।

আসর বসবার দেরি নেই।

জমিদারদের নাটমন্দিরের একদিকে চিকের আড়ালে মেয়েদের বসবার আসন, অন্যদিকে কানাইহাটির বাবুদের বসবার তক্তপোশ ও তাকিয়া বাবুদের তখন নাম-ডাক আছে মাত্র; কিন্তু সাবেক অবস্থা তখন আর ছিল না। হাতীশালা ছিল কিন্তু হাতীর সন্ধান ছিল না। ষোল বেহারার বড় পালকি নাটমন্দিরের পাশের ঘরে পড়েই থাকতো, কেউ চড়তো না তাতে। ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো হয়েচে, আজিম পেতে দেওয়া হয়েচে কবির দলের লোকদের জন্যে, ঠিক আসরের মাঝখানে। তারই পাশে ছিল সেই প্রাচীন বদ্দগাছটা, এখনো সেই আসর, সেই উৎসাহ ও কৌতূহলে-মত্ত শ্রোতৃবৃন্দের জনতা—ওই তো ডুমুরদ' শ্মশানঘাটের ওই শ্মশানবন্ধুদের বিশ্রাম করবার ঘরখানার মতই স্পষ্ট তাঁর কাছে। চোখের সামনে বেশ দেখতে পাচ্ছেন।

তাঁর নিজের দলের দোহার তখন ছিল চন্দ্র মল্লিক। বুড়ো মানুষ, অনেক ভালো ভালো দল ঘুরে দাঁত পড়বার জন্যে চাকুরী খুইয়ে শেষে তাঁর দলে ঢোকে। বছর-দুই পরেই মারা যায় লোকটা।

চন্দ্র বল্লে, "বাবা ঠাকুর, ওদের লোককে তাড়িয়ে দিয়ে ভালো করলে না। বড় জমকালো আসর হয়েচে। এতে হেরে গেলে বড় দুর্নাম রটবে—"

—"তোমার ভয় হচ্চে চন্দন খুড়ো?"

—"ভয় না, তবে তুমি ছেলেমানুষ, তাই ভাবছি।"

—"কিছু ভয় নেই। তুমি দেখে নিও—"

—"বড় বড় কবিওয়ালা কিনা ঠাকুর সিং, শেষে নাকানাবুদ না হ'তে হয়।"

—"তোমার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে উৎরে যাবো, দেখে নিও।"

সত্যি, সে-সন্ধ্যায় একটা নতুন প্রেরণা ও উৎসাহের জোয়ার তিনি অনুভব করলেন নিজের মনের মধ্যে। আজ এই সমাগত কৌতূহলোজ্জ্বল জনসাধারণকে তিনি দেখিয়ে দেবেন, শুধু ইতর-গালাগালি দিয়ে জয়লাভের মূল্য নেই, তিনি দেখাবেন ভাষার ও ভাবের মহিমা, নতুন ভাবের ঢেউ এনে দেবেন আজ কবির আসরে, গাইবেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গীত, সন্ধ্যার আকাশ থেকে সে প্রেরণা আসচে, আসচে ওই প্রাচীন বদবৃক্ষের শ্যামল শাখাপ্রশাখার ইঙ্গিত থেকে, তিনি বুঝতে পেরেচেন আজ তাঁর জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ সমাগত।

•

সেদিনের কথা ভাবলে আজও তাঁর মনে সেই অপূর্ব্ব উন্মাদনা জাগে। এই মৃত্যুর

দিনটিতেও। রসের ও ভাবের সে-পুলক মানুষকে অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী ক'রে দেয় এক মুহূর্তে। সকলে তা কি বুঝতে পারে ?

সাধারণে তার খবর কি জানবে।

সে বুদ্ধি এবং ভাবের সে গভীরতা ক'জনের মধ্যে আছে ?

এমন কি তাঁর নিজের ছেলেরাও তার সন্ধান রাখে না। ওদের মাতুলবংশের বৈষয়িক স্থুল-ধনের উত্তরাধিকার ওরা পেয়েছে, তাঁর নিজের রসেতরা ছন্দের-অনুগত-ভাবসমুদ্রে অবগাহন-স্নান-করে-ওঠা মন ওরা লাভ করে নি।

কাকে কি বলবেন ? কাকে কি বোঝাবেন ?···

তারপর আরম্ভ হ'ল কবির লড়াই। কিন্তু ইতর বা অশ্লীল একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না তিনি। নবাই ঠাকুর যা খুশি বলে বলুক, তিনি তার উত্তর দিতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে আক্রমণ করবেন না এই সংকল্প নিয়েই তিনি আজ আসরে নেমেছেন।

বরং তিনি তার উল্টোটাই গাইলেন।

নবাই ঠাকুরের সৃজনী-প্রতিভার প্রশংসা করলেন তিনি এ আসরে।

কাব্যবন বিচরণ সোজা কথা নয়
কল্পনার ফুল যেথা ফুটে সমুচয়
ভাবের ভাবুক যিনি সুকবি-রতন
নবাই সে পুষ্পরাশি করেন চয়ন
বন্দি আমি তাঁর পদে নবাই সুন্দর
বাণীর দুলাল তাঁর সবই সুন্দর।

নবাই ঠাকুর ও তাঁর দোহার গোপেশ্বর অবাক হয়ে গেল, ওরা তার ঠিক আগেই দীন-দয়ালকে লক্ষ্য ক'রে বলেছে—

কালে কালে সব গেল কাল কাল রাতি
যোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফার্সি পড়ে তাঁতি
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মলো শল্য সেনাপতি
আজব সহরে যথা শৃগাল ভূপতি।
তেলাপোকা হোল পাখী শিখী ছাতাধরিয়া
অর্বাচীন দীনু নাচে তাধিয়া তাধিয়া।

সে কথায় ও-রকমের শ্রদ্ধাপূর্ণ-উত্তর ওরা আশা করে নি। গোপেশ্বরকে কি ইঙ্গিত করলে নবাই ঠাকুর। গোপেশ্বর সুর বদলালে। দীনদয়াল নামের ওপর ওরা খুব কায়দা দেখালে।

কোথা ওহে দীননাথ, দীন দয়াময়
দীনহীনে দিন দিন হও হে সদয়
জায়া কায়া মায়া লয়ে মত্ত হয়ে রই
দিনান্তে তোমার নাম প্রাণান্তে না লই।

মিথ্যা কথা জুয়াচুরি করি কদাচার
রাগ দ্বেষ অভিমান অর্থ অলঙ্কার
এ সকল মহাপাপে ডুবি সর্ব্বক্ষণ
কি হবে আমার গতি পতিতপাবন ?

উভয় দল এক হয়ে আসরের মধ্যে ভক্তির বন্যা ছুটিয়ে দিলে। শ্যামরায়ের পূজারী বৃদ্ধ মাধব পণ্ডিত দীনদয়ালের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। কানাইহাটির বড় বাবু গরদের জোড় বকশিশ করলেন দীনদয়ালকে। দীনদয়ালের মধ্যে নতুন ভক্তির, ভাবের বীজ তখন সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। প্রৌঢ় নবাই সে-পথে কখনো হাঁটেন নি, কাজেই দীনদয়ালের গান আসরের সকলের প্রাণে রসের ছোঁয়া দিয়ে গেল।

কিন্তু আজও একটা কথা দীনদয়ালের মনে হয়!

ধন্য নবাই ঠাকুর!

নিজেকে হঠাৎ সামলে নিয়ে নবাই ঠাকুর যখন ভক্তির 'ছড়া' কাটতে শুরু ক'রে দিলেন, তখন সে কি চমৎকার উজ্জ্বল অনুপ্রাসের ঘটা, বিদ্যুতের ঝিলিকের মত খেলিয়ে নিয়ে বেড়াল আসরে।

পাঁচভূতে সুগঠিত দেহ নবদ্বার
কোন্ মন্ত্রে ছাড়াইব ভূত আপনার
মন্ত্র তন্ত্র জল পড়া এ ভূতে না মানে
নিজমূর্ত্তি ধরি ভূত পঞ্চভূতে টানে!
ভূতের জ্বালায় ভূতে সদা জ্বালাতন
কি হবে আমার গতি পতিতপাবন ?

শেষ রাত্রে আসর ভাঙলো। উভয় দল এমন গান জমিয়েছিল যে শ্রোতার দল উঠতে চায় না, আরো হোক, আরো চলুক, রাত ভোর হয়ে যাক, এমন সঙ্গীতমধু আর কখনো কেউ পান করায় নি এদের, রসের নেশায় ভাবের নেশায় এরাও উন্মত্ত হয়ে উঠেচে যেন, যেন নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন বেরিয়েচে রাজপথে, আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেচে ভগবানের নামের অপূর্ব্ব মহিমায়। নভোচারীর বায়ুপথ ত্যাগ ক'রে গীতরস এসেচে নেমে মৃত্তিকার বন্ধুর পথ-রেখায়।

দীনদয়াল বাসায় এলেন। রাত আর নেই বল্লেই হয়। তামাক সেজে দাঁড়িয়ে আছে দলের ভৃত্য বিশু নাপিত। এমন সময় কে সম্ভ্রমের সুরে বলে উঠলো—"নবাই ঠাকুর আসচেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন দীনদয়াল। একটু পরে নবাই ঠাকুর ঘরে ঢুকে দু'হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বল্লেন—"চক্কত্তি মশায়, আজ আপনি আমাকে জ্ঞান দিলেন—"

সম্ভ্রান্ত, খ্যাতিমান, অবস্থাপন্ন, প্রৌঢ় কবিওয়ালা নবাই ঠাকুরের সামনে দীনদয়াল বিনয়ে, সংকোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। জিব কেটে বল্লেন—"ও কথা বলবেন না, হাত জোড় করচি,

ওতে আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়।"

"আপনি ব্রাহ্মণ, হাত জোড় করবেন না আমার সামনে। ওতে আমার অপরাধ হয়—"

—"বসুন দয়া ক'রে।"

—"এই বসলাম। বড্ড খুশি হয়েছি আজ আপনার—"

—"একটা অনুরোধ।"

—"কি?"

—"আমাকে 'তুমি' বলুন। আপনি বয়েসে আমার পিতৃব্যের সমান।"

—"বাড়ী কোথায় তোমার?"

—"গুপ্তিপাড়া', হুগলী জেলা।"

—"তুমি নাম করবে বাবাজী। বয়েস হয়েচে আমার, অনেক দেখেচি, অনেক বলেচি। তুমি যে-জ্ঞান আমায় দিলে আজ এমন কখনো পাই নি। আণ্ট্নি ফিরিঙ্গির সঙ্গে আসরে উতোর গেয়েছি, ভোলা ময়রার সঙ্গে উতোর গেয়েছি, হরু ঠাকুরকে দেখেছি, গদাধর চক্কত্তিকে নাকাল করেছি শান্তিপুরের ঢুলঢোলের আসরে। কিন্তু হ্যাঁ বাবা, আমি স্বীকার করছি আজ হেরে গেলাম তোমার কাছে। তুমি নতুন সুর এনে দিয়েচ কবিগানের মধ্যে। আমরা পুরোনো ঘুঘু। ছাইতে না জানি, পোড় চিনি। তোমার যে ক্ষমতা, তাতে অনেক বেশি নাম করবে তুমি। নতুন সুর শোনালে আজ সবাইকে। ভগবানের কাছে কামনা করি, দেশের নাম উজ্জ্বল কর। কেউ বোঝে না বাবা, আসল জিনিস ক'জন বোঝে? রঙ্গ-রস শুনতে আসে সবাই, কবিত্ব যে কি অমৃত, এর মধ্যে যে কি আনন্দ, একটা অনুষ্ঠান ভালমত লাগাতে পারলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হয়, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয় বাবা, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয়, সে-সব বাইরের লোক কি বুঝবে? তুমি বুঝবে। তোমার মধ্যে সে জিনিস রয়েচে দেখলাম। আর দেখেছিলাম রাসু নৃসিংহকে, ফিরিঙ্গি হোক আণ্ট্নি, হাঁ, তারা বুঝতো বটে, রস চিনতো বাবা। তা সে-সব—"

দীনদয়াল নবাই ঠাকুরকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। নিজেকে প্রৌঢ়, অভিজ্ঞ কবিওয়ালার ছাত্র বলে বিনয়-প্রণাম করলেন। বিদায় নেবার সময় সেদিন দুপুরে, নবাই ঠাকুরের চোখে জল এল।

নবাই এর পরে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কোন আসরে দীনদয়াল আর তাঁর সঙ্গে কবিগানে গাইতে নামেন নি।

কি দিনই গিয়েচে সে-সব!……

সন্ধ্যা হয়ে এল কি?

দীনদয়াল ডাকতে লাগলেন, "বাবা রাধু—"

কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

দেবীপ্রসাদ কাছে এসে বলে—"বাবা, কষ্ট হচ্ছে?" দীনদয়াল ঘাড় নেড়ে জানাতে গেলেন কষ্ট নেই, কিন্তু ঘাড় নড়লো না শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বড় ছেলের

মুখের দিকে। দেবীপ্রসাদের চোখে জল পড়তে দেখে বল্লেন, "কাঁদছ কেন বাবা, আমি বড় আনন্দে আছি, কোনো কষ্ট নেই আমার। কেঁদো না।"

দীনদয়াল ভাব্‌লেন তিনি কথাগুলো বল্লেন ছেলেকে, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়ে গেল কথা, গলা দিয়ে স্বরের আধার বার হয়ে এল না।

দেবীপ্রসাদ বুঝতে না পেরে বল্লে, "জল খাবেন বাবা ?"

নরহরি জোয়ারদার পেছন থেকে বল্লেন, "হুঁ। জল খেতে চাইচেন। কুষী ক'রে গঙ্গাজল মুখে দাও।"

বিরক্ত হলেন দীনদয়াল। না, জল তিনি চাইচেন না। তাঁর মনে চমৎকার দুটি অনুপ্রাস-বহুল পংক্তি এসেচে, কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদকে সে-দুটি পংক্তি লিখে নিতে বলছিলেন। ওই ছেলেটি তাঁর নাম রাখতে পারে। জিনিস আছে ওর ভেতরে। তিনি লক্ষ্য করেচেন এটা মাঝে মাঝে। মাতুল বংশের স্থুল-বৈষয়িকতার ধারা হয়তো এই ছেলেটি কাটিয়ে উঠতে পারে।

পরম পুরুষ প্রভো নিত্য সনাতন
চিন্ময় তোমার নাম চিনে কোন্‌জন
আমি দীন জ্ঞানহীন না চিনি তোমারে।
কেমনে হইব পার, মায়া পারাবারে।

না, কেউ লিখে নিলে না। কেউ বুঝতে পারলে না। আর এই নরহরি জোয়ারদারটা এখানে এসে জুটেচে যে কেন ? ওটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি বৈষয়িক, ওকে তিনি খুব ভালোই জানেন। প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করা, মাথট আদায় করা, পার্ব্বণী আদায় করা, হয়কে নয়, নয়কে হয় করা, জুয়োচ্চুরি বাটপাড়ি ওর পেশা। ও কি বুঝবে তিনি কি চান ? ও কি বুঝবে নবাই ঠাকুর, আণ্টুনি সাহেব, ভোলা ময়রার কবিগানের মাধুর্য্যে, বাহাদুরি, কৌশল, ঔজ্জ্বল্য ?

না, বড় সুখে ও আনন্দে কেটেছিল সে-সব দিন।

নতুন যৌবন দেহের, নতুন যৌবন মনের ও প্রাণের।

দিন রাত আকাশে-বাতাসে কিসের উন্মাদনা। এই কবিতা আসচে মাথায়, এই লিখে নিচ্চেন, আবার কবিতা এসে গেল মাথায়। কী পীড়ন করেচে তাঁর কবিতার নেশা। ঘুমুতে দিত না, খেতে দিত না, শুতে দিত না। রাত-দুপুরে মাথায় কয়েকটি পংক্তি এসে গিয়েচে, আর ঘুম নেই, উঠে তখুনি লিখতে বসে গেলেন।

একটা দিন মনে পড়লো। দিনহাটার বারোয়ারীতে কীর্ত্তনওয়ালী বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। বিনোদিনী ওঁর কবিগান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে ডেকে পাঠাল। বিনোদিনী সেকালের খুব নাম-করা কীর্ত্তনগায়িকা। দীনদয়াল গেলেন ওর বাসায়। খুব সুন্দর সে, বয়েস তখন ত্রিশ-বত্রিশ—দীনদয়ালের সমবয়সী। একগাল হেসে এগিয়ে এল পৈঁছে বাজু বাজিয়ে, জলতরঙ্গ মলের বাজনায় ঢেউ তুলে।

দীনদয়াল বল্লেন—"কি জন্তে তলব পড়েছে ?"

বিনোদিনী বল্লে—"আমার কি ভাগ্যি! মেঘ না চাইতে জল। আসুন, ঠাকুর মশাই আসুন।"

দীনদয়াল বিনোদিনীর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন তার সামনা-সামনি এসে হঠাৎ বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। মুখে বল্লেন—"কেন তলব পড়েচে ?"

—"আমি কি ভাগ্যি করেছিলাম, আমার ঘরে আপনার মত লোক ?"

—"আমার ভাগ্যিই কি কম ? আমি কার কাছে এসেছি আজ!"

তারপর দুজনে মিলে সুর ও কবিতার চর্চ্চা হ'লো কত রাত পর্য্যন্ত। দুজন দুজনের গুণে মুগ্ধ, দুজনেই গুণী শিল্পী। গভীর রাতে দীনদয়াল বিদায় নিলেন, কিছু একটা প্রেমের কথা বলবার জন্তে বিনোদিনী কত আনচান করেছিল, দীনদয়াল বুঝেছিলেনও তা, সুযোগ দেন নি। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বন্ধুত্ব তিনি অন্ত পথে গিয়ে নষ্ট করতে চান নি।

ভোর হতে না হতে বিনোদিনীর ঝি এসে হাজির। বল্লে—"আপনাকে একটু ডেকেচেন, একটু বেলা হোলে স্নান ক'রে নিয়ে চলুন।"

—"স্নান ক'রে কেন ? তোমার মনিব কি দীক্ষা দেবেন নাকি ?"

—"আপনি পায়ের ধুলো তো দান কিরপা ক'রে। আমি কি জানি ?"

দীনদয়াল স্নান ক'রে পরিষ্কার আনকোরা কাপড় পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে চটি পায়ে বিনোদিনীর বাসায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখেন বিনোদিনীও স্নান করেচে, ভিজে চুলের লম্বা গোছা গেরো বেঁধে পিঠে ছড়িয়ে ফেলেচে, গরদের লালপাড় শাড়ী পরেচে। কুশাসন পাতা, কলার পাতে ফল ও মিষ্টি জলখাবার সাজানো, ঝকঝকে মাজা কাঁসার ঘটিতে জল বা চিনির পানা, মুখকাটা কচি ডাব-বসানো পাথরের খোরা। দীনদয়াল গিয়ে দাঁড়াতেই বিনোদিনী সামনে লুটিয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে—"একটু জলসেবা করতে হবে এখানে আজ।"

দীনদয়াল হেসে বল্লেন—"আমি তো খাই নে কারো বাড়ী, তবে তোমার এখানে খাবো। তুমি সাধারণ মেয়েমানুষ নও।"

—"আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাসী।"

—"অত বিনয় দেখানো ভালো নয়। কি আছে দাও খাই।"

—"আমি প্রসাদ পাবো কিন্তু। মনে রাখবেন।"

—"দেখি, পেটুক ব্রাহ্মণের পাতে কি থাকে।"

খাওয়ানোও তেমনি খাওয়ানো। কত কি ফলমূল, দু-রকমের চিনির পানা, ক্ষীরের মণ্ডা, ছানার মণ্ডা। যেমন বিনয় তেমনি আদর-যত্ন। হাত জোড় ক'রে বল্লে—"আপনি যে গুণী লোক। দশ হাজার লোকের মধ্যে একটা গুণী লোক মেলে। আপনার সেবা ক'রে ধন্য হোলাম, ঠাকুর।"

একটা পর্দ্দা যেন সরে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে।

এতকাল পরেও বিনোদিনীর সেই বাসা···সেই জলপানের থালা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। লালপাড় গরদের শাড়ীপরা বিনোদিনী হাসিমুখে নতনেত্রে সামনে বসে।

বিনোদিনী বলচে—"কি ঠাকুর, সবগুলো খেতে হবে। ফেললে চলবে না, আপনি যে গুণী লোক, আপনাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাই।"

—"সত্যি ?"

—"সত্যি না তো কি মিথ্যে ঠাকুর ? খান খান।"

দীনদয়াল কি বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় কি একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙলো। চার-পাঁচজন লোক একমনে কথা বলচে। ওরা সামনে এসে দাঁড়ালো। সব ক'জনকে চিনলেন না, তবে ওদের মধ্যে একজন হোল বর্দ্ধমান কাছারীর তিহিনবিশ কাসেমালি মল্লিক। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ওদের কথাবার্ত্তা থেকে, কাসেমালি মল্লিক কোন্ ভালো কবিরাজ এনেচে পাল্‌কি ক'রে। এখুনি দেখতে আসবেন তিনি। •

কাসেমালি বলচে—'এই মাত্র খবর শুনলাম। সবগুলো কাছারিতে আজ গাঁতি-জমার বিলির দিন। ঘোড়া ক'রে ফিরতে বেলা দু'পহর হয়ে গেল। নামাজ সেরে ভাতপানি গালে দিয়ে সবে শুইচি, শুনলাম চক্কত্তি মশায়কে ডুমুরদ'র ঘাটে অন্তর্জ্জলি করতে নিয়ে গিয়েচে কাল রাত্তিরে। বলবো কি, শুনে মনটার মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো। আর থাকতে পারলাম না। চক্কত্তি মশায় গেলে এদিগরের ইন্দ্রপাত হয়ে যাবে যে! অমন গান কে বাঁধবে, অমন শিবের কুচুনি-পাড়া যাওয়ার পাঁচালী কে গাইবে ? অমন অনুপ্রাসের ঘটা আর শুনবো না। আহা হা! এখনো মনে আছে, গেয়েছিলেন ষষ্ঠিতলার বারোয়ারীর আসরে—

পঞ্চভূত মন্ত্রপূত ভূত বিশ্বময়
ভূতে ভূতে ভূতোনন্দী, ভূত বিশ্বময়।

আহা হা!···বলি রামজয় কবিরাজ মশাইকে ডেকে এখুনি আমাকে ডুমুরদ'র ঘাটে যেতে হচ্ছে—তখুনি পাইক পাঠিয়ে দিলাম—'

কাসেমালি ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলো—"ও চক্কত্তি মশাই ? কেমন আছেন ? চিনতে পারেন আমাকে ?"

দীনদয়ালের মনে একটা প্রেমের ও ভাবের ঢেউ এল, তিনি কাসেমালি মল্লিককে খুব আপ্যায়িত করবেন ভাবলেন, বললেন—"এসো বাবা এসো! কেন কষ্ট ক'রে কবিরাজ আনতে গেলে বাবা ? আমি তো বেশ ভালো আছি। বোসো, বাবা।"

কিন্তু কাসেমালি কি তাঁর কথা শুনতে পেলে না ? লোকজনের দিকে চেয়ে বল্লে, "আহা, লোক চিনতে পারচেন না। কথাও বলতে পারচেন না। গলার সুরে অনুপ্রাসের মুক্তো বর্ষে গিয়েচে, আজ তাঁর গলার সুর বন্ধ! আল্লার মরজি!" তারপর কবিরাজ এসে বসলো মাথার শিয়রে। দেখে শুনে বল্লে, "সূচিকাভরণ দেবো। আহা, কি লোক! অমন

লোক আর হবে না।"

দীনদয়াল দেখলেন,—কালেমালি মল্লিক উড়ুনির খুঁটে চোখের জল মুছচে।

কালেমালি বলচে—"কবিরাজ মশাই, দেবীপ্রসাদ আর তার ভাই ছেলেমানুষ। এরা কিছু বোঝে না। সূচিকাভরণ দিতে হয় বা করতে হয় আপনি করুন। যা খরচ হয় আমি দেবো। ওদের মত নেবার দরকার নেই। ওরা ছেলেমানুষ। কি বোঝে?"

দীনদয়াল মুখে বলতে গেলেন ভাবের আবেগে, "বাবা কালেমালি, এই তো আমার সূচিকাভরণ। তোমাদের সকলের ভালবাসাই আমার সব চেয়ে বড় সূচিকাভরণ বাবা। বেঁচে থাকো, আশীর্বাদ করি, উন্নতি করো, ধর্মে মতি হোক। আমার দেবু রামু যা, তুমিও তাই। আমার আর সূচিকাভরণে দরকার নেই, বাবা।"

আবার দেখলেন, বিনোদিনী সামনে বসে হাসি-হাসিমুখে বলচে,—"আপনি যে গুণী লোক ঠাকুর। আপনার সেবা ক'রে ধন্য হই। খান।"

দীনদয়াল বিনোদিনীকে বল্লেন—"দ্যাখো, কি চমৎকার ছেলেটি! নিজের খরচে আমাকে সূচিকাভরণ দিতে কবিরাজ ডেকে এনেচে। ভালবাসার সূচিকাভরণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে তোমরা সবাই। নবাই ঠাকুরকে একদিন এই ওষুধে আমি বশ করেছিলাম, ও বিনোদিনী, মনে পড়ে?"

বিনোদিনী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো বালিকার মত।

একটু পরে দেবীপ্রসাদ রামপ্রসাদ দুই ভাইয়ে মিলে বাবাকে নাম শোনাতে আরম্ভ করলো—"ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।"

নরহরি জোয়ারদার বলে উঠলো—"ধরাধরি ক'রে গঙ্গার জলে নিয়ে চলো বাবা, আমি ধরচি একদিকে। শিবচন্দ্র।"

সবাই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বোতাম

আজকার ব্যাপারটি যা ঘটলো, তা আমার পক্ষে বেশ একটু আশ্চর্য্যজনক।

সাধারণতঃ জীবনে এমন ঘটনা বেশী ঘটে না।

সেদিন বেলা দশটার সময় ছোকরার দল আমাকে এসে ধরলে, আদিবাসীদের নেত্রী এলিশাবা কুই আজ জেল থেকে মুক্তি পাবেন, (কংগ্রেস গবর্নমেন্ট কার্য্যভার গ্রহণ করার পরদিনই প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এলিশাবা কুইকে মুক্তি দেওয়াই তাঁদের সর্ব্বপ্রথম কাজ, এ-সংবাদ খবরের কাগজ মারফৎ বিহারের অনেকেই অবগত আছেন) সেজন্যে আমাকে মোটরটা দিতে হবে।

আমি জানতাম না এলিশাবা কুই রাঁচি জেলে আছেন। সানন্দে সম্মতি দিলাম, কিন্তু

ওরাই যখন বেলা ছুটোর সময় আমার কাছে এসে জানালে এবার মোটর দিতে হবে, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো ড্রাইভার ছুটি চাওয়াতে তাকে ভুলে ছুটি দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং নিজেই মোটর চালিয়ে নিয়ে গেলাম জেলের ফটকে। বেলা ছুটো বেজে দশ মিনিটের সময় এলিশাবা কুই জেলারের সঙ্গে গেটে দাঁড়ালেন। খুব বেশি ভিড় না হলেও খুব কম লোক যে এসেছিল তাও নয়। গণ্যমান্য লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন, ছু'তিনটি এম-এল-এ, বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা হরজীবন পাঠক, ধনী ব্যবসায়ী নেমিচাঁদ, বাঙালী বড় উকীল প্রভাত রায়, তাঁর জামাই ডাক্তার নীহার মিত্র ইত্যাদি। জনতা এগিয়ে গেল, এলিশাবা কুই-এর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে আমার মোটরে নিয়ে এসে ওঠালে। একটু পরেই আমি মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমার বাড়ী হিনু ময়দানের কাছে, জগন্নাথপুরের রাস্তার খানিক এদিকে। জেল থেকে অনেকখানি চলে এলাম মোটর হাঁকিয়ে, সঙ্গে কেবল হরজীবন পাঠক ও ছুটি ছোকরা কংগ্রেস-কর্মী।

ওরা বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

বল্লাম—গরীবের বাড়ীতে মাননীয়া নেত্রীর জন্যে ও আপনাদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের যোগাড় করেছি—

একটি ছোকরা বল্লে—উনি তো চা খান না।

হেসে বল্লাম—জল খাবেন না হয় দয়া ক'রে।

পেছনের সিটে দেশনেত্রীর মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

যাঁরা দেশনেত্রী এলিশাবা কুই-এর কথা শোনেন নি বা ভালো জানেন না তাঁদের অবগতির জন্যে ছু-একটা কথা ওঁর সম্বন্ধে বলি।

এলিশাবা রাঁচি ও সিংভূমের বন্য আদিবাসীদের নেত্রী। বাংলাদেশ বা অন্যস্থানে এঁর নাম তত কেউ হয়তো শোনেন নি, কারণ বিহারের অনেক বিষয়েই বাংলার পাঠক উদাসীন। কিন্তু রাঁচি সিংভূম জেলার অধিবাসীদের কাছে এলিশাবা কুই-এর নাম ইন্দ্রজালের কাজ করে।

গত ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের সময় লোহারডগা থেকে যশপুর স্টেটের সীমান্ত পর্য্যন্ত পালামৌ জেলার সমগ্র বন্য অঞ্চলে ছু'মাস কাল একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ গবর্নমেন্টের হাত সেখানে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিল—প্রত্যেকটি থানা, বাংলো, প্রত্যেকটি ফরেস্ট রেস্টহাউস এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের কাছারী, থানা ও কর্মচারীদের থাকবার স্থানে পরিণত হয়েছিল। এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের নেত্রী ছিলেন এলিশাবা কুই।

লোহারডগা হতে বুন্জিগড় হয়ে যে বাস ঝার্গাগুড়া ও সম্বলপুর যায়, তিনমাসকাল তাদের লাইসেন্স-পত্রে সই নিতে হয়েছিল এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের কর্মচারীদের কাছেই। এই তিন-মাস একটি চুরি হয় নি এ অঞ্চলে, একটি পয়সা ঘুষ নেয় নি কেউ।

১২ই অগাস্ট লোবরা অভ্রখনির মালিক মিঃ স্পীড্ প্রথমে খবর পান যে বিপ্লবীদল ছ'টা থানা পুড়িয়েছে, টেলিগ্রাফের তার কেটেছে, রাস্তায় ঘাঁটি বসিয়েছে, রাঁচী-লোহারডগা রেলপথ উপড়ে তুলে ফেলেছে; বহু গ্রামগুলিতে হো বা ওঁরাও মণ্ডলেরা নিজেদের হাতে শাসনভার নিয়েছে, অভ্রখনির আদিবাসী মজুরেরা কাজ বন্ধ করেছে এবং সম্ভবতঃ তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে খুন ক'রে ফেলবে।

এই ব্যাপারের বাকি অংশটুকু আমি মিঃ স্পীডের ম্যানেজার মিঃ শর্মার কাছে শুনেছিলাম। আমি নিজে রাঁচিতে অনেকদিন থেকে কনট্রাক্টরী ব্যবসা করি, রাঁচী শহরে আমার আপিসও আছে, আমার বাড়ী গাড়ী সবই এই কনট্রাক্টরী ব্যবসায় যোগাড়ে। মিঃ স্পীডের খনিতে আমি মাঝে মাঝে জিনিসপত্র সরবরাহ করেছি, ওদের কোম্পানীর নাম জন স্পীড্ এণ্ড কোম্পানী—অনেকগুলি অভ্র ও বক্সাইট খনির মালিক।

১২ই অগাস্ট সন্ধ্যাবেলা স্পীডের বাংলোতে খবর এল বহুলোক জড়ো হয়ে আসচে বাংলো পুড়িয়ে দিতে। সাহেবের স্ত্রী ও দুই মেয়েও সে সময় বাংলোতে ছিল। রাত্রে বহু চেষ্টা করেও, পালানোর ব্যবস্থা করা গেল না। সকালবেলা একটা লরি যোগাড় করে ওরা মালপত্র ওঠাচ্ছে—আধঘণ্টার মধ্যেই লরি ছেড়ে বুন্‌দিগড়ের পথে ওরা ঝাড়গ্রাম বা সম্বলপুর পালাবে —এমন সময় দুজন একখানা মোটরে এসে নামলে—একজন সাহেবের হাতে একখানা চিঠি দিলে, তাতে কড়া হুকুম দেওয়া হয়েচে সাহেবকে, সে যেন স্থানত্যাগ করার চেষ্টা না করে, করলে বিপদে পড়বে পথে। যেখানে আছে সেখানে থাকলে সে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে, এর দায়িত্ব নিচ্ছে পালামৌ কংগ্রেস সরকার। চিঠিতে সই আছে এলিশাবা কুই-এর।

লোক দুটি চিঠি দিয়েই মোটরে উঠে চলে গেল।

সাহেব ভয় পেয়ে লরি থেকে মালপত্র নামাতে লাগলো। যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মেম সাহেব কাঁদতে লাগলো। বড় মেয়েটি একটি রিভলবার নিয়ে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইল।

ঠিক এই সময়ে মিঃ শর্মা আর একখানা লরি নিয়ে সেখানে হাজির। তিনি পাথরবাসা থেকে এই লরিখানা অনেক কষ্টে যোগাড় ক'রে এনেছিলেন সাহেবদের যাওয়ার সুবিধের জন্যে।

মিঃ শর্মা অবাক হয়ে বল্লেন—একি, মালপত্র নামাচ্ছেন কেন? যাবেন না?

সাহেব কিছু বলবার আগেই বড় মেয়েটি রাগের সুরে বল্লে—Oh, these black curs! Do you know what they have been up to?

—কি?

—Ask daddy—I am here to shoot them like pigs if they dare show their black faces.—

—ঠাণ্ডা হও মিসি বাবা। তোমার বাবা কই? দাঁড়াও আগে শুনি—

মিঃ স্পীড্ বাইরে এসে হাতের চিঠিখানা নেড়ে মিঃ শর্মাকে বল্লে—Hallo Sharma,

see this, these black Congress devils are at their dirty tricks even here—

—দেখি কি ব্যাপার ?

—And see how ungrateful these black dogs are, we teach them, we make them what they are, we give them our Gospels and—see this black woman with a funny name from the Old Testament intimidating me as if she is the—

মিঃ শর্মা চিঠি পড়ে হেসে বল্লেন—এরা তো ভালোই বলচে। এলিশাবা কুই আদিবাসীদের নেত্রী! সে-বার রামগড় কংগ্রেসে দেখেছিলাম। বেশ সুন্দর চেহারা। আদিবাসী হো, ওঁরাও, মুণ্ডা ও কোলেরা এঁকে বড্ড মানে। উনি ওদের জন্যে গ্রামে গ্রামে স্কুল করেচেন—হাতের কাজ শেখাচ্চেন—

—আর আমরা করি নি ?

—করবে না কেন সাহেব, তোমরাও, মানে তোমাদের মিশনারীরা, অনেক কিছু করেচে এদের জন্যে। কিন্তু একটা দোষ—তোমরা করেচ বা মিশনারীরা করেচে—সেটা হচ্চে, তাদের নিজের জাতি বা নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাবও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেচ তাদের মনে।

—তার মধ্যে খারাপ কি আছে ? ভূতপুজো গাছপুজো ছাড়িয়ে আমরা ভাল করেচি না খারাপ করেচি ? কি বলতে চাও তুমি ?

—তারা বড় শালগাছ দেখে তার তলায় মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ অরণ্যদেবতার পুজো করে—বড় পাহাড় দেখে তার তলায় জিয়াং বোঙ্গা অর্থাৎ পর্ব্বত দেবতার—

—ফেটিশ ওয়ারশিপ্—

—তোমার আমার পূর্ব্বপুরুষও একদিন ফেটিশ ওয়ারশিপ করতে ছাড়ে নি—বেদে তার প্রমাণ আছে—তোমাদেরও পুরোনো দিনের ধর্মের মধ্যে তার প্রমাণ আছে সাহেব—ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন কি করতে চাও বলো—

—লরি রওনা করবো। কি করবে কংগ্রেস কুকুরেরা ?

সাহেবের কথা শেষ হতে না হতে একখানা লরি এসে দাঁড়ালো বাংলোর সামনে। লোক-বোঝাই লরি, কংগ্রেসের পতাকা উড়ছে, জন-ত্রিশেক লোক হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল ফটক ঠেলে। মুখে তাদের 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ' ধ্বনি। সাহেব ও মিঃ শর্মার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। এবার এরা বোধ হয় সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে ঘরে আগুন দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু গাড়ী থেকে দলের পুরোভাগে নেমে এল একটি ছিপ্‌ছিপে কালো তরুণী, খদ্দরের শাড়ী পরণে। খালি পা, হাতে একখানা মোটা খাতা। তরুণীটিকে দেখে বোঝা যায় সে হো বা মুণ্ডা জাতের মেয়ে। কিন্তু মুখখানা ও চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

মেয়েটি এসেই ইংরেজিতে সাহেবকে বল্লে—তুমিই মিঃ স্মীথ ? অভ্রখনির মালিক ?

—হাঁ।

—কোন ভয় নেই। এখানে নির্ভয়ে থাকো। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করবে না? পথে অনেক ভয়। তোমাদের মেরে ফেললে তার দায়ী হবে না আমার গবর্নমেণ্ট।

—তুমি কে জানতে পারি কি?

—আমি স্বাধীন পালামৌ আদিবাসী কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট। আমার নাম এলিশাবা কুই। ইস্তাহারে আমারই নাম আছে। পথে বেরুলে যে বিপদের সম্মুখীন হবে, তার জন্মে আমার গবর্নমেণ্ট দায়ী হবে না বলে রাখছি। তোমাদের ভালোর জন্মেই বলচি। শোনো না শোনো তোমাদের খুশি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্মীত পরিবারের মেয়েরা এই ব্যাপার দেখছিল। ওরা যখন মোটরে উঠে চলে গেল, তখন সাহেবের বড় মেয়ে ঠোঁট উল্টে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ক'রে বল্লে—হু্ঁ! মাই গবর্নমেণ্ট। সাহেব বল্লে—I ought to talk to this bully, ram into her stupid noddle that she is a blockhead and a fool—

মিঃ শর্মা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সাহেবদের কথা তাঁর ভালো লাগচে না। তিনি সবিনয়ে বুঝিয়ে বল্লেন, এখন বাংলো ছেড়ে পথে না বেরুলেই ভালো হবে। সত্যিই এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়েচে। তিনি তার অনেক লক্ষণ দেখেচেন রাস্তায়-ঘাটে। সাহেব বল্লে—এখানে থাকলে কিছু হবে না?

—আমার তাই মনে হয়।

—ওদের কথায় বিশ্বাস কি?

—আমার মনে হয় ওদের কথায় বিশ্বাস করা যেতে পারে।

—আমাদের সঙ্গে তুমিও থাকবে এখানে?

—যদি বলেন, থাকবো।

—পাথরবাসাতে কত টাকা মজুত?

—ন' হাজারের ওপর। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। পথঘাট বন্ধ।

—টাকা এখানে নিয়ে এসো। চারটা বন্দুক এখানে।

—আনতে ভয় হয়। পথে টাকা নিয়ে বেরুতে পারবো না। সাত মাইল রাস্তা বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

—চলো আমি যাচ্ছি বন্দুক নিয়ে। টাকা আজই নিয়ে আসি।

—না সাহেব। তাতে বিপদ বেশি। আমি একা যাই। লোকজন কেউ কাজ করতে চাইচে না। প্রায় সবই তো পালিয়েচে। যারা আছে তাদেরও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

মিঃ শর্মা পাথরবাসা খনিতে চলে যাবার পরে দু'দিন কেটে গেল, সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লো। ব্যাপার কি, ম্যানেজার টাকা নিয়ে ভাগলো নাকি?

মেম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সাহেব বন্দুক নিয়ে নিজেই লরি চালিয়ে বেরিয়ে

গেল—তিন মাইল দূর গিয়ে জঙ্গলের পথে দেখলে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মিঃ শর্মা হেঁটে আসছেন, সঙ্গে একজন লোক তাঁর সাইকেল ঠেলে নিয়ে আসচে, তাঁর চারিধারে ঘিরে সাত-আট জন কংগ্রেসী পুলিশ। সাহেব লরি থামিয়ে দিলে দলের সামনে। জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার মিঃ শর্মা ?

মিঃ শর্মার ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটচেন। তিনি যা বল্লেন তার ভাবার্থ এই যে, পাথরবাসার কুলিদের সর্দার তাঁকে আক্রমণ ক'রে টাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তারা বলে, সাদা ভূতের রাজত্ব শেষ হয়েচে। ওদের টাকা এখন আমাদের। নাও টাকা কেড়ে। শেষ ক'রে দাও এ কুকুরটাকে।

মিঃ শর্মা ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে হাতে পায়ে আঘাত পান। মারাই পড়তেন, ঠিক এই সময় এঁরা এসে পড়েন। তাই—

সাহেব বল্লে—এরা কে ?

ওদের মধ্যে একজন সাহেবকে উত্তর দিলে—কংগ্রেস বিদ্যুৎ-বাহিনীর লোক—

আর একজন বল্লে—আমাদের এলাকার মধ্যে কোনো অরাজকতা হতে দেবো না—

সাহেব বল্লে—টাকা ঠিক আছে মিঃ শর্মা ?

—পাই পয়সা।

মিঃ শর্মা খুব ভালো আর প্রভুভক্ত লোক। সাহেব তাঁকে বিশ্বাসও করতো যথেষ্ট, কিন্তু এসময় শুধু বিশ্বাস নয়, ওঁর ওপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হয়েছিল সাহেবকে। কোনো দিক থেকে একটা আলু কি এক ছটাক চালও যোগাড় করা সম্ভব হ'ত না মিঃ শর্মার সাহায্য ছাড়া। সমস্ত জনমজুর চলে গেল, মোটরের ড্রাইভার চলে গেল, মেম সাহেব ও তার দুই মেয়ে নিজেরা বড় বড় তিনটে মুলতানী গরুকে বিচিলি কেটে খাইয়েচে, নিজেরা দুধ দুয়েচে—নয়তো গরুগুলো ওই ধাক্কাতে না খেয়েই মারা পড়তো।

একমাস। দু'মাস।

তারপর সব ঠিক হয়ে গেল।

এলিশাবা কুই ধরা পড়লেন বাণ্ডয়ার ঘাটোয়ালী কাছারীতে। দলবল কিছু পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালো, কিছু সুন্দরগড় স্টেটের অরণ্যভূভাগে গা ঢাকা দিলে।

সেই এলিশাবা কুই।

আমার বাংলোর সামনেই মোটর থামিয়ে ওঁকে এবং বাকী সকলকে নামতে অনুরোধ করলাম। কিছু না, সামান্য একটু চা। আমার বাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ে এসে জুটেছিলেন এলিশাবা কুইকে দেখবার জন্যে। শাঁক বাজলো, হলু পড়লো, খই ও ফুল ছড়ানো হ'ল। তারপর মেয়েরা হাত ধরে ওঁকে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

জনৈক কংগ্রেস-কর্মী বল্লেন—বেশিক্ষণ দেরি করতে পারা যাবে না মশাই, পাঁচটায় আমাদের মিটিং আছে—ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

—যত শীগগির হয় ছেড়ে দেওয়া হবে।

—একটু বুঝিয়ে বলুন মেয়েদের—

—এখন যতই বুঝিয়ে বলি ফল হবে না। কিছু সময় যাক—

বাইরের লোকদের চা-পর্ব্ব মিটে গেল। আধঘণ্টা সময় কাটলো। আবার ওঁরা ধরলেন—আপনি একবার অন্দরে যান মশাই, আমরা আর বিলম্ব করতে পারবো না।

আমারও আর ইচ্ছে নেই দেরি করাবার। বাড়ীর সামনে লোকের ভিড় যেন ক্রমশঃ জমচে।

আমি অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যকে উদ্দেশ ক'রে হেঁকে বল্লাম—কই, হ'ল? ইদিকে এঁরা তাড়াতাড়ি করচেন।

কোনো উত্তর নেই।

বহু মহিলাকণ্ঠের সম্মিলিত কলরবে অন্দর সরগরম। কে কার কথা শোনে?

অসহায়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বল্লাম—ইয়ে—এঁরা বড্ড ব্যস্ত হয়েচেন—একটু তাড়াতাড়ি।

ষোলো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে এসে বল্লে—কি বলচেন?

—ওঁকে একটু ডেকে—তুমি কোন্ বাড়ীর মেয়ে চিনতে পারলাম না তো—

—আমি রজনী বাবুর ভাইঝি—

—ও! তুমিই কলেজে পড়ো?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। মাঝে মাঝে এসো। তা ওঁকে একটু ডেকে দিতে হচ্চে—এত দেরি হচ্চে কেন?

—সবাই অটোগ্রাফ নিচ্চে যে। আবার বাণী চাইচে। বিশ পঁচিশটি কলেজের মেয়েই তো এসেচে—ওই আসচেন—

বলেই মেয়েটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়ালো। এলিশাবা কুই আগে আগে হাসিমুখে, পেছনে নারীবাহিনী। এই আমি প্রথম ভালো ক'রে এলিশাবা কুইকে দেখলাম। এতক্ষণ ব্যস্ততায়, উত্তেজনায় ও ভিড়ে আমি ভাল ক'রে ওঁর মুখ দেখবার সুযোগই পাই নি।

আমি চমকে উঠি। হঠাৎ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যাই। খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

আমার একেবারে সামনে যখন উনি এসেচেন, তখন আমি বল্লাম হিন্দিতে—দয়া ক'রে আসুন বাইরে। বড় তাড়াতাড়ি করচেন ওঁরা।

এলিশাবা কুইয়ের মুখশ্রী অতি সুন্দর। এদেশের আদিবাসিনী বহু রমণীদের সুঠাম দেহসৌষ্ঠব ও শান্তশোভন লাবণ্যমাখা মুখশ্রী এখনো ওঁর বজায় আছে। উনিও এই সময় আমার দিকে চাইলেন। একটু বেশিক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পেছনে মেয়েদের ভিড়। কিছু বলবার সুযোগ হ'ল না। বাইরে নিয়ে এসে মোটরে ওঠবার সময় সুযোগ ঘটলো, মিনিট খানেকের জন্যে। বল্লাম—বলিবার ছিলেন? বলিবার জঙ্গলে?

উনি চমকে উঠলেন। আমার দিকে ভালো ক'রে চাইলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় ও সংশয় মাখানো।

বল্লাম—তা'হলে আপনিই সেই! মনে পড়েচে?

উনি আশ্চর্য্য হওয়ার সুরে বল্লেন—আপনি?

কথা সবই হিন্দিতে।

বল্লাম—চিনেচেন? মনে পড়ে সেই ওভারসিয়ার নিকোভিম কারকাট্টা?

—হাঁ।

—কাজ সেরে আসুন সন্ধে বেলা। কথা কইবো অনেক।

—সেই ভালো।

সবাই ওঁকে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এলিশাবা কুই! এলিশাবা কুই! কি আশ্চর্য্য—শুধু বসে বসে ভাবি। এলিশাবা কুই তো নয়, ওর নাম চম্পু। কি আশ্চর্য্য লাগচে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা।

কুড়ি বছর আগের কথা।

আমি তখন সবে বছর দুই হ'ল ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে পাশ ক'রে ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে বাইরে বেরিয়েছি।

আমার বয়েস বাইশ-তেইশ। পি ডবলিউ ডি'র সামান্য চাকরি করি।

বলিবা থেকে কামারবেড়া পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী হচ্ছিল ঘন সারাণ্ডা অরণ্যের মধ্যে দিয়ে।

বলিবা একটি বন্য গ্রামের নাম, লোক-সংখ্যা হয়তো ছিল পঞ্চাশ কি ষেবট্টি, গুণে দেখি নি কখনো। তবে ওই রকমই হবে। গ্রামের সামনে পাহাড়, ডাইনে-বাঁয়েও পাহাড়, পেছনে গভীর জঙ্গল। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে যে সামান্য সমতল জমি, তাতেই গ্রামের লোকে ভুট্টা, জনার, শকরকন্দ আলু, টক পালং ও টোমাটোর চাষ করে।

আজ বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে বলিবা গ্রামের ছবি। প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় কর্ম্মস্থল। তারপর এই কুড়ি বছরে কত জায়গা দেখলাম, সামান্য রোড্‌সার্ভেয়ার থেকে এখন আমি একজন ধনী কনট্রাক্টর, কত কি ঘটে গেল জীবনে। কত অসম্ভব সম্ভব হ'ল। কিন্তু বলিবা গ্রামের কথা, তার সেই মাকা হো'র পেঁপে বাগান, ছোট্ট উম্‌রিয়া ঝর্ণার কলকল জলস্রোত, বোঙ্গা পূজোর প্রকাণ্ড জগহরি শাল গাছটা, সন্ধ্যাবেলায় মাকা হো'র উঠানের পুরু শালকাঠের পালিশবিহীন, অসমতল বেঞ্চিতে বসে চা-পান ও গল্প—কখনো ভুলবো এসব?

বলিবা গ্রামে প্রথমে আমার বাসস্থান ছিল না। বলিবা-কামারবেড়া রাস্তা জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছিল বন-বিভাগ থেকে। তাঁদের কর্ম্মচারীরা পি. ডবলিউ. ডি.'র কাছে আমাকে হাওলাতে চান রাস্তা করবার সময়। তিন মাসের জন্যে আমাকে হাওলাত দেওয়া মঞ্জুর করা হয়। সেই সূত্রেই আমাকে যেতে হয়েছিল এবং এগারো মাইল দূরবর্ত্তী জেরাইকেলা থেকে সাইকেল যোগে এসে রোজ কাজ করতাম। সার্ভের কাজ শেষ হয়ে গেল। রাস্তা তৈরী আরম্ভ হ'ল। তবুও আমাকে যেতে হ'ত, কতখানি হয়েচে সেটা তদারক করতে।

ভীষণ জঙ্গল। বড় বড় গাছ পড়েছিল রাস্তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট জমিতে। কুলিতে গাছ কাটছিল, পাহাড়ের গা কাটছিল রাস্তা বের করতে, বড় বড় পাথরের চাঁই রাস্তায় এসে

পড়ছিল, হো কুলি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে পাথর ও মাটি বইছিল।

সে-অঞ্চলে বুনো হাতী ও বাঘ ঘোরে রাত্রে। আমাদের নতুন তৈরী রাস্তার ওপর বুনো-হাতীর পায়ের দাগ। কি বিরাট শাল গাছ এক একটা। যেগুলো দুশো বছরের পুরানো। কুলি ও কুলিনীরা না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দী—হো ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। খাবার কিছু মেলে না, কেবলই মকাই আর জনার।

একজন ওভারসিয়ার ছিল হো খৃষ্টান, নাম নিকোডিম কারকাট্টা। লোকটা বনবিভাগের কর্মচারী, রাস্তার কুলিদের কাজ তদারক করতো আর কুলিদের প্রতি কি গালমন্দ, মারধোর করতো! মেয়ে-কুলিদের ওপরও এইরকম করচে দেখে একদিন আমার ভারি রাগ হ'ল। সে কি অকথ্য ভাষায় গালাগাল, চাবুক উঁচিয়ে মারতে যায় মেয়েদের, পাথরের ঝুড়ি বইছে মাথায় নিয়ে, দিলে সজোরে ধাক্কা, ঝুড়িসুদ্ধ ছিটকে পড়ে গেল একটি মেয়ে কুলি।

আমি বল্লাম—ও কি হচ্ছে?

নিকোডিম রেগে উঠে বল্লে—কি?

—কি দেখতে পাচ্ছ না? মেয়েদের অমন ক'রে ধাক্কা দেয়? ছিঃ!

—ওরা কাজ করচে না।

—তা বলে তুমি মারবে ওদের?

যে মেয়েটিকে ধাক্কা মারা হয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়ছিল, নিকোডিমের ভয়ে সবাই সেখানে জুজু, কারো কিছু বলবার সাহস নেই। আমি যখন নিকোডিমকে তিরস্কার করছি, তখন অন্য সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিল। আমার বকুনি খেয়ে নিকোডিম সেখান থেকে এগিয়ে পাহাড়ের নীচে রাস্তার ও-বাঁকে চলে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু তখুনি মিটলো না। নিকোডিম সেদিন থেকে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। ওসব জঙ্গলের মধ্যে ওদের সাহায্য ভিন্ন খাবার যোগাড় করা মুশ্‌কিল। ও গ্রামে বারণ ক'রে দিলে—আমি দুধ পাই নে, ডিম পাই নে। বন-বিভাগের কর্মচারীদের জন্যে বলিবা গ্রামে গবর্নমেণ্টের তৈরী ঘর আছে। সেখানে যাতে আমি রাত্রে আশ্রয় না পাই, তার ব্যবস্থাও করলে। ফলে এই দাঁড়ালো কাজ করতে করতে যদি বেলা যেতো, সূর্য্য অস্ত যাবার যোগাড় করতো পশ্চিমের বন পাহাড়ের ওপারে—আমার সাইকেলে ফিরতেই হ'ত বন্যজন্তু-অধ্যুষিত বনপথ ধরে এগারো মাইল দূরবর্ত্তী জেরাইকেলায়। আশ্রয় বা খাদ্য কিছুতেই মিলতো না নিকটে কোথায়ও।

আমার ভয় করতো না বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। সাত মাইল দূরে কেরুকোচা নালার ধারে বেলা একদম পড়ে আসতো, অন্ধকার দেখাতো পাহাড়ী চালূর বন শাল জঙ্গল। বড় বড় আসান গাছগুলো দেখাতো ভূতের মত, শুকনো পাতার শব্দ শুনলে মনে হ'ত বাঘ বেরিয়েচে প্রত্যেক বাঁকে মনে হ'ত আধ-অন্ধকারে বুনো হাতি রাস্তা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সাইকেলের সঙ্গে তাল লাগাবে বুঝি—তবুও যেতে হয়েচে বাধ্য হয়ে।

একদিন সম্বর হরিণের একটা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর দেখতাম বন-মোরগ

ফট্‌পট্‌ ক'রে সামনের রাস্তার ওপর থেকে উড়ে গেল; দেখতাম ময়ূর রাস্তা পার হয়ে এদিকের বন থেকে ওদিকের বনে যাচ্ছে। দেখতাম দু'-একটা কোৎরা সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে পালাচ্ছে, কিন্তু কোন হিংস্র জানোয়ার চোখে পড়ে নি।

দিন পনেরো কাটলো।

দুপুরবেলা একদিন পাহাড়ের নিচে তেপায়ার ওপর টেবিল বসিয়ে জরীপের নক্সা দেখছি, এমন সময়ে কোথা থেকে একখানা পাথর গড়িয়ে এসে পায়ে বিষম চোট লাগলো। দুটো আঙুল ছেঁচে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি দু'হাতে পা চেপে ধরে তখুনি বসে পড়লাম—দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না।

কিছুদূরে কুলিরা কাজ করছিল, ওরা ছুটে এল। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে আমার পা বেঁধে দিলে। আমি সেখান থেকে উঠতেই পারলাম না, যখন অতি কষ্টে উঠলাম তখন দেখি সাইকেল চালিয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়েছি।

বেলা গেল, সূর্য্য চলে পড়লো বনের ওপারে। সেটা ছিল মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতও তেমনি নামলো সেদিন সূর্য্য বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কুলির দল তো আর একটু পরেই পালাবে। বনবিভাগের লোকেরা আমাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে না নিকোডিমের ভয়ে। ওদের তাঁবুতে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি এখন যাই কোথায়?

কুলিরা কাজ শেষ ক'রে দলে দলে পাহাড়ের ওপরের রাস্তা বেয়ে বলিবা গ্রামের দিকে চললো। আমার অবস্থা কি তা অনেকেই জানে না। কাকে বা বোঝাই, কি বা বলি। হো ভাষা তেমন আয়ত্ত করতে পারি নি, দু'একটি কথা ছাড়া।

এমন সময়ে সেই কুলির দল আমার সামনে দিয়ে নীচে থেকে ওপরে উঠচে। কাজ করতে করতে ওরা রাস্তার নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল। আমার কাছে যখন দলটি পৌঁচেছে, তখন একটি মেয়ে দল ছেড়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলাম ওর দিকে, এই মেয়েটিই আমার পায়ে ওর শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল। আরও আমার মনে হ'ল নিকোডিম সেদিন একেই ধাক্কা মেরেছিল। যখন ও আমার পায়ে ওর শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে বাঁধে, তখন যন্ত্রণার চোটে কারো মুখ ভালো ক'রে দেখবার অবস্থা ছিল না আমার। তখন চিনি নি।

ও বল্লে—ব্যুম্ পে?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম, বুঝি নে ও কথা। হাত দিয়ে দেখলাম পায়ের ঘা। ওর মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি সাইকেলে উঠতে পারবো না। পায়ে ব্যথা।

এতদিন পরেও একটা কথা আমার মনে আছে, মেয়েটির বড় বড় কালো চোখের সে অদ্ভুত স্নেহ ও সহানুভূতি ভরা চাউনি। সে-চাউনি কখনো ভুলবো না। আমি এদের কাছে আশা করি নি এরকম চাউনি। কেন না বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছিলাম, বড় আভিজাত্য মানুষই না,

ওসব একরকম কিম্ভূতকিমাকার জীব—এই ছিল আমার ধারণা ওদের সম্বন্ধে। তাদেরই একটি মেয়ের চোখের চাউনির মধ্যে দিয়ে আমারই মা বোন উঁকি মারবেন, একেবারে সুস্পষ্ট ভাবেই উঁকি মারবেন—দেখবার আগে সে বিশ্বাস আমার হ'ত না।

আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। তার চেয়েও বিস্মিত হবার কারণ ঘটলো যখন সে এসে আমার হাত ধরে তুলবার চেষ্টা ক'রে বল্লে—নাকি ওঙ্ দিইসানা, স্থুম্ সে?

আমি ঠেলে উঠলাম—দাঁড়ালাম অতি কষ্টে।

কি বলচে মেয়েটি? কি একটা প্রশ্নের সুর ওর কথায়, কি প্রশ্ন? ঘাড় নেড়ে বোঝালাম বুঝি না ওর কথা।

তারপর মেয়েটি যা করলে, তা যে কত বিস্ময়কর হয়েছিল তখন আমার কাছে। মেয়েদের কি বল্লে ও। আমার চারিপাশ ঘিরে ওরা দাঁড়ালো এসে। দু'তিনজনে শক্ত ক'রে আমার বগল ও হাত ধরলে। মেয়েটিও ধরেচে ডান হাত। চল্লাম ওদের সঙ্গে। আমাদের পেছনে পেছনে একটি মেয়ে সাইকেলখানা ঠেলে নিয়ে আসতে লাগলো।

জঙ্গলের ধারে বলিবা গ্রামের একটি ঘরে ওরা আমায় নিয়ে এল। পরে গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার নাম মাকা হো, বলিবা গ্রামের মণ্ডল। শালকাঠের খুঁটি ও আড়া-লাগানো একখানা কুঁড়ে ঘর, না তার জানালা, না দরজা—ঘরের সামনে শালকাঠের তক্তা সোজা ক'রে পুঁতে বেড়া দেওয়া। ওরকম ঘরে কখনো বাস করি নি। তেমনি শীত এখন এই বনের মধ্যেকার গ্রামে। চৌহদ্দ লতার ছালের দড়ি দিয়ে ছাওয়া একখানা খাটিয়াতে ঘরের চরখা-কাটা মোটা সুতো দিয়ে বোনা একখানা চাদর পেতে দিলে, শতরঞ্জির মত পুরু।

সেই মেয়েটি আমায় শুইয়ে রেখে চলে গেল। সবাই চলে গেল।

আমি একা ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শালকাঠের মোটা মোটা আড়া লক্ষ্য করতে লাগলাম। সেই জন্যে শালকাঠের আড়ার কথা আমার বড় মনে আছে। অসহায় অবস্থায় চুপ ক'রে শুয়ে আছি, দূর এক বন্য গ্রামে, বন্য জাতিদের মধ্যে। কি আমার উপায় হবে এখানে, কি করি এখন, এমন সত্যেরো হাত জলের তলায় পড়ে যাবো বিদেশে এসে তা কখনো ভাবি নি। তাও হ'ল, এ ঘরে তো দরজা নেই, নিকটেই বন, গভীর রাত্রে বাঘ ভালুক ঘরে ঢুকবে না তো? প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকারেই শুয়ে আছি। বাইরে কিন্তু চাঁদনী রাত, তবে শুক্লপক্ষের প্রথম দিক, জ্যোৎস্নায় তেমন জোর নেই। আকাশে মেঘ হওয়ার জন্যেও সেটা হ'তে পারে—আমার তত্টা মনে নেই।

হঠাৎ দোর দিয়ে কে ঘরে ঢুকলো, কবাটহীন দোর, যে কেউ যেতে-আসতে পারে।

চমকে বাংলায় বল্লাম—কে?

মৃদু নারীকণ্ঠে উত্তর এল—চম্পূ—

মেয়েটি আমার ভাষা বোঝে নি। কিন্তু আমার প্রশ্নের সুরে স্বভাবতঃই তার মনে হয়েচে ঘরে কে ঢুকলো তাই আমি জিজ্ঞেস করচি, সুতরাং সে তার নাম বলেচে।

এই প্রশ্নোত্তরের অভিনবত্বের জন্যেই চম্পু নামটা হঠাৎ এমন মিষ্টি লাগলো। অনার্য্য নাম নয় বলেও বোধ হয়। কারণ আমি জানি ও-অঞ্চলে মেয়েদের নামের মধ্যে কমনীয়তা খুঁজতে গেলে বড্ড নিরাশ হতে হবে।

ভাষা জানি নে, সুতরাং চম্পু নামটার ওপরই একটি সম্পূর্ণ বাক্যের জোর দিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম—চম্পু ?

—হোই।

অর্থাৎ 'হাঁ'।

—খিদে পেয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়ে খাওয়ার অভিনয় করলাম। মেয়েটি হেসে ঘর থেকে বার হয়ে গেল এবং আধঘণ্টাটাক পরে কতকগুলো শকরকন্দ আলুসিদ্ধ শালপাতায় জড়িয়ে নিয়ে এল। চা খাবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই মেয়েটিকে তা বোঝানো আমার দুঃসাধ্য-জ্ঞানে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

মেয়েটি তখনও চলে গেল। আবার আধঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকলো, শালকাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঘরের ঠিক মাঝখানে। ছোট একখানা তুলোর লেপ আমায় দিয়ে গেল রাত্রে গায়ে দেবার জন্যে।

আমি প্রশ্নের সুরে বল্লাম—চম্পু ?

একটিমাত্র কথাই জানি, যতক্ষণ এবং যত রকম ভাবে সম্ভব সেই কথার সদ্ব্যবহার করি।

মেয়েটি একবার হেসে ফেলে আমার সামনেই। বলে—হোই।

আমার হো ভাষার দৌড় বোধ হয় বুঝতে পেরেচে।

ঘরে আগুন জ্বললে আমি চম্পুকে ভালো ক'রে দেখতে পেলাম। এ সেই মেয়েটি, যাকে নিকোডিম ধাক্কা মেরেছিল। বেশী ওর বয়েস নয়, পনেরো ষোলোর বেশি হবে না, সুন্দর মুখশ্রী। এই বন্য দেশে এমন মেয়ে আছে জানতাম না। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বাংলাদেশের যে কোনো স্কুল কলেজের মেয়ের মত।

একটু পরে মাকা হো ঘরে ঢুকলো। পঞ্চাশ ছাড়িয়েচে বয়েস, এখনো দিব্যি সবল। মাকা হো ঘরে ঢুকেই হিন্দিতে বল্লে—কেমন আছ ?

আমি মহা খুশি হয়ে বল্লাম—বাঁচলাম। হিন্দি জানো দেখছি—

—বাংলা ভি জানে। কিছুটা বুঝচে।

—বাঃ বাঃ—বেঁচে থাকো। নাম কি তোমার ?

—মাকা হো—

—এ গ্রামের নাম কি ?

—বলিবা আছে।

—শোনো মাকা হো, তোমাকে বাংলা শেখাই ভালো ক'রে। এখানে 'আছে'

অনাবশ্যক ক্রিয়াপদ। শুধু 'বলিবা' বল্লেই হ'ল। বুঝলে? এরপর ওরকম আর বলবে না।

মাকা হো আমার বৈয়াকরণিক আলোচনা বুঝলে না। না বুঝেই বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো।

হিন্দিতে বল্লাম—চম্পু তোমার মেয়ে?

—না। ওর কেউ নেই কেবল এক বুড়ি দিদিমা ছাড়া। এ গাঁয়ে ওদের বাড়ীও' নয়। করমপন্না থেকে এসেচে।

—বড় ভাল মেয়ে।

—সবাই ওকে ভালো বলে।

চম্পু মাকা হোকে কি বল্লে। মাকা আমার দিকে চেয়ে বল্লে—চম্পু বলচে এ গাঁয়ে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে।

—ওকে বলো, এখানে দেখবে কে?

—চম্পু বলচে, ও দেখবে।

—আমাকে রেঁধে খাওয়াবে?

—বলচে যা কিছু দরকার সব করবে! শোনো তোমায় বলচে এখন ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা যাই। কাল সকালে তোমার পায়ে ওষুধ বেটে দেবে বলচে।

—আমি চম্পুকে ধন্যবাদ দিচ্চি। ও আমার বোনের মত।

—ও বলচে, তুমিই ওকে নিকোতিমের হাত থেকে বাঁচিয়েচ।

—বলো, সে আমার কর্ত্তব্য কাজ। করা উচিত তাই করেচি।

—চম্পু বলচে, কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার পা ও সারিয়ে দেবে। তুমি যতদিন সেরে না ওঠো, নির্ভাবনায় এখানে থাকো। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেচ, ওর কর্ত্তব্য ও করবে।

সেই রাত্রিটির কথা আজও ভুলি নি। ওরা চলে গেল। আমি একা শুয়ে রইলাম। নতুন জায়গা, বনের মধ্যে গ্রাম। দরজার কপাট নেই। নানারকম শব্দ বনের মধ্যে সারা রাত, গ্রামের অদূরেই নিবিড় অরণ্য। বনকুক্কুটের ডাক শুনচি, কোৎরা ডাকছে, ঘুম আর আমার আসে না। ঘরের পেছনে খস্‌খস্ শব্দ হয়, আমি অমনি চমকে উঠে ভাবি এ বোধ হয় ভালুকের পায়ের শব্দ। গভীর রাত্রে দূরে দূরে কোথায় বন্য হস্তীর বৃংহিত কানে গেল। কত রকম ভয়ে যে রাত কাটলো—ঘুমিয়ে পড়লাম একেবারে ভোরবেলা। জেগে উঠে দেখি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়েচে, চম্পু এসে ডেকে উঠিয়েচে, বিছানার পাশেই সে দাঁড়িয়ে, হাতে ওষুধ বাটা।

ও আমার পা বেশ ভাল ক'রে টিপে টিপে দেখলে। একবার জোর ক'রে টিপতে আমি যন্ত্রণায় 'উঃ' ক'রে উঠলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—ন্থুম্ পে?

পরে জেনেছিলাম এর মানে—পায়ে লাগচে?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম—ও বুঝি নে।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম মুখ ধোয়ার জল আনতে। চম্পু জল নিয়ে এল। নতুন ওষুধ বাটা আমার পায়ে লাগিয়ে দিলে এবং একটা জাম বাটিতে কি একটা জিনিস আনলে, শালপাতা দিয়ে ঢাকা।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম—কি ওতে?

—মান্তি।

তার মানে বুঝলাম না।—দেখি বাটি নিয়ে এসো—

চম্পু আমার ইঙ্গিত বুঝে বাটি নিয়ে এল, ও হরি—এক বাটি ভাত! আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম—মান্তি?

চম্পু হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। সে আমার ভাষাজ্ঞানের দৌড় বুঝে নিয়েচে। হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে বল্লে—হোই। এইভাবে ও আমার মনের ভাব আন্দাজে বুঝে নিত, আমি বুঝে নিতাম ওর।

সেই ঘরে কেটেছিল দশ দিন। চম্পু কি সেবাটাই করেছিল এই দশদিন। ভাষা না বুঝলেও আমি ওর ভালোবাসা বুঝতাম, নয়নের স্নেহদৃষ্টি বুঝতাম। আমি ওর হাত দুটি ধরে একবার আবেগের মাথায় বলেছিলাম—চিরকাল মনে থাকবে তোমার কথা চম্পু। কখনো ভুলবো না তোমায়।

চম্পু কিছু চায় নি আমার কাছে। যা করেছিল, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবে। এমনি স্ফূর্ত্ত মন ছিল ওর। আমিও তখন গরীব, তবুও আসবার দিন সাইকেলে ওঠবার সময়, ওকে আমার হাতঘড়িটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি। আমার জামার বোতাম দেখিয়ে বল্লে—ওটা নেবে। মাকা হোকে বল্লাম—বুঝিয়ে দাও, এ সোনার নয়, পেতলের ওপর গিল্টি করা। এর দাম ছ'আনা পয়সা। এ নিয়ে কি হবে?

চম্পু শুনলে না, বল্লে—না, বোতাম নেবো।

সরলা হো বালিকা। যা চায় তাই দিলাম, ছ'আনা পয়সার চারটি পেতলের বোতাম। অনেক দিনের কথা হয়ে গেল সে-সব। মধ্যে অবস্থা যখন দিনকতক খুবই খারাপ হয়ে গেল, রাস্তার কনট্রাক্টরি করতে গিয়ে গরবাই-নালার সিমেন্টের সেতু দু-দুবার জলের তোড়ে ভেঙে গেল, সাড়ে তিন হাজার টাকা আমার পুঁজি থেকে বেরিয়ে গেল, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো পাওনাদারদের অত্যাচারে—তখন সামনে দেখলাম সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পথ জেলের ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েচে—কতবার তখন ভেবেচি, সব ফেলে পালিয়ে যাবো বলিবা গ্রামে মাকা হো'র বাড়ী। সেই মন অরণ্যে শালফুলের আলক্ত-মাখানো দিনগুলিতে চম্পু হো'র সঙ্গে নীরব ভাষার কথোপকথন। সেই নির্জ্জন রাত্রিগুলির নিবিড় মোহ।...

বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল।

বাড়ী গাড়ী করেছিলাম, বড়লোক হয়েছিলাম।

চম্পুর দেখা পাই নি, আজকার দিনটি ছাড়া।

কিন্তু এ কোন চম্পু ? এ ইংরেজি বলে, মোটর চড়ে, সভায় হিন্দিতে বক্তৃতা দেয়। সেই সরলা বালাকে এর মধ্যে কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবুও উদগ্রীব হয়ে রইলাম সন্ধ্যার জন্যে।

এলিশাবা দুই এলেন সন্ধ্যার একটু পরে। কেউ ছিল না ঘরে।

বল্লাম—মনে পড়ে ?

হেসে বল্লে—সব।

—চম্পু, তোমার কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি জানি তাই, না জানলে অবিশ্বাস করতাম। কি করে এমন হ'লে ? বলিবা ছাড়লে কেন ? লেখাপড়া শিখলে কোথায় ?

—দশ মিনিটের জন্যে এসেছি। অন্য সময় শুনবে। মিশনারী স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমাদের গ্রামের হো পাদ্রী আমাকে রাঁচী নিয়ে যায়। মাকা মারা গেল, কেউ ছিল না গাঁয়ে, কে আশ্রয় দেয় ? রাঁচীতে বল্লে, খৃষ্টান হ'লে সব সুবিধে ক'রে দেবে। সত্যি বলচি, এখন এসব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে বলিবা গাঁয়ে। অগাস্ট আন্দোলনের পরে জেলে বসে বসে শুধু বলিবার কথাই ভাবতাম।

—আর কোনো কথা মনে পড়তো না ?

চম্পু কৃত্রিম রাগের সুরে বল্লে—না। কি কথা মনে পড়বে ? মান রেখে কথা বলতে শেখো। জানো আমি কে ?

আমি পাল্টা রাগের সুরে বল্লাম—বেশ। দাও আমার বোতাম ফেরৎ—

চম্পু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বল্লে—কাল আসবো। মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছুতো ক'রে এসেছি।

তারপর একটু থেমে বল্লে—বোতাম নিয়ে আসবো। হারাই নি।

খোলস

আমার ছেলেবেলায় মহকুমার শহরে যখন স্কুলে পড়তাম তখন নীলমণি মল্লিক মশায়কে দেখতাম দামী শাল গায়ে দিয়ে বেড়াতেন, শহরের একজন নাম-করা উকিল। আমরা তখন তাঁকে ভয় ক'রে চলতাম, আমাদের স্কুলে মাঝে মাঝে এসে তিনি আমাদের পরীক্ষাও নিতেন।

নীলমণি মল্লিক সে সময়ে শহরের একজন বিশিষ্ট, সম্রান্ত ব্যক্তি। সকলে তাঁকে সম্মান করে, ভয় করে। নীলমণি বাবুর কাজকর্ম ঘড়ির কাঁটার মত চলে। সকালে উঠে তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বার হবেন, ফিরবার পথে মুন্সেফ বাবু ও মহকুমা হাকিমের বাড়ী ঘুরে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে আসবেন। হয়তো বসে ওঁদের ওখানে এক পেয়ালা চা খেয়েও আসতে

পারেন। এর নাম হাকিমকে তুষ্ট রাখা। এতে ক'রে শহরে অনেক সুবিধে আছে, বিশেষ ক'রে মহকুমার মত জায়গায়, যেখানে এই হাকিমেরাই সব।

সেবারে দীনবন্ধু সেন ডেপুটি বাবুর মেয়ের বিয়েতে নীলমণি বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বিয়ের রাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনা থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নার চালায় গিয়ে রান্না-তাজার তদারক করা পর্য্যন্ত—সমস্ত কাজ নিজে যেমন উৎসাহ নিয়ে করেছিলেন, মেয়ের বাপ দীনবন্ধু সেন ডেপুটিও তেমন করতে পারেন নি।

পরের দিন বার লাইব্রেরীতে এজন্যে তাঁর সতীর্থ উকিল রামজয় বাঁড়ুয্যে নাকি বল্লেন, কি হে, কাল কর্মকর্ত্তা তুমি না দীনবন্ধু বাবু বোঝাই যাচ্ছিল না—

নীলমণি বাবু জানতেন তাঁর এই হাকিম-তোষণের নীতি অনেকে এখানে ভালো চোখে দেখে না, আগে দেখতো এবং সেজন্য নীলমণি বাবুকে সাধারণে খাতিরও করতো কিন্তু এখন পড়েছে স্বদেশীর যুগ, সুরেন বাঁড়ুয্যে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়ে দিলে আর কি—এখন হাকিমের বাড়ী বেশী যাতায়াত নাকি তত সম্মানজনক নয়।

নীলমণি বাবু রাগের সুরে বল্লেন—মানে ?

—মানে কাজের দড় আটা দেখাচ্ছিলে কিনা তাই বলচি—

—তাতে তোমার কি ?

—না, আমার কিছু না। সকলেই বলছিল তাই—

আমি একথা শুনেছিলাম রামজয় বাবুর ছেলে নীরদের মুখে, সে আমার সহপাঠী ছিল। লোকে যে যা বলুক, নীলমণি বাবু গ্রাহ্য করেন না। তিনি আজ পনেরো বছর ধরে এই হাকিম-তোষণের ফলে সরকারী হাসপাতালের কমিটির সদস্য, পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সহকারী সভাপতি, লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতি, চৌকিদারী কমিটির সদস্য প্রভৃতি বহু সম্মান-জনক পদে গবর্নমেন্ট থেকে নির্ব্বাচিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দানশীল বলেও তাঁর একটা খ্যাতি আছে, তবে ব্যাপারগুলো গবর্নমেন্ট-ঘেঁষা হলেই তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। গবর্নমেন্ট দাতব্য হাসপাতালে একটা উইং বাড়ানোর জন্যে গবর্নমেন্টের হাতে তিনি সাড়ে চার হাজার টাকা সেদিন দিয়েছেন। এই রকম আরো অনেক আছে। তিনি গবর্নমেন্ট প্লীডারও বটে আজ আট ন'বছর ধরে। গবর্নমেন্ট প্লীডার একটা কতবড় সম্মানজনক পদ, যদিও এই ছোট মহকুমার শহরে গবর্নমেন্ট প্লীডারের বিশেষ কাজ যে কিছু আছে তা নয়, তবে ওই যে বল্লাম একটা বড় সম্মান। সকলে তো গবর্নমেন্ট প্লীডার হতে পারে না। নীলমণি বাবুর ছাপানো চিঠির কাগজে লেখা আছে "এন. মল্লিক, বি. এল.—গবর্নমেন্ট প্লীডার।" সম্মানও তিনি পেয়ে এসেছেন খুব। দু-তিনটি স্থানীয় স্কুলের তিনিই হর্ত্তা-কর্ত্তা। মোটা বাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ি হাতে ক'রে যখন তিনি রাস্তায় বেড়াতে বেরোন, তখন সকলেই সম্ভ্রমের সুরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। লোককে জব্দ করতেও তিনি অদ্বিতীয়, টুক্ ক'রে কোথায় কি লাগালেন, তার পর দিন থেকে তার পেছনে পুলিশ লেগে গেল।

একটা উদাহরণ দিলে এখানে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

শহরের বাজারে রামনাথ দাঁ তখন বড় ব্যবসাদার। তার ছেলে শিবু খুব শৌখীন মেজাজের লোক, বড়লোকের অপদার্থ ছেলে যেমন হয়ে থাকে। মদ, গাঁজা, গুলি খায়—মাসের মধ্যে দশবার কলকাতায় ছোটে, ফুর্ত্তি করবার জন্তে। বাপের পয়সা দু'হাতে ওড়ায়। রামনাথ দাঁ ওকে টাকা দিতো না, টাকা দিতো ওর ঠাকুরমা।

সেদিন নীলমণি বাবু বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেড়িয়ে ফিরচেন, ঠিক সেই সময় শিবু সত্ত ঘুম ভেঙে উঠে তাঁদের বাড়ীর দরজায় বসে বিড়ি টানচে। তিনি যখন খুব কাছে এসে পড়েচেন, তখনও বিড়ি ফেলে দেবার বা লুকিয়ে ফেলবার কোন আগ্রহই তার দেখা গেল না, অথচ সে তাঁকে দেখতে পেয়েচে। নীলমণি বাবু আরও কাছে এসে পড়লেন, আর হাত বিশ-ত্রিশ দূর, তখনও শিবু বিড়ি খাচ্ছে। তারপর যখন একেবারে তার সঙ্গে একই সরলরেখায় এসে পড়লেন নীলমণি বাবু, তখন শিবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আধপোড়া-বিড়ি সমেত হাতটা একবার পেছন দিকে নিয়ে গেল মাত্র।

রাগে ও অপমানে নীলমণি বাবুর আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো।

এত বড় স্পর্দ্ধা শিবু দাঁর! ওর বাপ রাস্তা-ঘাটে দেখা হ'লে মাথা নীচু ক'রে প্রণাম করে, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায়—আর ও কি না—

বজ্রগম্ভীর স্বরে হেঁকে বললেন, এই শিবে—

শিবু বললে—আজ্ঞে, আমায় বলচেন?

তখনও সে রোয়াকে বসেই আছে।

—হ্যাঁ, তোমাকেই বলচি।

—বলুন—

নীলমণি বললেন—তুমি না কালকের ছেলে? গুরুজনদের সামনে কি ভাবে চলতে হয় তোমার বোঝা উচিত।

শিবুর অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সে উত্তর ক'রে বললো—কেন, আমি কি করলাম? বারে! আপনি যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে, আমি বসে আছি আমার বাড়ীতে। কি দোষ হ'ল এতে?

নীলমণি মল্লিকের স্বর অতিমাত্রায় কঠোর হয়ে পড়লো। বললেন—কি দোষ হয়েছে? দেখতে পাচ্ছ না এখনো? আচ্ছা, দেখতে পাবে।

শিবু ভয় পেয়ে চুপ ক'রে গেল। নীলমণি বাবু অধিকতর দ্রুতবেগে সেখান থেকে চলে এলেন।

এরপরে থানা থেকে দারোগা এসে রামনাথ দাঁয়ের বাড়ী সার্চ করলে, শিবুকে ধরে নিয়ে গেল হাজতে। সে নাকি কি স্বদেশী হাঙ্গামায় জড়িত আছে। রামজয় বাঁড়ুয্যে জামিনের দরখাস্ত ক'রে নিরাশ হলেন। শিবু হাজতে দু-দিন দু-রাত কাটালে। শহরময় গোলমাল পড়ে গেল। এই সময় বৃদ্ধ রামজয় উকিলের পরামর্শে রামনাথ দাঁ গিয়ে নীলমণি মল্লিকের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। বাস্, সব ঠাণ্ডা।

এ সব আমার স্কুল-জীবনের সমসাময়িক ব্যাপার।

তারপর নীলমণি মল্লিক আরও বড় হয়ে উঠলেন মহকুমার শহরে। সব সভাতেই তিনি, সব সমিতিতেই তিনি। সব প্রতিষ্ঠানের তিনি হর্ত্তাকর্ত্তা। গবর্নমেণ্টের খেতাবও পেলেন নববর্ষের এক শুভদিনে। তিনি আরও উদার হয়ে উঠলেন, আরও দাতা হয়ে উঠলেন।

আমি তখন দেশে থাকি না। মহকুমার শহরটি বা তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যারা পাদ-চারণ করে তাদের কোনো খবরই রাখি না।

বছর পনেরো পরে আবার দেশে ফিরে এলাম।

রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক অনেক প্রবীণ হয়ে পড়েচেন। শহরের উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ের সেক্রেটারি, বালিকা বিত্তালয়ের সেক্রেটারি, হাকিম-তোষণ নীতির একনিষ্ঠ সেবক নীলমণি বাবু কিন্তু আগের উচ্চস্তরে এখন যেন নেই—লোকের চোখে। আমার সে স্কুল-জীবনের দিনগুলির পরে ত্রিশ বছর কেটে গিয়েচে। এখনকার যারা তরুণ সম্প্রদায়, তারা দেখলুম ওঁকে আমল দেয় না।

দেশে ফিরে আসবার মাস-দুই পরে এর এক প্রমাণ পেলাম।

সুরনাথ উকিলের বৈঠকখানায় বসে আছি, সেখানে ছোকরা উকিল শুভেন্দু গাঙ্গুলী এসে বসলো। খুব বড় বড় ক'রে ইংরেজী বলে, ঘন ঘন সিগারেট ফোঁকে (তবে আমার সামনে না), কথায় কথায় হাসে। তার মুখেই শুনলাম সে এবার রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে হাই স্কুলের সেক্রেটারিশিপের ব্যাপারে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে।

আমি অবাক।

এ কি কখনো সম্ভব? নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে টক্কর দিতে চলেচে তাঁর ছোট ছেলের বয়সী শুভেন্দু? যে নীলমণি বাবু আজ বিশ বছর ধরে স্কুলের সেক্রেটারি, তার সঙ্গে?

আমি বল্লাম—শুভেন্দু, এ সম্ভব হবে না। তুমি কার সঙ্গে লড়তে যাচ্চ, জানো?

শুভেন্দু বললে—আপনিই জানেন না দাদা। উনি আজ স্কুলটা গ্রাস ক'রে বসে আছেন বিশ বছর। যেন সেকেলে ধরনের স্কুল চলচে। নিউ ব্লাড্ না ঢুকলে আর—

—কিন্তু তুমি পারবে?

—সেকাল আর নেই দাদা। আপনি বহুদিন দেশে ছিলেন না। ওঁকে আর কেউ চায় না। ইয়্যং দল ওঁর ঘোর বিপক্ষে। তা ছাড়া সকলেই ওঁকে ধামাধরা বলে থাকে। মুন্সেফ ডেপুটিদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে চা খেয়ে বেড়ালে যে সম্মান একদিন পাওয়া যেতো, এখন তার পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় ঘৃণা। আগে বলতো, অমুক বাবু হাকিমের ডান-হাত বাঁ-হাত, অতএব ওঁকে খাতির করো। এখন বলে ও সেকেলে মেণ্টালিটির লোক, খোশামুদে। ওঁর সব শেষ হয়ে গিয়েচে। ওঁর দ্বারা আর কি হবে? নিউ ব্লাড্ চাই দাদা, নিউ ব্লাড্ চাই।

—তোমাকে ভোট দেবে সবাই?

—দেখুন কি হয়। আপনি জানেন না।

শুভেন্দু উঠে গেল। আমি সুরনাথ উকিলকে বল্লাম—শুভেন্দু বলে কি হে? ও পাড়ার নীলমণি কাকার সঙ্গে?

সুরনাথ বল্লে—নীলমণি বাবুর দিন চলে গিয়েচে। এখন সকলে ওঁকে আড়ালে ঠাট্টা করে।

—বল কি হে?

—তাই। ওঁর সমসাময়িক উকিল আর কেউ নেই এক হৃদয় চক্কত্তি ছাড়া। তা হৃদয় চক্কত্তি আজ প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন দশ বছর। পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আমাদের রায়বাহাদুর এখনো দু'বেলা সেই রকম ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে যান পাম্পশু পরে, সিগারেট খেতে খেতে। লাইক এ্যান্ ওল্ড সব্ ডাট হে ইজ—হি হি—

রাস্তায় নেমে একটু দূর গিয়েই রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা।

শীতকাল। দামী জামিয়ার গায়ে দিয়ে মলকা বেতের ছড়ি উল্টো ক'রে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি পঁচিশ বছরের যুবকের দর্পে ও তেজে পথ চলচেন। আজকালকার যুবক নয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবক, যাদের চোখে ছিল শেষ ভিক্টোরিয় যুগের মোহ-অঞ্জন, নিশ্চিন্ত ব্রিটিশ-প্রীতি, ব্রিটিশ জাষ্টিসের প্রতি অগাধ ও অটুট বিশ্বাস।

আমায় অনেক দিন পরে দেখেও কিন্তু নীলমণি কাকা কথা বল্লেন না।

কেন না আমি 'কমনার্'; তাঁর সেটের লোক নই।

তিনি আমায় খুব ভাল জানেন, আমায় বালক-কাল থেকে দেখে আসচেন আমাকে। কিন্তু ওই যে বল্লাম, ওই এক ধরনের লোক থাকে। ওল্ড্ সবই বটে, পয়লা নম্বরের স্নব। নাক-উঁচু লোক।

আমি হৃদ্যতার সুরে বল্লাম—কাকা ভালো আছেন? অনেক দিন পরে দেখলাম আপনাকে—

—হুঁ।

—জ্ঞান আজকাল কোথায় আছে?

—কলকাতায়।

ব্যস্—আমার অযথা ঘনিষ্ঠতা করবার প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই নির্মূল ক'রে দিয়ে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক উল্টো-করে-ধরা মলকা বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেলেন।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেছন থেকে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

আমার কষ্ট হ'ল। পিতার বয়সী লোক। এ সব মানুষ জানে না যে যুগ বদলে যাচ্চে ওদের চোখের ওপরে? কিছুই দেখে না—দেখেও দেখে না?

স্কুলের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নীলমণিবাবু হেরে গেলেন। হেরে গিয়েও নির্ব্বাচন ব্যাপারের কি একটা খুঁৎ ধরে তিনি আবার এক মোকর্দ্দমা করলেন, তাতেও হেরে গেলেন।

গত ত্রিশবৎসরে এই ক্ষুদ্র শহরটির বুকে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক এক একখানি ক'রে ইট বসিয়ে সম্ভ্রমের যে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করেছিলেন, আজ এক অর্ব্বাচীন যুবকের হাতের আঙুলের এক ধাক্কায় তা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এর পর থেকে কি যে হ'ল, বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাইব্রেরী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব একে একে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যে লাইব্রেরীর জন্যে তিনি কত কৌশলে চাঁদা আদায় ক'রে, গবর্নমেন্টের কাছ থেকে মোটা টাকা সাহায্য বার ক'রে বর্তমান পাকাবাড়ী তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই লাইব্রেরীর কমিটির মধ্যেও তাঁর নাম আর রইল না। অথচ তিনি ঐ কমিটির সহকারী সভাপতি ছিলেন গত পনেরো বছর যাবৎ। সভাপতি অবিশ্যি ছিলেন মহকুমার হাকিম, সেও রায় বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমেই। হাকিম, মুন্সেফ, সরকারী ডাক্তার, দারোগা প্রভৃতি যাতে সন্ধ্যার সময় এসে লাইব্রেরীতে তাস খেলতে পারেন, তার সুবন্দোবস্তও ক'রে রেখেছিলেন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর বলতেন—আরে, ওরা আসা ভালো, এতে লাইব্রেরীর প্রেস্টিজ বাড়ে। দরকার হ'লে দু'পয়সা সাহায্য দেবার মালিক তো ওরাই।

এই লাইব্রেরীতে কতবার বদলির আদেশপ্রাপ্ত হাকিমদের বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হয়েচে, তাদের হিসেব ওর প্রত্যেকখানা ইটে লেখা থাকলে সব ইট ভর্ত্তি হয়ে যেতো আজ। শুধু কি হাকিম, তা হ'লেও তো কথা ছিল। কি সমাচার, সরকারী ডাক্তার বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। কি সমাচার, ছোট দারোগা বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। বিদায়-সভার চাঁদার চোটে লোক বিরক্ত। এ সব আগে আগে ঘটে গিয়েচে, তখন তিনি ছিলেন শহরের নেতা, সম্রান্ত ব্যক্তি, অনেকের ভীতির স্থল। সুতরাং লোকে দিয়েচেও বিনা কৈফিয়তে।

জেলার শহর থেকে জজসাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছেন, নীলমণিবাবু পূর্ব্বাহ্নে খবর পেয়ে গেলেন, তাঁর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই জজসাহেব মোটরে যাবেন কলকাতায়। অমনি একঘণ্টার মধ্যে বিদায়-সভার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললেন। গেট সাজানো হ'ল নীলমণিবাবুর বাড়ীর সামনে, সভার অনুষ্ঠান হ'ল ওঁর বৈঠকখানার বারান্দায়। সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, চা, ফুলের মালা, গান কোনো কিছুরই ত্রুটি হ'ল না। সব খরচ বহন করলেন অবিশ্যি তিনি নিজেই।

রামজয় বাঁড়ুয্যের দল বল্লে—অস্তগামী সূর্য্যের পুজোয় কি হবে ভায়া? ও যখন চলে যাচ্ছে তখন থাক না। ওদের সম্মান দেখানো তো ওদের ব্যক্তিগত মেরিটের জন্যে নয়, পদের জন্যে। সে পদ ছেড়ে সে যখন চললো, তখন আর কেন?

নীলমণিবাবুর প্রায় একশো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল, এ সব খরচের বেলা তিনি চির দিনই মুক্তহস্ত। এ সব সেকালের কথা নয়, সেদিনের কথা।

হঠাৎ কিন্তু দিন বদলে গেল আশ্চর্য্যভাবে। কয়েক বছরের মধ্যে। কি রকম একটা হাওয়া এসে ঢুকলো শহরে। ছেলে-ছোকরার দল সব বিষয়ে এগিয়ে এসে হ'ল পাণ্ডা। লাইব্রেরি তারা দখল করলে, বললে—বুড়োদের দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। একখানা আধুনিক কালের বই নেই—সব সেকেলে। শুধু হাকিমহুকুমদের তাসখেলার আড্ডা হয়ে রয়েচে লাইব্রেরি—আজ বিশ বছর ধরে। এ অচলায়তন আমরা ভাঙবো।

তারা নিজেদের মধ্যে দল পাকিয়ে হৈ হৈ ক'রে ছাপানো কাগজ শহরময় বিলি ক'রে জানিয়ে দিলে—শহরের সব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা অং-ধরা প্রাচীন ফসিলদের তাড়িয়ে নিজেরা ঢুকে পড়বে। তাড়ালোও তারা। লাইব্রেরিতে এক কংগ্রেসী সভা করতেই হাকিমের দল সরে দাঁড়ালো—তাদের আড্ডা হাওয়া হয়ে গেল। তারপরই ধরলে এক সাহিত্যসভা—কলকাতা থেকে নবীনপন্থী প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদল এলেন। তাঁদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শহরময় শোভাযাত্রা বার করা হ'ল—বহু প্রবন্ধপাঠ, বহু বক্তৃতাদান সাড়ম্বরে সম্পন্ন হ'ল! দেশের স্বাধীনতা নিয়েও অনেক কথাবার্তা হ'ল সে সভায়।

রায়বাহাদুর সে সভার ত্রিসীমানায় পা দেন নি। কিন্তু যত দিন যায়, তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন, কিছু বুঝতে পারেন না। এ সব কি দিন এসে গেল? ছেলে-ছোকরার দল আর তাঁকে দেখে সম্ভ্রম করে না, হাকিম পুলিশ পেয়াদা আরদালিদেরও আর যেন সুদিন নেই, কোথায় সেই সব রক্তচক্ষু দোর্দণ্ড-প্রতাপ হাকিমের দল সেকালের? সব যেন মিইয়ে গেল। নইলে মুন্সেফবাবু এখন সুরনাথ বাবুদের ক্লাবে বসে আড্ডা দেন? মনে পড়ে সেকালের মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির কথা। এখনো অনেকে তাঁকে মনে রেখেচে বৃদ্ধদের মধ্যে। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো তাঁর প্রতাপে। কারো বাড়ী যেতেন না, কোর্টের বাইরে কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতেন না। নীলমণিবাবুর বড় মেয়ের বিবাহে কাপড় মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের মারফৎ—নিজে আসেন নি।

পরদিন সকালে সব কাজ ফেলে নীলমণিবাবু ডেপুটিবাবুর বাংলায় গেলেন কাপড় মিষ্টি পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ দিতে। বললেন—আপনি গেলেন না কাল হুজুর, কাল সকলেই আমরা আপনাকে চেয়েছিলাম।

মহেন্দ্রবাবু বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—সেটা আমার ত্রুটি নিশ্চয়ই, আমি স্বীকার করি।

—না হুজুরের ত্রুটি হয়েচে তা কি বলতে পারি, তা নয়—

—না না ত্রুটি নিশ্চয়ই। তবে কি জানেন নীলমণিবাবু, এখানে আমি সামাজিক জীব নই, গবর্নমেন্টের কর্মচারী। আমাকে নিমন্ত্রণ না করাই আপনাদের উচিত।

—সে কি কথা বলচেন আপনি—তা কি কখনো—

—আমি ঠিকই বলচি নীলমণিবাবু। ভবিষ্যতে আপনার বাড়ীর কোনো অনুষ্ঠানে আর আমাকে নিমন্ত্রণ না করলেই আমি সুখী হবো। কারণ এতে আমার লজ্জায় ফেলা হয় মাত্র।

সরল সোজা কথা। তেমন ধরণের লোক আর আসে না। সব যেন মিইয়ে গিয়েচে।

তারপর কিছুকাল কেটে গেল।

রায়বাহাদুরের অস্তিত্ব যেন এ শহর ভুলে গিয়েচে। কোনো অনুষ্ঠানেই আর তিনি কর্মকর্তা নন, কোনো সভায় সভাপতি নন। কেউ তাঁর কাছে যায় না কোনো বড়

কাজের পরামর্শ নিতে। একদিন যাঁর পরামর্শ ভিন্ন এ শহরের লোকের চলতো না, আজ তাঁকে বাদ দিয়েও লোকের দিব্যি চলচে।

রামজয় বাঁড়ুয্যে মারা গিয়েচেন, রায়বাহাদুরের সমসাময়িক উকীলদের মধ্যে দু-একজন মাত্র জীবিত আছেন। নীলমণিবাবুও কোর্টে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েচেন। তবে ছড়ি ঘুরিয়ে এখনও ভ্রমণে বার হয়ে থাকেন সেকালের মত।

চৈত্র মাসের প্রথমে এবার আমি অনেকদিন পরে মহকুমার শহরে গেলাম। তখন শহরে জেলার ছাত্র-সম্মেলন হবার বিরাট তোড়জোড় চলচে। একদিন সকালে নীলমণিবাবুর সঙ্গে দেখা রাস্তায়। বৃদ্ধ ছড়ি ঘুরিয়ে পথে চলেচেন আগেকার মতই। আগেকার সুচেহারা আর নেই, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হ'ল, জরার অধিকারের চিহ্ন সারাদেহে। আমি কথা বল্লেও উনি কথা বলবেন না জানি, কারণ আমি ছেলে খেপিয়ে বেড়াই উনি জানেন এবং বোধ হয় সেজন্যেই আমায় পছন্দ করেন না। পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন কিন্তু কোনো কথা বল্লেন না আমার সঙ্গে। আমার সামনে এসে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

ছাত্রের দল আমার কাছে এল ওদের সম্মেলন সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি তাদের বল্লাম, আমার অনুরোধ এবার নীলমণি বাবুকে সম্মেলনের সভাপতি করতে হবে।

তারা বল্লে—আপনি কি বলচেন? উনি সভাপতি হ'লে লোকে কি বলবে?

—যে যাই বলুক, তোমরা ওঁকেই সভাপতি করো। উনি আর ক'দিন? অনেক কিছু উনি করেচেন একসময়ে এই শহরের জন্যে। সে সব আজ লোকে ভুলে গিয়েচে। ওঁর সম্মান ওঁকে দাও। এ কথা তোমাদের রাখতেই হবে।

বহুকষ্টে ওদের রাজি করিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে আমি নিজে ওদের নিয়ে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা। রায়বাহাদুর বৈঠকখানায় বসে ওঁর মুহুরি জীবন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াতেই বল্লেন—কে?

—আজ্ঞে, কাকাবাবু আমি।

—ও, এসো। কি মনে ক'রে?

আমার ইঙ্গিতে ছাত্রের দল এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়ালো। তারপর ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরের পায়ে হাত দিয়ে এরা প্রণাম করলে। বিস্মিত রায়বাহাদুর কিছু বলবার পূর্ব্বে আমি বললাম—কাকাবাবু, এরা আপনার কাছে এসেচে, এদের ছাত্র কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হবে কাল এখানে—আপনার কাছে আসতে তো সাহসই করছিল না, আমি ওদের বল্লাম—চলো নিয়ে যাচ্চি, কোন ভয় নেই, তিনি ছাড়া উপযুক্ত লোক আর আছেই বা কে এখানে? তাই এরা এসেচে, আপনাকে কাল ওদের সম্মেলনে প্রিজাইড্‌ করতে হবে। আপনাকে রাজি হতেই হবে, নিরাশ করবেন না। আমি জানি আপনি খুব বিজ্ঞ লোক, কিন্তু এদেরও তো একটা দাবি আছে আপনার ওপর—

রায়বাহাদুর চমকিত, অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যেন তাঁর মুখে কথা বার হ'ল না।

ছাত্রদের চাঁই সুধীর অমনি হাতজোড় ক'রে বল্লে—আমাদের নিরাশ করবেন না স্যার, আপনি ছাড়া আর কেউ উপযুক্ত লোক নেই এখানে—

—বেশ, বেশ। তা হবে। বোসো বোসো তোমরা—

রায়বাহাদুর অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—ওহে নরেন, বোসো বাবা বোসো—সে সব হবে এখন, তুমি যখন নিজে এসেচ তখন আর 'না' বলতে পারি নে। একটু চা খাও সব, বোসো—ওরে—শোন্— ও হৃদে—আচ্ছা সব বোসো, আমি বাড়ীর মধ্যে থেকে আসচি—এক মিনিট—

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জন্যে বেশ ভালো জলখাবার এল, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, পেঁপে-কাটা ইত্যাদি। ছাত্রেরা জলখাবার খেয়েই চলে গেল, তারা কেউ চা খাবে না। আমাকে একা পেয়ে রায়বাহাদুর নিজের বহু পূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা প্রাণভরে আমার কাছে বলে গেলেন। এ শহরে কিছুই ছিল না, না লাইব্রেরী, না বালিকা বিদ্যালয় না প্রসূতি-ভবন। যা কিছু করেচেন, তিনিই করেচেন। ডেপুটি মুন্সেফবাবুরা তাঁকে খাতির করতেন কত। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত তাঁর বাড়ী এসে চা খেয়েচেন। আজই এখানকার লোকে তাঁকে পোঁছে না।

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—আপনাকে চিনবে কে, জানবে কে, কাকাবাবু? সবাই কি সকলকে জানতে পারে? ওরা আমায় বল্লে আপনার কথা। সাহসই পায় না এগোতে। বলে, অত বড় লোক কি আমাদের সভায় প্রিজাইড করতে রাজি হবেন? আসতে চায় সবাই, আসতে ভয় পায়—

—বোসো বোসো, বাবা, উঠচো কেন? আর একটু চা খাবে না?

—আজ্ঞে না কাকাবাবু। অনেক কাজ আছে, উঠি। আপনার মত লোককে নিয়ে যেতে হ'লে তার উপযুক্ত তোড়জোড় করতে হবে তো? আশীর্ব্বাদ করুন যেন ওয়া সফল হয়—

আমরা পরদিন ওঁকে মস্ত বড় শোভাযাত্রা ক'রে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সভাস্থলে নিয়ে গেলাম। গত দশ বৎসরের মধ্যে কেউ তাঁকে ডাকে নি। বিস্মৃত, উপেক্ষিত রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের বহুদিনের অজ্ঞাতবাস মহাসমারোহে আমরা ভঙ্গ করলাম। সভায় অনেক ভালো ভালো লোক এসেছিলেন, জেলা ছাত্র কংগ্রেসের বিরাট সভা, যথেষ্ট আয়োজন, যথেষ্ট আড়ম্বর। বন্দেমাতরম গান হ'ল, জয় হিন্দ্ গান হ'ল। রায়বাহাদুর মুগ্ধদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। সেক্রেটারি তার রিপোর্টে রায়বাহাদুরের যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে বললে, এ জেলায় তাঁর মত বদান্য, উদার, দেশহিতৈষী লোক আর দ্বিতীয় নেই।

সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রায়বাহাদুর এই সর্ব্বপ্রথম জীবনে প্রকাণ্ড সভায় দেশের স্বাধীনতার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মহাত্মাজীর প্রশংসা করলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রশংসায় তাঁর বচন খলিত হতে লাগলো উত্তেজনায়। আমরা অবাক হয়ে তাকাতে লাগলাম—ইনি কি সেই নীলমণি মল্লিক?

ভাষণের শেষে ঘোষণা করলেন ছাত্রসংঘের তহবিলে পাঁচশো টাকা তিনি দেবেন।

রায়বাহাদুরের জয়-জয়কার পড়ে গেল। সকলে বলতে লাগলো—লোকটার মধ্যে জিনিস ছিল।

পরদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা। বেতের ছড়ি ঘুরিয়ে রায়বাহাদুর সদর্পে পথ চলেছেন। আমায় দেখে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন—কোথায় চললে বাবাজি? বেড়াতে? বেশ বেশ। তোমাকে দেখলে চোখ জুড়োয়। জেলার একটি রত্ন তুমি। তোমার বাবা—

হঠাৎ আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর।

চৌধুরাণী

এ ইতিহাস আজকালকার দিনে শোনাবার মত বলেই শোনাচ্ছি।

যদি লিখে রেখে না দিই—এ কথা কেউ জানতে পারবে না। অনেক লোকের উপকার হবে পড়লে এই বিশ্বাসেই লেখা।

আমার ছেলেবেলাতে গ্রামের ওপাড়ায় রামলাল কাকার হাঁকডাক ছিল। সমস্ত খাঁন-পাড়ার লোকে তাঁর প্রজা, তাঁর মুখের হুকুমে একশো জোয়ান মরদ পুরুষ লাঠি হাতে এগিয়ে আসতো। শক্ত হাতে লাঠি না ধরতে পারলে তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে জমিজমা রাখা যেত না। জমি নিয়ে দাঙ্গা, জমির ফসল লুঠতরাজ—এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

রামলাল কাকার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার মায়ের চেয়ে তিন বছরের বড়, তিনি ছিলেন মায়ের সই, তাঁকে সই-মা বলে ডাকতাম। সই-মা লোক ভালো ছিলেন বলে শুনি নি, সারা বাল্যকাল ধরে তাঁর নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে তাঁর খাঁড়াখাঁড়ি ঝগড়ার কথা শুনে এসেছি।

শাশুড়ীরা বৌএর ওপর অত্যাচার করে একথা বাংলাদেশে সবাই জানে। কিন্তু অত্যাচারিতা অনেক বধূ তখন আমার এই সই-মার নামে পুলকিত হয়ে উঠতো।

এমন এক নিপীড়িতা বধূকেই আমি বলতে শুনেছি ঘাটের পথে :—

—বৌ বলতে বৌ হ'ল ওপাড়ার হরির মা। আমরা জন্মেছি ছাগল ভেড়া। শাশুড়ীকে কি ক'রে ছেঁচতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছে।

তাঁর সঙ্গিনী বললে—কাল নাকি সেজগিন্নির মুখে বৌ কেরোসিনের ডেমির ছেঁকা দিয়েছে —সেজগিন্নি তাই সহ্যি করে বাপু। আমাদের মত শাশুড়ী যদি হ'ত—

—সহ্যি না ক'রে উপায় কি বলো। খাঁড়াখেকো বৌ যে। পেরে না উঠলে, সহ্যি করতেই হচ্ছে বই কি।

—তা ধন্যি বৌ বটে। আবার রাগে দু'দিন খেতেই দিলে না শাশুড়ীকে। মুখের জোরে দাঁড়াবে কে সামনে? সেজগিন্নির কর্ম নয়।

—শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করবার সময়ে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে। অমন বৌ ঘরে ঘরে হ'লে শাশুড়ীরা জব্দ।

—আমরা পারি নে বাপু, ভয় করে।

—সেই জন্যেই ঝাঁটালাথি খাচ্ছি উঠতে বসতে। কাল হয়েচে কি, মুগের ডাল রোদে দেওয়া ছিল, বিষ্টি এসেচে কখন দেখতে পাই নি—খুকীর কাঁথা সেলাই করচি—সে কি গালাগাল! আচ্ছা গালাগাল দাও না হয় দিলে—কিন্তু বাপ-ভাই কি দোষ করলে? তাদের তুলে গালাগাল দেওয়া কেন বলো তো ভাই?

—বলবো আর কি! নিজেই দু'বেলা স্বচক্ষে দেখচি, স্বকর্ণে শুনচি। হাড়-ভাজাভাজা হয়ে গেল ভাই। এক সময় মনে হয় একদিকে বেরিয়ে যাই—আর ভাল লাগে না—

সই-মা দেখতে শুনতে ভালো ছিলেন। সবাই তাঁকে সুন্দরী বলতো। তাঁর পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে হয়। বড় ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, বিশেষ লেখাপড়া শেখে নি। অল্পবয়সে জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবী কাজে ভর্ত্তি হোল।

এই সময় সই-মা মারা গেলেন। রামলাল কাকা আবার বিবাহ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিন চারটি ছেলেমেয়েও হ'ল। কিছুদিন পরে রামলাল কাকা আবার বিপত্নীক হলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিবাহ করলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরও পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে হ'ল।

মাঝের পক্ষের প্রথম সন্তানের নাম আশালতা, বেশ সুন্দরী মেয়ে। রামলাল কাকা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করবার কিছুদিন পরেই আশালতার ভাই-বোনগুলি একে একে মারা গিয়ে বেঁচে রইল কেবল সে নিজে।

আশালতার বিয়ে হ'ল এগারো বছর বয়সে এবং সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল। কন্যা বিধবা হয়ে বাড়ী আসার পর থেকে শোকে রামলাল কাকার শরীর ভেঙে পড়লো এবং বছর খানেকের মধ্যে তিনিও ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এর মুখ্য কারণ কন্যার বৈধব্য নয়, কেন না রামলাল কাকার মৃত্যু হয়েছিল বসন্ত রোগে। ভূমিকা এই পর্য্যন্ত।

এখন আসল কাহিনী শুরু করা যাক।

আমাদের এ ইতিহাস প্রধানতঃ আশালতার ইতিহাস।

ব্যাপারটি এখন দাঁড়িয়েছে যা তা এখানে আর একবার বলি।

রামলাল কাকার সংসারে এখন কর্ত্তা হয়ে দাঁড়ালো ওঁর প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ। শরতের তখন বিয়ে হয়েছে এবং দুটি সন্তানও হয়েছে। শরতের ছোট ভাই সনতও লেখাপড়া শেখে নি, সে গ্রামেই ধানের ব্যবসা করে। প্রথম পক্ষের মেয়ে ক-টির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, তারা সকলেই শ্বশুরবাড়ী। রামলাল কাকার তৃতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েগুলির বয়স কম। বড়টি ছেলে, তার বয়েস এই সবে আট।

রামলাল কাকা সম্পত্তিওয়ালা লোক ছিলেন। বড় ছেলে শরৎ এমন দুই ফন্দি সব খাটাতে লাগলো, যাতে তার নাবালক বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলি সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বিমাতার কোন কথা এ সংসারে খাটে না, তাঁর বয়সও খুব বেশী কিছু নয়। শরৎ জমি বৌয়নী বন্দোবস্ত করতে লাগলো মোটা টাকা নিয়ে। পুকুর জমা দিতে লাগলো নিকিরিদের কাছে মোটা টাকা নিয়ে। গোলার ধান বিক্রি করে ফেলতে লাগলো আড়ত-

দারদের কাছে, তাতে পেতে লাগলো মোটা টাকা। গাছের নারকোল সুপুরি বিক্রি করতে লাগলো কলকাতায় যারা মাল চালান দেয় তাদের কাছে।

অথচ ওর বিমাতা বা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলির পরনে কাপড় নেই, স্কুল পাঠশালায় যাবার বন্দোবস্ত নেই, যা টাকা পাওয়া যাচ্ছে ওরা ত তার ন্যায্য-অংশীদার—অথচ শরৎ বা সনৎ সে চিজ্ নয়, সোজা পথে হাঁটার অভ্যেস তাদের নেই, বিমাতা মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করেন না, নিজের চেয়ে বেশী বয়সের সৎ-ছেলের কাছে।

এভাবে অরাজকতা চলল বছর দুই। শরতের বিমাতা মুখ বুজে সহ্য করেন।

তিনি গরীব ঘরের মেয়ে। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে এসেছিলেন এ সংসারে। যা জোর ছিল এখানে, বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু গিয়েচে। দোর্দণ্ড প্রতাপ সৎ-ছেলেকে কিছু বলতে সাহস করেন না তিনি। নির্জ্জনে চোখের জল ফেলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা বিষয় সম্পত্তির কি বোঝে, মহা আনন্দে লাট্টু ঘোরায় আর ঘুড়ি ওড়ায় পথে পথে মাঠে মাঠে।

শীতকাল। সকালবেলা।

শরৎ এক বাটি মুড়ি খাচ্চে বসে, এখুনি চা খেয়ে সে বেরুবে।

আশালতা এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বল্লে—বড়দা।

শরৎ মুখ তুলে বললে—কিরে?

—একটা কথা তোমায় বলবো।

—কি? বল তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই। কাছারিতে বেরুতে হবে এখুনি।

—তুমি বাগদিপাড়ার জমি বন্দোবস্ত করেছ কত টাকায়?

—কবে?

—এই যে সেদিন ক'রে এলে? বৌদিদির হাতে টাকা এনে দিলে?

—কেন অত খোঁজে তোমার দরকার কি?

আশালতা মুখ গম্ভীর ক'রে দাদার সামনে এসে দাঁড়ালো। সুন্দরী মেয়ে নিরাভরণা বিধবার বেশ, চাপা রাগে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। বললে—দাদা আজ আমি যে কথা বলতে এসেছি শোনো। তুমি ও-রকম ক'রে বিধু নিধুকে ফাঁকি দিতে পারবে না বলে দিচ্চি—

শরৎ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা যে আশালতা তাকে বলতে পারে; এটাই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না তখনো। অতটুকু মেয়ে আশালতা!

পরক্ষণেই রাগে ও বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে গিয়ে আটকে রইল খানিকক্ষণ। যখন কথাটা বেরিয়ে এল অবশেষে, তা বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়লো। তার মানে বোঝা গেল না।

—কি? জমি কার?……টাকা—বিধু নিধুর ফাঁকি মানে?

—শোনো দাদা। বিধু নিধু আছে, ওদের তিনটি বোন আছে। ওদের তুমি ভাখো না। মা ভাল মানুষ, তিনি কিছু বলতে পারেন না। ওদের পরনে না আছে কাপড়, না

গায়ে একটা জামা। মা একখানা থান, তাই শুকিয়ে নেয়। বিধু বড় হয়েছে, ওকে স্কুলে দিলে না। ওরা সব খাবে কি এর পরে ?

—কি খাবে সে আমি কি জানি ? আমারই বা কি দায় পড়েছে বিধুর পড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার। বাবা থাকতেই তো আমাকে আর সনৎকে পৃথক ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সে সব কথায় কি দরকার এখন জিজ্ঞেস করি ? তোমার সে সর্দারি করার দরকার কি ?

আশালতা দৃঢ়স্বরে বললে—সর্দারি করি নি দাদা, কিন্তু না বলেও আর পারছি নে। মা কিছু বলেন না, কিন্তু এটুকু তো বোঝেন যে বিধু নিধু ফাঁকে পড়চে। তুমি যে জমি বিলি করলে, বাঁশ ধান বিক্রি করলে, পুকুর জমা দিলে—সে টাকার ভাগ ওরা পাবে না ? অথচ ওদের পরনে না আছে কাপড় না আছে ওদের গায়ে একটা জামা—

শরৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—এত বড় কথা তোর ! তুই কথা বলতে আসবার কে শুনি ? তোর কি ভাগ আছে বিষয়ের ? তোর কোন জোর এখানে খাটবে শুনি ?

—আমার কথা তো একটুও বলি নি দাদা। বিধু নিধুর ভাগ ওদের দাও। মাকে দাও। শৈলবালার বিয়ে দিতে হবে আজ বাদে কাল, সবই যদি বেচে কিনে ফেললে, কাল শৈলর বিয়ে হবে কি দিয়ে ?

—সে ভাবনায় আমার রাত্তিরে ঘুম হচ্চে না। মা গিয়ে বুঝুন তাঁর মেয়ের বিয়ে কি দিয়ে হবে। আমার তাতে কি ?

—এই কথা তোমার উপযুক্ত হ'ল দাদা ? শৈলর বিয়ে না হ'লে কার মুখ হাসবে ? মা'র না তোমার ? লোকে বলবে অমুকের বোনের বিয়ে হ'ল না, ধুমসি ক'রে ঘরে রেখেচে। রাগ কোরো না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার কিছু চাই নে। একবেলা দুটো আলো চালের ভাত, একখানা কাপড়। কিন্তু বিধু নিধুকে স্কুলে দাও, এর পর ওরা ক'রে খাবে কি ? তোমারই দোষ দেবে লোকে, আমাকে কেউ বলতে আসবে না। ভেবে ভাখো।

শরৎ একটা বড় ধাক্কা খেলে এই দিনটিতে।

এতদিন তার বিশ্বাস ছিল সে যখন সংসারের কর্তা, সে যা করবে তাই হবে। অবিশ্যি বাবা তাকে ও সনৎকে পৃথক ক'রে দিয়ে গিয়েচেন কিন্তু হঠাৎ পরলোক গমন করাতে পাকাপাকি কিছু ক'রে যেতে পারেন নি বিষয়-আশয়ের। নগদ টাকার দরকার হলেই জমি বিলি, ধান বিক্রি, ইজারাবন্ত খাজনা আদায় ইত্যাদি করলে বাধা দিচ্চে কে তাকে ? বিমাতা বাধা দিতে সাহস করবেন না, হাবা-গোবা ভীতু মানুষ। আজ সে দেখলে এমন একজন আছে, যে তার আঙুল উঁচিয়েচে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ওর খেয়ালখুশির বিপক্ষে। আর সে কি না আশালতা ?

যাকে কাল দত্ত মশায়ের পাঠশালাতে হাত ধরে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছে ! কেন না ও পাঠশালায় যাবার নামে কেঁদে আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই সনৎকে ডেকে বললে—আশার কাণ্ড শুনিচিস ?

—কি ?

—ও নাকি আমাকে দেখে নেবে। আমি নাকি নিধু বিধুকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয়ের বিলিব্যবস্থা করছি। ওইটুকু মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা!

—তাই তো।

—এর একটা বিহিত করতে হবে সনৎ। আশার কি জোর থাটে এ-সংসারে?

—তা বলে ভাখো।

—তুইও বলবি। আমার সঙ্গেই বলবি।

—বেশ।

কালই সকালে বলা যাবে। ওকে তাড়িয়ে তবে আর কাজ। বড্ড বাড় বেড়েচে ওর। আমাকে একেবারে অবাক ক'রে দিয়েচে আজ।

—আমি বলবো এখন বুঝিয়ে—

—বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বলার কিছু নেই। ওকে বিদেয় ক'রে দেবো কালই।

—বেশ।

সনৎ তখন দিব্যি রাজী হয়ে গেল, কিন্তু সকালে এসে বললে—দাদা, ওই যে কাল বলছিলে আশাকে বলবার কথা না?

—হাঁ, তা কি ?

—আমি ও সব পারবো না। তুমি যা হয় কোরো—

—সে হবে না। তোকেও বলতে হবে—

—আমি ভেবে দেখলাম, ও সব কথার মধ্যে আমার না থাকাই ভালো।

—তুই আমাকে ভয় করিস, না মাকে ভয় করিস ?

—কাউকে ভয় করি নে। মা আমাদের দুজনকেই ভয় ক'রে চলে দাদা, সে তুমি জানো। মা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—নিরীহ প্রাণী। তাকে আবার ভয় করবার কি আছে ?

—তবে তুই কেন বলবি নে আশাকে ?

—না দাদা। আশা আমাদের কোলপোঁছা বোনটা। ওর মা নেই, বাপ নেই, স্বামীপুত্তুর নেই। আমি ওকে ও সব কথা বলতে পারবো না।

শরৎ মুখ কিলে পড়ে গেল। দুই ভাই একযোগে কাজ করলে যে জোর পৌঁছতো, সে তো পৌঁছলোও না, তার ওপর সে দেখলে আশার ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলে সনতের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া বোধ হয় বিচিত্র নয়। সনৎ এত দরদ দেখাবে আশার ওপর তা কে জানে। একেবারে গদগদ গোদাবরী! বলিহারি।

কিন্তু শরতের এ ধারণা ভুলও বটে, আবার নয়ও বটে।

সেদিনই সনৎ আশাকে সিঁড়ির নিচের ঘরে নির্জ্জনে ডেকে বললে—তুই কি বলেছিস দাদাকে ?

—কেন কি বলবো ?

—চোখ রাঙিয়েছিস শুনলাম—

—ওমা, মাথা কুটবো তোর সামনে ছোড়দা ? আমি চোখ রাঙাবো বড়দাকে ? আমি ন্যেয্য কথা বলিচি—

—কি কথা শুনি।

আশা সব ব্যাপার বললে। বলে কাঁদতে লাগলো।

সনৎ বললে—কেঁদে মরচিস কেন তুই ?

—না ছোড়দা, তুই বল্ আমি কি অন্যাই কথা বলচি—

—তাই তো।

—আহা, মা'র কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায় ছোড়দা। তুইই বল। বড়দা এতগুলো টাকা পেলেন, জমি বিলি ক'রে, জিনিস বিক্রি ক'রে—একটা পয়সা মা'র হাতে দিয়ে বলেচেন, মা তুমি একাদশীর দিন একটু মিষ্টি কিনে খেও কি শৈলকে একটা ফ্রক কিনে দিও ? আহা, কিছু পরবার নেই ওর, শাড়ীর পাড় জুড়ে জুড়ে আমি সেদিন ওর একটা ফ্রক ক'রে' দিয়েচি তবে পরে বাঁচে। কে আছে ছোড়দা ওদের মুখে তাকাবার ? মা তো ওই হতগজ—

—হতগজ না ভালমানুষ।

—তার মানেই তাই। তুমি গায়ে আগুন ঢেলে দাও, রা কাটবে না। এদিকে বিধু নিধু শৈল ভেসে যাক !

—তা তুই আমাকে বললি না কেন, আমি দাদাকে বলতাম—

—তুইও ওই এক রকম ছোড়দা। তোর দ্বারা হ'ত না।

সনৎ আশাকে যতই স্নেহ করুক, সে বেশিদিন বাঁচে নি। সেই বছর শীতের শেষে নিমোনিয়া হয়ে সাত আটদিন ভুগে সে মারা গেল। আশা দিনরাত রোগীর পাশে বসে সেবা করতো, সারাদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে। মজুমদার গিন্নির মুখে আমি একথা শুনেছি। কারণ সে সময় দেশে থাকতাম না। মজুমদার গিন্নি যার খুঁৎ ধরতেন না, সে সত্যিই একজন বুদ্ধ বা খৃষ্ট। মজুমদার গিন্নী বলেছিলেন—সংমায়ের পেটের বোন বটে, কিন্তু নিজের বোন কজই আছে আজকাল, যারা অমন ক'রে ভাইয়ের সেবা করে।

ওঁর মুখে এইটুকু কথার মূল্য অনেকখানি।

সনতের মৃত্যুর পরে সংসারে শরতের একাধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাধা দেবার আর কেউ রইল না। রাধলাল কাকার বিষয় সম্পত্তির মধ্যে যা ছিল ভালো, যে জমার খাজনা বিনা মোকদ্দমায় সহজে আদায় হয়, যে পুকুরে মাছ বাড়ে এবং বেশি দামে নিকিরিদের কাছে বিক্রি হয়, যে আমন ধানের ক্ষেতে জল বাধে সকলের আগে এবং শুকোয় সকলের শেষে—এক কথায় দুধের সরটুকু শরৎ গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল।

আবার আশালতাকে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল ওর কাছে।

শরৎ চীৎকার ক'রে রেগে তক্তপোশ চাপড়ে কথা বলে, আশা ধীরভাবে মৃদুস্বরে কথা বলে। শরৎ দিন দিন বিস্মিত হচ্ছে, কে জানতো সেই আশা এই মানুষ।

নিধু বিধুকে নিয়ে গিয়ে শরতের সামনে দাঁড় করিয়ে সেদিন বললে—ছেলে দুটো যে একেবারে বয়ে গেল, এরা ক'রে খাবে কি? এদের উপায় কি করচো বড়দা?

—আমি কি উপায় করব, তুমি এখন ওদের গার্জেন হয়েচো, তুমি করো—

—আমি তোমার পায়ের জুতোর তলা বড়দা, আমায় অমন কথা বোলো না।

—তোমাকে আর মিষ্টি কথা শোনাতে হবে না আমাকে, যাও এখান থেকে—

—এদের উপায় কি করবে করো বড়দা, পায়ে পড়ি তোমার।

—মাইনে দেবে কে?

—তুমি!

—কেন আমি দেবো? আমার—

শরতের উত্তরের বাকি অংশটুকু ছাপার উপযুক্ত নয়।

আশা চুপ ক'রে থেকে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি দাদা—এদের লেখাপড়ার দিয়ে করো—বাঁদর হয়ে গেল একেবারে।

—তবে তো আমার—

শরতের সবটুকু উত্তর ছাপবার পুনরায় অযোগ্য হ'ল।

আশালতা পরদিন নিজে কোথা থেকে টাকা জোগাড় ক'রে বিধু নিধুকে দু'মাইল দূরবর্তী সোনাখালি-বাকুপার মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিল। ছেলে দুটো বদ হয়ে গিয়েছিল—নিজে জোর ক'রে ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দিত, নিজে সকালে বিকালে পড়াতে বসাতো। আশা নিজে লেখাপড়া জানত সামান্যই। গ্রামের অবৈতনিক গুরুমশায়ের পাঠশালায় বাংলা সরলপাঠ তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত। কিন্তু নিজের চেষ্টাতে সে অনেক শিখেছিল। ওর মামার বাড়ী ছিল কলকাতার কাছে এঁড়েদ'। মা বেঁচে থাকতে সেখানে গিয়ে দু'তিন মাস থাকতো। এঁড়েদ' থেকে একবার মামীমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা শুনেছিল। আমি অন্ততঃ ওর কাছে একখানা কথামৃত দেখেচি। আশা রামায়ণ মহাভারত পড়তো, গীতা দু'বেলা পড়তো, বাংলা কবিতা কিছু কিছু পড়তো।

সৎমাকে বলতো—নিধু খুব বুদ্ধিমান মা, ও পড়ালে মানুষ হবে—

মা বলতো—বিধুকে কেমন দেখলি?

—বুদ্ধি নেই এর মত। তবে কিছু হবেই।

—তুই চেষ্টা কর্, হয়ে যাবে।

আশা যেন উঠে পড়ে লেগে গেল নিধুকে মানুষ করতে। শয়নে স্বপনে ওর এই এক ভাবনা। নিধুর এতটুকু বেচাল দেখলে নিজে শাসন করে, কড়া পাহারায় পড়াশুনো করায়, একদিন স্কুল কামাই করলে ভাত দেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়।

অথচ আশা আর বিধু নিধুর বয়সের তফাৎ খুব বেশি নয়। আট বছরের কি দশ বছরের।

পাড়ার লোকে বলতো—ওদের মা আর ওদের কি করে—আশা ওদের দিদিকে দিদি, মাকে মা—

শরৎ চেষ্টার ত্রুটি করে নি ওদের সম্পত্তি ফাঁকি দেবার। আশা না থাকলে ওরা পথের ফকির হ'ত একথায় কোন ভুল নেই। শরৎ অত্যন্ত কুচরিত্রের লোক, মদ এবং আনুষঙ্গিক সব কিছুই তার ছিল।

একবার মদ খেয়ে বিধুকে ডেকে বল্লে—বিধু, এই কাগজখানাতে একটা সই দিতে বল্ মাকে—

বিধু একে বড়দাকে ভয় করে, তার ওপরে মাতাল অবস্থায় বড়দা অধিকতর ভয়ের কারণ, ভালোই জানে সে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সে কাগজখানা মায়ের কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে এসে দিলে।

শরৎ চলে গেল।

এর দিন-দশেক পরে আশা নাইতে গিয়ে দেখলে ওদের ঘাটের ধারের বাগানে সাত আটজন লোকের জটলা। পাঁচজন কাঠুরে গাছ কাটছে, দু'জন লোক দাঁড়িয়ে লোক খাটাচ্ছে; আশার সঙ্গে ছিল গোয়ালপাড়ার কালী গোয়ালিনী। সে কালীকে বল্লে—পিসি, গিয়ে জিজ্ঞেস করো তো ওরা গাছ কাটছে কেন?

কালী জিজ্ঞেস ক'রে এসে বল্লে—মাঠাকরুণ, ওনারা বললে, শরৎবাবু এ বাগানের গাছ বিক্রি করেছে আমাদের কাছে।

—সে কি কথা! জিজ্ঞেস ক'রে এসো কত টাকায় বিক্রি করেচে।

কালী আবার গেল এবং ফিরে এসে বললে—তিনশো টাকায় মা ঠাকরুণ—

আশা তখুনি বাড়ী গেল তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে। শরতের সঙ্গে কথাটা বলতে শরৎ ধীরভাবে বল্লে—কেন, তোমায় সব জানাতে হবে নাকি? তুমি বাড়ীর কে? মা'র জায়গা মা সই ক'রে বিক্রি করেচেন, নাবালকদের অছি হয়ে—

—কত টাকা দিয়েছ মাকে?

—সে খোঁজে তোমার দরকার নেই, জিজ্ঞেস ক'রে এসো—

—তা ছাড়া ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি করার কি ক্ষমতা আছে তোমার? পঞ্চাশ ষাট টাকার ফল বিক্রি হয় বছরে। কেন ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি হবে? মা সই দিয়েচে?

—তোমার কাছে আমি সে কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই, যাও তুমি—

আশা ছুটে এসে সৎ-মাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলে, কিছুদিন আগে একখানা কাগজে সই দিয়েছিলেন বটে, তবে কি জন্যে তাঁর সই নেওয়া হ'ল তা জানেন না তিনি। হ্যাঁ, কাল বিকেলে বিধু এসে তাঁর হাতে তিরিশটি টাকা দিয়ে বলেছিল, বড়দা দিয়েচে। তিনি বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিলেন—এই পর্য্যন্ত।

আশা রেগে বল্লে—তুমি একটি আস্ত বোকা। সই দিতে বল্লে অমনি দিলে। আমাকে জিজ্ঞেস কর নি কেন? তুমি কি জানো কিসের সই?

—তুই তখন বাবের পুজো দিতে গিইচিস পঞ্চানন্দ তলায়। শনিবারের দুপুরে। তা ছাড়া শরৎ মদ খেয়ে এসেছিল। বিধু ভয়ে কেঁদেই বাঁচে না। জানো তো যমের মত ভয় করে ওরা শরৎকে।

—তা তো জানি, এদিকে যে দিব্যি ওদের মাথায় হাত বুলোলো বড়দা। তিনশো টাকায় বাগান বিক্রি করেচে। তার তিন ভাগের এক ভাগ একশো টাকা তুমি পাবে—সেই জায়গায় তিরিশটি টাকা ঠেকিয়েচে মোটে—উঃ কি অন্যায় কাজ বড়দার! বোকা বুঝিয়ে দিয়েচে তিরিশ টাকা দিয়ে। তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন এ টাকা কিসের? আচ্ছা মা, এত বোকা হলে মানুষ সংসার করতে পারে? বিধু নিধু যখন পথে বসবে তখন মজা টের পাবে কে শুনি? তুমি না আমি?

আশা গিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধালে শরতের সঙ্গে। ফাঁকি দিয়ে গাছগুলো এভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া? মায়ের টাকার ভাগই বা দেওয়া হয়েচে কই?

শরৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে—যা—যা, যা পারিস তুই করগে—

আশা রাঙামুখে বল্লে—বড়দা, তুমি এখনো চেনো নি আমায়। বিধু নিধুকে আর ওই বোকা-সোকা মাকে ফাঁকি দিতে পারো, কিন্তু আমার পারবে না। এই চল্লাম বাগানে, দেখি কার সাধ্যি বাগানের গাছ কেটে নিয়ে যায়—আর তো বিধু আমার সঙ্গে—এখনো এত অরাজক হয় নি দেশে বড়দা—

আশা গিয়ে বাগানে যারা গাছ কাটছিল, বিধুকে দিয়ে তাদের বারণ ক'রে পাঠালে। গাছ বিক্রি করা হয় নি বিধুদের অংশের, বাগানের গাছে কেউ যেন হাত না দেয়।

আশার চেহারার মধ্যে এমন কি একটা জিনিস ছিল, সকলে সমীহ ক'রে চলতো। তারা টাকা দিয়ে দলিল লেখাপড়া ক'রে নিয়েছিলো আগেই—তবুও আশার কথায় গাছ কাটা বন্ধ করলে।

শেষ পর্য্যন্ত শরতের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হ'ল তারা।

এই সব ব্যাপারে শরৎ ক্রমে আশার মহাশত্রু হয়ে উঠলো। ওর ওপরে নানা নির্য্যাতন শুরু হ'ল—এমন কি বড় ভাই হয়ে বোনের নামে হীন কুৎসা রটাতেও দ্বিধা করলে না।

আশা শরতের কাছে গিয়ে বল্লে—বড়দা, তুমি আমার নামে গাঙুলী কাকার কাছে এসব কি বলে এসেছো?

শরৎ মন দিয়ে হাঁসের পেনের তথা কাটছিল। শরতের স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে। শরৎ ওর দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বল্লে—কেন এখানে এসেচিস? বলবো না? তুমি বড্ড সতী—তা আমার জানতে বাকি নেই—

—কেন কি করেছি আমি?

শরতের উত্তর ছাপাবার অযোগ্য।

আশা মুখ ফিরিয়ে শরতের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লে—শুনলে তো বৌদিদি? বড়দাদার কথা?

শরতের স্ত্রী স্বামীকে অনুযোগের সুরে বল্লে—কি যে বলো, অত বড় সোমত্ত বোনকে ওই সব—

শরৎ দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে—তুমি চা দিয়ে চলে যাও দিকি, নিজের কাজ দেখো গে—

শরতের স্ত্রী চোখের ইশারায় আশাকে চলে যেতে বলে সেখান থেকে সরে গেল। আশা সে কথা শুনলে না, দুজনে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। পাড়ার লোকে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। আশাকে অনেক অপমানজনক কটূক্তি শুনতে হ'ল শরতের মুখে। শেষ পর্য্যন্ত শরতের স্ত্রী হাত ধ'রে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল। আশার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—দেখো দিকি বৌদি—কি সব কথা যে উনি বল্লেন।...শুনছিলে তো বৌদিদি? আমি না কি—

—তুমি ওবাড়ী চলে যাও ঠাকুরঝি, কেন মিথ্যে অপমান হওয়া—আমি কি বলবো বলো? আমার বলবার যো নেই কিছু সবই জানো। খিড়কি-দরজা দিয়ে চলে যাও—

কিছুতেই কিন্তু আশাকে দমানো গেল না। সে ডানা দিয়ে আগলে রেখে দিলে বিধু নিধু, শৈলকে নয় শুধু, তাদের মাকে পর্য্যন্ত, যদিও ওর মা তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। গ্রামের লোকে আশাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। অনেকে অনেক রকম সাহায্য পেতো আশার কাছ থেকে। কারো আঁতুড়ে রাত জাগতে হলে আশা, কোনো যজ্ঞি-বাড়ীতে রান্না করতে আশা, কারো বাড়ী থেকে পুরুষ অভিভাবক বিদেশে যাবেন, সে বাড়ীতে দু'চার দিন শুতে হ'লে আশা, কারো বাড়ীর ডাল বেটে দেবার সময়ে আশা। সারা গাঁ-খানার যে কোনো বিপদে আশাকে সবাই স্মরণ করবে এবং পাবেও। পাবে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটার মত পাবে। কখনো নিরাশ করে নি কাউকে।

সে-বার বৃদ্ধ বেণী হালদার ওকে বল্লেন—দিদি, একটা উপকার করতে হচ্ছে। রাতে কষ্ট পাচ্চি—একটু দুধ পেলে খেতাম। দুধ পাওয়া যায় না, আমি গরীব, আমায় কেউ দেয়ও না। ছহু বোষ্টমের গাই দুধ দিচ্ছে, তুমি গিয়ে বলে কয়ে যদি একপোয়া ক'রে দুধ দৈনিক যোগান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারো—

—দাদু, আপনার ভাত রেঁধে দেয় কে?

—যম। কে দেবে দিদি, এ গাঁয়ে কি কেউ কারও দিকে তাকায়? তোমার দিদি মারা গিয়েচে আজ দু'বছর, এই দু' বছরই হাঁড়ি ঠেলচি। ছেলে নেই—মেয়ে থাকে শ্বশুর বাড়ী। আমি না রাঁধলে রাঁধবে কেডা?

—আমি যদি রেঁধে দিই, খাবেন দাদু? যদি আপনার বাত না সারে, রেঁধে দিলে খাবেন?

—খাবো। খেয়ে বর্ত্তে যাবো। দু'হাত তুলে নাচবো। মনে করবো ছিকেষ্টদেবের মহাপ্রসাদ খেলাম। কেন, একথা বলচি কেন দিদি?

—আমার নামে নানা রকম রটনা রটেচে কি না গাঁয়ে। বড্ড রটিয়ে বেড়াচ্চে—

—আমার মায়ের নামে যদি রটনা রটতো তবে আমি তাঁর হাতে খেতাম না?

মাস ছুই অর্থাৎ সে-বার গোটা শীতকাল ধরে রোজ সকালে এসে বুড়ো বেণী হালদারের রান্না ক'রে দিতো আশা। ফলে সেই শ্রাবণ মাসেই যখন বেণী হালদার মারা গেলেন, তখন নিজের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি থেকে ছবিঘে আমন ধানের জমি তিনি আশার নামে উইল ক'রে দিয়েছেন শোনা গেল। এ নিয়ে মোকর্দমার সৃষ্টি হয়েছিল। বেণী হালদারের জামাই এসে বললে, ও উইল জাল। সব সম্পত্তি তার ছেলের প্রাপ্য। আশা কে যে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যাবেন তাঁর শ্বশুর? শরৎ বেণী হালদারের জামাইয়ের তরফে মোকর্দমার গোপনে তদ্বিরও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশার জমি কেউ কেড়ে নিতে পারে নি।

বিধুর লেখাপড়া যেটুকু হয়েছিল তা আশার চেষ্টা ও উৎসাহের ফলেই। নিধু লেখাপড়ায় খুব ভালো, ম্যাট্রিক পাশ করলে বেশ ভাল ভাবে। ইদানীং শরৎ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, এদের সম্পত্তিতে হাত দিতে সাহস করতো না, আশাকে ভয় করতো। সেই শরতের বৌ যখন হঠাৎ মারা গেল, আশা গিয়ে শরতের সংসারে বুক দিয়ে পড়লো। ওর ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো, রান্না ক'রে খাওয়ানো, সব কিছু করতো আশা। অবিশ্যি বেশিদিন করতে হয় নি, কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে শরৎ তিন মাসের বেশী দেরি করে নি।

আশা চোখের জল ফেলে বলেছিল—বৌদিদির যে কি গুণ ছিল, তা কেউ জানতো না, আমি জানতাম। বড়দার ভয়ে জুজু হয়ে থাকতো বেচারি, নিজের ইচ্ছেতে কিছু করবার কি তার উপায় ছিল? অমন বৌকে বড়দা চিনতে পারলে না—ছ'দিন যেতে তর সইল না, অমনি বিয়ে ক'রে নিয়ে এলো!

মাঘমাসের শেষ। আশা শরতের বাড়ী গিয়ে বললে—বড়দা, তোমায় যেতে হচ্চে একবারটি—

—কোথায় যাবো?

—বিধুর বিয়ের জন্যে হাঁটাহাঁটি করচে সাতবেড়ের দুঃখীরাম চৌধুরী। একবার গিয়ে মেয়ে দেখে এসো—

—আমি যাবো?

—তবে কে যাবে বলো। তুমি আমাদের মাথার মণি, বংশের বড় ছেলে, আমাদের সকলের অভিভাবক। তুমি যা ঠিক করবে ওর বিয়ের বিষয়ে, তাই হবে। যাও গিয়ে দেখে এসো বড়দা—

শরৎ খুশি হয়ে মেয়ে দেখে এসে সব ঠিকঠাক করলে বিয়ের ব্যাপারের। ফাল্গুন মাসেই বিধুর বিয়ে হয়ে গেল। বোশেখ মাসে সরাটি-ফুলসারার পাঁচ আনি জমিদার বাড়ী থেকে নিধুর বিয়ের সম্বন্ধ এল। কেন না নিধু ভালো ছেলে, সেবার আই. এ. পরীক্ষা দেবে। আশা আবার গিয়ে শরৎকে ধরলে। শরৎকে বললে—বড়দা, বিয়ে তুমি দিয়ে দিও যদি মেয়ে ভালো হয়, কিন্তু নিধুকে যেন তারা আরও পড়ান। পয়সা-কড়ি আমাদের দিতে হবে না তাঁকে! মেয়ের বাবাকে এই কথাটা বোলো বড়দা—

নিধুর বিয়ে হয়ে গেল এখানেই। ওরা নিধুকে বি. এ. পড়াবার খরচ দিতে লাগলো। যেবার নিধু বি. এ. পাশ ক'রে শ্বশুরের খরচে এম. এ. আর আইন পড়তে ভর্তি হ'ল ইউনিভার্সিটিতে, আশা সে-বার খুব অসুখে পড়ল।

ভাদ্রমাসের শেষ। খুব বর্ষা। নিধু কলকাতায়, বিধু মীরপুরের জমিদারী কাছারীতে কাজ করে, সস্ত্রীক সেখানেই থাকে, বাড়ীতে কেবল বিধুর মা আর ওদের সকলের ছোট অবিবাহিতা বোন তুলা। আশা ডাক্তার ডাকতে দেবে না। বিধু সামান্য রোজগার করে, ডাক্তারের খরচ পাবে কোথায়? এমনি সেরে যাবে।

রোগ হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো। তুলা দৌড়ে গিয়ে শরৎকে ডেকে নিয়ে এলো। শরৎ এসে বল্লে—কি হয়েচে মা? আশার নাকি অসুখ?

ওদের মা কেঁদে বল্লে—বাবা শরৎ, তুমি বাঁচাও আমার আশাকে—ও আমার মেয়ে নয়, ও বিধু নিধুদের মা, আমি তো মিথ্যে মা হয়েছিলাম। কি করলাম কার? ওই করেচে সব! সর্ব্বস্ব বিষয় বিক্রি ক'রে দাও, আমার মাকে বাঁচিয়ে তোলো। দুপুর থেকে মা আমার অজ্ঞান হয়ে আছে, পাঁচ সাড়ে পাঁচ জ্বর, লোক চিনতে পারচে না, বিছানা হাতড়াচ্চে—

এসব আট দশ বছর আগেকার কথা। বিধু এখন চালের কল আর আড়ত ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে, নিধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসতে পরিবার নিয়ে আছে সম্প্রতি। বড়দিদির কথা বলতে বলতে এখনো ওদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। আশার স্মৃতি আমাদের গ্রামের আকাশ-বাতাস ছেয়ে আছে। এখনো সকলে বলে—সৎ বোন হলেই কি খারাপ হয়—না সৎ-মা, সৎ-ভাই হলে খারাপ হয়—আশাকে দেখেচো তো?

নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব

আচার্য্য কৃপালনী কলোনি

আমার স্ত্রী আমাকে কেবলই খোঁচাইতেছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী। এই সময় জমি না কিনিলে পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরে আর জমি পাওয়া যাইবে কি? কলিকাতায় জমি ও বাড়ী করিবার পয়সা আমাদের হাতে নাই, কিন্তু পনেরোই আগস্টের পরে কলিকাতার কাছেই বা কোথায় জমি মিলিবে? যা করিবার এইবেলা করিতে হয়।

সুতরাং চারিদিকে জমি দেখিয়া বেড়াই। দমদমা, ইছাপুর, কাশীপুর, খড়দহ, চাকুরিয়া ইত্যাদি স্থানে। রোজ কাগজে দেখিতেছিলাম জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সব হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসহায় ও উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে বাড়ী ও জমির মালিকেরা একটুও বিলম্ব করেন নাই। এক বৎসর আগে যে জমি পঁচিশ টাকা বিঘা দরেও বিক্রয় হইত না সেই সব পাড়াগাঁয়ের জমির বর্ত্তমান মূল্য সাত-আটশো টাকা কাঠা।

বহুস্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইলাম।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি জমির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে, আমাদের সাধ্য নাই ওসব স্থলে জমি কিনিবার। তাছাড়া জমি পছন্দই বা হয় কই?

এমন সময়ে আমার স্ত্রী একখানা কাগজ আনিয়া হাতে দিলেন। বলিলেন—তোমার তো জমি পছন্দই হয় না। ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় করে ফেললে। পিনারি নেই তো কি হয়েছে? এটা পছন্দ হয় না, ওটা পছন্দ হয় না। এবার কি আর কিনতে পারবে কোথাও? যাও এটা দেখে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে। তোমার মনের মত। পড়ে ভাখো—

আমাকে আমার স্ত্রী যাহাই ভাবুন, স্থির হইয়া বসিয়া আমি নাই। সত্যিই খুঁজিতেছি, মন-প্রাণ দিয়াই খুঁজিতেছি। ভালো জিনিস পাইলে আমার মত খুশী কেহই হইবে না।

বলিলাম—এ কাগজ কোথায় পেলে?

—বীণাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ওরাও জমি খুঁজচে, ওদের দেশ থেকে সব উঠে আসচে ইদিকে, কলকাতার আশেপাশে। ওরা এটা কোথা থেকে আনিয়েচে।

পড়িয়া দেখিলাম—লেখা আছে—

'আচার্য্য কৃপালনী কলোনি।'

আজই আসুন! দেখুন! নাম রেজেষ্ট্রি করুন!!!

'কলিকাতার মাত্র কয়েক মাইল দূরে অমুক স্টেশনের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিরাট নগরটি গড়িয়া' উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনির পাদদেশ ধৌত করিয়া কলকলনাদিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধাই

এখানে পাওয়া যাইবে। আপাততঃ পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলেই নাম রেজেষ্ট্রি করিয়া রাখা হইবে।

স্টেশনের নাম পড়িয়া মনে হইল, কলিকাতার কাছেই বটে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—দেখলে ? ভালো না ?

—খুব ভালো। বীণার কাকা জমি নিয়েচেন এখানে ?

—না, নেবেন। নাম রেজেষ্ট্রি করেচেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, জমি পরে দেখো। উনিও ত দেখেন নি এখনো।

—জমি দেখবো না ? আচ্ছা, বীণার কাকাকে জিগ্যেস করি।

বীণার কাকার নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। চিরকাল বিদেশে চাকুরী করিয়াছেন, কোথাও বাড়ীঘর করেন নাই, জমি বাড়ী সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। আগে-আগে ভাবিয়া আসিয়াছেন কলিকাতায় বাড়ী করিবেন, সম্প্রতি সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণবাবু বলিলেন—আসুন। ও কাগজটা আপনি দেখেচেন ? ভালো জায়গাই বলে মনে হ'চ্ছে।

—একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে না কি ?

—ওর চেয়ে কাছে আর কোথায় পাবেন মশাই ?

—তা বটে। স্টেশনের কাছেই, গঙ্গার পারে।

—এখনো সস্তা আছে। এর পরে আর থাকবে না। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পঁচাশ ফুট চওড়া রাস্তা—

—আপনি টাকা পাঠিয়েচেন ?

—নিশ্চয়। রসিদ এসে গিয়েচে। আপনি যদি নেবার মত করেন তবে টাকা পাঠিয়ে দিন।

—জমি না দেখেই ?

—ও মশাই, এইবেলা নাম রেজেষ্ট্রি করে রাখুন। এর পরে আর পাবেন না। ঠিকানাটা হচ্চে—দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট। রাজীবনগর।

আমার স্ত্রী আমার নামের রসিদ দেখিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন—কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা। ক' কাঠার জন্যে টাকা পাঠালে, মোটে দু'কাঠা ?

—এখন এই থাক। পনেরোই আগস্ট কেটে যাক। সীমানাকমিশনের রায় বের হোক। পরে—

পনেরোই আগস্ট পার হয়ে গেল। সীমানা-কমিশনের রায় আর বাহির হয় না। আমার স্ত্রী বলিলেন—একবার জমিটা দেখে এলো না ? বীণার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও—অনেক লোক আসচে ময়মনসিং পাবনা নোয়াখালি থেকে পালিয়ে। আমাদের পাশের বাড়ীর ফ্লাটগুলি সব বোঝাই। এক-এক গেরস্ত বাড়ীতে তিন-চার ঘর লোক আশ্রয় নিচ্চে।

—কেন নিচ্ছে ? কোথাও তো কোনো গোলমাল নেই।

—তা কি জানি বাপু, অত-শত জিগ্যেস করেছে কে ? বীণাদের বাড়ীই ওর পিসতুতো ভাই আর বীণার দাদামশায়ের ছোট ভাই এসেছেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কথাটা মন্দ নয়। দাম রেখেছি করিয়াছি, জমি কোথাও যাইবে না। তবে আর এক-আধ কাঠা বেশী জমি রাখিব কি না, ইহাই ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে কলোনিটা একবার চোখে দেখা উচিত নয় কি ?

সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগে বীণার কাকা আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলাম—ব্যাপার কি ? এত ব্যস্ত কেন ?

—নিয়ে নিন, নিয়ে নিন। জমি কোথাও এতটুকু পাওয়া যাবে না এর পরে। হাজার হাজার লোক আসছে 'ইস্টবেঙ্গল' থেকে। আমার বাড়ী তো ভর্ত্তি হয়ে গেল। জমি এইবেলা যা যেখানে নেবার নিয়ে নিন।

—বলেন কি ?

—সত্যি বলচি। কলোনির জমিটা চলুন কাল দেখে আসি। দেখে এসে কিছু বেশী করে জমি ওইখানেই কিনে রাখুন। কত করে দাম নেবে তা কিন্তু এখনো বলে নি। কাল সেটাও ওদের আপিস থেকে জেনে আসি চলুন—

—কোথায় যেন ওদের আপিস ?

—রাজীবনগর। কোন্নগরের কাছে।

পরদিন কিন্তু আমাকে একাই যাইতে হইল।

বীণার কাকা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়ীতে আবার দুটি গৃহস্থ আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কোন্নগর স্টেশনে নামিয়া রাজীবনগর যাইতে মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। স্টেশনের সংলগ্ন তো নয়ই। পাকা আড়াই মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা কাদায় ভর্ত্তি। যেমন জঙ্গল, তেমনি মশা।

খোঁজ করিয়া এক গ্রাম্য ডাক্তারবাবুকে জমির মালিক হিসাবে পাওয়া গেল। তিনি একখানা টিনের ঘরে রোগীপত্র দেখিতেছিলেন, যাহাদের সংখ্যা আর যাহাই হউক ডাক্তারের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু নহে। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চাচ্ছেন ?

বিনীতভাবে বলিলাম—আপনারই নাম মনীন্দ্র বটক ? আমি যশোর থেকে আসচি। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন—ও—

এবং পরক্ষণেই রোগীদের দিকে মনোযোগ দিলেন পুনরায়।

আমি বড় আশা করিয়াই গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে স্টেশনের গায়ে জমি, এ জমিটা লইতে পারিলে নানাদিক দিয়াই সুবিধা। কিন্তু জমির মালিক অত নিস্পৃহ কেন। তবে কি বিক্রয় করিবেন না স্থির করিলেন ?

প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া গেল।

দাঁড়াইয়াই আছি। কেউ বসিতেও বলে না।

আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—আমি—মানে, এই ট্রেনেই আবার—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি বলচেন?

—জমিটা—

—কোন্ জমি?

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—স্টেশনের সংলগ্ন—কৃপালনী কলোনি—

—ও—

আবার রোগীদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আমিও অতটা সুবিধাসম্পন্ন যে জমিটুকু, তাহার খোদ মালিককে বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

দশ মিনিট কাটিল।

এবার ডাক্তারবাবুই আমাকে বলিলেন—তা, বসুন।

বসিবার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকক্ষণ হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। বসিবার মিনিট দুই পরে আমি বলিলাম—ইয়ে—জমিটার কথা—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কী বলচেন?

—জমিটার কথা বলছিলাম। মানে—একবার দেখলে ভালো হয়। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে—

—জমিটা দেখবেন? ও কাত্তিক, কাত্তিক! যাও, এই বাবুকে জমিটা দেখিয়ে আনো।

ভাবিলাম, তাইতো ইহা আবার কি। ডাক্তারখানার পাশের ঘরে বড়-বড় হরফে ইংরাজীতে লেখা আছে বটে, 'দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট'।

গঙ্গার ধারে বিরাট ভূখণ্ড লইয়া এই উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে—কিন্তু গঙ্গা হইতে রাজীব-নগরই তো দেখিতেছি আড়াই মাইল দূরে। তবে ইহাও হইতে পারে, দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্টের আপিস এখানে, জমি গঙ্গার ধারে।

কাত্তিক নামধেয় লোকটি ডাক্তারবাবুর আহ্বানে এইমাত্র আসিয়াছিল। বলিল—কোন্ জমি বাবু?

—আরে, ওই যে বরোজের পশ্চিম গায়ে—

—জমি?

—আ মলো যা। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হ্যাঁ, জমি। কোথাকার ভূত?

বাড়ীর চাকরটা বোধ হয় বোকা, প্রভুর এমন মূল্যবান ভালো বহুবিজ্ঞাপিত ভূমিখণ্ডের সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না কেন?

আমি পথে বাহির হইয়া বলিলাম—চলো—

লোকটা পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম—ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? ইস্টিশানের কাছে যে জমি—কৃপালনী কলোনি—

—ইস্টিশানের কাছে কোনো জমি নেই বাবু।

—আলবৎ আছে। তুমি কোনো খবর রাখো না।

—না বাবু, কোনো জমি নেই ওদিকে।

—শোনো। ইস্টিশানের গায়ে। কাগজে যে জমির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে নাম রেজেষ্ট্রি করতে বলা হয়েছিল যে জমির জন্যে। আমি নাম রেজেষ্ট্রি করে রেখেছি—রসিদ আছে পকেটে—

—এ-কথাটা আপনি ওখানে বল্লেন না কেন বাবু। আমি তো আর কোনো জমির সন্ধান জানি না। কালও তো এক বাবু এসেছিলেন, তিনিও নাম রিজিস্টারি করে নিয়ে গেলেন।

—জমি দেখেন নি?

—না। ডাক্তারবাবু বল্লেন, জমি দেখে যাবেন সামনের রবিবারে।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলো—

—বাবু—

—কি বলে আবার?

—আপনি জমি দেখতে চান?

—কি বলে আবোল-তাবোল? জমি দেখবো না তো কি?

—আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস্ করে আসি।

আমি বিরক্ত হইয়া নিজেই আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। বলিলাম—আপনার চাকর জানে না আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

এবার ডাক্তারবাবু দেখিলাম, আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনিও জমির জন্যই আসিয়াছেন মনে হইল। কারণ তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নাম রেজেষ্ট্রি করিলেন। ডাক্তারবাবু রসিদ কাটিয়া দিলেন দেখিলাম। লোকটির সঙ্গে আরো কি কথা হইয়াছে জানি না, দুটাকা দিয়া রসিদ লইয়া লোকটা চলিয়া গেল।

আমাকে ডাক্তারবাবু বলিলেন—জমি দেখবেন? আচ্ছা, চলুন আমিই যাচ্ছি।

পরে আমাকে দুর্গন্ধময় জল-ভর্ত্তি নালা, কচুবন, ভাঙা চালাঘর প্রভৃতির পাশ দিয়া কোথায় কোন্ অনির্দেশ্য মহল্লের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

আমি একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন, এ জায়গাটি ষ্টেশনের খুব কাছে। ষ্টেশনের সংলগ্ন বলিয়া বিজ্ঞাপনে আছে—

ডাক্তারবাবু আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনার তো আইডিয়া দেখছি বেশ। ষ্টেশন-সংলগ্ন মানে কি একেবারে কোয়ার্টার ইস্টিশানের টিকিটঘরের পাশে হবে মশাই?

বলিতে পারিতাম, 'সংলগ্ন' বলিতে দুই মাইল দূরবর্ত্তীই কি বোঝায় ? কিন্তু না, দরকার নাই। পূর্ব্ববঙ্গের অসহায় হিন্দু আমি, এখানকার জমির মালিকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করিব না। স্থান পাওয়া লইয়া কথা। চটিয়া গেলে জমি না দিতেও তো পারে।

বিনীতভাবে বলিলাম—কলোনি কতদূর ?

—মাইলখানেক দূরে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বলেন কি ! তবে সাড়ে তিন মাইল দূর পড়লো স্টেশন থেকে। এর নাম 'সংলগ্ন' ? এ তো কখনো শুনিনি—

ডাক্তারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—না শুনেছেন কি করবো ? কিন্তু আপনাকে বলচি, কলোনির এক ইঞ্চি জমি পড়ে থাকবে না। সব নামে-নামে বেজেষ্ট্রি হয়ে যাচ্চে। আপনার ইচ্ছে হয়, না নেবেন। তবে কি দেখতে যাবেন, না, দেখবেন না ?

—চলুন যাই।

পকেট হইতে একগোছা চিঠি বাহির করিয়া ডাক্তারবাবু আমার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন—এই দেখুন। মনি অর্ডারে টাকা আসচে অফিসে, রোজ একগোছা চিঠি আসচে, আপনি দেখুন না মশাই। না দেখলে ঠকবেন এর পরে। তবে আপনি না নিলে জোর করে তো আপনাকে দেওয়া হবে না—

রাস্তায় ভীষণ কাদা। একটা গোয়ালা-পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, মহিষ ও গরুর বাথান চারিদিকে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতাসে। ইহাতে মশা বিন্-বিন্ করিতেছে। খানিকদূর গিয়া একটা অবাঙালী কুলি বস্তি, যেমন নোংরা, তেমনি ঘিঞ্জি। তারপরে আবার জঙ্গল বাঁশবন আর ডোবা।

মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের একপাশে রাস্তার ধারে একটা টিনের সাইনবোর্ড বড়-বড় করিয়া লেখা আছে—'আচার্য্য কৃপালনী কলোনি'।

এখানে আসিয়া ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন। সামনের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—এই—

চারিদিক চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বোধের শক্তিও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারই নাম, আচার্য্য কৃপালনী কলোনি। এই সেই বহু-বিজ্ঞাপিত ভূখণ্ড ? কোথায় ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে ? কোথায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ? পকাশফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল প্রভৃতি ছবির সঙ্গে এই অন্ধকার বাঁশবন, কচুবন আর মশাভরা ডোবার খাপ খাওয়াইতে অনেক চেষ্টা করিলাম ; মনকে অনেক বুঝাইলাম, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কি ছিল ? অমুক কি ছিল ? কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। তাহা ছাড়া এখানে ডাঙা-জমিই বা কোথায় ? সব তো জলেডোবা আর জলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বনকচুর ঝাড়।

সে কথা বলিয়া লাভ নাই।

ডাক্তারবাবু গর্ব্বের সহিত বলিলেন—সাড়ে ছ'শো করে কাঠা, তাই পড়তে পাচ্ছে না। সব প্লটের নাম রেজেষ্ট্রি হয়ে গিয়েচে মশাই।

কিন্তু 'প্লট' বলিতে জমির টুকরো বোঝায়, এখানে জমিই যে নাই, এ তো সবই জলাভূমি। পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী ইহার ত্রিসীমানায় আছেন বলিয়া মনে হইল না।

বলিলাম—গঙ্গা এখান থেকে কতদূর ?

—বেশী নয়। মাইলখানেক হবে কিংবা কিছু বেশী হবে—

তাই-বা কি করিয়া হয় ? গঙ্গা এখান হইতে চারি মাইলের কম কি করিয়া হয়, বুঝিলাম না।

সে যাহা হউক, তর্ক করিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। এই জলাভূমি আর কচুবনই হয় তো ইহার পর পাইব কিনা কে জানে। মন ভীষণ খারাপ হইয়া গেল।

বাড়ী আসিতেই স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ গা, কি রকম দেখলে ? ভালো ?

বলিলাম—চমৎকার !

—বলো না, কি রকম জায়গা ? গঙ্গার ওপর ?

—সংলগ্ন বলা যেতে পারে।

—বেশ বড় রাস্তা করেচে ?

—মন্দ নয়। বড়ই।

বীণার কাকাকে সেদিন কিছু বললাম না। পঞ্চাশ টাকা জলে ফেলিলাম বটে, কিন্তু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ! পূর্ব্ববঙ্গই ভালো ! আর জমি খুঁজিব না ঠিক করিয়া ফেলিলাম !

পরদিন র‍্যাডক্লিফের রায় বাহির হইল।

আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে।

নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব

সাহেবের নাম এন. এ. ফারমুর। নীলগঞ্জের নীল কুঠীয়াল সাহেবদের বর্ত্তমান বংশধর। আমি বাল্যকাল হইতেই সাহেবকে চিনি। যখন স্কুলে পড়ি, সাহেবদের কুঠীতে একবার বেড়াইতে যাই। ফারমুর সাহেবকে এদেশের লোক ফালমন্ সাহেব বলিয়া ডাকে। আমার বাল্যকালে ফালমন্ সাহেবের বয়স ছিল কত ? পঞ্চাশ হইবে মনে হয়। সাহেবদের কুঠিতে যাইয়া দেখিতাম সাহেব দুধ দোয়াইতেছেন। অনেকগুলি বড় বড় গাই ছিল কুঠীতে, বিশ ত্রিশ সের দুধ হইত। নৌকা করিয়া প্রতিদিন ওই দুধ মহকুমার শহরে প্রেরিত হইত।' আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমাকে দেখিয়া বলিতেন—সকাল-বেলাতেই এসে জুটলে ? খাবা কিছু ?

—খাবো।

—কি খাবা? দুধ?

—যা দেবেন।

—ও মতি, ছেলেটিকে গুড় দিয়ে মুড়ি দাও আর দু'উড়কি দুধ দাও।—আমি এই মাত্তর খেয়ে আলাম—বোসো খোকা, বোসো।

নীলকুঠীর আমলে কালমন্ সাহেবের বাবা লালমন্ (লালমূর) সাহেবের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এদেশে। নীল চাষ উঠিয়া যাইবার পরে বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হইয়া এ দেশেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে জমিদারীও চলিয়া যায় অনেক, লালমন্ সাহেবও মারা যান। কালমন্ বিস্তৃত আউশ ও আমন ধানের জমি চাষ করিতে থাকেন, বড় বড় গরু পুষিতেন, সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ভেড়া। সাহেবের কুঠীতে সারি সারি ধানের গোলা ছিল বিশ ত্রিশটা। জমিদারীও ছিল, কুঠীর পূবদিকের বড় হলদে ঘরে (যার সামনে বেগুনি প্যাটেনফুলের প্রকাণ্ড গাছ, কি ফুল জানি না, আমরা বলিতাম 'প্যাটেন' ফুল) কুঠীয়াল সাহেবের নায়েব বড়ানন বক্সি কাছারি করিতেন, এবং প্রজাপত্র ঠেঙাইতেন। লালমন্ সাহেব কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, তবে তাঁহার বৈঠকখানায় একখানা বড় ছবির তলায় লেখা ছিল "T. Farmour of Bournemouth, England." কালমনের জন্ম নীলগঞ্জেই। তাঁহাদের সকলেই যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ের কৃষক শ্রেণীর ভাষায় কথা বলিতেন।

—কি পড়ো?

—মাইনর, সেকেন্ ক্লাসে।

—ইউ, পি, পাশ করেচ?

—হ্যাঁ।

—বিত্তি পেয়েছিলে?

—না।

—আমার ইস্কুলে পড়ো?

—আপনার ইস্কুলে না। জেলাবোর্ডের স্কুলে, চেতলমারির হাটতলায়।

—ও বুঝিচি। তবে তোমার বাড়ী এখানে না?

—আজ্ঞে না। আমার পিসির বাড়ী এখানে।

—কেডা তোমার পিসে?

—৺ভূষণচন্দ্র মজুমদার।

—আরে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী এসেচ তুমি? বেশ বেশ, নাম কি?

—শ্রীরতনলাল চক্রবর্ত্তী।

—পিতার নাম?

—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

—তুমি মাখনলাল মাস্টারের ছেলে? চেতলমারির ইস্কুলির?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই বলো। মাখন মাস্টার তো আমাদের বন্ধু লোক। বেশ, বলো, দুধ দিয়ে মুড়ির ফলার ক'রে খাও।

ফালমন্ সাহেবের সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ শুরু। তা' বাদে মাঝে মাঝে সাহেবকে চিতলমারির খড়ের মাঠে আমীনকে সঙ্গে লইয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। কতদিন নৌকায় লোকের সাহায্যে পটল কুমড়া বোঝাই করিতে দেখিয়াছি। লম্বা একহারা সাহেবী চেহারা। ভুঁড়ি একদম নাই, গায়ে এক আউন্স চর্বি নাই কোথাও। গোঁফ জোড়াটা বড্ড লম্বা, মুখ চোয়াল সবই ঠিক সাহেবী ধরনের। কিন্তু পোশাকটা সব সময় সাহেবের মত নয়, কখনো ধুতি, কখনো কোটপ্যান্টের উপর মাথায় তালপাতার টোকা। শেষোক্ত বেশটা দেখা যাইত যখন ফালমন্ মাঠে চাষবাসের তদারক করিতেন। কৃষাণ ছিল সংখ্যায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, লাঙল গরু চল্লিশখানা, আট-দশখানা গরুর গাড়ী। অত বড় ফলাও চাষ সাধারণ কোনো বাঙালী গৃহস্থ চাষী কল্পনাও করিতে পারে না। তালপাতার টোকা মাথায় কৃষকদের কাজকর্ম দেখা-শোনা করিতেন বটে, কিন্তু হুঁকোয় তামাক খাইতে কখনো দেখি নাই—পাইপ সর্বদা মুখে লাগিয়াই থাকিত। কৃষাণদের বলিতেন—বাবলাতলার জমিগুলোন্তে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মণ্ডল? তা দাও। আর দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেধে যাবে আনে। তখন লাঙল বেশী লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে।

সোনাই মণ্ডল হয়তো বলিল—বাবলাতলার ভুঁইতে পানি আর কনে, সাহেব? কে বল্লে আপনারে?

—নেই? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট্ (সাহেবের শালা, এখানেই বরাবর থাকিত দেখিতাম, চাষবাসের কাজ দেখে) যাইনি বুঝি? যা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার।

—এখনো দানা পুরুষ্ট হয়নি, আর চার পাঁচটে রোদ খাক্। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

এই সময় নদীপপুরের গোপেশ্বর বৈরাগীকে মাঠের পাশের পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া মাথার টোকাটা কপালের উপর দুই আঙুল দিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিলেন—ও গোপেশ্বর—শোনো—ও গোপেশ্বর—

গোপেশ্বর আসিয়া বলিল—সেলাম সায়েব—

সাহেবের দোর্দণ্ড প্রতাপ এ অঞ্চলে, কারণ অধিকাংশই তাহার প্রজা।

—যাচ্ছ কনে?

—যাবো একবার পানচিতে। মেয়ের খবর পাইনি অনেক দিন। জামাইডা কেমন আছে দেখে আসি, পেট জোড়া পিলে তার। গত অঘ্রাণ মাসে যায় যায় হইছিল—

—ম্যালেরিয়া?

—তা আমরা কি বুঝি ? তাই হবে।

—বেশ। একটা কৃষ্ট বিষয় গান করে শুনিয়ে যাও দিকি ?

—কৃষ্ট বিষয় ?

—কিংবা শ্যামা বিষয়। না, তুমি বোষ্টম টুম টুম আবার বুঝি শ্যামা বিষয় গাইবা না। যা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ্দ পড়চে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বৌসো, এই শিটুলিতলায় ছাওয়া পানে।

গোপেশ্বর গান গাহিতে বসিয়া দুবার কাশিল, সাহেবের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে দু'একবার চাহিয়া পরে গান আরম্ভ করিল—

কোন্‌টি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে—

ফালমন্ সাহেব হাতে তালি দিতে দিতে বলিলেন—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশুরায় না নীলকণ্ঠ ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশুরায় একখানা হোক না ?

সাহেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এ অঞ্চলে, সুতরাং গোপেশ্বরকে আর একখানা গান গাহিতেই হইল।

ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা।
কূলে বসে দুনয়নে বারি ঝরে
কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাও জানে না।
একবার ভাবি যদি বর্ত্তমান কংসের পদে
দৈবে দয়া যদি হোত পাষাণ হৃদে—
তা হয় না আর
গেল একূল ওকূল দুকূল
অকূল পারে গোকুল
কূলের তিলক রাখতে কূল পেলেম না।
ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা—

ফালমন্ সাহেব চক্ষু মুদিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গান শুনিতেছিলেন। আবার গোপেশ্বরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ—দাশুরায়ের গানের কাছে আর-সব কিছু লাগে না। কি রগম—কি ওরে বলে গোপেশ্বর ?

—অনুপ্রাস ?

—ওই যা বল্লে। ভারি চমৎকার, লাগতিই হবে যে। দাশুরায় হুঁঃ—

—আজ উঠি সাহেব।

—আচ্ছা এসো—

ফালমন্ সাহেবের কাছারি ঘরে—রাম শ্যামকে মারিয়াছে, তাদের গরু বছুর পটলের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে—এই সব গ্রাম্য মামলার বিচার হইত। বিচার সাধারণতঃ করিত নায়েব ষড়ানন বক্সি, গুরুতর মোকর্দ্দমার ফালমন্ সাহেব নিজে বিচারাসনে বসিতেন।

আমি দেখিয়াছিলাম যেদিন গুড়ে জেলের ভাই-বৌ রেমো ধোপার ছেলে অতুলের সঙ্গে সোজা চম্পট দেওয়ার পরে আড়ংঘাটা স্টেশনে ধরা পড়িয়া পুনরায় গ্রামে আনীত হইল, সেদিন ফালমন্ সাহেবের বিচার। গ্রামে হৈ চৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ দু'দশ বছরে এই ধরনের ব্যাপার কেহ এ অঞ্চলে দেখে নাই, শোনেও নাই।

ফালমন্ সাহেব অতুলকে কড়া সুরে প্রশ্ন করিলেন—জেলেবৌয়ের বয়সটা কত?

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তা জানিনে সাহেব।

—তোমার চেয়ে বড় না ছোট?

—আমার চেয়ে বড়।

—তোমার বয়েস কত?

—আজ্ঞে, এই তেইশ।

রেমো ধোপার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন—এই রেমো, বয়েস ঠিক বলচে তো?

রেমো বলিল- হাঁ, সাহেব।

—আর জেলে-বৌয়ের বয়স কত?

গুড়ে জেলে বলিল—আজ্ঞে, বত্রিশ।

—বত্রিশ?

—আজ্ঞে।

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোর বড় দিদির বয়িসী মে-রে হারামজাদা—তোর লঘু-গুরু জ্ঞান নেই? মারো দশ জুতো সকলের সামনে—আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, যাও—

ব্যস্, বিচার শেষ।

আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা ওকালতি খাটিবে না।

The great Khan has spoken—মিটিয়া গেল।

সেকালের নীলকুঠির অটোক্র্যাট ভূম্যধিকারীর রক্ত ছিল ফালমন্ সাহেবের গায়ে, প্রজা পীড়ন ও শোষণে তিনি তেমনি পটু, তবে যুগপ্রভাবে নখ-দন্ত অপেক্ষাকৃত ভোঁতা—এইমাত্র।

সেবার খুব বড় দাঙ্গা বাধিল বাগ্‌দী ও জেলে প্রজাদের মাৎলার বিলের দখল লইয়া। মাৎলার বিল বরাবর বাগ্‌দী প্রজাদের কাছে বন্দোবস্ত করা ছিল রানী রাসমণি এস্টেটের মকপলগর কাছারী থেকে। কখনো এক পয়সা খাজনা আদায় হইত না। মামলা মোকর্দ্দমা করিয়াও কিছু হয় না—তখন রানী-এস্টেটের নায়েব ভৈরব চক্রবর্ত্তী মাৎলার বিল দশ বৎসরের জন্য ইজারা দিলেন ফালমন্ সাহেবকে। সেলামি এক পয়সাও নয়, কেবল খাজিয়ানা

আড়াইশো টাকা খাজনা। কারণ দুর্দ্ধর্ষ জেলে ও বাগ্‌দী প্রজাদের কাছ থেকে বিলের দখল পাওয়াই ছিল সমস্যা—সাহেবের দ্বারা সে সমস্যা পূরণ হইবে, ভৈরব চক্রবর্ত্তীর এ আশা ছিল এবং সে আশা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়—বিল ইজারা দেওয়ার এক পক্ষ কালের মধ্যেই পদ্মকোটা বাৎলা বিলের রক্ত-রঞ্জিত জল তাহার প্রমাণ দিল। প্রকাশ কালমন্ সাহেব স্বয়ং টোকা মাথায় দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দাঙ্গা পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও পুলিশ রিপোর্টে পরে প্রকাশ হইল, দাঙ্গার সময় কালমন্ সাহেব তাঁর বড় মেয়ে মার্জোরির টন্‌সিল অস্ত্র করিবার জন্তে তাহাকে লইয়া কৃষ্ণনগর মিশন হাসপাতালে যান।

মামলাবাজ ও-ধরনের আর একটি লোক সারা জেলা খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ; প্রায়ই মহকুমায় মামলা পড়িত।

সাহেবের চারদাঁড়ের ডিঙি সাতটার সময় ছাড়িত কুঠিঘাট থেকে। ছইয়ের মধ্যে কালমন্ সাহেব ও তাঁর খাওয়ার জন্ত ফলের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, দুধের বোতল, নায়েব ষড়ানন বাবু ও তাঁর বিছানাপত্র, দুজন মাঝি (তার মধ্যে একজনের নাম গোপাল পাইক, জাতে বাগ্‌দী খুব ভাল গান গাহিতে পারে)—এই লইয়া তীরবেগে নৌকা ছুটিত দশ মাইল দূরবর্ত্তী মহকুমার শহরের দিকে। হু হু করিয়া মুখোড় বাতাস বহিত। গাঙে সাহেবের প্রিয় অনুচর গোপাল পাইক প্রভুর ইঙ্গিতে নৌকার গলুইয়ের কাছ থেকে ছইয়ের কাছে সরিয়া আসিত। সাহেব বলিতেন—একটা কৃষ্ণ-বিষয় কিংবা শ্যামা-বিষয় গাও গোপাল—

গোপাল অমনি ধরিত—

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা সুশোভিনী
নীল নয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী—

তারপর গাহিত—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, ছাড় যাই নিজ কাজে—

গোপাল পাইক যাত্রাদলে অল্প-বয়সে গাহিত, সাহেবের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার আশায় একদিন সে নীলগঞ্জের কুঠীতে গাহিতে আসে—গান শুনিয়া সাহেবের বড় ভাল লাগিল এবং সেই হইতে গোপাল সাহেবের এস্টেটের চাকুরীতে বহাল হইয়া গেল।

এক পয়সা খাজনা বাকি থাকিলেও যেমন সাহেবের এস্টেট হইতে নালিশ হইত, আবার ধরিয়া পড়িলে ক্ষমা করিতেও কালমন্ সাহেব ছিলেন বিশেষ পটু। কতবার এরকম হইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি প্রজা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কিংবা উকিল-মোক্তারদের উৎসাহে নীলগঞ্জ এস্টেটের বিরুদ্ধে মামলা জড়িয়াছে। একবার ফৌজদারী, তারপর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী দেওয়ানী, মহকুমা হইতে সাব্-জজকোর্ট, সেখান হইতে আবার পুনর্বিচারের জন্ত মহকুমার মুনসেফকোর্ট—এই করিতে করিতে প্রজা এস্টেটকে হয়রান করিয়া এবং নিজেও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিল, তখন হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টের বট-তলাতেই একেবারে কালমন্ সাহেবের পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল পায়ে।

—আরে কি কি, কে?

—আজ্ঞে আমি মুকুন্দ বিশেস।

সাহেব পায়ের ঝটকা মারিয়া বলিলেন—বেরো হারামজাদা—বেরো—বেরো—

ফালমন্ হিন্দী কথাই জানিতেন না, খাঁটি বাংলা ইডিয়মযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সে শুধু এইজন্য যে নীলগঞ্জের কুঠীই তাঁহার জন্মস্থান, এই গ্রাম্য আম-জাম-নিকুঞ্জ ছায়ার শ্যামলতায় ও কৃষকদের সাহচর্য্যে তিনি আবাল্য লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। ভরসেট-শায়ারের ইংরাজরক্ত ধমনীতে থাকিলেও মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী, উনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিন্ত শান্তি ও আলস্যের মধ্যে যাহার যৌবন কাটিয়াছে, সেই স্বচ্ছল বাঙালী জমিদার। মুকুন্দ বিশ্বাস ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিতে লোক ছুটিয়া ভিড় বাধাইল। সকলেই ভাবিল সাহেব কি অত্যাচারী। গরীব প্রজাকে কি করিয়া পীড়ন করিতেছে ভাখো। একেবারে এইভাবেই সর্বস্বান্ত হয়? ছিঃ—

কেহ বুঝিল না কিরূপ তেঁদড় ও দুর্দে-প্রচণ্ড মুকুন্দ কলু।

—কি চাই? কি?

—সাহেব মা বাপ—ধরম বাপ—মোরে বাঁচাও ধরম বাপ—

—কেমন? মোকদ্দমা করবিনে? কর ছানি—শোনছেন ও হরিশ বাবু শোনেন—ই দিকি।

চোগা-চাপকান্ পরনে বড় উকিল হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলী ঘটনাস্থলের কিছু দূর দিয়া যাইতে-ছিলেন। সাহেবের আহ্বানে নিকটে আসিতে আসিতে বলিলেন— গুড্ মর্ণিং মিঃ ফারমুর, বলি ব্যাপার কি?

—আরে ভাখেন না কাণ্ডখানা! চেনেন না মুকুন্দ বিশ্বাসকে? পাচপোতার মুকুন্দ বিশ্বাস। বদমায়েশের নাজির, ওর বদমায়েশী দেখতে দেখতে মাথার চুল আমি পাকিয়ে ফ্যাললাম হরিশবাবু, ওরে আর আমি চিনিনে? শুনুন তবে— আরে নায়েব মশায়, বলুন দিকি সব খুলে—

সব শুনিয়া হরিশবাবু মুকুন্দ কলুকে ধমক দিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! তাহার মত ট্যানাপরা লোকের পক্ষে? যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে, সাহেব নিজগুণে এবারটি গরীবকে মাপ করিয়া দিন।

সাহেবকে হরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন— আজ বুঝি ডিক্রির দিন?

—নিশ্চয়। ও এতদিন আমার সঙ্গে একটা কথা কইতো না। আজ একেবারে পায়ে ধরেছে।

ষড়ানন বক্সি বলিল—শুধু পায়ে ধরা নয় একেবারে ২ড়াকান্না কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলেছে—

সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—এই, যাও সব এখান থেকে। এখানে কি? চলে যাও সব—

হরিশবাবু উকিলও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, তোমরা কেন এখানে বাপু?

কাছারির সামনে ভিড় কোরো না— হাকিম চটবেন—যাও এখন—এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

হিসাব করিয়া ষড়ানন বক্সি সাহেবকে জানাইল, এই মামলায় এ পর্যন্ত সাতশো সাড়ে-সাতশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা যা, মাপ করলাম। নায়েববাবু মামলা মিটিয়ে নেবেন।

ষড়ানন বক্সি বলিল—খরচার টাকা?

—ওর সঙ্গে না হয় খত কার নেবেন। তবে বলে দিন আবার কুঠীতে গিয়ে নাকে খত দিতি হবে ওকে। নইলে আমি ওকে ছাড়বো না। ও নাকে খত দিতে রাজী কিনা?

মুকুন্দ বিশ্বাস খুব রাজী। সে এখনি নাকে খত দিতে প্রস্তুত আছে। সাহেবের আশ্বাস পাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার শীতকালের মাঝামাঝি মিসেস্ ফালমন্ লিভারের অসুখে ভুগিয়া কলিকাতার হাসপাতালে মারা গেলেন। দিন-সাতেক পরে নীলগঞ্জের চারিপাশের পাঁচ ছয় খানি গ্রামের সম্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের কাছে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল—মেম সাহেবের আত্মার মঙ্গল কামনায় যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা খাইবেন কিনা। তখনকার দিনে এসব ধরনের খাওয়ায় সামাজিক কড়াকড়ি অনেক বেশী ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজী না হইয়া এক্ষেত্রে উপায় ছিল না। সাহেবকে চটাইতে কেহই রাজী নয়।

নীলগঞ্জের কাছারি ঘরের সামনে তুঁততলায় দু'দিন ধরিয়া কালী ময়রা সন্দেশ, বোঁদে পানতুয়া ভিয়ান করিল। কাছারি বাড়ীর হলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল, ও অঞ্চলে সে রকম খাওয়ানো কখনো কেহ দেখে নাই।

ফালমন্ সাহেব কুঠীর গেটে নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে বলিতেছিলেন—পেট আপনাদের ভরেছে? কষ্ট দেলাম আপনাদের এনে? কিছু মনে করবেন না—

আমিও সে দলে ছিলাম, তখন স্কুলের বালক, ভূরিভোজন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। দীর্ঘাকৃতি ফালমন্ সাহেবের সে বিনীত মুখভাব, সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টি এখনো মনে আছে। মানবতার উদার গতিপথের পার্শ্বে অবস্থিত এই ছবিখানি আজিকার এই হিংসা দ্বেষ ও সাম্প্রতিক ধর্মমতের দ্বন্দ্বের দিনে বেশী করিয়া স্মরণে উদিত হয়।

বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন্ সাহেব সকলের সামনের চেয়ার পাতিয়া বসিতেন। যাত্রা গানের অমন ভক্ত দুটি দেখা যাইত না।

—ও বেয়ালাদার, একটা এ'কালে গৎ ধরো বাবা—জুড়িদের এগিয়ে দাও—

সাহেবের ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে যাত্রাদলের গাইয়ে-বাজিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আর কৃষ্ণ সাজিয়া আসিয়া গান ধরিলেই হইল, অমনি মেডেল ঘোষণা।

সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—এই যে ছোড়াডা কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রূপোর মেডেল দেবো। কথা শেষ করিয়াই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—হাততালি—হাততালি—

অমনি চট্‌পট্ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাততালি পড়িবে। নিজে সকলের আগে হাততালি দিবেন।

কোন করুণ ভক্তিরসের ব্যাপার ঘটিলে সাহেব সকলের সঙ্গে 'হরিবোল' দিয়া উঠিবেন।

বারোয়ারীতে চাঁদা দিতে সাহেব যেমন মুক্তহস্ত, তেমনি রক্ষাকালীপূজা বা শীতলাপূজার অনুষ্ঠানে। তখনকার দিনে বারোয়ারি দুর্গাপূজা বা শ্যামাপূজার রেওয়াজ ছিল না।

মিসেস্ ফালমন্ মারা যাওয়ার পর নীলগঞ্জের কুঠীর রাঙা 'প্যাটেন' ফুলের গাছ, নদীর ধারের অত বড় বাড়ী, লেবু ও আমের বাগান, পসার প্রতিপত্তি, অর্থসম্পত্তি সব কিছু শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বাড়ীর এক নিম্নজাতীয়া দাসীর সঙ্গে সাহেবের নাম জড়িত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। মার্জোরি ও ডোরা বিবাহ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সাহেবের যে ছেলে বিলাতে পড়িত, সে আর এদেশে আসিলই না। শোনা গেল, ইংলণ্ডেই বিবাহ করিয়া সেখানেই সংসার পাতাইয়া সে ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধির দিকে মন দিয়াছে।

এই সময় নীলগঞ্জের কুঠীতে এক ঘটনা ঘটিল।

বাহির হইতে কে একজন সাহেব আসিয়া কিছুদিন কুঠীতে রহিল। এ সময়ে প্যাটও কুঠী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নবাগত সাহেবের নাম মিঃ মুডি। এ অঞ্চলে তাহাকে "মুদি সাহেব" বলিত সবাই। মুদি সাহেব একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইত।

একদিন কি ঘটিয়াছিল কেহ জানে না, গভীর রাত্রে মিঃ ফাল্‌মনের সঙ্গে মুদি সাহেবের বচসার শব্দ শোনা গেল। বাহির হইতে চাকরে বাকরে কিছু বুঝিল না। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল, সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে মুদি সাহেবের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ঘরের মেঝেতে লুটাইতেছে এবং ঘরের কোণে সেই নীচ জাতীয়া দাসীটা দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

পুলিশ তদন্ত হইল। কিন্তু মিঃ ফালমনের কিছু হয় নাই, ব্যাপার নীলকুঠীর শক্ত কম্পাউণ্ডের বাহিরে এক পাও গড়ায় নাই।

এই ঘটনার পরেও ফালমন্ সাহেব অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। একাই থাকিতেন। পুত্র-কন্যা কখনো আসিত না। সাহেবের এক ভাই শোনা যায় ইংলণ্ড হইতে কতবার তাঁহাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছিল, ফাল্‌মন সাহেব বলিতেন— এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় কবর দিও, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবে।

ফাল্‌মন্ সাহেব এদেশেই মাটি মুড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে। নীলগঞ্জের কুঠী ভাঙিয়া চুরিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে দিনমানেও বাঘ বুনো-শূয়োরের ভয়ে কেউ যায় না। কুঠীর নিমতলায় ঘন কুঁচকাঁটার দুর্ভেদ্য ঝোপের ছায়ায় খুঁজিলে ফালমন্ সাহেবের কবরের ভগ্নাবশেষ এখনো কৌতূহলী রাখাল বালকদের চোখে পড়ে। আলমপুর পরগণার বড় তরফের যে চৌধুরী জমিদার বাবুরা নীলগঞ্জের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

বরো বাগদিনী

ওর নাম 'বরো', এর মানে বলতে পারব না। সবাই তাকে বরো বাগদিনী ব'লে। একটু মোটাসোটা, কুচকুচে কালো, আঁট সাঁট গড়নের, বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

এই পাড়াতেই বামুনবাড়ী বরো কাজ করতো, বাইরের কাজ, কারণ বাগদিনীর হাতের জলে কোন কাজ হবে না। গোয়াল গোবর করা অর্থাৎ গোয়াল পরিষ্কার করাই ছিল তার প্রধান কাজ। বিচুলি কেটে গরুকে জাবও দিত। উঠোন ঝাঁটও দিত।

একদিন শুনলাম, বরো মুখুয্যেবাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েচে। মুখুয্যে মশাই নিজেই এসে আমার কাছে নালিশ করলেন। বললেন—তুমি তো পল্লীমঙ্গলের সেক্রেটারী, এর একটা বিহিত করো—

—কি ব্যাপার হয়েচে কাকা?

—সেই বরো বিটি আজ কোথাও কিছু না, কাজে এল না আমার বাড়ীতে। এক হাঁটু হ'য়ে রয়েছে গোয়াল, থৈ থৈ করচে উঠোন আর বিটি কিনা স্বচ্ছন্দে বললে আমি কাজ করবো না। ছোটলোকের এত বড় আস্পর্দ্ধা আর সহ্যি হয় না। বলি যাই দিকে বিভূতির কাছে, একটা বিহিত এর করো দিকি বাবা।

—কাজ ছাড়লো কেন হঠাৎ, তা কিছু জানেন!

—কি করে জানবো বাবা, কাল বললে আমার তামাক-পোড়া খাওয়ার পয়সা আলাদা দিতে হবে। তাই বললাম, তিন টাকা করে মাইনে আবার তার ওপর তামাক-পোড়া খাওয়ার পয়সা! পারবো না। তাই বাবা—

—এর কি করা যাবে পল্লীমঙ্গল থেকে বলুন? আপনার পয়সা-কড়ি নিয়ে সে তো আর চলে যায় নি! আমি কি করবো বলুন কাকা। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—তা হবে কেন? তা কি আর হবে? ছাইভস্ম কি সব মাথামুণ্ডু লিখতেই শিখেচো। গাঁয়ের কোন উপ্‌কার কি তোমায় দিয়ে হবে বাবা—তা হবে না। সে বুঝতে পেরেচি অনেকদিন—

মুখুয্যে কাকা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেলেন। কি করবো—আমি নাচার। পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী তো আর নবাব-নাজিম খান্‌জা খাঁ নয় যে, যাকে তাকে ধরে নিয়ে এসে যে কোনো অপরাধে গর্দ্দান নেবো। আমি কি করতে পারি বরো বাগদিনীর?

হঠাৎ বরোর সঙ্গে একদিন গোপালনগরের পথে দেখা।

একটা ভাঙা চুপড়ি কাঁখে সে বাজারে যাচ্ছে, পরণে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র।

বললাম—কি বরো? ভাল আছ?

বরো থমকে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল জড়সড় হ'য়ে, আমায় পথ দেবার জন্যে, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, পথ দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট চওড়া। বললে—বাবু, আমাকে কাঠ দেবেন একখানা!

—কাঠ? কি কাঠ?

—বাবু, সেই রেশম কাঁঠ।

—বুঝলাম। তোমার নেই?

—না বাবু, কে এনে দেবে, মোদের কথা কি কেউ শোনে? কাপড় নেই। এই দেখুন এই কাপড়খানা—

বরো আঁচলের অংশটুকু আমার সামনে মেলে ধরলে। বললাম—থাক্ থাক্ ও দেখাতে হবে না, দেখেই বুঝতে পাচ্চি।

কথাটা তখনি মনে পড়ে গেল।

বললাম—আচ্ছা, মুখুয্যেবাড়ীর কাজটা ছেড়ে দিলে কেন হঠাৎ? মুখুয্যে কাকা সেদিন বলছিলেন—

বরো আমার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে বললে—সে বাবু আর আপনার সামনে বলবো না।

একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে বললে—ওনার মতিগতি ভাল না বাবু, এই একটা কথা আপনাকে বললাম—

বরো চলে গেল।

ব্যাপার কি?

মুখুয্যে কাকা কি বরো বাগদিনীর কাছে প্রেম করতে গিয়েছিলেন? উভয়ের এই বয়সে? বিশ্বাস তো হয় না। মরুকগে, পরের কথায় দরকার কি আমার!

পৌষমাসের প্রথমেই ভীষণ শীত পড়লো।

একদিন রাত দশটার পর ওপাড়ার হাজারি ঘোষের বাড়ী থেকে ভাগবতের কথকতা শুনে ফিরচি—এমন সময় পায়ে-চলা মাটির পথের ধারে একখানা কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় কে শুয়ে আছে দেখে সেখানে থমকে দাঁড়ালাম।

এ পাড়ায় আমার যাতায়াত খুবই কম। তার ওপর বহুকাল গ্রামে না থাকার দরুণ কোন্টা কার বাড়ী চিনিনে। এগিয়ে গিয়ে বললাম—শুয়ে কে?

—কে, বাবু? আসুন? কনে গিয়েলেন এত রাত্তিরি? আমি বরো।

—ও, এই তোমার বাড়ী নাকি?

—হ্যাঁ বাবু। এরে কি আর বাড়ী বলে। ওই কোনো রকমে আছি মাথা গুঁজে। গরীব লোকের আবার বাড়ী আর ঘর। আপনিও যেমন।

সত্যি অবাক হ'য়ে গেলাম। কেউ বললে বিশ্বাস করবে না। ছোট্ট একখানা চার-চালা ঘর, ঘরের পেছন দিকে দেওয়াল নেই; কঞ্চির বেড়া বা টাঁচ কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা সামনের যে দাওয়ায় বরো বাগদিনী এতক্ষণ শুয়েছিল তার দুদিকে নোনার পাতার বেড়া কিন্তু সামনের দিকে একদম ফাঁকা। এই ভীষণ শীতে এই খোলা দাওয়ায় কি-একখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের মধ্যেও যেন কে শুয়ে আছে মেঝেতে। বললাম—ঘরে ও কে?

—এ মোর ছেলে ট্যানো। ওরে চেনেন না ?

—না, তোমার ছেলে আছে তাই জানিনে ? কত বড় ?

—তা বাবু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বড়-সড় হয়েছে। কত তা কি মোরা জানি ? এই পাড়ার রাখাল। সবারই গরু চরায়।

—বেশ।

এইবার আমার নজর পড়লো বয়ো যেখানা গায়ে দিয়েছিল সেই কাপড়খানার দিকে। থলের চট বলই মনে হওয়াতে জিগ্যেস করলাম—গায়ে দিয়েছ কি ওটা ?

—এখানা বাবু কম্বল।

—কি রকম কম্বল ?

—আর বছর বনগাঁ থেকে এনে ডাক্তার বাবু বিলি করেলেন। এর মধ্যে তুলো পোরা। পাঁচখানা মোদের গাঁয়ে বিলি হয়েল, গোঁরমেণ্ট থেকে নাকি বিলি হয়েল। কি জানি বাবু, আপনারাই জানেন—মোরা কি খবর রাখি বলুন। দিলে একখানা, নেলাম। তা বাবু একখানা কাপড় পাবো না ? মুছলবে বেরোবার উপায় নেই—

গ্রামের লোকে কি করে জীবন কাটায়, ভাল করে দেখিনি কোনোদিন, আজ একে দেখে তা বুঝলাম। এই শীতে একখানা থলের চট গায়ে দিয়ে বাইরে শুয়ে যে আছে, তার কালই নিমোনিয়া যদি হয় এবছরের এই ভীষণ শীতে, তবে কোন্ ডাক্তারখানা থেকে এদের ওষুধ আসবে ?

দিনকতক পরে গ্রামে বাঘের উপদ্রব হোল। প্রতি বৎসরই শীতকালে বাঘের উপদ্রব হয় এ অঞ্চলে। লোকের গোয়াল থেকে গরু বাছুর নেয়, রাত্রিচরা গরু তার পরের দিনের আলো হয়তো আর দেখে না। এ বছর উপদ্রবটার বাড়াবাড়ি দেখা গেল। দিনদুপুরে দক্ষিণ মাঠের বেগুনের ক্ষেতে কি নয়ালি দীঘির পাড়ের জঙ্গলে চুয়োডাঙার রাস্তার অশথ গাছের তলায় বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখে চাষী কি পথ-চলতি লোকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে ইছামতীর ধারের বাঁশবনের পথ দিয়ে সীতে জেলে মাছ ধরে নিয়ে তেঁতুলতলার ঘাট থেকে বাড়ী ফিরচে, মস্ত বড় বাঘ (অবিশ্যি সীতে জেলের বর্ণনানুসারে) রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। জনপ্রাণী নেই তেঁতুলতলার ঘাটের পথে, বাঘও নড়ে না—সীতে জেলের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তারপর বাঘটা হঠাৎ লাফ দিয়ে পাশে ঝোপে কেন পালিয়ে গেল সে-ই জানে। একদিন তো আমারই বাড়ীর পেছনে বাঁশবনে সন্ধ্যা রাতে ফেউ ডাকতে শুরু করলো। হাট থেকে ফিরবার পথে বয়ো বাগদিনীর ঘরের পাশ দিয়ে এলাম ওকে বাঘের কথাটা বলে সতর্ক করে দেবার জন্যে।

জ্যোৎস্না উঠেছে, সন্ধ্যার অল্প পরেই। তেমনি শীত।

বয়ো দেখি দাওয়ায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে একটু করে ঘুঁটের আগুন। একেবারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

—কি বয়ো, এত সকালে শুয়ে পড়েচ ?

—বাবু ? আসুন, বড্ড জর এয়েল দুপুর বেলা। আজ আর হাটে যেতে পারিনি। চটখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি।

—তোমাকে এলাম একবার সাবধান করে দিতে। বাইরে এরকম শোয়া ঠিক না। কাল তো আমার বাড়ীর পেছনের বাগানে বাঘ ডেকেছে। তোমার ঘর আরও বনের মধ্যে—

—বাবু, কিছু হবে না। বাঘে মোদের কি করবে ? ও ভয় নেই মোদের। তা থাকলি কি আর বারোমাস এই ফাঁকা জায়গায় শুতি পারি। ও মোদের সয়ে গিয়েচে। ভয় ডর থাকলি কি মোদের চলে ?

একদিন পরের কথা।

সকালবেলা হৈ হৈ ব্যাপার। সবাই ছুটচে ওপাড়ার দিকে।

বরো বাগদিনীকে নাকি শেষরাতে বাঘে মেরেচে। সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না।

ব্যাপার কি দেখবার জন্ম ছুটলাম ওপাড়ার দিকে।

গিয়ে দেখি বরো বাগদিনীর ঘরের উঠোনে লোকে লোকারণ্য। বরো বাগদিনীর গলা সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে। সে হাত-পা নেড়ে কি একটা বর্ণনা করচে সকলের সামনে। আর সেই জনমণ্ডলীর মাঝখানে বরো বাগদিনীর দাওয়ার ঠিক সামনের উঠানে একটা বড় গুল-বাঘ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বরো বাগদিনী নাকি বাঘটাকে গত শেষরাতে কাস্তে বঁটি দিয়ে মেরেচে।

জিগ্যেস করলাম—কাস্তে বঁটি দিয়ে অত:বড় বাঘটাকে—?

তখন বরো আবার আমার দিকে ফিরে তার কাহিনী গোড়া থেকে শুরু করলে। সত্যিই সে বাঘটা মেরেচে এবং বঁটি দিয়ে মেরেচে। শেষরাত্রে বাঘটা ওর ঘরের পেছনে এসে হাঁক পাড়ে। বরোর ছেলে ঘর থেকে ভয়ে চীৎকার করে উঠতেই বরোর ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেকে বাঘে ধরেচে ভেবে ও দাওয়ার কোণ থেকে কাস্তে বঁটি নিয়ে বাঘের ঘাড়ে পড়ে। বাঘ আসলে তখন ধরেচে ওদের সেই ধাড়ি ছাগলটাকে। অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না বাঘে ছাগল ধরেচে না ছেলে ধরেচে। কাস্তে বঁটি দিয়ে বাঘের ঘাড়ে মরীয়া হয়ে নির্ঘাত ঘা কতক কোপ দিতে বাঘ সেখানেই ঘাড় কাত করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—এই হল বরো বাগদিনীর বর্ণনা।

ভিড়ের মধ্যে মুখুয্যে কাকা ছিলেন, তিনি বললেন—তোর একটুও ভয় করলো না ওর সামনে যেতে! বরো বললে—মোর কি তখন জ্ঞান ছিল, দাদাঠাকুর ? মোর আজ দুদিন জর। ওই উনি (আমার দিকে আঙুল দিয়ে) পরশু দেখে গিয়েছেন। বাঘ হ্যাকোর হ্যাকোর করে উঠলো তাও শোনলাম জরের ঘোরে, মোর ছেলে চীৎকার করে উঠলো, তাও শোনলাম। জরের ঘোরে ভাবলাম মোর ছেলেটাকে বাঘে ধরেচে, তখুনি কাস্তে-বঁটি কোণ থেকে তুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িছি—মোর তখন জ্ঞানগম্যি নেই—ছেলেকে বাঘে

খাবে আর মুই বসে ভাখবো? মোর পেরাণ যায় আর থাকে—বাঘ আসলে মোর ঐ ধাড়ি ছাগলডা ধরেচে তখন—মুই কি অন্ধকারে চকি দেখতি পাচ্ছি কিছু? মুই ভাবলাম মোর খোকারে ধরেচে—

ক্রমে ভিড় আরও বাড়তে লাগলো দেখে আসবার উপক্রম করচি এমন সুময় বোয়ো বললে—বাবু, একটা কথা। মোর কাপড় একেবারে কালা কালা হয়ে গিয়েছে বাঘের সঙ্গে হুড়যুদ্ধ করতি। এ পরে আছি কলু বাড়ীর মনো দিদির থানখানা। সকালে এটু চেয়ে এনেছে মোর ছেলে গিয়ে। মোর সে কাপড় তো রক্ত-মাখা মোনাতলায় পড়ে রয়েচে ওই দেখুন—ও আর পরা যাবে না। তা বাবু, রেশম কার্ট খানা মোরে দিয়ে একখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে ভান আপনি—এ পরের কাপড়, ওরা আজই চেয়ে নিয়ে যাবে এখন—মুছলবে বেরুতি পারবো না বস্তর বিনে—

মুখুয্যে কাকাও আমার দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন—দাও বাবাজি, ওর রেশম কার্ডখানা দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আর যাতে একখানা কাপড় ওকে আজই দিতে পারো—ওর মোটেই কাপড় নেই—যাতে হয় বাবাজি—তুমি মনে করলেই হবে—

মুখুয্যে কাকা আমার হাতদুটো ধরেন আর কি।

প্রভাতী

সেদিন কি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল নদীর তীরের কানন-ভূমিতে।

জানি, এসব কথা লেখা এত কঠিন! একটা ছত্র যদি লিখতে ভুল হয়, মনের ক্রমের সঙ্গে না মেলে, তবে সবটাই ভুল হয়ে যাবে, অস্পষ্ট হবে, অবাস্তব ঠেকবে।

তবু আমার চেষ্টা করতে হবে। সে অভিজ্ঞতার আনন্দ পরকে দিতে হবে। নিজে ভোগ করে চুপ করে বসে থাকা আমার ভালো লাগে না।

বর্ষার দিনের মেঘমেদুর আকাশ। ঠাণ্ডা দুপুরটি, অথচ বৃষ্টি হয় নি আজ তিন চারদিন। রাস্তা-ঘাট শুক্‌নো খট খট করচে। ঘন মেঘ জমে রয়েচে আকাশে, কালো মেঘে অন্ধকার জল-স্থল, বৃষ্টি এল এল, অথচ বৃষ্টি আসচে না। স্নান করতে গেলাম নদীতে, ঘরের বাইরে পা দিয়েই কি যে আনন্দ হোল মনে!

সবুজ তাজা প্রাণের প্রাচুর্য্যে ধরিত্রীর অঙ্গ ভরপুর। শ্যামল আতা, সবুজ মটরলতা, মটর-লতার মটরফল, মাকাল-লতায় অগ্রভাগে মাকালফল, বুনো যজ্ঞিডুমুর গাছের আর্দ্র গুঁড়িতে থোলো থোলো কচি ডুমুর, ঝোপে ঝোপে নাকজোয়ালের সুদৃশ্য তিন রঙা ফুল (Gladiosa superba) দুলচে সজল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে দুলচে বাঁশের কোঁড়, নদীর গৈরিক জল, ওপারের কালো মলথাগড়ার গুচ্ছ। আমি নদীজলে অবগাহন করলাম বাঁশতলার ঘাটে। স্নান করে উঠলাম সিক্ত বস্ত্রে। উঁচু পাড়, চখা বালির ঘাট, পায়ে এতটুকু কাদা লাগে না কোথাও, আবক্ষ অবগাহন করো, যতদূর যাও ততদূর চখা বালি। নম্র, নতশীর্ষ বেণুবন ঘাটের জলে

ছায়া করে থাকে খর রোদের সময়, খড়খড় শব্দ করচে তালগাছে দোদুল্যমান বাবুই পাখীর বাসা। উঁচু পাড় বেয়ে উঠতে ডানধারে এক বিরাট ঝোপ, তার মাথায় মাথায় মটরলতার ঝোপ, আঙুরলতার ঝোপ। কাবুলী আঙুর নয় অবিশ্যি, আমাদের বনে এক রকম অতি সুদৃশ্য লতা বর্ষায় গাছের মাথা বেয়ে গজিয়ে উঠে নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করে, আঙুরের মত খাঁজকাটা পাতা, আঙুরের মত থোকো থোকো ফল ধরে লতার গাঁটে গাঁটে। মটরলতাও যাকে বলচি, মটরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—ওকে বলে বড় গোয়ালে লতা, মটরের মত ছোট ছোট চমৎকার ফল গুচ্ছ গুচ্ছ দুলচে লতাগ্রভাগে, সবুজ কচি পত্রসম্ভার বুনো যজ্ঞিডুমুর গাছের তলায় নিবিড়তার সৃষ্টি করেচে।

আমি ভালবাসি এ ধরনের সম্পূর্ণ বন্য গাছঝোপ দেখতে, নইলে বিহারে চাকুলিয়া মিলিটারী ক্যাম্পের লোহার বেড়ায় দেখেচি পটপটিলতার ফুল—সে আমায় ভাল লাগেনি, কেননা তার পাশেই রয়েচে ট্যাঙ্ক, মোটর, ট্রাক্টর প্রভৃতি জিনিস—যার পাশেই অদূরে রয়েছে বম্বার প্লেনের সারি। এখানে সে সবের বালাই নেই। নিভৃত লতাবিতান ও কাননভূমি ও পল্লীনদীর শান্ত তীর, মানুষের উগ্রলোভ ও অর্থোপার্জ্জনের জন্ম নিষ্ঠুর স্বৈরাচার—এর জন্যে পটভূমিকা রচনা করে নি।

তারপর যে কথা বলছিলাম।

স্নান করে ঝোপটির কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বেশ চমৎকার লাগছিল।

হঠাৎ নিজের মন সংযত করে নানাদিক থেকে মনকে কুড়িয়ে এনে চুপ করে দাঁড়ালাম। ঠিক যেন দেবদর্শনে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা জগৎ যেন দেখতে পেলাম ঝোপের মধ্যে উঁকি দিয়ে। এতক্ষণ কোথায় কি পাখি ডাকছিল সেদিকে মন দিই নি। এই সময় ঝোপের গভীর অন্তপ্রদেশ থেকে একটা পাখী শুনলাম থেকে থেকে ডাকচে—অনেকক্ষণ থেকেই ডাকচে, বহু দূর থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসচে মেঘনীল আকাশের তলা বেয়ে। মন সমস্তটা কুড়িয়ে এনে যেমন এই ঝোপের দিকে দিয়ে একমনে দাঁড়ালাম, অমনি এই সব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। অমনি ঝোপের মধ্যে উঁকি মেরে সেই অদ্ভুত, অপূর্ব জগৎটাকে দেখতে পেলাম।

সে জগৎ কি আমি বর্ণনা করতে পারি?

এত সুন্দর, এত অদ্ভুত ধরনের জগৎ এ!

যে জগতে শুধু বনকলমীর গায়ে বেগুনী ফুল ফোটে, টুকটুকে মাকাল-ফল দোলে, মটর কলের লতায় টুনটুনি পাখী বসে গান করে, বর্ষার সজল প্রভাতে যজ্ঞিডুমুরের ফল টুপ টুপ করে মাটিতে পড়ে, বনকুসুমের গন্ধ ভেসে আসে—বহুদূরের জগৎ অথচ খুব নিকটের—কিন্তু সে নিভৃত, নিরালা জগৎ অতি নিকটে থাকলেও চেনা যায় না, দেখা যায় না, দৃষ্টির অতীত, স্পর্শের অতীত কোন অনুভূতির রাজ্যে তার অবস্থান—ধরা দেয় না কিছুতেই। কি অবর্ণনীয়, গাঢ় শান্তি ও অপরূপ সৌন্দর্য্য বহন করে আনে দূর-থেকে তার মনোমোহিনী রূপ। তার

বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না, কতকগুলি প্রতীক দিয়ে তাকে এতটুকু বোঝানো যায় কি না যায়। অন্তর্মুখী মন সে জগৎকে একটু স্পর্শ করে যায় মাত্র—সে জগৎকে দেখতে গেলে মনের উদ্বোধনের নব দ্বারপথে উঁকি দিতে হয়, তবে যদি ধরা পড়ে! আরও কত কি রহস্যময় কথা শোনায় এ জগতের পত্রমর্মরে। মন কোথায় নিয়ে যায় সীমাহারা সৌন্দর্য্যের রাজ্যে, দৈনন্দিন সুখদুঃখ ও বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান যোগায়—যে-মুক্তি নিরাসক্তির অমরত্বে ঐশ্বর্য্যশালী, প্রতিদিনের পরিচিত জগতের বহু দূরে সে লোকাতীত-লোকের বাণী মাঝে মাঝে দু' একজন মানুষের কানে এসে পৌঁছায়।

কতক্ষণ অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তখনও সেই নিভৃত, গুপ্ত জগৎ আমার চোখের সামনে ঝলমল করচে মৌন আমন্ত্রণের মুখরতায়। কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল, দাঁড়ানোর উপায় নেই আমার। মনটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হলাম সে জগতের দূরাগত বংশীধ্বনির মূর্চ্ছনা থেকে।

সেদিনই আবার বাঁশতলার ঘাটে অবগাহন করতে নামলুম সন্ধ্যার আগে। বর্ষার অপরূপ মেঘমেদুর অপরাহ্ণ, পাখী তেমনিই ডাকচে, বনকলমীর ফুল তেমনি ফুটে আছে, মটর-লতা তেমনি দুলচে—কিন্তু লতা-বিতানের নিরালা ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ও-বেলার দেখা সে রহস্যময় জগৎ অন্তর্হিত হয়েচে। কিছুতেই তাকে আর খুঁজে পেলাম না।

সাহায্য

গরীবপুরের হাট হপ্তায় দুদিন। দুদিনই আসি।

গোপালনগরের বাজারে পানবিড়ি বিস্কুটের দোকান। রোজ দোকানে যা বিক্রি, হাটে এলে অনেক বেশি বিক্রি হয় তার চেয়ে; আশে পাশের ক'খানা গ্রামের হাটই করতে হয় একজে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ের গোপীনাথ বৈরাগী সাছে আর গোপালনগরের আলি নিকিরি, মধু জেলে। কিন্তু ওরা গোপালনগর ইষ্টিশান পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে, বাকিটা যেতে হবে আমাকে একলা। নিতান্ত ভীতু নই, তাই ওই বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারবো। আমি পানবিড়ি বিস্কুট বড় থলের মধ্যে পুরে বললাম—চলো। সন্ধে হয়ে গেল যে—শীতও পড়েচে আজ বড্ড—

আলি নিকিরি বললে—রও গো রও। ভবিল বেঁধে নিই—শীত পড়েচে বটে—

তারপর আমরা তিনজনে রেল রাস্তায় উঠলাম! রেল লাইনের পাশে সরু পায়ে-চলার পথ। কিন্তু আমরা সবাই যাচ্ছি একখানা স্লিপার থেকে আর একখানা স্লিপারে পা দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। গরীবপুর ইষ্টিশান ছাড়িয়ে লাইনের দুধারে মাঠ আর বন। নির্জ্জন জায়গা, লোক-জনের বসতি নেই। ছ'মাইল দূরে গোপালনগর ইষ্টিশান। এ ছ'মাইলের

মধ্যে লাইনের বাঁ পাশে কেবল একখানা চাষাগাঁ। আছে মেহেরপুর, তার আধ মাইল পরেই গোপালনগর ইষ্টিশান।

সুতরাং অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে হেঁটে এই অন্ধকারে। বেশ মজা লাগে তিনজনে গল্প করতে করতে যাচ্চি বলে।

আলি বললে কত বিক্রি হোল গো?

—সাত টাকা পাঁচ আনা।

—পানবিড়ি?

—বিস্কুটও আছে।

—আছে দু' একখানা? বড্ড খিদে পেয়েল। খ্যাতাম।

—না আলি দা। গুঁড়োগাঁড়া পড়ে আছে টিনি। সে আর তোমারে দেবো না।

গোপীনাথ বৈরাগী ঘুন্‌সি চিরুনি, কাঠের মালা বিক্রি করে। সে বললে—হাট আর সে যুতের নেই বামুন দা। এই গরীবপুরের হাটে আগে আগে পাঁচ টাকার কম হাট থেকে ফিরতাম না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েচে দুই তিন—আজ ন'সিকে। এতে মুনকা কি পাই আর পেট চালাই কি দিয়ে। সাড়ে তিন টাকা সরষে তেলের সের। পয়সা জোট্‌চে আলি ভাই—

আলি বললে—কি আর জোট্‌লাম? মনসুর বনগাঁর বাজারে বসে, একডালা খয়রা আর একডালা পুবে চিংড়ি—রোজ সতেরো টাকা আঠারো টাকা মুনফা—আমার সেই জায়গায় সাত আট—বড্ড জোর নয়।

—উঃ রে মুনকা!

—বড্ড হোল?

—আমরা তো ধারণা কত্তি পারিনে—

—পারবা কি করে। ঘুন্‌সি কাঠের মালা ক'জন লোকে কেনবে? ও না হলিও লোকের চলে যাবে। কিন্তু মাছ না খেলি মুখে ভাত ওঠবে কি দিয়ে সেটা বোঝো। এই শীতি মাছ না খেলে মানুষ বাঁচে?

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম—চুপ চুপ ওই শোনো—

সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে চারিপাশে। সামনে একটা রেলের ছোট সাঁকো। তার দুদিকে জলাভূমি, জলার ধারে জঙ্গল, বেজায় ঘন। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটু দূরে কেউ ডাকচে। ক'দিন ধরে আমাদের এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব হয়েচে। প্রায়ই এ গ্রাম ও গ্রামে গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। সামনে পড়লে মানুষকে কি আর ছাড়ে?

আলি সভয়ে বলল—কোথায়?

—রেলের পুলের ধারে জঙ্গলে—

—দাঁড়াও সব।

গোপেশ্বর এগিয়ে এসে বললে—চলো চলো, ও কিছু নয়—এতগুলো লোককে বাঘ ধরচে না—চলো—

বাঘের জলা পার হয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। মধু জেলে ছেলেমানুষ, তার ভয় হয়েছে। সে বললে—রায় কাকাবাবু, মোরে মাঝখানে করে ন্যাও—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—নে, আচ্‌কান! বিশ বছরের ধাড়ির ভয় ভাখো—শীত-কালে কি বছর বাঘ আসে, জানো না?

মধু বললে—না, পায়ে পড়ি মোরে এটু মাঝখানে ন্যান্—মোর গা ভোল দিয়ে উঠেচে—এই দেখুন হয় না হয়—

—এত ভয় তোর? হাট কত্তি আসিস কেন? মার আঁচল ধরে বসে থাক গে।

কথাটা বললে আলি নিকিরি।

মধুকে মাঝেই নেওয়া হোলো সবার কথায়।

মধুর ভয় তখনো যায় নি। বললে—রাত্তিরি ছ'টা পয়সা বাঁচাবার জন্যি এল-গাড়ীতি না গিয়ে হেঁটে এ্যালেন সবাই কিন্তু ভাল কাজ করলেন না। আজ মঙ্গলবার অমাবস্তে—সেবার মুই আলেয়া ভূত দেখেলাম চাতরাবাগির বিলি—

আলি বললে—বিলির জলে?

—না গো। বিলির জলের ধারে? জ্বলচে নিভচে জ্বলচে নিবচে—

গোপেশ্বর বললে—থাকগে। রাত্তির কালে ওই সব—রাম, রাম, রাম, রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেচি: এ দলের মধ্যে সাহসী আলি নিকিরি, তারপরেই আমি; ভূতটুতের ধার ধারিনে। মধু ছেলেমানুষ, ওর না হয় ভয় হওয়া সম্ভব—কিন্তু গোপেশ্বর বোষ্টম আধবুড়ো লোক, ওরও ভয়! হাসি পায় বৈকি।

এর পরে নানারকম ভূতের গল্প উঠলো! জলার মধ্যে নক্ষত্র জ্বলচে, কাশবনে শেয়াল ডাকচে! শ্যাম-লতার সাদা ফুল অন্ধকারে দেখা যাচ্চে ঝোপে ঝোপে, মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্চে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে পায়ের তলায় ঘাসবনে।

আলি নিকিরি মাছের ব্যবসার গল্প করচে। এবার ও পাঁচপোতার বিল জমা নেবে, আশিখানা কোমড়ে আছে। এক এক কোমড়ে দু মণ মাছ হবে। গোপেশ্বর জিগ্যেস করলে—কোমড় যে পেতেছিল, সে মাছ তোলে নি তা থেকে?

আলি বললে—কি করে ধরতি পারবে? অত জলে আর কচুরিপানার দামে বোঝাই বিলির মধ্যি মাছ! অত সোজা না মাছ ধরা!

গোপালনগর ইষ্টিশান এল, ওরা রেলের বেড়া টপকে অন্য রাস্তায় চলে গেল। আমি এবার একা। ইষ্টিশান ছাড়িয়ে দুধারে জঙ্গল বড্ড ঘন। আমার ভয়-ডর নেই, অত বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একাই যাচ্ছি, নানারকম অপদেবতার গল্প শুনেও। রায়পুরের রাস্তাটা যেখানে রেল লাইনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেখানটাতে জঙ্গল বড্ড ঘন।

হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ওটা কি জঙ্গলের মধ্যে সাদা-মত। নড়চে। একটা ভুবহুও কানে গেল। সর্বনাশ। এখন উপায়? আমার গলা কাঠ হয়ে গেল। হাত-পা যেন জমে স্থির বরফ হয়ে গিয়েচে।

কানে গেল কে যেন ক্ষীণ দুর্বল স্বরে কি বলচে। আমার শরীর দিয়ে যেন ঘাম বেরিয়ে গেল। এ তো মানুষের গলা। ভূতে শুনেচি, নাকি সুরে কথা কয়।

ঝোপের দিকে এগিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখি একটা কালোমত বুড়ো লোক ময়লা নেকড়া-চোকড়া জড়িয়ে বসে আছে একটা কুঁচঝোপের নিচে। ভয়ের সুরে চিঁ চিঁ করে বললে—মোরে খাতি দাও। না খেয়ে মরে গেলাম।

—এখানে কি করে এলে? বাড়ী কোথায়?

—মোরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েল গোপালনগর ইষ্টিশানে। হাঁটতি হাঁটতি এয়েলাম। না খেয়ে মলাম। এট্টু অন্ন দাও। বাঁচবো না—মোরে বাঁচাও—তুমি মোর ধম্মের বাপ—

—গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলে কেন? টিকিট করো নি?

—গায়ে 'মায়ের দয়া' হয়েছে! হাঁটতি পারিনে। সারা অঙ্গে ব্যথা। মোরে বাঁচাও—

অন্ধকারে ভালো দেখতে পাইনে। তাইতো, ওর সারা গায়ে বসন্ত বেরিয়েচে! নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। আর এই শীতে, এই নির্জন রেল রাস্তার ঝোপের মধ্যে···আমার সারা গা শিউরে উঠলো। কিন্তু কি উপায় করি আমি একা?

—বিস্কুট খাবা?

আমার থলেতে বিস্কুট আছে। তখন আমি নিকিরিকে মিথ্যে কথা বলেছি। রোজ রোজ বিনি পয়সায় পরকে বিস্কুট খাওয়াতে গেলে চলে না। ও কি কখনো বিনি পয়সায় মাছ খাওয়ায় আমাকে? থলেতে খান কুড়ি বিস্কুট ছিল, থলে ঝেড়ে ওর নেকড়াতে ফেলে দিলাম দূর থেকে। একটা বিড়ি ও একটা দেশালাইয়ের খোলে দুটি মাত্র কাঠি পুরে ওর নেকড়াতে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম—খাও—

বিড়ি ধরাবার সময় দেশালাইয়ের কাঠি ও অতি কষ্টে জ্বাললে। ওর হাত কাঁপচে। দেশালাইয়ের কাঠির আগুনে দেখলাম ওর মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্ছে বসন্তের ঘায়ে! বলতে নেই, মা শীতলা, রক্ষে করুন।

—এট্টু জল দাও মোরে—জল তেষ্টায় মলাম—

মুশকিল! জল পাই কোথায়? জলের পাত্র বা কোথায় এখানে। রাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধ ক্রোশ দূর। সেখান থেকে জল আনতে হবে।

যদি না আমি ও তেষ্টায় মরে যাবে। চলে গেলাম সেই অন্ধকারের মধ্যে রাইপুর। কুমোর বাড়ী থেকে একটা কলসী কিনে পাঁচু তরফদারের টিউব-কল থেকে জল পুরে আবার নিয়ে আসি রেল রাস্তার ধারে। ওর কাছে কলসী এনে এনে দেখি সে ক্ষীণ সুরে কাতরাচ্ছে জল খাবার জন্যে কিছু আমা হয়নি, ভুল হয়ে গিয়েছে। কলসীটা ওর পাশে বসিয়ে বললাম

—কলসীর কানায় হাত দিয়ে জল খাও।

থলে থেকে আরও গোটাকতক বিড়ি বার করে একটা দেশালাই সমেত কলসীর পাশে রেখে আমি যখন যেতে উদ্যত হয়েছি, লোকটা বললে—যাচ্চ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কনে যাবা?

—বাড়ী যাবো আর কোথায় যাবো?

—মুই দুটো ভাত খাবো—

আমি রাগ করে বললাম—কোথায় পাবো ভাত? রাত ন'টার গাড়ী চলে গিয়েচে, বাঘের ভয়, আমি বাড়ী যাবো কি করে? এখনো একক্রোশ পথ। আমি চললাম—

—শোনো, ওগো শোনো—মোর কাছে বসবা না?

—আমার কাজকর্ম নেই তো, বসি তোমার কাছে এখন! কি ঝকমারি যে আজ আমি করিচি! এর পর থেকে আর কোন্ শালা—

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললে—মোর বড্ড শীত লেগেচে—

বিবেচনা করে দেখলাম তা লাগতে পারে। আমারই হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে কনকনে উত্তুরে কলাই-ওড়ানো হাওয়ায়। আগুন করে দিই শুকনো ডালপালা দিয়ে ওর কাছ থেকে একটু দূরে। এবার চলে যাবো, ওর কোনো কথা এবার শুনবো না। ও কিন্তু আবার গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললে—মোর কাছে একটু বসবা না?

ওর চোখে অসহায় মিনতি।

না, বাড়ী যেতে পারলাম না।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই সেই হিম-পড়া কনকনে রাতে বাড়ী ফেরার কথা ভুলেই গেলাম। বসে রইলাম সারা রাত সেই আগুনের কাছে। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর রাতেই লোকটা মারা গিয়েছিল, তা আমি জানিনে—তখনো আমি আগুনের পাশে ঘুমুচ্চি।

গিরিবালা

দেশের বাড়ীতে অনেক দিন ছিলাম না। গ্রামের অন্ত পাড়ার লোকদের ভালো ভাবে চিনিনে বা জানিনে।

সেবার মাঘমাসের দিন, বাজার থেকে ফিরচি এমন সময় একটি সাদা থান-পরা বিধবা স্ত্রীলোক বিনীত সুরে বললে—একটু দাঁড়ান বাবা—

পরে সে সাষ্টাঙ্গে আমাকে প্রণাম করলে।

এরকম ভাবে প্রণাম পেতে আমি অভ্যস্ত নই। সঙ্কুচিত ভাবে বললাম—এসো মা এসো। কল্যাণ হোক

—ও বেলা কি বাড়ী থাকবেন ?

—হ্যাঁ, কেন বল তো ?

—আমি একবার যাবো এখন আপনার কাছে।

—বেশ।

মনে ভাবতে ভাবতে এলাম, মেয়েটিকে আমি অনেকদিন আগে যেন কোথায় দেখেছি। তখন ওর একরকম বিধবার বেশ ছিল না। তা ছাড়া এখন ওর বয়েসও হয়েছে।

বিকেলবেলা যখন মেয়েটি আমার বাড়ী এল, তখন ওকে ভালো করে চিনলাম। এ দেখচি সেই গিরিবালা। এর যৌবনবয়সে আমি একে অনেকবার দেখেছি, তখন এর বেশভূষা ছিল অন্যরকম। বাজারে যাবার আসবার পথে একে রূপের ঝলক ছুটিয়ে হেলেদুলে চলতে দেখেছি। তখন এর পরনে ছিল লালপেড়ে শাড়ী, বাহুতে অনন্ত, হাতে বালা, কানে মাকড়ি, গলায় হার, কোমরে রূপোর গোট্। অনেকদিনের কথা, তখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম ওর নাম গিরিবালা, চরিত্রের পবিত্রতার জন্যে বিখ্যাত নয়। সেই থেকে ওকে দেখলে পাশ কাটিয়ে বরাবর চলে গিয়েছি।

গিরিবালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম।

এখন ওর বয়েস হয়েছে, যৌবনে কি রকম ছিল আমার মনে হয় না, তবে এখন ওকে দেখে মনে হয় না কোনোদিন ওর যৌবন ছিল। তবে রংটা এখনো বেশ ফর্সা আছে, চোখ-দুটি এখনো সুন্দর।

মনে ভাবছিলাম গিরিবালার কি দরকার আমার কাছে। আমি তো কোনোদিন ওর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। আমাকে কি করেই বা ও চিনলে। আমাকে এ গ্রামে অনেকেই চেনে না, কারণ বহুদিন অনুপস্থিতির পরে আবার দেশে ফিরেচি। ছেলেবেলায় যারা আমায় চিনতো, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বেঁচে নেই। গিরিবালা যদিও সেই সময়ের মানুষ, কিন্তু ও আমাকে জানতো না বা চিনতো না সে সময়।

ওর বসবার জন্যে পিঁড়ি পেতে দিয়ে আমার স্ত্রী চলে গেলেন।

আমি বললাম -তোমার নাম গিরিবালা না ?

—হ্যাঁ বাবা—

—তুমি আমাকে চেন ?

—আপনাকে এ দেশে কে বা না চেনে ?

—সেকথা বলচিনে, তুমি আগে আমাকে দেখেছিলে ?

—দেখেছিলাম বাবা। তখন তোমার বাবা-মা আছেন। তুমি ইস্কুলে পড়তে যেতে;

—বেশ। বোসো।

কিছুক্ষণ গিরিবালা বসেই রইল চুপ করে। আমি ভাবচি, কেন গিরিবালা এখানে এসেচে। ভেবে কিছুই পাইনে। একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

গিরিবালা বেশীক্ষণ কিন্তু আমায় অস্বস্তি ভোগ করতে দিলে না। হঠাৎ সে বেশ গম্ভীর-

তাকে জিজ্ঞেস করলে—বাবা, ব্রহ্ম কি ?

তার নম্র ভাব ও আগ্রহের সুরে মনে হোল জিজ্ঞাসু শিষ্য যেন পরমজ্ঞানী গুরুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শুনতে চাইচে।

আমার হাসি পেল। প্রথমটা কিন্তু চমকে উঠেছিলাম।

তা পরিবেশটি মন্দ নয়। আমার সামনে কালকের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। যুদ্ধের খবর পড়চি। জিনিসপত্রের দাম-দস্তুর ক্রমেই বাড়চে। রাশিয়া হেরে যাচ্চে, হিট্‌লারের দুর্ধর্ষ বাহিনী লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। চা খাচ্চি। তামাক খাবো একটু পরেই। আর ভাবচি, কাল ডাকঘর থেকে কিছু টাকা না তুললে হাট বাজার হবে না।

এমন সময় সাবেকদিনের কুচরিত্রা স্ত্রীলোক গিরিবালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করচে কি ? না, ব্রহ্মের কথা। তাই না হয় বাপু জিগ্যেস কর দেশের খবর, আজকালকার খবর। যেমন গদাই পাড়ুই আমাকে মাছ দিতে এসে জিজ্ঞেস করে—দাদাঠাকুর, যুদ্ধির খবরটা কি ?

মনে মনে চটে যাই। সে খবরে তোর কি দরকার ? জার্মানি কোথায়, হিট্‌লার কে, জানিস্ এসব ? ,,ইউরোপের ইতিহাস পড়েচিস ? তবে যুদ্ধের খবরের তুই বাপু কি বুঝবি ?

গদাই পাড়ুই তবু পদে ছিল। যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করা এমন কিছু আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। সে আজকাল সবাই করে থাকে। কিন্তু এ বলে কি ? আর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করবার উপযুক্ত গুরুও কি সে খুঁজে খুঁজে বার করেচে !

প্রশ্নটা চাপা দেবার জন্তে বললাম—তুমি আজকাল থাকো কোথায় ?

গিরিবালা বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে বললে—বাবা, আজকাল আশ্রম করেচি বাজারের পেছনে। গোয়ালাপাড়ার মুড়োয় যে বটগাছ, ওরই উত্তর গায়ে।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠচে ক্রমশঃ। গিরিবালা আশ্রম করেচে! এত কথা আমি কি করেই বা জানবো। না জানি ভালো করে ওর পূর্ব্ব ইতিহাস, না জানি ওর বর্ত্তমান জীবনের কোনো খবর।

কথাবার্ত্তা চালু রাখবার জন্তে বললাম—বটে। বেশ, বেশ। একদিন তোমার আশ্রমে যাবো।

গিরিবালা হাতজোড় করে বললে—সে সৌভাগ্যি কি আমার হবে বাবা!

—না না, সে কি কথা। কতদিন আশ্রম করেচ ?

—তা বাবা বৃন্দাবন থেকে যে বছর ফিরলাম, সে বছরই। শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবন থেকে ফিরলাম, কার্ত্তিক মাসে আশ্রম পিতিষ্ঠে করলাম।

তাহোলে বৃন্দাবনেও গিয়েচে গিরিবালা। না, আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়। ব্যাপার জটিল হয়ে উঠেচে। বললাম—বৃন্দাবনেও গিয়েছিলে ?

—পাপমুখে আর কি করে বলি ?

—আর কোথায় গিয়েচে ?

—কোথাও আর যাওয়ার দরকার হয় নি। ওখানেই তিনি আমার কৃপা করেচেন।

আর অনর্থক তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে কি করবো ? যা কাজ তা হয়ে গেল। তিনি আমায় দয়া করে সব দিয়েচেন।

তিনি মানে ভগবান ? না, এ দেখচি খুবই জটিল ব্যাপার। থৈ পাওয়া যাচ্চে না। গিরিবালা প্রবর্তকের ধারেও নেই, একেবারে কৃপাসিদ্ধ। এর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় কই!

বললাম—ও!

—আমায় তিনি বললেন, আমাকে তোর পূজা করতে হবে না। তুই যে আমার মা। আমি তোর ছেলে।

—বটে!

আমার চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম হয়েচে। আর না, একে এবার তাড়াতে হবে। আর কোনো কথা চলবে না।

বললাম—আচ্ছা, গিরিবালা, আর একদিন শুনবো এখন একটু ব্যস্ত আছি আজ।

কিন্তু গিরিবালাকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সে হাতজোড় করে বললে—আমার কথাটা ?

—কি ?

— ব্রহ্ম কি ?

—ওসব কথার আমি জবাব দিতে পারবো না। তুমি ওপাড়ার গোসাঁই ঠাকুরের কাছে যাও বরং—

—না বাবাঠাকুর, আপনি বলুন।

—তুমি ভুল করেচ গিরিবালা, আমি বইয়ের ব্যবসা করে খাই। ব্রহ্ম-ট্রহ্মের খবর রাখিনে—

—আচ্ছা বাবাঠাকুর, আর একদিন আমি আসবো। আজ ফাঁকি দিলেন, কিন্তু সেদিন ফাঁকি দেবেন না যেন।

আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গিরিবালা বিদায় নিল।

আমার স্ত্রী জিগ্যেস করলেন—ও কে গো ?

— ওর নাম গিরিবালা এইটুকু জানি। আর জানি যে ওকে তিনি নাকি কৃপা করেচেন।

—তিনি কে ?

—তিনি আর চিনলে না—তিনি মানে তিনি। ভগবান, গড্, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম।

—আহা হা, ঢং!

বলে স্ত্রী বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। আমি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের ফটিক চক্কত্তির কাছে গেলাম। ফটিক চক্কত্তির এখন বয়েস হয়েচে, এক সময় যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির অনুষ্ঠান করার ফলে এখন ভগ্নস্বাস্থ্য, হাঁপানি রোগগ্রস্ত

বললাম—ফটিক কাকা, গিরিবালাকে চেন ?

—এসো বাবা, বসো। কোন্ গিরিবালা? ও মায়ের অনেক লোক ছিল। কার কথা বলচো?

—এই যে গিরিবালা আশ্রম করেচে গোয়ালপাড়ায়, পথে ঘাটে বেড়াতে দেখি।

—ওঃ, বুঝলাম। ওকে আর জানিনে?

—ওকে জানতে?

—জানতে মানে? জানতে মানে? হুঁঃ, জানতে! বলে—

—যাক, যাক, সে সব কথা যাক গে। বলি ও কি রকম লোক ছিল?

—তা ভালো লোক ছিল। অনেক ফুর্তি করিচি ওর সঙ্গে। ওর চেহারা ভারি সুন্দর ছিল। যেমন নাচতে পারতো তেমনি গাইতে পারতো। একবার নন্দ পাল, যতীন দত্ত আর শশী আচাযি—তিন জনে দোলের দিন ওর ঘরে সে ফুর্তি কি! ও মদ খেয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচ কি! কালাপেড়ে শাড়ী পরে ঘুঙুর পায়ে—তারপরে ইদিকে—

—গিরিবালা মদ খেতো?

ফটিক চক্কত্তি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললে—নাঃ, তোমায় দিয়ে বাবাজি কাজ চললো না। গিরিবালা মদ খেতো মানে? গিরিবালা মদ খেতো মানে কি? গিরিবালা মদের পিপের জন্মো দিয়েচে বলো। তুমি বাবাজি এ সবের কি বোঝো। কেন, গিরিবালার খবর নিচ্চ কেন বলো তো? ব্যাপার কি?

—এই জন্যে নিচ্চি যে সে কাল আমার কাছে এসেছিল—

—তোমার কাছে এসেছিল? কেন তোমার কাছে—তার এখন আর—তোমার কাছে বাবাজি, এখন তার বয়েস কত?

—না কাকা, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে এখন আর সে গিরিবালা নেই, সে এসেছিল আমার কাছে ব্রহ্মের কথা জানতে।

—কার কথা জানতে?

—ব্রহ্মের কথা।

—সে কে?

—ব্রহ্ম মানে ভগবান, মানে—

—থাক বুঝেছি, থাক বাবাজি। আবার তোমার সামনে যা-তা বেফাঁস বলে ফেলবো বাবাজি—

—আপনি জানেন না, সে আশ্রম করেচে। তিনি তাকে কৃপা করেচেন। তিনি তাকে মা বলে ডেকেছেন—

ফটিক চক্কত্তি বিস্ময়ের সুরে বললে—তিনি কে?

—ওই দেখুন আবার আপনাকেও—তিনি মানে, যাকগে—ইয়ে, আমি এখন যাই। আপনার মেজাজ এখন ভাল নেই দেখচি।

—ভালো কি করে হবে বাবাজি? যে কথা তুমি সকালবেলা শোনালে তাতে মেজাজ

ভালো রাখবার উপায় কি বলো? গিরিবালা নাকি আশ্রম করেচে। গিরিবালা নাকি—

—আচ্ছা তাহলে এখন আসি ফটিক কাকা। আমার একটু কাজ আছে। বসুন।

শশী আচার্য্যির নাম পেলাম ফটিক কাকার মুখে। শশী স্থানীয় কালীমন্দিরের পূজারী, এখন বয়েস হয়েচে। চোখে ভাল দেখতে পান না। তাঁকে গিরিবালার নাম করতে তিনি বললেন—গিরিবালা ডাকসাইটে ইয়ে ছিল। সে সব কথা আর তোমার কাছে বলবো না বাবা। হাঁ জানি, সে আশ্রম করেচে, সন্নিসিনি হয়েচে, ওই যে বলে বুড়ো বেশ্যা তপস্বিনী তাই—

গিরিবালার পূর্ব্ব ইতিহাস ভালো ভাবেই জানা হয়ে গেল।

সুতরাং সে যখন পুনরায় আমার বাড়ী সেদিন এল, তখন আমি বেশ কৌতুহলের দৃষ্টি নিয়েই ওকে দেখলাম।

বৈকাল বেলা। আমি চা খেয়ে একটু বেড়াতে যাবো ভাবছিলাম। গিরিবালা বললে—বাবা, একটু পড়ে আমায় শোনাবেন? আমি একখানা বই এনেচি।

—কি বই দেখি?

—আপনার বাড়ীতেই বইখানা থাক। মাঝে মাঝে এসে শুনে যাবো। বড় ভালো বই বাবা। তা আমি তো লেখাপড়া জানিনে—

বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখলাম। বইখানা অত্যন্ত পুরনো, নাম "সাধনতত্ত্ব ও জীবমুক্তি"। লেখকের নাম শ্রীমৎ ওঙ্কারানন্দ সরস্বতী, প্রাপ্তিস্থান সাধন আশ্রম, গ্রাম সারাড়িতলা, জেলা পুরুলিয়া, মানভূম। এসব ধরনের বইয়ের ওপর আমার কোনো কালে শ্রদ্ধা নেই, তবুও গিরিবালার মনস্তুষ্টির জন্যে পাতার পর পাতা অত্যন্ত কঠিন সেকেলে বাংলায় লেখা সেই তত্ত্ব আমাকে গড় গড় করে পড়ে যেতে হোল।

গিরিবালা মাঝে মাঝে হয়তো প্রশ্ন করে—হ্যাঁ বাবা, তাহোলে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্কটা কি বলচে?

আমি আবার আগের পাতা থেকে পড়ে যাই। যা বুঝতে পারি ওকে বুঝিয়ে বলি। প্রত্যেক পাতা শেষ হওয়ার পর ভাবি এইবার কি একটা ছুতো করে উঠে পড়া যায়।

ঘণ্টাখানেক এভাবেই কেটে যাওয়ার পরে গ্রামের দু'জন লোক হঠাৎ এসে পড়াতে ধর্ম্মালোচনার আসর ভেঙে গেল। গিরিবালা যাবার সময় বইখানা আমার কাছে রেখে গেল। আবার একদিন খুব শীগগির হয় ও আসবে 'সাধন তত্ত্ব' শুনতে। আমার স্ত্রী বললেন—ও তোমার কাছে রোজ রোজ আসে কেন? ও আপদকে রোজ রোজ আসতে দিও না।

—তুমি জানো না। গিরিবালা আগে যেমনই থাক, এখন এর পরিবর্তন এসেচে বলেই মনে হয়।

—তা হোক গে। ও সব লোক কখনো ভালো হয় না। দরকার কি ওর এখানে আসবার?

এবার কিন্তু গিরিবালা যখন এল, তখন সকলের আগে আমার স্ত্রীকে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। অনেকক্ষণ ধরে কি সব গল্পগুজব করলে। তারপর বাইরে এসে আমার সামনে বসলো। তাকে 'সাধন তত্ত্ব' পড়ে শোনাতে হোল ঝাড়া দু'ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে চা খেতে গেলে গৃহিণী বললেন—গিরিবালা কি চলে গেল?

—না। বাইরে বসে আছে, সাধনতত্ত্ব শুনবে।

—যাবার সময় যেন এবেলা এখানে খেয়ে যায়।

—কেন, হঠাৎ তার ওপরে এত প্রসন্ন?

—জানো না, সে এক গাদা ফুলবড়ি নিয়ে এসেচে। তিনখানা আমসত্ত্ব আর অনেকখানি আমের আচার। আমি বললাম আমি নেবো না। এ তুমি নিয়ে যাও। সে আমার হাতে ধরে জোর করে দিয়ে বললে—এ নিতেই হবে। ব্রাহ্মণের সেবার জন্ত এনিচি, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কি ব'লে?—ওকে এ বেলা খাইয়ে দিতে হবে।

—বেশ। বলচি আমি।

গিরিবালাকে গিয়ে বলতে সে ভারি খুশি হোল। এক গাল হেসে বললে—মায়ের হাতে রান্না পেসাদ পাবো—এ কি আমার কম ভাগ্যি? বৃন্দাবনে একবার—

—ভালো কথা, বৃন্দাবনে তোমার কি হয়েছিল সেদিন বলছিলে?

গিরিবালার মুখে হঠাৎ যেন ভক্তি ও দীনতার ভাব ফুটে উঠলো। হাত জোড় করে বললে—ঠাকুর যদি কৃপা করেন, তবে মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে পারেন—

—নিশ্চয়ই।

—আমি তবে বলি শুনুন, আমি কত সামান্ত মানুষ আপনি তা জানেন। বৃন্দাবনে গিয়ে গুপীনাথের ঘেরা বলে জায়গায় আমাদের গাঁয়ের রসিক পরামাণিকের বাসায় উঠলাম। গাঁয়ের রসিক পরামাণিক সেখানে অনেকদিন থেকে কাপড়ের ব্যবসা করচে জানেন তো? রসিকের দিদি বড় ভালো লোক। আমার তো বৃন্দাবনে গিয়ে কি রকম হোল, দু'চারদিন মন্দির আর ঠাকুর দেখে দেখে বেড়াই? একদিন একেবারে অজ্ঞান।

—অজ্ঞান?

—বাবাঠাকুর, একেবারে ভাবের ঘোরে অজ্ঞান।

—বল কি? ভাব-সমাধি?

—তাই বলেন বাবাঠাকুর। দশ বারো দিন একেবারে দিনরাত জ্ঞান ছিল না আমার। নাওয়া-খাওয়া করতে পারতাম না। না খেয়ে মরতে হোত যদি রসিকের দিদি না থাকতো। কি সেবাটাই করেছিল পনেরো কুড়ি দিন।

—এই যে বললে দশ বারো দিন?

—দশ বারো দিন তো একেবারে অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান হোল বটে, কিন্তু ঘোর কাটে না। উঠতে পারিনে, হাঁটতে পারিনে।

—ফিটের ব্যামো ছিল না তো আগে?

—মা বাবাঠাকুর, শুনুন বলি আশ্চয্যি কাণ্ড। সেই অবস্থায় একদিন রসিকের ঝিঁঝি সন্ধেবেলা আমাকে সঙ্গে করে কাছে এক ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে গিয়েচে। ফিরে আসচি, পায়ে কিসের একটা ঠোকর লেগে হোঁচট খেলাম। একখানা ছোট্ট পাথর, মাটিতে অর্দ্ধেক পোঁতা। মাটি একটুখানি খুঁড়ে হাতে তুলে দেখি বাবা, পাথরের গোপাল মূর্ত্তি। বাবা বলবো কি—আমার সারা গা যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম আমি তো মহাপাপী, আমার ওপর তাঁর এ অহৈতুক কিরপা কেন? আমি তো কিছু করি নি তাঁর জন্যি?

গিরিবালার চোখ ছলছল করে এল। নাঃ, ফটিক কাকা যা-ই বলুন, এর সত্যিই অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে। 'পরম মোহান্তী' হওয়ার পথে উঠেচে দেখচি গিরিবালা। হরিদাস ঠাকুর আর লক্ষহীরার উপাখ্যান চোখের সামনে পুনরায় অভিনীত হতে চলেচে নাকি?

ফটিক কাকার কথা আর শুনচিনে।

বলনাম—তারপর?

—তারপর বাবা সেই পাথরের বিগ্রহ আমার কাছে তো এসে ঠেলে উঠল। আঁকড়ে আমায় রইল কি বাবা, কোথাও যেতে চায় না! আমারও বাবা সেই যে বলেচে চৈতন্য চরিতামৃতে—নিজেরে পালক ভাবে, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান—আমারও হোল তাই। খাওয়া-নাওয়া চুলোয় গেল। গোপাল আমার কি খাবে, গোপাল আমার কি নেবে, এখনো তাই। সেই গোপাল ঘাড়ে চেপে আছে, আর নামতে চায় না। এখানে আমার আশ্রমে তাকেই তো পিরতিষ্ঠে করে তাকে নিয়েই আছি।

—বল কি?

—কি বলবো বাবা, পূজো করতে দেয় না। বলে, তুমি যে আমার মা। মা হয়ে ছেলেকে পূজো করতে আছে! হাত চেপে ধরে। স্বপ্ন দিইছিল রাত্তিরি। ওর জন্যি ভাত রাঁধতে হবে। আর কোন দেবদেবী আমি জানিনে বাবা ঠাকুর। গোপালই আমার সব। গোপালই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর কিছু মানিনে।

গিরিবালা অবাকই করেচে আমাকে। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারিনে।

ও খেয়ে-দেয়ে সেদিন চলে গেল। আমার স্ত্রী খুব যত্ন করেই খাওয়ালেন ওকে। যাবার সময় ও বার বার বলে গেল—সামনের পূর্ণিমার দিন বাবা আমার আশ্রমে ঠিক যাবেন। দেবেন পায়ের ধুলো! বিকেলের দিকি যাবেন।

গেলাম ওর আশ্রমে পূর্ণিমার দিন বিকেলে। ওদের গ্রামের গোয়ালপাড়ার পেছনে খামারকালনা বলে সেকালের গ্রাম। সে গ্রাম এখন জনশূন্য। বড় বড় ভিটে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। দিনমানে বাঘ বেরোয় খামারকালনায়, বরাবর শুনে এসেছি। সেই খামার-কালনার নির্জ্জন বনের প্রান্তে এক প্রাচীন বটতলায় চারখানা খড়ের ঘর। বটের মোটা মোটা ঝুরি নেমে এসেচে চালা ঘরের মটকায়। সন্ধ্যামালতী ফুল ফুটেচে আশ্রমের আঙিনায়। বনে জঙ্গলে পাখীর দল কিচির মিচির করচে। ঘন বিকেলের ছায়া দেখে মনে হয় রোদ বুঝি এদিকের ত্রিসীমানায় কোনদিন ছিল না।

অনেক মেয়ে-পুরুষ দেখলাম ওর আশ্রমে। উঠোনের মাটিতে বটগাছের ছায়ায় বসে তামাক খাচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা পটল আর লাল ডাঁটা কুটচে রাশীকৃত। আধমণটাক লাল মোটা আউশ চাল ধুচ্চে দুজন মেয়েতে। আজ নাকি ওরা সবাই এখানে খাবে। প্রতি পূর্ণিমাতেই নাকি এমন হয়। গিরিবালা আমায় পূর্ণিমার দিন আসতে বলেছিল কেন, এখন বুঝলাম।

সন্ধ্যার আগে খোল বাজিয়ে কীর্ত্তন শুরু করলে পুরুষেরা। আরো বরাহুত অনেক পথ-চলতি লোক এসে জুটলো। জঙ্গলের দূর প্রান্তে গাছের ওপরকায় আকাশ জ্যোৎস্নায় সাদা দেখাচ্ছিল। এরা সবাই আশপাশের গ্রামের চাষী, গোপ, কাপালী প্রভৃতি শ্রেণীর নরনারী। সবাই মিলে বেশ আমোদ করচে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। রাত্রে ওরাই রাঁধলে, বড় বড় আওট কলার পাতা পেতে আউশ চালের ভাত আর লাল ডাঁটার চচ্চড়ি সোনা-হেন মুখ করে খেল! যে যখন আসে, আগে দেখি গিরিবালাকে সাষ্টাঙ্গে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে দুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দেয়।

আমি অবিশ্যি ওর ওখানে মচ্ছবের প্রসাদ পাইনি। গিরিবালা আমায় খুব যত্ন করে বসালো দাওয়ায়। আমি বললাম— না, আমি গাছতলায় বসি, বেশ লাগচে তোমার এই জায়গাটা, এত বন আছে খামারকালনায় আমার জানা ছিল না।

আমায় বললে—একটু কিছু সেবা না করে যেতে পারবেন না বাবা।

—ভাত আমি খাবো না।

—না বাবা, আউশ চালের মোটা ভাত আপনাদের খেতে দেব কি বলে? ও ওরা খাবে গিয়ে।

—এত চাল ডাল পেলে কোথায়? খুব খরচ হয় তোমার দেখচি।

—কিছু না বাবা। ওরাই সব আনে। নিজেরাই রাঁধে, আমোদ করে খেয়ে যায়। ওরা বড্ড ভালবাসে আমাকে। সবই গোপালের ইচ্ছা।

ওর সে বিগ্রহ আমি দেখলাম। খুব ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। ছোট একটি পাথরের পুতুলের মত। সে ঘরে সবারই অবারিত দ্বার। চাষীরা পাকা কলা, বাতাবি লেবু, শশা প্রভৃতি ফল নিয়ে এসেচে, গোপালের বেদীর আশেপাশে সেগুলো জমা আছে। সন্ধ্যার সময় ধূপধুনো দেওয়া হয়েচে। ছোট একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জলচে ঘরে।

গিরিবালা আমায় বাতাবি লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে, শশা কেটে কলার পাতায় সাজিয়ে নিয়ে এসে দিলে। মিষ্টির মধ্যে আখের গুড়। গোটাকতক ছোলা ভিজে ওই সঙ্গে। ওর আশ্রমের আবেষ্টনীতে বসে সেই পূর্ণিমার প্রথম প্রহর রাত্রে বেশ লাগল খেতে।

গিরিবালার মুখে কিছু ভালো কথা শুনবার জন্যে ওরা এসেচে। গিরিবালা বোধহয় প্রতি পূর্ণিমাতেই ওদের কিছু কিছু কিছু ভাল কথা শোনায়। যারা এসেচে, তারা দেখি কেবলই বলতে লাগলো, মা, আজ দু'কথা বলবেন না? সন্দে উতরে গিয়েচে, এবার বলুন মা—

গিরিবালা সঙ্কুচিত হতে লাগলো আমার সামনে।

—বাবাঠাকুর বরং কিছু বলুন ওদের। আপনি থাকতি আমি আবার কি শোনাব ?

—সে কি কথা ? আমি তো ধর্মকথায় আচায্যি নিজেকে বলিনি কোনোদিন। রাজনীতির কথা শুনতে চাও শোনাতে পারি। উড়ো জাহাজ কি করে হোল তার কথা বলতে পারি। কিন্তু তত্ত্ব কথা! বাপরে!

গিরিবালা সলজ্জ মুখে বলে—বাবার যেমন কথা! আমিই বা কি কথা বলি। আমি বলি, তাঁর ওপর' ভক্তি রাখো সব হবে। লোকে এসে বিরক্ত করে, আমার গরুর বাছুর হচ্চে না, আমার স্ত্রীর সন্তান হচ্চে না, বেগুনের ক্ষেত থেকে বেগুন চুরি যাচ্চে, গাঁয়ে গরুর মশা-পশ্চিমের মড়ক লেগেচে, অমুকের বৌয়ের সন্তান হয়ে বাঁচে না—এসব আমার কাছে নালিশ। বিহিত করে দাও মা।

—তবে তো খুব দায়িত্ব তোমার—

—বাবা, ওরা কোথায় যাবে বলুন ? সংসারে ধরে কাকে ? কার ওপর নির্ভর করে ? একটা কিছু চাই তো। আমাকেই এসে মা বলে ধরে। আমাকেই সব ধকল সইতে হয়। আমার কি খ্যামতা বল, গোপাল ভালো করবেন। গোপালের প্রসাদী ফুল নিয়ে যাও—যা হয় গোপাল করবেন, তাঁর দয়া। বুঝলেনা বাবা ?

—কাজ হয় ?

—হয় বৈ কি বাবা। লাগে তুক্, না লাগে তাক্। ঝাড়ে ঢিল মারলে কোনো বাঁশে লাগবেই। ওরা সংসারী মানুষ, ওদের বুঝুতে হবে সংসারের ভেতর দিতেই।—আপনাকে আলো ধরে পৌঁছে দিয়ে আসুক বাবা—

—না, না, আমি বেশ যাবো এখন, সবে তো সন্দে—

—না বাবা, সন্দের সময় এখানে বাঘ বেরোয়। আপনি যান, সঙ্গে লোক দিচ্চি বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসুক গিয়ে—

বড় রাস্তায় যে লোকটা আমায় আলো ধরে এগিয়ে দিতে এল, ওর দেখি বড় ভক্তি। আমায় বললে—মা একেবারে সাক্ষাৎ—হেঁ হেঁ উনিই—সব উনিই—

ভক্তিভরে হাত কপালে ঠেকিয়ে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

বললাম—খুব ক্ষমতা নাকি ?

—উনিই সাক্ষাৎ—উনিই সব। যা বলবেন তাই হবে। ছেলে হবে বলি ছেলে হবে, মেয়ে হবে বলি মেয়েই হবে। বিষ্টি হচ্চে না, কলাই মুগ বুঝতে পারচিনে, জমি ভাঙতে পারচিনে—মাকে গিয়ে ধরলেই হোল—

—বলো কি ? বাক্‌সিদ্ধ নাকি ?

—কি বললেন বাবু বুঝতে পারলাম না—

—না ঠিক আছে। তারপর ?

—তারপর লোকের বিপদে আপদে সব উনি। ওনারে ছাড়া যোরা জানিনে। ছুটে ছুটে আসচি ওঁর কাছে। না,রা করেন।

লোকটি আমাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললে—দেন একটু চরণের ধুলো ঠাকুর মশাই। আমরা মুকখু সুকখু গরীব মানুষ, কি বুঝি বলুন। অনেক কিছু বলে ফেললাম অপরাধ নেবেন না। যাই, মা এসময় দু'একটা ভালো কথা আমাদের শোনান—

—কি কথা!

—ভালো কথা! ভেনার—ভগবানের কথা। আমাদের ওসব কথা কে বলচে বলুন। চাষা লোক সারাদিন ভুঁই চাষ ক্ষেত-খামার নিয়েই থাকি। মায়ের ছিরিমুখ থেকে ছাড়া আর পাচ্চি কোথায় বলুন—কে মোদের শোনাচ্চে!

ও চলে গেল।

এতক্ষণে বেশ চাঁদ দেখা যাচ্ছে ফাঁকে। খামারকালনায় বড্ড জঙ্গল। ঝিঁঝিঁ পোকা আর মুগরো পোকা ডাকচে বনে ঝোপে।

গিরিবালাকে অন্য চোখে দেখলাম এতক্ষণ পরে। ওর ঠিক স্থানটি কোথায় বুঝতে পেরেচি। ওর সম্বন্ধে আমার যে বিদ্রূপভরা মনোভাব ছিল তা এখন নেই।

গঙ্গা নদী সব জায়গায় নেই, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে শাখা নদী, খাল, সোঁতা সমস্ত দেশের সব লোকের কাছে পৌঁছে দেয় জীবনদায়িনী বারিধারা। গিরিবালা বড় নদীর একটি ক্ষুদ্র সোঁতা ছোট্ট অজ চাষীদের গ্রামে জল বিতরণ করে বেড়াচ্চে, তা যতই হোক, তবু সেটা জলই, তাতে স্নান করে, জল পান করে লোক তৃপ্ত হয়। নইলে এই সব গরীব লোক বাঁচে কিসে?

ফটিক চক্কত্তির কথা আর শুনচিনে।

এর পরে আমি গিরিবালাকে অনেকবার দেখেচি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি, যেখানে সংকীর্তন হচ্চে কিংবা ভাগবত পাঠ হচ্চে কিংবা কথকতা হচ্চে সেখানেই ও সকলের সামনের সারিতে চুপটি করে বসে আছে এবং হাঁ করে শুনচে। খালের জল আগে হয়তো ঘোলা ছিল, এখন ক্রমে ফর্সা হয়ে আসচে।

চিঠি

আজই সকালে যে এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটবে, এমন দিনটি যে নির্দিষ্ট ছিল এমন এক আশ্চর্য্য কাজের জন্য—তা যখন ঘুম ভেঙে উঠেচি তখনও জানি কি?

আজই বিশেষ করে বলচি একজন্যে যে, আজ আমাদের দিল্লী যাওয়ার দিনটি নির্দিষ্ট ছিল। দিল্লীতে জওহরলালজী পৌরোহিত্য করবেন আমাদের এক সভায়।

সমস্ত জগতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়েছেন দিল্লীর মহাসম্মেলনে, আমিও সেখানে যাবো, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছি, সবাই মিলে মিশে একত্র যাবো। মনে খুব উৎসাহ এবং নীরব আনন্দ।

এক বন্ধুর চিঠি কাল পেয়েছি, তিনি আমার সঙ্গে যাবেন সস্ত্রীক ; আমি যেন কলকাতায় গিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

গ্রামেই থাকি। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আমার প্রয়োজন হয় পল্লী-প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ, ছায়াভরা লতাবিতান। সেখান থেকে ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্র দিল্লীতে যাবো। পথে পড়বে কাশী এলাহাবাদ কানপুর—ভারতবর্ষের ইতিহাসের কত সুপ্রসিদ্ধ কর্মভূমি। ঐতিহাসিক দিগন্তের কত বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল এদের পুণ্যভূমিতে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি। বনে বনে সাটা-কাঁটার ফুলের শিষ উঁচু হয়ে আছে, ফুর ফুর করছে সুবাস শরতের বাতাসে। এবার বর্ষা বেশি। রোজ লেগেই আছে বৃষ্টি। রাস্তা ঘাটের কাদা শুকুতে চায় না।

ভাবছি এখানে প্রত্যাসন্ন শরতের অপূর্ব্ব শ্যাম শোভা ছেড়ে দিল্লীর ঊষর রুক্ষ প্রান্তরে যাবো বটে, কিন্তু কি পাবো সেখানে? জওহরলালের সঙ্গে হয়তো পরিচয় হবে ; রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এক টেবিলে চা-পানের সৌভাগ্য হয়তো হয়ে যাবে। মনে মনে যে এসব নেই সে কথা অস্বীকার করলে মিথ্যে কথা বলা হবে।

হরিপদ বাঁড়ুয্যে এসে বললে—ভায়া, দিল্লী যাচ্ছ না কি শুনচি?

—যাবো ভাবছি!

—কবে যাবে?

—কাল সকালে।

—তারা খরচপত্র দেবে তো?

—না তারা কেন দেবে?

—বলো কি, সব খরচ তোমাদের করতে হবে? নইলে ভাবছিলাম তোমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে না হয় যাবো তোমাদের সঙ্গে। ভাড়াটা লাগতো না।

—রিজার্ভ গাড়ীতে গেলেও ভাড়া লাগে দাদা। হরিপদ বাঁড়ুয্যে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললে—কেন? ভাড়া তো তোমাদের জমা দেওয়াই আছে।

—আছে তো বটেই, কিন্তু যারা সে ভাড়াটা দিয়েছে তারাই যাবে সে গাড়ীতে তোমাদের নেবে কেন?

—তুমি যদি নেও?

—ভাড়া দিতেই হবে। বিনা ভাড়ায় যাওয়া চলে না।

—তবে আর রিজার্ভ মানে কি হোল!

হরিপদ বাঁড়ুয্যে অপ্রসন্ন মুখে তামাক খেতে লাগলেন। রিজার্ভ গাড়ী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটু অদ্ভুত রকমের সন্দেহ নেই। ভাবছি যে ওঁর ভ্রান্ত ধারণায় একটু সংশোধন করে দেওয়া দরকার।

এমন সময় গহর সিদ্দুন এসে বললে—বাঁড়ুয্যে মশাই বাড়ী আছেন?

গফুর পিয়ন বড় ভালো লোক। আমাদের এখানে গফুর অনেকদিন আছে, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা ওর। বাড়ীতে ডেকে ওকে জল-খাবার খাওয়ায়। কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, আমের সময় আম, তালের বড়ার সময় ঝোলা গুড় আর তালের বড়া। বললাম—গফুর কি পাকিস্তানে চলে যাবে?

—হ্যাঁ বাবু, আমাকে যশোরে বদলি করেচে।

—সত্যি গফুর, তুমি পাকিস্তানে গেলে আমাদের সকলেরই মনে বড় দুঃখ হবে।

গফুর বিনীত হাস্যে বললে—বাবু, আমারও মনডা কি ভাল থাকবে? আপনাদের এখানে যে রকম কাটিয়ে গেলাম, এমন সোনার চোখে আমাকে অপর জায়গায় কি দেখবে?

—সকলেই দেখবে। যে ভালো হয় তাকে সকলেই ভালো বলে, বুঝলে না গফুর।

গফুর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললে—বাবুর আজ মোটে একখানা।

গফুর চিঠি দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, আমি বললাম—যাবার আগে একটু দেখা করে জল মুখে দিয়ে যেও। সামান্য একটু মিষ্টিমুখ—

গফুর হেসে চলে গেল।

তারপর চিঠিখানার দিকে চেয়ে বিস্মিত হলাম। কাঁচা মেয়েলি হাতে লেখায় চিঠিখানা লেখা—পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণকমলেষু—

কে চিঠি লিখেছে? খামখানা এত ময়লা আর পুরোনো আর অদ্ভুত রকমের! এ আবার কি রকমের খাম—আজকালকার খামের মত নয়।

কোনো ভক্ত পাঠিকার চিঠি নাকি?

খুলেই ফেলা যাক।

আশ্চর্য্য! এ কার চিঠি!

চিঠিখানা এই:—

শ্রীচরণের দাসিকে কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? অনেক দিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই। আমরা কি অপরাধ করিয়াছি কি জানি। আপনি খড়িবেড়েতে নারান মুখুজ্যের ভাইপোর বিয়েতে বরযাত্রি আসিয়াছিলেন ভরত দাদার মুখে শুনিলাম। কিন্তু এ দাসিকে দর্শন দিতে আসিলেন না কেন, ইহার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আপনি রাগ করিলে দাসির আর কে আছে বলুন? সেই ফুলশয্যার রাতের দিন আমাকে আম খাওয়ানোর জন্যে আপনার কি জেদ। আমি আম খাইনি কেন জানেন, তাহা বলিব। বিয়ের দরুণ ভালো চেলি পরণে ছিল জানো গো মশাই। তাই যদি নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য আম খাইনি। অমনি মশায়ের রাগ হোল, কি রাগ সারা রাত্তির। জানো এখন আমার সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। না, এসব লিখিব না তুমি আবার রাগ করিবে। এতদিন এখানে আসিলে না কেন? আমার ওপর রাগ করিও না। তুমি এমন নির্দয়, আমার ওপর মায়া হইল না! যাই হউক, তোমার ওপর জোর আছে বলিয়া তাই তোমাকে বার বার জ্বালাতন করিতেছি।

মা ও পিসিমা কত দুঃখিত ও চিন্তাবিত হইয়াছেন একবার আসিয়া তাঁহাদের চিন্তা দূর করিবেন। ভাবিয়া দেখুন কতদিন আপনাকে দেখি নাই, না দেখিয়া আমার মনটার মধ্যে কি রকম হইতেছে। তুই সেই গান গাহিয়াছিলে, বিভাদিদি গান গাহিয়াছিল, সেই সব কথা মনে পড়ে আর বুক যেন ফাটিয়া যায়। ওগো তুমি আমাকে আর দুঃখ দিও না একবার শ্রীচরণ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। ওগো, তুমি এবার আসিলে আমি কত গান শুনাবো বিভাদিদির কাছে ও কর কাকাদের বাড়ীর সেজ-বৌয়ের কাছে কত গান শিখিয়াছি। শুনবে তো? এসেছে হৃদয়ের হাসি অরুণ অধরে। সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা তরণি বেয়ে চলো নাহি বেলা। সুখ যদি না পাও যাও সুখেরি সন্ধানে। কিছু নাহি চাবো গো আমি তোমার বিহনে। তোমাতে করিব বাস দীর্ঘ দিবস মাস। এই সব গান শিখিয়াছি। তুমি এলে চিলের কোঠায় দুপুরে দু'জনে বসিয়া গাহিয়া শুনাবো। রাণি দিদি ঠাট্টা করে বলিয়া আমার গান গাহিতে লজ্জা করে। যাহোক, এবার ঠিক গান গাহিয়া শোনাবো। আমায় আর কষ্ট দিও না, ওগো অত নিদয় হয়ে দাসিরে চরণে ঠেলিও না। আমার প্রণাম নিও। ইতি তোমার শ্রীচরণের দাসি —

নিরুপমা

তাং ২২ ফাল্গুন, ১৩২৪ সন।

ফুলবেড়িয়া। জেলা নদীয়া।

ভাল বুঝতে পারলাম না। বানান ভুল, ভাষা ভুল, ছেদচিহ্নহীন এ চিঠিখানা কার? নিরুপমা? কে নিরুপমা?

পত্রখানি মনে এক অপূর্ব ভাব এনে দিল। কতদিন আগেকার বিস্মৃত প্রথম যৌবনের সুবাসভরা দিনগুলির বাতাসে মেশানো ছিল যে পিককুলের রসিকতা, নব বসন্তের পত্রশোভা, দায়িত্বহীন জীবনের নিশ্চিন্ত আরাম, মোহমদির দিগন্ত, অপরূপ মাধুরী এতকাল পরে আবার ফিরিয়ে আনল চিঠিখানা।

তবুও বুঝতে পারলাম না কার এ চিঠি। গত ২৪ সালের চিঠি এল ৫৪ সালের ডাকে। আচ্ছা এও কি সম্ভব? আমার এতকাল আগেকার পরলোকগত স্ত্রী নিরুপমার চিঠি এল আজ ত্রিশ বছর পরে?

এতকাল এ চিঠি কোথায় ছিল? কোন্ ডাকঘরের কোন্ আলমারির অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করে ছিল সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর? আমার যৌবন বয়সের চিঠি এল যখন আজ আমি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত? আমার ফুলশয্যার পরে নবপরিণীতা বধূর করুণ আহ্বান-লিপিখানি ডাকঘরের কর্মচারীরা এতকাল লুকিয়ে রেখে কি রসিকতা করতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে!

এই চিঠি আসছিল গত ত্রিশ বছর ধরে। কত ঘটনা ঘটে গেল এই ত্রিশ বছরে, আমার জীবনের কত উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। কত শোক, দুঃখ প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়ে এই চিঠিখানা আসছিল।

ত্রিশ বছর পরে এ চিঠি পেয়ে লাভ কি আমার ?

চমৎকার শরৎ দুপুরটিতে শুধু বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম চিঠিখানা হাতে করে। দূর আকাশের কোণে যেন বেলগুচ্ছ গ্রামটিতে আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ীর চিলেকোঠার ঘরে আমার প্রথম পরিণয়ের নববধূ আজও যেন আমার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে। চতুর্দশ বর্ষীয়া দেশে অবস্থিতা সেই সুন্দরী বধূটির মুখ এতকাল একেবারেই মনে ছিল না— আজ হঠাৎ অতি আশ্চর্যারূপে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকে বললে—পিয়ন এল দেখলাম, কার চিঠি এল গো ? অমন করে বসে আছ কেন ?

চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিয়ে বলি—পিয়ন ? কই চিঠি কিছু আসে নি। ও বই দিতে নিয়ে এসেছিল।

নিরুপমা মারা গিয়েছে আজ কত বছর ? আটাশ উনত্রিশ বছর খুব হবে। বিয়ের পর কতদিন বেঁচে ছিল বা ? বছরখানেক কি দেড় বছর হবে।

মড়িঘাটের মেলা

আমাদের গ্রাম্য নদীর ধারে মড়িঘাটা বলে ছোট্ট একটা গ্রাম। ক'ঘর বুনোর বাস। এ জেলায় যখন নীলকুঠীর আমল ছিল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকুঠীর সাহেবরা টমটম্ হাঁকিয়ে চলে যেত নদীর পাশের চওড়া ছায়াচ্ছন্ন পথ বেয়ে, তখন শ্রমিকের কাজ করবার জন্যে সাঁওতাল পরগণা থেকে যে সব লোক আমদানী করা হয়েছিল, তাদেরি বর্ত্তমান বংশধরগণ এখন একেবারে ভাষায়, ধর্মে আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে পড়েচে—এদেশে তাদের বলে 'বুনো'। সমাজের নিম্নস্তরের শেষ ধাপে এদের স্থান। লোকের কাঠ কেটে, ধান মেড়ে দিনমজুরি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিন খাটুনির পরে তাড়ি খায়। এই তাড়ি খাওয়ার জন্যেই এরা ঘৃণিত হয় পল্লীসমাজে। পল্লীগ্রামে হিন্দু বা মুসলমান চাষীমহলে মদ কেউ ছোঁয় না। ওটা ভদ্রলোকেদের একচেটে ব্যাপার।

মড়িঘাটা নদীপথে চার ক্রোশ আমাদের ঘাট থেকে।

সেবার মাঘীপূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যাচ্ছে কেউ নবদ্বীপে কেউ গৌরনগরের ঘাটে। উভয় স্থানই বহু দূর আমাদের গ্রাম থেকে। যাদের নিজেদের গরুর গাড়ী আছে, তারা আগের রাত্রে গাড়ী চড়ে চলে গিয়েছে আঠারো উনিশ মাইল দূরবর্তী গৌরনগরের গঙ্গাতীরের দিকে। অপেক্ষাকৃত সাহসী ও চালাক চতুর যাত্রীরা যাবে ট্রেনে উঠে নবদ্বীপ।

রাখা দুধ দিতে এসে বললে—বাবু, গঙ্গাচানে গ্যালেন না ?

—যে ভিড়! মেয়েদের নিয়ে অতদূরে যাওয়া—

—তবে মড়িঘাটা যান বাবু নৌকা করে। কত লোক যাচ্ছে।

—সেখানে গঙ্গা কোথায় ? মড়িঘাটায় গিয়ে কি হবে ?

—না বাবু, সেখানে আজ গঙ্গা আসেন।

—কে বললে?

—সেখানে এক বুনো সাধু আছে, তাকে মা স্বপ্ন দিয়েছেন। আজ দুবার হোল মাঘী-পূর্ণিমের দিন গঙ্গা সেখানে আসবেন। মা বলেছেন, গরীব দুঃখী লোক, যারা নবদ্বীপে বা গৌরনগরে পয়সা খরচ করে যেতি পারে না—তাদের উদ্ধার করবার জন্যি ঐ মড়িঘাটাতে তিনি আসবেন একদিনের জন্যি। সব গরীব দুঃখী লোক সেখানে যায় আজ দু'বছর ধরে। মস্ত মেলা বসে। যান না আপনি!

কথাটা লাগলো ভালো। গঙ্গাস্নানে উদ্ধার হবার বাসনা যত থাক না থাক, অনেক লোক যেখানে এসে জোটে পুণ্য অর্জনের আশায়, সে স্থানের অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য্য।

অক্রুর মাঝির নৌকো ভাড়া করে সবাই মিলে রওনা হই মড়িঘাটার দিকে। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে চলেচে মেলা দেখতে। যেখানে মাঠে ফুল পেকেচে সেখানেই তারা নৌকো লাগাবে ডাঙায়, হৈ হৈ করে ফুল পাড়তে ছুটবে, ছোলাক্ষেতে ঘুঘু মারবার চেষ্টা করবে গুলতি ছুঁড়ে, ছোলার ফল তুলবে। প্রথম বসন্তে মাঠে মাঠে ঘেঁটুফুল, বড় বড় শিমুল গাছে শিমুল ফুলের মেলা, কোকিল ডাকচে, জলপিপি চরচে শেওলার দামে, বাতাসে ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ আর শুকনো কশাড়ঝোপের গন্ধ ভেসে আসচে।

মড়িঘাটা পৌঁছুতে বেলা বারোটা বেজে গেল।

দূর থেকে একটা কোলাহল কানে গেল। বহুলোকের সমাগম হয়েছে বটে। আমাদের নৌকো ভিড়লো একটা প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায় সেখানে আমাদের মত অমন কত নৌকো ভিড়েচে। বটতলায় কত লোক রান্না করে খাচ্ছে। মেয়েদের ভিড় বটতলার ওপাশের ঘাটে—সেখানে সবাই স্নান করচে, গঙ্গা নাকি মাত্র সেই জায়গাটুকুতেই আসবার অঙ্গীকার করেছিলেন সেই বুনো সাধুর কাছে। সুতরাং সেখানেই ভিড় করেচে স্নানার্থীরা, তার এক হাত এদিকেও নয়, এক ফুট ওদিকেও নয়।

অক্রুর মাঝি বললে—মেয়েদের নিয়ে এপারের ভিড়ে কষ্ট হবে। চলুন ওপারে। ওপারে সেই বুনো সাধুর আখড়া। আপনি সেলি জায়গা দেবে। ওই দেখা যাচ্ছে তেনার আখড়া। ওপারে রান্না করে খাওয়ার জায়গা হবে খন। নইলে এপারে কনে বা কাঠ কনে বা উনুন—

মেয়েরা বললেন, আগে তাঁরা মেলা বেড়িয়ে দেখবেন।

মেলা বেড়াতে গেলেন মেয়েরা। আমিও সঙ্গে আছি। তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরির দোকান, খেল্‌নার দোকান, ঘুন্‌সি ফিতে চিরুনির দোকান, চায়ের দোকান। ভিড় বেশী লেগেছে তেলেভাজা খাবারের দোকানে আর তার চেয়েও ভিড় চায়ের দোকানে।

পাড়াগাঁয়ে চায়ের দোকানে ভিড় বেশী হয়। এখানে যারা এসেচে, এদের মধ্যে চা অনেকেই বাপের জন্মে খায়নি। শৌখীন জিনিস হিসেবে অনেকেই এক পেয়ালা কিনে চেখে দেখচে। বুনো, কাওরা, মালো, ডোম, বাগদি, মুসলমানদের ভিড় বেশী এ সব মেলায়। হাঁ, মুসলমানদেরও। তাদের মেয়েদের উৎসাহ কোনো অংশে কম নয়। 'গঙ্গা'স্নান তারা

বিক্রি করে না, কিন্তু মেলা দেখতে আসে ও জিনিসপত্তর কেনে।

চায়ের দোকানের ভিড়ের মধ্যে দেখি মা অনিচ্ছুক ছোট ছেলের মুখের কাছে চায়ের ভাঁড় ধরে বলচে—খেয়ে নে, অমন করবি তো—এরে বলে চা—ভারি মিষ্টি—ভাখো খেয়ে—ওষুধ—জ্বর আর হবে না—আ মোলো বা ছেলে। চার পয়সা দিয়ে কিনে এখন আমি ফেলে দেবো ক'নে? মুই তো দু ভাঁড় খালাম দেখ্‌লি নে? খা—

সরলা পল্লীবধূদের ঠকিয়ে মহকুমা শহরের ঘুঘু দোকানদার অবিনাশ যোড়ল মনিহারি জিনিস বিক্রি করচে।

—এরে বলে 'সোহাগী' সাবান! গরম জল করে মেখে ভাখো মা নিয়ে গিয়ে। ভুর ভুর করবে গায়ে গন্ধ! চুলকুনি সেরে যাবে ছেলেদের। সাড়ে ন' আনা দাম, তা তোমাদের কাছে আলাদা কথা, দুটো পয়সা কম দিও! দাও পয়সা—বাবু যে! ভালো আছেন? মাছের এনেচেন বুঝি? বেশ বেশ। প্রাতোপেন্নাম! একটা সিগারেট খান—আসুন—আচ্ছা, পেন্নাম হই—আসবেন তাহলে এর পর দয়া করে। রান্নাবান্না করবেন ওপারে? সেই ভালো—এপারে সত্তিক জাতের ভিড়—

কিন্তু কি চমৎকার লাগে এদের আমোদ, উৎসাহ, ফুর্তি! বছরে একদিন—মেলা, এমন উৎসব আসে ওদের জীবনে। আর সব দিন এরা বেগুন পোঁতে, ধান মাড়ে, কলাই মাড়ে, হলুদ শুকোয়। আজ এসেচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে মেলা বেড়াতে। খাবে না চা, কিনবে না 'সোহাগী' সাবান?

নদীর ধারে লোকেরা রেঁধে খাচ্চে। সবাই কিনচে নূতন হাঁড়ি, মাছ ও আলু। আমার বেশী ভাল লাগে দেখতে লোকে কি খায়! বেশীর ভাগ লোকে রেঁধেচে মাছের ঝোল আর ভাত। আলু ও বেগুন ফুটে দিচ্চে ঝোলে। আলু ভাতে, বেগুন ভাতে মাখচে কলাতেল দিয়ে, যাদের ভাত হয়ে গিয়েচে। কপি বিক্রি হচ্চে চড়া দামে। এ অঞ্চলে কপির চাষ নেই, ওটা সৌখীন শহরে আনাজ বলে গণ্য। কপি সবাই কেনে নি, যারা কিনেচে তারা অনেকে রেখে দিয়েচে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবে। খুব গরীব যারা তারা রাঁধচে শুধু আলু বা মানকচু ভাতে ভাত। একটি মা ও ছেলে একটা আস্ত কলার পাতে একত্রে খেতে বসেচে, মোটা লাল আউশ চালের ভাত একরাশ, তার সঙ্গে ছোট্ট এতটুকু আলু ভাতে। তার পাশেই একদল বড় বড় কই মাছ ভাজচে দেখে ছোট ছেলেটা বলচে—ভাখ্‌ মা কত বড় মাছ? কই মাছ খাবো মা—

—চুপ কর। ওদিকে তাকাতে নেই—খেয়ে নাও—লংকা খাবি? লংকা মেখে দেবো? একজন কুন্দের অবল সঁতলাচ্ছে ওপাশে।

আমাদের বেলা হয়ে যাচ্চে। মাছও কিনতাম, কিন্তু মাঝি বলে দিয়েছিল সাধুর আখড়াতে মাছ রান্না চলবে না। নৌকো নদী পার হোল। ওপারে মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর ধারে সাধুর আশ্রম, পাঁচ-ছ' খানি খড়ের ঘর, নিচু চালা, ছোট নীচু দাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিকোনো-পুঁছোনো ঘরগুলি। গোবর দিয়ে লেপা চওড়া উঠোন। উঠোনের মাঝখানে

বাতাবিলেবু গাছে থোকা থোকা সাদা ফুল ও কুঁড়ি, মন মাতানো ফুরফুরে তীব্র গন্ধ দুপুরের বাতাসে।

অনেক যাত্রী আশ্রয় নিয়েচে ঘরের দাওয়ায়, বাতাবিলেবুতলার ছায়ায়। এরা কিন্তু রাঁধেচে না। আখড়ায় আজ মচ্ছব, বড় বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্চে, সাধুর শিষ্যবর্গ মচ্ছবের প্রসাদ খাবে। আমাদের মাঝি গিয়ে আমাদের কথা বলতেই সাধু বেরিয়ে এল। বিনীত ভাবে হাত দুটি জোড় করে বললে—আসুন বাবাঠাকুর। বামুনের পায়ের ধুলো পড়লো। বড্ড ভাগ্যি আমার।

বললাম—আপনার আখড়াটি বেশ ভালো দেখছি।

—আপনাদের দয়া।

আঙুল ঊর্দ্ধদিকে তুলে বললে—আর তেনার দয়া। সে জনার দয়া। তা একটা কথা হচ্চে, এসেছেন যখন দয়া করে তখন রান্নাবান্নার যোগাড় করে দিই। মা ঠাকরুণ তো আছেন—

বললাম—অন্য কোনো যোগাড়ের দরকার নেই। সব আছে আমার সঙ্গে। আপনি শুধু রান্না করবার একটা স্থান দেখিয়ে দিন আর উনুন খুঁড়বার জন্য দয়া করে একখানা শাবল যদি থাকে তো পাঠিয়ে দিন। মাঝি উনুন খুঁড়ে দেবে এখন। ঐ মাঠে শুকনো কাঠ পাওয়া যাবে না?

সাধু হেসে বললে—ওর জন্যি কিছু ভাববেন না। পুব পোতার ঘরখানা নিকোনো পুঁছোনো আছে, ওর দাওয়ায় নতুন উনুন পাতা আছে। কেউ রাঁধেনি সে উনুনে। কিন্তু একটা কথা বাবু—

—কি?

হাত জোড় করে বললে—চাল ডাল আমি দেবো—

—না না, কেন আপনি দেবেন? আমাদের সঙ্গে সব আছে। আমাদের শুধু একটু জায়গা দেখিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

সাধু দুঃখিত হোল বুঝলাম ওর মুখ দেখে, কিন্তু আর কিছু বললে না।

একটু পরে আমরা দলবলসুদ্ধ গাঙের ধারের ঘরখানা দখল করে নিজেদের জিনিসপত্তর সেখানে আনিয়ে নিলাম নৌকো থেকে। সাধু নিজে এসে দুখানা নতুন মাদুর বিছিয়ে দিয়ে গেল দাওয়ায়, বললে—মাঠাকরুণদের জন্যে একখানা মাদুর ঘরের মধ্যে দেবো এনে?

—না, আমাদের সঙ্গে শতরঞ্চি রয়েচে।

সাধু ডাকলে—হরিদাসী, ও হরিদাসী—ইদিকে শুনে যাও—এনাদের জল তুলে এনে দাও—

একটি পাঁচশ ছাব্বিশ বছরের সুন্দর বৌ আধঘোমটা দিয়ে এসে দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে বললে—কি বাবা?

—এনাদের এখানে থাকো। যা লাগে এনে দাও। তেঁতুলতলা থেকে চালা করা শুকনো বড়ার কাঠ যত লাগে এনে দাও—মা ঠাকরুণকে শুধোও কি লাগবে।

বৌটি হাসিমুখে দাওয়ার উঠে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলে। তারপর ছুটলো কাঠ আর জল আনতে। বারবার ছুটোছুটি করে সে এটা ওটা আনতে লাগলো, কেন না শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অনেক জিনিসই আমাদের আনা হয়নি বাড়ী থেকে—যেমন, হাতা আনতে ভুল হয়েচে, জল রাখবার বালতি বা ঘড়া নেই, ডাল ঢালবার পাত্র নেই, শুকনো লঙ্কা খুঁজে পাওয়া গেল না মসলার পুঁটলিতে, ইত্যাদি। আমার স্ত্রী অপ্রতিভ মুখে আমার দিকে চেয়ে আমার ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় বললেন—বাবাঃ, যে তাড়াতাড়ি তোমার —ওতে কি সুস্থির খুলে সব জিনিস গোছানো যায়? অত হুড়বড়ানিতে মাথা গুলিয়ে যায় না?

আমি নির্বিকার ভাবে অন্যদিকে চেয়ে থাকি।

ইতিমধ্যে সাধু বাবাজি একটা বড় আড়াইসেরা পালি ভর্ত্তি মুড়কি এবং একছড়া সুপক্ক মর্ত্তমান কলা নিয়ে এসে বললে—বাবু, সেবা করুন—

—এ সব আবার কেন?

—কেন বাবু আমরা এতই অধম জাত যে আমাদের কোনো জিনিস নেবেন না?

—নিচ্ছি তো। জল নিচ্ছি, কাঠ নিচ্ছি, বাসন-কোসন নিচ্ছি—তা হোলে কি নিলাম না বলুন। খাবারদাবার কেন আবার—

—তা হোক। আমার আখড়ায় আপনাদের মত লোক কখনো আসে নি। আমি জেতে বুনো। ভেক নিয়ে বোষ্টম হইচি। তেনার দয়া। কি বুঝি বলুন? আমার নাম ছিল রামলাল বুনো। আমার বাপের নাম ছিহরি বুনো। তিনি তবলদার ছিলেন। ভদ্দর লোকের বাড়ী কাঠ কেটে সংসার নির্ব্বাহ করতেন। তেনার বয়েস হয়েছিল অনেক, এক কম একশো বছরে মারা যায়। আমার বয়েস কত বলুন দিকি বাবু?

সাধুর চেহারা বেশ ভালো লেগেছিলো আমার। খুব মোটা, জোয়ান লম্বা চেহারা। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি—অথচ অথর্ব্ব গোছের মোটা নয়, বেশ বলিষ্ঠ, কর্ম্মকুশল হাত পা। লম্বা ধরনের খুব বড় মুখখানা, মস্ত বড় বড় জলজলে চোখ দুটো, নারদ ঋষির মত এতখানি সাদা দাড়ি। মাথায় লম্বা চুল পেছন দিকে মেয়েদের মত ঝুঁটি করে বাঁধা, অথচ মুখখানিতে বালকের সারল্য ও হাসি। যাত্রাদলের মহাদেবের মত দেখতে।

বললাম—কত হবে, ষাট-বাষট্টি?

সাধু হেসে বললে—বিশ্বাস করবেন না। উনআশি বছর যাচ্চে তেনার দয়ায়—

সত্যিই আশ্চর্য্য হবার কথা। এমন মর্দ্দ জোয়ান পুরুষটিকে আশি বছরের বুড়ো কোনো ক্রমেই ভাবা যায় না। মুখের চামড়া মসৃণ, অকুঞ্চিত, বালকের মত। একটি রেখা নেই কোথাও মুখে। অবশ্যি সেটা খানিকটা সম্ভব হয়েচে মেদবাহুল্যের দরুণ। অবাক হয়ে সাধুর দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

—বাবু, বিশ্বাস না হয় অভয়পুরের কাছারীর পুরনো কাগজ ভাখবেন। ১৩০১ সালের বন্যের সময় আমি কাছারীতে পেয়াদা ছিলাম। তখন আমার উঠ্তি বয়েস। মাটি ধরতে

পারি। পড়কি ধরতে পারি।

—তারপর ?

—তারপর এ পথে আলাম। তেনার হুকুম হোল। তা অনেকদিন ভেক নিইচি, আজ ছত্রিশ আটত্রিশ বছর হবে। বিয়েথাওয়া করি নি, এই আখড়া যেখানে ভাখচেন, এখানে জঙ্গল ছেল, কি গহিন্ জঙ্গল। বাঘ থাকতো। জঙ্গল কেটে আখড়া জমাই।

—ভাল লাগে ?

—বড্ড আনন্দে থাকি বাবু। পিঁড়িসেবকরা আসে, সন্দেবেলা জ্যোচ্ছনা ওঠে। গাঙের ধারের বড় ঘরখানা হোল ঠাকুরঘর। ওর দাওয়ায় বসে খোল কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করি। একটা কথা বাবু, পথচলতি লোক আমার আখড়ায় এলি ফিরতি পারে না। চাল দেই, ডাল দেই,—রেঁধে খাও, আমি ছোট জাত, আমাদের হাতে খাবা না ? রান্না বাড়া করো, খাও, মিটে গেল। মানুষের এট্টু সেবা, তা করবার ভাগ্যি কি আমার হবে ? তেনার দয়া। বাবু, তামাক সেবা করেন ?

—হ্যাঁ, তবে আমার কাছে বিড়ি আছে।

—তামুক সেজে আনি, বসুন।

নদীর ধারে ক্রমে বেলা পড়লো। সাধুর আশ্রমে ভিড় বেড়ে গেল খুব। মচ্ছবের কীর্ত্তন শুরু হোল বাতাবিলেবুর তলায়। সাধু সবদিকে তদারক ক'রে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে। কিন্তু একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে পায় না। এ এসে বলে, একটা ঘড়া দাও, ও এসে বলে, একটা ঘটি দাও। সাধু উঠে উঠে গিয়ে তাদের জিনিস দিয়ে আসচে। যে যা হুকুম করছে, তখুনি তামিল করচে। এতটুকু অহঙ্কার নেই, সাধুগিরির দম্ভ নেই, যেন সবারই ও চাকর। অনেক লোক আখড়ার বড় উঠানে ইতস্ততঃ রেঁধে খাচ্ছে। সবাই মচ্ছবের ভাত খাবে না বুঝলাম।

একবার হরিদাসী এসে বললে—বাবা, নামযজ্ঞ শেষ হয়েছে, কিছু মুখে দেন এবার। সকাল থেকে খাননি। সাধু বললে—আগে ওদের সকলকে পাতা ক'রে বসিয়ে দাও। আমার খাওয়ার জন্যি ব্যস্ত কেন ?

তখন বেলা পাঁচটা হবে। আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—সকাল থেকে কিছু খাননি ?

হরিদাসী বললে—বাবার ওই রকম। সন্দের আগে একবার খান। অন্যদিন সকালে পেঁপে খান, কলা খান, আজ তাও খান নি। আপনি কিছু না মুখে দিলে আমি খেতে বসবো না বাবা।

সাধু হেসে বললে—আচ্ছা যা মা। একটু গুড়জল নিয়ে আয়। মালসা ভোগ নিবেদন হয়েচে ? যা, বাবুদের জন্যি একটা ভালো দেখে মালসা নিয়ে আয় দিকি আগে। দুখানা পাটালি বেশী করে দিয়ে আনিস। বাবুদের মালসা ভোগ খেতে কোনো আপত্তি নেই তো ?

—না, আপত্তি কিসের ?

হরিদাসী চলে গেল এবং খানিক পরে একটা মাল্সা ভোগ আমাদের সামনে নিয়ে এসে রাখলে। রান্না হচ্ছিল পাশের ঢেঁকিশালের এক কোণে। হরিদাসী সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—বাবু, আপনাদের রান্না নেমে গিয়েচে। কলার পাতা কেটে আনি, জায়গা করে দিই—খেতে বসুন, বেলা নেই।—সে আবার চলে গেল।

জিগ্যেস করলাম—বৌটি কে?

—ওরা গোয়ালা! কাছেই কামদেবপুরে বাড়ী। আমাকে বড্ড ভক্তি করে। একেবারে যেন আর-জন্মের মেয়ে কি মা! ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাদের এখানে মচ্ছবের অন্নভোগ খায়। অনেকে খায়।

আমাদের খাওয়ার সময় সাধু কতবার যে এল গেল, হাতজোড় করে ঢেঁকিশালের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। খাওয়ার শেষে যখন হরিদাসী বড় একবাটি জাল দেওয়া দুধ হাতে ঢুকলো, তখন আমরা প্রতিবাদ জানালাম। দুধ কেন আবার? হরিদাসী জানালে এ দুধ তার নিজের হাতে জাল দেওয়া, খেতে কোনো আপত্তি হবার কারণ নেই।

সাধু বললে—সেবা করুন বাবু। আমি ওরে বলেছিলাম বাবুদের জন্যে দেড় সের দুধ আলাদা করে ক্ষীরের মত জাল দাও। ওঁদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

আহারাদির পর বেলা একেবারে গেল। অম্বরপুরের মাঠের বড় কুলগাছগুলোর পেছনে টক্‌টকে রাঙা সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছে। লেবুফুলের সুবাস ছায়াস্নিগ্ধ বাতাসকে মদির করে তুলেচে। শুকনো কশাড়ঝোপের গন্ধ আসচে গাঙের ধার থেকে। মেলা-ফেরত যাত্রীরা আখড়ার সামনে গরুর গাড়ীতে উঠে নিজের নিজের গ্রামে রওনা হচ্ছে। খেয়াঘাটে একখানা যাত্রীবোঝাই নৌকো এপারের দিকে আসচে। মেলা থেকে যারা বাড়ী ফিরচে তাদের কারো হাতে তেলেভাজা পাঁপরের গোছা, কারো হাতে একটা কপি, কারো হাতে নতুন বঁটি।

মাঝি আবার ওপারে গেল মেয়েদের নিয়ে। যাবার আগে অপরাহ্নের ছায়ায় আর একবার মেলা দেখতে চায় মেয়েরা। আমি গেলাম না। সাধুর সঙ্গে বসে গল্প করছি দেখে স্ত্রীও কিছু বললেন না।

সাধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক, এ বছরের মত মেলা শেষ হয়ে গেল। আবার যদি বাঁচি আসচে বছর, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আসবেন তো বাবু?

কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, একটা কথা। মড়িঘাটের এখানে গঙ্গা আসেন কে নাকি স্বপ্ন দেখেছিল? আপনি নাকি?

সাধু গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। কেমন এক অদ্ভুত ধরনের হাসি ওর দাড়ির জাল ভেদ করে ওর সারা মুখখানায় বিস্তারলাভ করলে। কি চমৎকার জ্ঞান ও কৌতুকমিশ্রিত হাসির ছবি, যেন অতি প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা কৌতুক ও করুণার হাসি হাসচেন তাঁর অবোধ নাতিটির প্রশ্ন শুনে।

বললে—স্বপ্ন-টপ্ন নয়। এখানকার গরীব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে

পারে না রাখী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই বড়িঘাটার গাঙে আসবেন বলেছেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধ করে নাইলে এখানেই গঙ্গা। তিনি নেই কোন্ জায়গায়?

সন্ধ্যা হবার আগেই সাধুর কাছে বিদায় নিয়ে যখন নৌকোয় উঠি তখন ওপারের সেই বটগাছটার পিছন থেকে মস্ত বড় চাঁদখানা উঠচে। এপারে চিক্‌চিকে চখা-বালির ঘাটে হাতজোড় করে বুনো সাধুটি দাঁড়িয়ে বলচে—মা-ঠাকরুণকে নিয়ে আবার আসবেন বাবু সামনের বছর।—ভুলে যেও না মা তোমার বুড়ো খোকাকে—দণ্ডবৎ হই মা—যদি বেঁচে থাকি, সামনের বছরে পায়ের ধুলো যেন পড়ে—।

দেখি আমার স্ত্রীর চোখে জল।

হাজারি খুঁড়ির টাকা

গ্রামের মধ্যে বাবা ছিলেন মাতব্বর।

আমাদের মস্ত বড় চণ্ডীমণ্ডপে সকালবেলা কত লোক আসতো—কেউ মামলা মেটাতে, কেউ কারো নামে নালিশ করতে, কেউ শুধু তামাক খেতে খোশগল্প করতে। হিন্দু মুসলমান দুই-ই। উৎপীড়িত লোকে আসতো আশ্রয় খুঁজতে।

আমরা বসে বসে পড়ি হীরুঠাকুরের কাছে। হীরুঠাকুর আমাদের বাড়ী থাকে খায়। পাগল মত বামুন, বড্ড বকে—আর কেবল বলবে—ও নেড়া, একটু কুলচুর নিয়ে এসো তো বাড়ীর মধ্যে থেকে। আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলতো—কুলচুর কোথায় পাবো পণ্ডিত মশাই, ঠাকমা বকে। হীরুঠাকুর বলে—যখন কেউ থাকবে না ঘরে, তখন নিয়ে আসবি।

আমাদের গোমস্তা বঙ্কিনাথ রায় কানে খাগের কলম গুঁজে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকের পশ্চিম কোণে প্রজাপত্তর নিয়ে বসে বাকিবকেয়া খাজনার হিসেব করতো। সবাই বলতো বঙ্কিনাথ কাকা লোক ভাল নয়। প্রজাদের উপর অত্যাচার-অনাচার করে, দাখিলা দিতে চায় না। বাবা এ নিয়ে বঙ্কিনাথ কাকাকে বকুনিও দিতেন মাঝে মাঝে। তবু ওর স্বভাব যায় না। বাবা কখনো প্রজাদের কিছু বলেন না। তাঁর কাছে আসতেও প্রজারা ভয় পায়। যখন আসে তখন কিছু মাপ করার জন্যে বা বঙ্কিনাথ কাকার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্যে।

তামাকের অঢেল বন্দোবস্ত আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে। কেনা তামাকে কুলোয় না, সুতরাং হিংলি কিংবা মোতিহারি গাছ তামাক হাট থেকে কিনে আনা হয়। আমাদের কৃষাণ দুলাল মুচি সেগুলো বাঁশের উপর রেখে দা দিয়ে কাটে, তারপর সেই রাশীকৃত গুঁড়ো তামাক কোতরা গুড় দিয়ে মেখে মেটে কলসী ভর্তি করে রাখা হয়। যে আসচে সেই কলসীর মধ্যে হাত পুরে এক থাবা তামাক বার করে নিচ্চে, কলকে আছে, তেরেণ্ডা কিংবা বাবলা কাঠের কয়লা আছে একরাশ, সোলা আছে বোঝা বোঝা, চকমকি পাথর আর ঠুকুনি আছে—খাও

কে কত তামাক খাবে। গ্রামের কতকগুলি লোক শুধু তামাকের খরচ বাঁচাবার জন্যেই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সকাল-বিকেল আসে—একথা আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলে।

দুপুরের বেশী দেরি নেই। হীরুঠাকুরকে আমি বললাম—পণ্ডিত মশায়, নাইতে যাবেন না?

– কেন?

—এর পর জোয়ার এলে আপনি নাইতে পারেন না তাই বলচি। নিরীহ সুরে বললাম কথাটা।

—কখন জোয়ার আসে?

—এইবার আসবে।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি—আমি জানি। বিধু বলছিল।

—না, বসে নামতা পড়ো। কড়ি-কষার আর্য্যা মুখস্থ হয়েছে বিধুর? নিয়ে এসো—বলো শুনি।

বিধু না বলতে পেরে হীরুঠাকুরের বেঁটে হাতের চটাপট চড় খায়। আমি হঠাৎ ধারাপাতের ওপরে ভয়ানক ঝুঁকে পড়ি। এমন সময়ে আমাদের হাজারি খুঁড়ি এসে বৈদ্যনাথ কাকার সামনে দাঁড়ালো।

হাজারি খুঁড়ি গোপাল ঘোষের পরিবার, ওর ছেলের নাম বলাই, আমার বয়সী, আমাদের সঙ্গে খেলা করে। গোপাল ঘোষ মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক, ওদের সংসারে বড় কষ্ট। হাজারির এক পা খোঁড়া বলে গ্রামের সকলে তাকে হাজারি খুঁড়ি বলে ডাকে। সে এর ওর বাড়ী ঝি-গিরি করে কোনো রকমে দিনপাত করে।

বৈদ্যনাথ কাকা বললে—কি?

হাজারি বললে– ট্যাকা।

—কি?

—ট্যাকা এনেলাম।

—কিসের টাকা?

—এই ট্যাকা।

হাজারি লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। বৈদ্যনাথ কাকা বাবার দিকে চেয়ে বললেন– ও অধিক!

বাবা ছিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ওদিকে বসে। যেন না এদিকে ছেলেদের নামতা পড়ার গণ্ডগোল ও বিভিন্ন প্রজা-পত্তরের কচকচি তাঁর বরদাস্ত হোত না। তিনি ওদিকে বসে নিবিষ্ট-মনে তামাক খেতে খেতে কি সব খাতার পাতা ওল্টাতেন। বৈদ্যনাথ কাকা তাঁকে ডাক দিতে তিনি খাতার পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—কি?

—গোপাল গয়লার পরিবার কি বলচে শোনো। আমি তো কিছু বুঝলাম না। টাকার

কথা কি বলচে।—যাও, বাবুর কাছে যাও।

আমরা নতুন কিছু ঘটনার সন্ধান পেয়ে ধারাপাত থেকে মুখ তুলে কান খাড়া ক'রে দু'চোখ ঠিকরে সোজা হয়ে বসলাম।

বাবা বললেন—কি হাজারি, কিসের টাকা বলছিলে?

—ট্যাকা এনেলাম।

—কিসের টাকা? তোমরা তো খাজনা কর না। গোপাল গয়লার ভিটের খাজনা মাপ ছিল।

—এজ্ঞে, সে ট্যাকা নয়—

কথা শেষ করেই হাজারি খুড়ি একখানা কালোকিষ্টি ময়লা নেকড়ার পুঁটুলি খুলে বাবার পায়ের কাছে ঢাললে—একটি রাশ রুপোর টাকা।

বাবা অবাক, বৈদ্যিনাথ কাকা অবাক, চীরু পণ্ডিত অবাক, আমাদের তো কথাই নাই। গরীব হাজারি খুড়ি একটি রাশ নগদ টাকা ঢালচে তার ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি খুলে।

বাবা বললেন—এ কিসের টাকা? এত টাকা কেন এনেচ? তুমি পেলে কোথায়?

হাজারি মুখে ঘোমটা টেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—উনি দিয়ে গিয়েছেন। আপনার ছেলে। আপনার কাছে রাখুন।

এতক্ষণে আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝলাম। হাজারি টাকাটা গচ্ছিত রাখতে এনেচে বাবার কাছে।

বাবা বললেন—টাকাটা আমার কাছে রাখবে?

—হ্যাঁ বাবা।

—কত টাকা আছে?

সে বললে—চারশো। আপনি গুনে দেখেন।

বৈদ্যিনাথ কাকা টাকা গুনে দেখলে ঠিক চারশো টাকাই আছে। বাবা বললেন—চারশো টাকা পুরোপুরি রাখতে নেই। এক টাকা কম কি এক টাকা বেশী রাখতে হয়। এক টাকা তুমি নিয়ে যাও। কোথায় এতদিন টাকা রেখেছিলে?

—ঘটির ভিতর বাবা।

—একটা কথা শোনো গয়লা-বৌ। তুমি গরীব মানুষ, টাকাটা দুই-এক টাকা করে নিও না। এতে টাকা খরচ হবে যাবে, অথচ তোমার কোন বড় কাজে আসবে না।

—বাবা, আপনি যা বলেন, তাই করবো।

হাজারি চলে গেল।

বৈদ্যিনাথ কাকে বললে দেখলে অধিক, খুকড়ির ভেতর খাসা মাল! কে জানতো যে ওর ঘরে ঘটির মধ্যে তিনশো চারশো টাকা আছে? ঝি-বৃত্তি করে সংসার চালায় এদিকে, আজকাল মানুষ চেনা দায়।

—যাও, কাজ করগে। সে কথায় তোমার দরকার কি?

এই ঘটনার পর মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। আবার আমরা বসে হীরুঠাকুরের কাছে ধারাপাত মুখস্থ করচি।

এমন সময়ে হাজারির ছেলে বলাই এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বঙ্কিনাথ কাকাকে বললে—মা মারা গিয়েচে নায়েব মশাই।

বঙ্কিনাথ কাকা চমকে উঠে হাতের কলম ফেলে বললে—তোর মা? কোথায়—কই—তা তো জানিনে—এখানে মারা গিয়েচে?

—না। মোর ভগ্নিপতির বাড়ী, কালোপুরে।

—কবে গিয়েছিল?

—তা আজ দুমাস। মুইও তো সেখানে ছেলাম।

একটু পরে বাবা এলেন বাড়ীর ভিতর থেকে। বলাই গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো বাবার সামনে। বঙ্কিনাথ কাকা বললে—শুনলে অম্বিক, হাজ্‌রি মারা গিয়েচে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ও তাই বলচে।

—বলিস কিরে বলাই, শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েচে?

—তা হয়েল।

—তা তুই কি মনে করে এলি এখন?

—সে বলবানি। এখন মেলা লোকের ভিড়। নিরিবিলি বলবানি।

বাবা স্বভাবতই ভাবলেন যে বলাই টাকার জন্য এসেচে। কিন্তু তার বদলে সে যা বললে তাতে বাবা একটু অবাক হয়েই গেলেন।

কথাটা যখন বললে তখন বঙ্কিনাথ কাকাও সেখানে ছিল।

বাবা বললেন—কি কথা বলবি বলাই?

—মোদের ঘরের চাবিটা নায়েব মশায়কে খুলে দিতে বলুন। ঘরে একটা ভাঁড়ে তিনশো ট্যাকা আছে, মা মরণকালে মোরে বলেচে।

—ভাঁড়ে?

—হ্যাঁ, একটা ভাঁড়ের মধ্যে।

—আর কোন টাকার কথা বলেচে তোর মা?

—না।

—আর কারো কাছে কোনো টাকা আছে বলে নি?

—না। বলেছে ভাঁড়ে ট্যাকা আছে।

—বেশ, তুই চাবি নিয়ে ঘর খুলে দেখগে।—বঙ্কিনাথ, ওর ঘরের চাবিটা দিয়ে দাও।

দুপুরের পর বলাই চাবি হাতে আবার আমাদের বাড়ী এসে বললে—ট্যাকা পেলাম না।

বাবা বললেন—টাকা পেলিনে ? কোথায় গেলো অতগুলো টাকা ?

—ইঁদুরে বাঁদরে নিয়ে কোথায় ফেলেচে বাবা। তখন বললাম অঘোর ঘোষের বাড়ীর দিকি বাঁশঝাড়টা কাটিয়ে দেন। ঐ বাঁশঝাড় থেকে ইঁদুর বাঁদর আসে।

—বটে।

—তা মুই যাই ?

—কোথায় যাবি ?

—মুই কালোপুরে চলে যাই। ভগ্নীপতির বাড়ী গিয়েই থাকবো। এখানে একা ঘর থেকে কেডা রাঁধবে, কেডা বাড়বে। মা মরে গেল। দুটো রাঁধা ভাতের জন্যি কার দোরে যাবো ?

— বুঝলাম। তোকে কোন নগদ টাকা দিয়েছিল তোর মা ?

—এক কুড়ি ট্যাকা দিয়ে গেছে। মোর কাছে আছে সে ট্যাকা। মুই তেলেভাজা খাবার কিনে খাই হাটে হাটে। একমুটো ট্যাকা।

—আচ্ছা তুই একবার মাসখানেক পরে আসবি! দেখি তোর মায়ের টাকার যদি কোনো সন্ধান করতে পারি। বুঝলি ?

—সে আর আপনি কোথায় সন্ধান করবা ? সে ইঁদুরে-বাঁদরে নিয়ে গিয়েচে। বাপ ভান।

—তাহলেও আসিস্ বুঝলি ?

বলাই চলে গেলে বদ্যিনাথ কাকা বললে—আরে অম্বিক, তোমাকে একটা কথা বলি। ও টাকাটা তুমি ওকে আর দিও না। দেখচো ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ? অতগুলো টাকা নাকি ইঁদুরে নিয়ে গিয়েচে। ওকে আজ টাকা দেবে, কাল ওর ভগ্নীপতি ওর হাত থেকে ভুলিয়ে টাকাগুলো নেবে। মাঝে পড়ে—ন দেবায়, ন ধর্মায়। ছেলেমানুষের হাতে অতগুলো টাকা দিতে আছে ? বিশেষ করে ওর মা মরণকালে যখন বলে যায়নি, তখন তোমার টাকার কথা কবুল করবারই বা দরকার কি ? কেউ যদি এর পরে বলে, তখন বললেই হবে ওর মা জামাইবাড়ী যাবার সময় গচ্ছিত টাকা আমার কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। খাতায় তুলিনি ও টাকা। মুখে মুখে টাকা রাখা। কে সাক্ষী আছে টাকার ?

বাবা বললেন—বদ্যিনাথ, সাক্ষী নেই বলচো। তখন চণ্ডীমণ্ডপে কত লোক ছিল জানো তো ?

—তারা জানে না কিসের টাকা। তুমি মহাজনী করো, তোমার দেনার টাকা তো হতে পারে।

—খাতায় দেনার কথা প্রমাণ করতে পারবে ?

—তা হাতচিঠি একখানা তৈরী করে ফেলি আজই। দুবছর আগের তারিখ দিই।

—পাগল। টিপসই কে দেবে ?

—মরা লোকের টিপসই বুঝে নিচ্ছে কে? কোর্টে তার টিপসই কবুল করাচ্ছে কে? আমার টিপসই যে হাজারির নয় তাই বা প্রমাণ হচ্ছে কিসে থেকে?

বদ্যিনাথ কাকা ধড়িবাজ ঘুঘু লোক। ওর পেটে বহু অন্যায় ফন্দি সর্ব্বদাই বিরাজ করছে, নদীর জলে ভেচোকো মাছের ঝাঁকের মতো। বাবা হেসে বললেন—তা হয় না বদ্যিনাথ, এ কোর্টে না-হয় গরীব বেচারা হারলো, কিন্তু উঁচু কোর্টে যে আমি হেরে যাব।

—উঁচু কোর্ট করছে কে?

—সে কোর্ট নয়—

বাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

বদ্যিনাথ কাকা আর কোনো কথা বললে না।

মাস দুই পরে বলাই এসে হাজির হোল একদিন! বাবা বললেন, ভাল আছিস বলাই?

—আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে—

—তোর টাকার সন্ধান পেয়েছি।

—পেয়েছেন?

—পেয়েছি। একটা কাজ করতে হবে তোকে। তোদের সেখানে তোদের স্বজাতির মধ্যে কোন মাতব্বর কেউ আছে?

—আছে। তেনার নাম সতীশ ঘোষ।

—আচ্ছা, সেই সতীশ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে তুই সামনের বুধবারে আসবি। টাকার সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করবো।

সেই বুধবারে বলাই আবার এল, সঙ্গে একজন আধবুড়ো লোক। গলায় ময়লা চাদর, পায়ে চটি জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো পায়ে। সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু ওর। বাবা তখন পাড়ায় কোথায় বেরিয়েচেন। আমি আর আমার মাসতুতো ভাই বিধু গাছের কচি ডাব পাড়াচ্চি।

বলাই বললে—এই সতীশ ঘোষকে এনেচি। তোমার বাবা কনে?

সতীশ ঘোষ বললে, প্রাতঃপেনাম। আমাকে আপনার বাবা ডেকেচেন কেন জানেন কিছু? আমি তো তাঁকে চিনিনে। কখনো দেখিনি। ব্রাহ্মণ দেবতা, ডেকেচেন তাই এলাম।

—আমি তো কিছু জানিনে। বাবা আসুন। আপনি তামাক খাবেন?

—হাঁ বাবা, খাই। তামাক টিকে কোথায় আমি সেজে নিচ্ছি।

আমি ঠাকুরমাকে গিয়ে বলতেই তিনি বললেন—তোমার বাবা বাড়ী নেই। ভিন্ গাঁ থেকে লোক এলে যত্ন করতে হয়। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর এখন কি তাকে জলপান পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সতীশ ঘোষ বললে জিভ কেটে—সে কি কথা? ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁর বাড়ী এসে আমি আগে তাঁদের পায়ের ধুলো না নিয়ে জল খাবো কেমন কথা? মা ঠাকরোণ কই?

আমি তাকে ঠাকুরমার কাছে নিয়ে গেলাম। সতীশ গড় হয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করে জোড়হাতে বললে – আমার উপর কি হুকুম হয়েছে আপনার ? আমি তো আপনাদের চিনিনে — তবে মনে ভাবলাম, ব্রাহ্মণ দেবতা যখন হুকুম করেচেন—

মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখি সতীশ ঘোষ আমাদের ভেতর-বাড়ীর রোয়াকে বসে কাঠা-খানেক চিঁড়ে-মুড়কি আর আধখানা ঝুনো নারকেল ধ্বংস করচে।

ঠাকুরমাকে একটু মিষ্টি কথা বললে আর রক্ষা নেই। কত প্রজা যে বিপদে পড়ে এসে ঠাকুরমার মনস্তুষ্টি করে শক্ত শক্ত বিপদ পার হয়ে গিয়েচে তার ঠিক নেই। ঠাকুরমার মন অতি সহজেই মিষ্টি কথায় গলে। এদিকে বাবা অত্যন্ত মাতৃভক্ত। ঠাকুরমা যা বলবেন, তাই বেদবাক্য বাবার কাছে। ঠাকুরমা কেবল ভুলবেন না আমাদের কথায়। হাজার মিষ্টি কথা বলে নিয়ে এসো দিকি একটু তেঁতুলছড়া, কি একটু কাসুন্দি, কি এক থাবা কুলচুর! উঁহু, আসল কাজে ঠিক আছে ঠাকুরমা। .তার বেলা—এই নব্‌নে, ভাঁড়ার ঘরের তাকের দিকে ঘন ঘন আনাগোনা করা হচ্চে কেন ? খবরদার, ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠে পা দেবে না বলে দিচ্চি—

একটু পরে বাবা এলেন। সতীশ ঘোষকে দেখে বললেন—এ কে ?– না, না—তুমি খাও —খাও—উঠতে হবে না। খেয়ে নাও আগে—

ঠাকুরমা বললেন—তুমি খাও বাবা, আমি বলচি। এ হোল সতীশ ঘোষ। হাজারির ছেলে বলাই সঙ্গে করে এনেচে কালোপুর থেকে।

—ও বুঝলাম। আচ্ছা, বেলা হয়েচে, আমি চান্ করে আহ্নিক করে নিই। আহারাদির পর কথাবার্ত্তা হবে। তুমিও গঙ্গায় চান করে এসো। দিব্যি ঘাট, চখা বালি, কোনো অসুবিধে হবে না।

সতীশ ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপে খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ঠাকুরমা বললেন—এতটা পথ হেঁটে এসেচ বাবা, একটু জিরিয়ে নাও খেয়েদেয়ে।

বিকেলে বাবা সতীশ ঘোষকে বললেন সব কথা। সতীশ অবাক হয়ে বললে—কত টাকা বললেন ?

—চার শো টাকা।

—তা আমায় ডাক দেলেন কেন ?

—তার মানে ওর হাতে টাকা দিতে চাইনে। ও ছেলেমানুষ, যেমন ওর হাতে টাকা পড়বে, অমনি ওর ভগ্নীপতি শরৎ ঘোষ ওর হাতে থাবা দিয়ে সমস্ত টাকা কেড়ে নেবে। তাকে আমি চিনি, অভাবগ্রস্ত লোক। ও বেচারী মায়ের ধনে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। তার চেয়ে আমি তোমার হাতে টাকাটা দিই, তুমি রেখে দাও আপাততঃ, ওকে জানানোর দরকার নেই। জানালে বিরক্ত করে মারবে টাকার জন্যে, আজ দাও দুটাকা, কাল দাও পাঁচটাকা—ওর সেই ভগ্নীপতি প্ররোচনা দেবে, যা গিয়ে টাকা নিয়ে আয়। বুঝলে না ? তুমি টাকাটা রেখে দাও, বলাই সাবালক হোলে সমস্ত টাকাটা ওর হাতে দিয়ে দেবে। তারপর সে যা হয় করুক

গে। এখন তুমি আমি ভগবানের কাছে দায়ী আছি নাবালকের টাকার জন্যে। নাবালকের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আমার এবং তোমার।

সতীশ হাতজোড় করে বললে—দেখুন দিকি, এই জন্যিই তো বলি ব্রাহ্মণ দেবতা। সাধে কি আর বলি। তা আপনি আমাকে ডাকলেন কেন? আমাকে কেন জড়ান? আপনার কাছেই তো—

—না। বলাই যদি এ গাঁয়ে বাস করতো, তবে টাকা আমিই রাখতাম। ওরা আমার প্রজা, ভিটের খাজনা নিইনে, তবে ব্যাগার দিতে হয় আমার বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে। প্রজা হয়ে থাকতো, ওর স্বার্থ দেখতাম। এখন যখন চলে যাচ্ছে, সে দায়িত্ব আমি রাখি কেন? সেই জন্যে ওকে বলেছিলাম, তোমার গাঁয়ের মাতব্বর লোক একজনকে ডেকে এনো। কেন, কি বৃত্তান্ত তা আর বলিনি। টাকা অতি খারাপ জিনিস সতীশ, তুমিও তো বিষয়ী লোক, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে। টাকাটা আমি এনে দিই, তুমি নিয়ে যাও—

—আচ্ছা দেবতা, একটা কথা। আপনার যখন হুকুম, তখন নিয়ে আমি যাবো। তবে মোড়ল মাতব্বর আমি কিছুই নই। আপনাদের ছিচরণের চাকর—এই মাত্তর কথা। মোড়ল মাতব্বর আমি নই। কিন্তু একটা কথা—

—কি?

—যদি বলাই সাবালক হওয়ার আগে মারা যায়, তবে টাকার কি হবে?

—তাহলে মা ও ছেলের নামে এই দিয়ে স্বজাতি জ্ঞাতিকুটুম ভোজন করিও একদিন। ওদের তৃপ্তি হবে।

—আহা, ওর মা হাজারি বড্ড ভালো লোক ছিল। তার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। বড্ড সরল।

সতীশ সেদিন টাকাকড়ি গুনে-গেঁথে নিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু মাসকয়েক পরেই একদিন এসে হাজির হোল। সে-ই চণ্ডীমণ্ডপে হীরুঠাকুরের কাছে তখন আমরা পড়চি। সতীশ ঘোষ এসে বাবাকে প্রণাম করে বললে—সে হয়ে গিয়েচে। আপনাকে আর (আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) এই খোকাবাবুকে আর এই নায়েববাবুকে একবার যেতে হচ্চে কালোপুর—

বাবা বললেন—মানে?

—মানে, আপনাদের বলাই আজ তিনদিন হোল গরু চরাতে গিয়ে বাজ পড়ে মারা গিয়েচে।

—বাজ পড়ে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মরে মাঠেই পড়ে ছিল। সন্ধের সময় টের পেয়ে তখন সবাই গিয়ে তাকে দেখে, পড়ে আছে। নিয়তির খেলা, আপনিই বা কি করবেন, আমিই বা কি করবো। এখন চলুন, অপঘাতে মৃত্যু, তিনদিন অশৌচ, কাল তার শ্রাদ্ধ। সেই টাকাটা আপনি যেমন হুকুম দেবেন, আপনার সামনে খরচ করবো।

যতিনাথ কাকা আর বাবা পরদিন কালোপুর গেলেন, সঙ্গে আমি। আশ্চর্য্য হলাম

আমরা সকলেই সেখানে গিয়ে। সতীশ ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, আটচালা বড় ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, সদর অন্দর পৃথক। সবই ঠিক, কিন্তু লোকজনের সমারোহ আয়োজন দেখে আমরা তো অবাক। চারশো টাকায় এত লোক খাওয়ানো যায় না এমন সমারোহ করা যায় না। হাজারি খুঁড়ির বার্ষিক সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধও ওই সঙ্গে হোল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোক খাওয়ানোর বিরাম নেই। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল বটে, তবুও সাত আটশো টাকার কমে সে রকম খাওয়ানো যায় না, তত সমারোহই করা যায় না। আর কি যত্নটা করলে আমাদের সতীশ ঘোষ! লুচি, ছানা, সন্দেশ, দই; সব সময়ে হাতজোড় করেই আছে।

বাবা বললেন—সতীশ, এ কি ব্যাপার? তোমার ঘর থেকে কত খরচ করলে? তুমি তাদের কেউ হও না, জ্ঞাতি নও, কুটুম্ব নও, তাদের জন্য এত টাকা—

সে হাতজোড় করে বললে—দেবতা, টাকা তো ময়লা মাটি। আপনি হুকুম দেলেন। বলি, করতে যদি হয় তবে তিন্ গাঁয়ের মা আর ছেলে বেঘোরে মারা গেল, ওদের শ্রাদ্ধ একটু ভাল করেই করি। আপনি খুশি হয়েচেন, দেবতা?

বদ্যিনাথ কাকা যে অত জাহাঁবাজ ঘুঘুলোক, কালোপুর থেকে ফিরবার পথে বলল—না সত্যি, হাজারি খুঁড়ির পুণ্যি ছিল। তাই টাকাটার সদ্ব্যয় হোলো। ভালো হাতে পড়েছিল টাকাটা।

ছেলেবেলার কথা এ সব। তখন পল্লীগ্রামের লোক এমনি সরল ছিল, ভালো ছিল—আজ বাবাও নেই, সে সতীশ ঘোষও নেই। এখন দূর স্বপ্নের মত মনে হয় সে সব লোকের কথা। হাজারি খুঁড়ির শ্রাদ্ধের পরে সতীশ ঘোষ আমাদের বাড়ীতে অনেক বার এসেছিল। আমার ঠাকুরমাকে মা বলতো, বাবাকে দাদাঠাকুর বলে ডাকতো। সঙ্গে করে আনতো মানকচু, আখের গুড়, ঝিকরহাটি বাজারের কদমা আর জোড়া সন্দেশ। কখনো কখনো ভাঁড়ে করে গাওয়া ঘি আনতো। আমার বড়দিদির বিয়ের সময় ওদের বাড়ীর ঝি-বোয়েরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। একখানা ভাল কাপড় দিয়েছিল বিয়েতে।

বাবা মারা যাওয়ার পরে আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে যাই। শুনেছিলাম সতীশ ঘোষ মারা গিয়েচে বহুদিন। আর কোন খোঁজখবর রাখিনি তাদের।

মাথাটা আগে থেকেই ঝিম্ ঝিম্ করছিল। আবার বোধ হয় জ্বর আসচে।

পাল্লা-হরিশপুরের মাইনর স্কুলে পড়ি। বাবার হাতে পয়সা নেই, মা কান্নাকাটি করেন, ছেলেটার লেখাপড়া হোল না—তাই পাল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট যতীন চাটুয্যে আমার সাবেক স্কুলের মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধে পাল্লার মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়তে দিয়েচেন। গ্রামের পুরুতঠাকুর শ্রীগোপাল চক্কত্তি দয়া করে তাঁর বাড়ীতে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেচেন। আমি এখানে আজ বছরখানেক হোল।

থাকতে পারিনে ভালোভাবে দু' কারণে। সে কথা কেউ জানে না। মা জানতো; কিন্তু মা তো এখন নেই এখানে।

প্রথম—ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি আজ একটি বছর। কত ওষুধ খাচ্ছি কিছুতেই সারে না।

দ্বিতীয় কারণটা—আমার ছোট ভাই রেখে আছে, তার নাম নন্তু। বড় চমৎকার ছেলে সে। সাত বছর বয়স হোল। আগে আমার ডাকতো—'ভাতা—ও ভাতা—'। এখন 'দাদা' বলেই ডাকে। সুন্দর দেখতে। নন্তুকে না দেখে বড় কষ্ট হয়।

সেদিন টিফিনের ছুটি হবার আগেই মাস্টার মশাইকে বলি—স্যার, আমার জ্বর আসচে—

ননী মাস্টার আমার দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন—আবার জ্বর?

—হ্যাঁ, স্যার।

—বাড়ী যাবি?

—এখন হাঁটতে পারব না, স্যার!

—বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আয় দিকি হাত দেখি—

হাত দেখতে হোল না, গায়ে হাত দিয়েই বললেন—এঃ, বড্ড জ্বর যে! গা পুড়ে যাচ্চে। শুয়ে পড়।

শুয়েই পড়ি বেঞ্চিতে।

তারপর জ্বরে কখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েচি। যখন জ্ঞান হোল তখন আমতলার স্কুল-বোর্ডিংয়ে আমাদের ক্লাশের গোপালের তক্তপোশে শুয়ে আছি।

গোপাল আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বললে—কেমন আছিস বিনোদ?

সে কোথা থেকে দৌড়ে এসেচে। গায়ে ঘাম, মুখ রোদে রাঙা হয়েচে। বললাম—দৌড়ুচ্ছিলি?

—হাঁ, ষাঁড় তাড়াচ্ছিলাম—হেড্ মাস্টারের কপিক্ষেত সাবাড় করেচে।

—আমার গায়ে হাত দিয়ে ছাখ—জ্বর আছে?

—হুঁ। বেশ আছে। বাড়ী যাবিনে?

—হাঁটতে পারলেই যাবো।

—তাই যা। এখানে শোবার জায়গা নেই, কোথায় থাকবি? বাড়ী যা।

বাড়ী যাবো কোথায়, তাই ভাবি। এ আমার নিজের বাড়ী নয়। যাঁর বাড়ী থাকি, তিনি বাড়ী-বাড়ী ঠাকুরপুজো করে বেড়ান। তাঁর বাড়ীতে খুব খাটতে হয় আমাকে, তাঁর ছোট মেয়েটাকে সর্ব্বদা কোলে করে বসতে হয়। একটু যদি কেঁদে ওঠে খুকি, তার মা আমার উপর চটে যান।

একদিন মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ী গিয়েছি, খিদের সমস্ত শরীর হালকা হয়ে গিয়েছে, খুকিকে আমার কোলে দিয়ে তার মা রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি আসবার আগে থেকেই খুকি কাঁদছিল। আমার কোলে উঠে আরও কাঁদতে লাগলো। আমি কত বোঝালাম, কত ছড়া বললাম, গান গাইলাম, কিছুতেই শুনলে না, কান্নাও থামলো না। ওর মা এমন রেগে গেলেন আমার ওপর, আমার কাছ থেকে খুকিকে নিয়ে নিজে কোলে করে বসলেন। আমার কিছু খেতে দিলেন না। রাত্রেও আমাকে ভাত দিতেন না বোধ হয়। রাত্রে চক্কত্তি মশায় খেতে বসে বললেন—বিনোদ খেয়েচে?

তখন কত রাত হয়ে গিয়েচে! খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়েচি। স্কুল থেকে এসে পর্য্যন্ত একগাল মুড়িও খাই নি।

অন্য দিন এমন সময় কোন্ কালে আমার খাওয়া হয়ে যায়! পুরুত মশায় নবীন দাঁর চণ্ডীমণ্ডপের দাবা-খেলার আসর থেকে রোজই বেশী রাত করে ফেরেন। তারপর তিনি খেতে বসেন।

খুকির মা বললেন—না।

পুরুত মশায় বললেন—কেন? এত রাত্রেও খায় নি এখনো? জ্বর হয়েচে বুঝি?

—না, জ্বর হবে কেন? বসে পড়ছিল, তাই ভাত দিই নি এখনো।

—যাও, ডেকে দাও। ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে, আমার পাশেই বসুক।

—তুমি খেয়ে উঠে যাও, দেবো এখন।

—না, ওকে ডাকো। জায়গা করে দাও এপাশে।

পুরুত ঠাকুরের কথায় আমার জায়গা করে দিলেন খুকির মা। নয়তো আমি জানতাম রাত্রে তিনি আমার না খাইয়ে রেখে দিতেন। কাউকে কিছু বলা আমার স্বভাব নয়। চুপ করেই থাকতাম।

সেই বাড়ীতেই ফিরে যাওয়ার কথা বলচে গোপাল!

সেখানে আমার মা নেই। মা থাকলে—আমার দেখলে রাস্তা থেকে ছুটে আসতেন। এখানে খুকির মা আমার জ্বর দেখলেই মুখ ভার করে বলবে—ঐ এলেন অসুখ নিয়ে। কে এখন সেবা করে? আমার তো বড্ড উপকার হচ্ছে ওঁকে দিয়ে! কুটোটুকু ভেঙে দুখানার উপকার নেই। শুধু সেবা করো! বাবি রে—বাবু রে—

কিছুই করতে হয় না ওঁকে। আমি ওঁকে কখনো কষ্ট দিইনে। আমার রোজ, জ্বর লেগেই থাকে। ওঁকে ডাকতে বা কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়। উনিও আমার কাছে বড় একটা আসেন না। মিথ্যে বলব না, সে বরং পুরুত মশায় যত রাত্রেই ফিরুন না দাবা

থেকে, আমার অসুখ হয়েছে শুনলে আমার শিয়রে এসে বসে আমার হাত দেখবেন ; গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবেন। স্ত্রীকে ডেকে বলবেন সাবু কি বার্লি করে দিতে। নিজে কাছে বসে খাওয়াবেন। সকালে উঠে গোবিন্দ ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ব্যস্ত হয়ে—ও ডাক্তারবাবু, বিনোদ যে অমন ভুগতে লাগলো! পরের ছেলে আমার বাড়ী আছে, অমন করে পড়ে থাকলে মন বড় ব্যস্ত হয়। ওর অসুখের একটা বিহিত করুন।

পুরুত মশাইকে দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে। দুজনেই নিরীহ; কেউ ওদের মানে না, বরং ওঁরাই সবাইকে ভয় করে চলেন!

বড় যদি হই, পুরুত মশাইয়ের দুঃখু আমি ঘোচাবো। ওঁর ছেলে নেই। আমি ওঁর ছেলে হবো। না, ওঁদের বাড়ী আমি এখন যাবো না। জ্বর আমার এবার খুব বেশি। হয়তো আরও বাড়বে।

গোপালকে আমি বললাম—ভাই, আমি মার কাছে যাবো।

—মার কাছে যাবি! তোদের গাঁয়ে? সে এখান থেকে ছ' কোশ রাস্তা। নদী পার হতে হবে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে। পারবি কেন? এই জ্বর-গায়ে—

—তা হোক। তুই কাউকে বলিসনে। আমার পকেটে সরকারি ডাক্তারখানার ওষুধ আছে। আমি যাবো। রাত্তিরটুকু তোর খাটে থাকতে দে।

গোপাল রেগে গেল। বললে—দায় পড়েছে তোকে থাকতে দিতে! তোর মত বাজে আবদার! বাড়ী যাবি কি করে এই অসুখ গায়ে? বাড়ী যাবি বললেই হোল? আমারও খাটে নেই জায়গা। দুজনে শোবো কোথায়? আমি রুগীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইনে। [বাড়ী যা।

মনে বড় দুঃখু হোলো, গরীব বলে সবাই হেনস্তা করে। গোপাল যে আমার এই অসুখ-গায়ে তাড়িয়ে দেবে, তার মানেও তাই।

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা এখনও ঘন্টা-দুই আছে। শরীরটা একটু হালকা মনে হচ্ছে। এই দু ঘন্টা হাঁটলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না? খুব পারবো। খেয়াঘাটের ইজারাদার যে ঘরে থাকে, বললে আমাকে জায়গা দেবে না একটু? গোপালের মত নিষ্ঠুর তারা নয়। পুরুত ঠাকুরের বৌয়ের মত নিষ্ঠুর তারা নয়।

—আচ্ছা ভাই, চললাম।

বলেই রওনা হলাম বোর্ডিং থেকে। লুকিয়ে মাঠের রাস্তা ধরলাম। আমি জানি, আমি বেশিদিন বাঁচবো না। মাকে আমার দেখতেই হবে। কারো কাছে যাবো না, মার কাছে যাবো।

চৈত্র মাস। অথচ এমন শীত করে এখনো! বেলা খুব বেড়েচে। মেঠো পথের দুধারে ঘেঁটুফুল ফুটেচে কতো!

বাবজোয়ানির ঠাকুর-বাড়ী পার হয়ে কলোয়া গ্রামের পথে পড়ে ছোট্ট খালের খেয়া।

একখানা নৌকো আছে। মাঝি থাকে না, নিজেই নৌকো বেয়ে পার হয়ে ওপারে শিমুল-তলায় বসি। শিমুলফুল ফুটেচে গাছটাতে, টুপটাপ করে রাঙা ফুল ঝরে পড়চে। শুকনো কঞ্চির বেড়া দিয়েচে পোড়া খালের ধারে ধারে। চাষাদের মুসুরি-ক্ষেতে মুসুরি পেকে গাছ শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো মুসুরি তোলে নি। ঘেঁটুফুলের কি সুন্দর সুগন্ধ বেরুচ্চে পড়ন্ত রোদে। নিঃশ্বাস টেনে শুঁকি।

কেবলই হাঁটছি, কিন্তু হাঁটতে পারিনে আর। পা ধরে আসচে। কলেরা গ্রামের পেছনে মস্ত বাঁশবাগানে মরা শুকনো বাঁশপাতার কেমন চমৎকার গন্ধটা! বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে পথটা, তারপর আবার মাঠ। মাঠের মধ্যে বড় একটা যজ্ঞিডুমুর গাছ। থোলো থোলো যজ্ঞিডুমুর পেকে টুপটুপ করচে গাছে। আমার গা বমি-বমি করছিল। ডুমুরতলায় বসে বমি করলাম। গা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। জলতেষ্টা পেলো। ঠাণ্ডা জল কোথায় পাই?

অবসন্ন হয়ে থাকলে চলবে না, মার কাছে পৌঁছতে হবে। কখনো একা এত দূর পথ হাঁটি নি। ভয় করচে। অন্য কিছুর ভয় আমার নেই। চিলতেমারি গ্রামের শ্মশানটা রাস্তার ধারেই পড়ে। শ্মশানে নাকি কত লোক ব্রহ্মদত্যি দেখেচে, পেত্নী দেখেচে। চিলতে-মারি যেতে অবিশ্যি সন্ধ্যে হবে না। হে ভগবান, যেন সন্ধ্যা না হয়। মাকে দেখতেই হবে। তার আগে যেন সন্ধ্যা না হয়, অথবা না মরি! হে ঠাকুর!

একটা কাদের বাড়ী পথের ধারে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম—একটু জল দেবে?

একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে আমার সামনে এসে বললে—কি জাত!

—ব্রাহ্মণ।

—আমাদের জল খাবে? আমরা জেলে।

—তা হোক, দাও।

মেয়েটি একটু পরে একখানা পাটালি আর এক ঘটি জল নিয়ে এসে আমায় দিলে। আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে বললে—তোমার কি হয়েচে?

—জ্বর।

—কোথায় বাড়ী?

—মনোহরপুরে।—পাটালি খাবো না। শুধু জল দাও।

জল খেয়ে আমি হেঁটে চললাম অতি কষ্টে। মেয়েটা আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল কতক্ষণ। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্চে। সে চেঁচিয়ে বললে—আজ এখানে থেকে গেলেই পারতে—হ্যাগো?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—না, আমাকে যেতেই হবে, মার জন্যে মন কেমন করচে।

আবার মাঠ। কি সুন্দর মাঠ! শুধু আকন্দ ফুল আর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে। যদি শরীর ভালো থাকতো, হয়তো মাঠে হাডুডু খেলতাম বন্ধুদের নিয়ে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে এখনো সামনে চিলতেমারি গ্রাম, তারপর কেউটেপাড়ায় খেয়াঘাট—যমুনা নদীর ওপর।

সন্ধ্যে হলেই আমার ভয় করবে। চিলতেবাড়ির শ্মশান তার আগেই পেছনে ফেলতে হবে; কিন্তু আর যেন হাঁটতে পারচিনে। শরীর কেমন করচে!

একটা তুঁতগাছের তলায় গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে দম নিই। সূর্য্যটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। সূর্য্য ডুবলেই অন্ধকার হয় না। ভরসা একেবারে ছাড়ি নি। আচ্ছা, তুঁততলায় যদি আর খানিকটা বসি? না, তা হলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে পৌঁছতে পারবো না। আবার জ্বর আসবে নাকি? শীত করচে আবার!

এক দাগ ওষুধ পকেট থেকে বের করে নাক টিপে খেয়ে নিলাম। বিকট তেতো কুইনিন্ মিক্‌চার। মা সুপুরি কেটে দেবে বাড়ীতে, তখন শুধু মুখে আর ওষুধ খেতে হবে না। চিল্‌তেমারি ছাড়লাম প্রাণের দায়ে জোর হেঁটে। শ্মশান-রাস্তার বাঁ-দিকে বেলাকুচো আর সোঁদালি গাছের নিবিড় ঝোপে অন্ধকার হয়ে আসচে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখে সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে যাচ্চি।

কে যেন বলে উঠলো, পারবিনে তুই মায়ের কাছে যেতে। আমরা তোকে যেতে দেবো না। তোকে এই শ্মশানেই রাখবো।

দূর, ওসব মনের ভুল। রাম রাম, রাম রাম! এখনো অন্ধকার হয় নি। অন্ধকার না হোলে ওসব বেরুতে পারে না। রাম-নামে ভূত পালায়।

সত্যি, আর কিন্তু হাঁটতে পারচিনে। কেউটেপাড়া এখনো কত দূর। ওই দূরে বাঁশবন দেখা যাচ্চে কেউটেপাড়া গ্রামের। এখনো অনেক দূর। এই বড় মাঠটা পার হতে হবে, জনপ্রাণী নেই! এই সন্ধের সময় মাঠে! কেউ দেখবার নেই!

কেন গোপাল আমায় তাড়িয়ে দিলে বোর্ডিং থেকে? আমার ভয়ানক জ্বর এসেচে। আবার জ্বর এসেচে। কেউটেপাড়া কতদূর? চোখে যেন সর্ষের ক্ষেত দেখচি চারদিকে! পুরুত ঠাকুরের স্ত্রী রাগ করে বলচেন—বাপো, ছেলেটার শুধু জ্বর আর জ্বর। পরের আপদ কে দেখাশুনো করে? আজই বিদেয় করে দাও।

মনী মাস্টার বলচে—ওর পা ফুলেচে, ও বাঁচবে না। ও এবার যাবে।

ডানদিকে একটা বড় আমগাছ রাস্তার ধারে। ঐখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নেবো? আর এক দাগ ওষুধ খাবো? আর হাঁটতে পারচিনে। ভীষণ জ্বর এসেচে।

হঠাৎ আমার মনে হোল ওই আমতলাতেই মা আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন। আমি আসবো বলেই কখন থেকে বসে আছেন। মা এগিয়ে এসেচেন আমায় নিতে।

আমি টলতে টলতে মার কোলে শুয়ে পড়ি। মাথায় একটা কিসের চোট লাগলো। তারপর আমার আর জ্ঞান নেই। অন্ধকার নামলো মাঠে।

পড়ে পাওয়া

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা।

বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই।

বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কানখাড়া করে বললে—ঐ শোন—

আমরা কানখাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম—কি রে?

বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কানখাড়া করে রয়েছে।

হঠাৎ আবার সে বলে উঠলো—ঐ-ঐ শোন—

আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়-গুড় মেঘের আওয়াজ।

নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—

বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠলো—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা। বোশেখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামবো না। কালবৈশাখী।

আমরা সকলে ততক্ষণ বুঝতে পেরেছি ও কি বলছে। কালবোশেখীর ঝড় মানেই আম কুড়নো। বাঁড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কি! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তারই জয়।

সবাই বললাম—তবে থাক।

কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ এখনো দূর হয় নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মত চাঁপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হোল ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠলো, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগলো পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো, ধুলোতে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে চড় চড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামলো।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মত; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক-এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ী চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যের অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনা সুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্ত্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কি একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে—ভাখ তো রে জিনিসটা কি?

আমি হাতে তুলে দেখলাম একটা ছোট টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললে—দেখি জিনিসটা?

—ভাখ তো, চিনিস?

—চিনি, 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'।

—টাকাকড়ি থাকে।

—তাও জানি।

—এখন কি করবি?

—সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?

—তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

'টিনের ক্যাশ বাক্স' হাতে আমরা দু'জনে সেই অন্ধকার তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দু'জনে এখন কি করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

—তা তো বটেই। কে জানবে আর।

—এখন কি করা যায় বল।

—বাক্স তো তালা-বন্ধ—

—এখুনি ইঁট দিয়ে ভাঙি যদি বলিস তো—ওঃ, না জানি কত কি আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দু'জনে নেবো, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাবো।

ঝড়ের ঝাপটা আবার এল। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে

চলে গিয়েছে। অন্যদিনে আমাদের দু'জনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বললে—শীতে কেঁপে মরছি। কি করা যাবে বল। বাড়ী কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহোলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কি করবি?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

—ভাঙি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

—না। তালা ভাঙিসনে। ভাঙলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে, ভেবে ছাখ। কোন গরীব লোকের হয়তো। আজ তার কি কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেবো বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

—দেবো ভাবছি।

—কি করে জানবি কার বাক্স?

—চল সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্ত্তে দু'জনের মত বদলে গেল। দু'জনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স দেওয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হোল। বাক্স নিয়ে জল ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বড়ী চলে এলাম। বাদলদের বাড়ীর বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হোল বাক্সটা।

তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসলো বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোষ্টমের ডোবায়।

আমাদের দলের সর্দ্দার বিধুর নির্দেশমত এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে —এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে জিজ্ঞেস করা হোল বাক্স ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বার করবার। কারো মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হোল। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কি করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করবো? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্ত করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হোল।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কি লিখবো বলো—

—লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মত। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

—বল—

—আমরা এক বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়ীতে খোঁজ করুন। ইতি—বিধু সিধু নিধু তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি? আমাদের ভালো নাম লেখো।

বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখো।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হোল।

দু'তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমত রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কি চাও?

—বাবু, ইদ্রিভীষণ কার নাম?

—আমার নাম। কেন? কি চাই?

—একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কি রকম বাক্স?

—কাঠের বাক্স।

—না। যাও।

—বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

—কি রংয়ের টিন?

—কালো।

—না যাও—

—বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মত—

—না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোভে পড়ে এসেছে। ওর মত কত লোক আসবে!

আবার তিন চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এল তারপরে। তারও বর্ণনা মিললো না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে

নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—যাও যাও, যা পারো করো গিয়ে। ধান আমরা ছড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ।

সেবার আমাদের নদীতে এল বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু'একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অধরপুর চরের কাপালীরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ী সেবারেও দেখে এসেছি। কি চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর ক্ষেত, লাউ কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু'পয়সা আয়ও পেতো তরকারি বেচে। কোথায় রইলো তাদের পটল কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়ী ঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগলো অধরপুর চরের কাপালীরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এল। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু'একজন প্রজাপত্তর এসেছে খাজনা দিতে। আমরা দু'ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি। এমন সময়ে একটা লোক এসে বললে—দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে অধরপুর থেকে। আমরা কাপালী।

—বোসো। কি মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগলো। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নিশ্চিন্তখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু'আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এল। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাবো। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত ভাদ্র মাসে নিশ্চিন্তখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরচি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেবো বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি—একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ী থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হোল না। সেই হোল শুরু—আর তারপর এল এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কি? অতগুলো টাকা গহনা হারালে?

—আজ্ঞে, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কি রঙের বাক্স?

—সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কি দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক-ছুটে বিধুর বাড়ী গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কি না?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হোলে উকিল হবে, সবাই বলতো।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরীবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত-সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কিনা আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জানো তো?

না, ও উকীলই হবে বটে!

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না।

আমার ছাত্র

মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্ছে সভ্যতার নামে, শত বৎসরের শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে বাতে করে তুলোর মত উড়ে গেল, উদগ্র লোভ হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্তি দেখা গেল চোখে,—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মহত্ত্ব সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশাদের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।

আমাদের গণেশদাদার কথা বলবার যোগ্য বলে এতদিন ভাবতামই না, কিন্তু আজ দেখছি গণেশদাদার ছবি আমার মনের পটে বড় বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। এর আর একটা কারণ যে গণেশদাদা আমার ছাত্র।

গণেশদাদার নাম গণশা মুচি। আমাদের গ্রামের মুচিপাড়ায় ছোট্ট খড়ের চালাঘর দুটি গরু ও চার-পাঁচটি বাছুর এবং স্ত্রী পুত্র নিয়ে, উঠানে লাউমাচা পুঁইমাচা বানিয়ে, পুকুরে মটে শাক বুনে, বেটে আলু ও মুলো ওল তুলে হাটে বিক্রি করে সংসার চালাতো।

যখন পাঠশালায় পড়ি, তখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের বাড়ী গণেশ মুচি কৃষাণের কাজ করে। আমরা গণেশদাদা বলে ডাকতাম, অন্যলোকে বলতো গণশা মুচি। মিশ্‌কালো, রোগা

গড়ন, মুখে একপ্রকার শান্ত, দীন ভাব, লাজুক-নম্র চোখ দুটি, সর্ব্বদাই যেন অপ্রতিভ, যেন কি একটা মহা অপরাধ করে ফেলেচে সে।

হরিশ জ্যাঠামশায় কড়া প্রকৃতির গ্রাম্য পাঁতিদার। গণেশদাদাকে ডেকে বলতেন—এই গণশা—বাব্‌লাতলার জমিতে দোয়ার দেওয়া হয়েচে ?

গণেশ অমনি হাত কচলাতে কচলাতে বলতো—আজ্ঞে না, বাবাঠাকুর। কাল তো যোটে লাঙল দেলায়—

—হারামজাদা, এতদিন ঘুমুচ্ছিলে নাকে তেল দিয়ে ? কবে বলিচি চষ্‌তে ও ভুঁই ?

—জমিতি লাঙল না লাগলি কি ক-অ-রবো বাবাঠাকুর। আজ গাঁজবাড়ির মড়ি দোয়ার দিয়ে দেবানি—

—না দিলে জুতিয়ে তোমার আজ হাড় খুলে নোব মনে থাকে যেন।

গণেশদাদা আমরা যেখানে খেলা করচি সেখানে এসে হেসে বলতো—বাবাঠাকুর চটে গিয়েচেন।

আমি বলতাম—ও গণেশদাদা, ইংরিজি জানো ?

—ইন্‌জিরি ? কনে থেকে জানবো ? মুই কি লেখাপড়া জানি ?

—শিখবে ?

—শিখিয়ে দাও দাদাঠাকুর তো শিখি—

—শেখো—ওভার মানে ওপর।

—কি ?

—ওভার মানে ওপর, উড্‌ মানে কাঠ, কাউ মানে গরু—

গণেশদাদা মুখস্থ করতে লাগলো। ইউ. পি. পাঠশালায় কৃষ্ণ মাস্টারের শেখানো যত বিদ্যা আমার মাথায় ভিড় করে তাদের উগ্রতায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছিল, তা সবগুলো গণেশদাদার ঘাড়ে না চাপাতে পারলে যেন আমার নিস্তার নেই। সেই থেকে গণেশদাদার ইংরিজি শিক্ষার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করলাম। গোটা ওয়ার্ডবুকখানা গণেশদাদাকে কণ্ঠস্থ করাবার সে কী দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আমার। মুখে মুখে শেখানো ছাড়া অবিশ্যি অন্য উপায় ছিল না, গণেশদাদার ভাষাতেই বলি, 'মা সরস্বতীর ঘরের ঝন্‌কাট কখনো মাড়াইনি যে।'

গণেশদাদা কিন্তু শিখলো অনেক কথা। শ্রুতিস্মৃতির প্রাচীন উপায়ে প্রায় শতখানেক ইংরিজি শব্দের ঐশ্বর্য্যে সে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠলো। আমিও শিক্ষাগর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে উঠলাম রীতিমত।

আমার সে-গর্ব্ব মাঝে মাঝে বড় অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করতো, গণেশদাদার লাজুকতা ও অপ্রতিভ ভাবকে আরও বাড়িয়ে। যেমন একটা উদাহরণ দিই। হরিশ জ্যাঠা-মশায়ের বাড়ী তাঁর বড় ছেলে হুটুদা'কে বিয়ের জন্ত কন্যাপক্ষ দেখতে এসেচে—দু'তিনটি ভদ্রলোক, জাবনগরের কাছে কোথায় বাড়ী। আমরা ছেলেরা বলাবলি করলাম জাবনগর

অর্থাৎ শহরের দিকে যতই বাড়ী হোক বাছাধনদের, আমাদের অজপাড়াগাঁ বলে যে নাক সিঁটকোবেন তা হোতে দিচ্চিনে—দেখিয়ে দেবো এ গ্রামের একজন মুচি কৃষাণও ইংরিজি কেমন জানে। সেই ভদ্রলোকের দল যখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে, তখন আমি গণেশদাদাকে ডেকে বললাম—এই দেখুন, এদের মাইন্দার কেমন ইংরিজি জানে—

তাদের মধ্যে একজন কৌতূহলের সুরে বললে—তাই নাকি। দেখি—দেখি—

আমি অমনি বলি—গণেশদাদা, ওভার মানে কি?

গণেশ হাত ওপরে তুলে বললে—ওপোর।

—ওয়াটার?

—জল।

—স্কাই?

—আকাশ।

ইত্যাদি।

এক ডজন শব্দের ক্ষীণ পুঁজি শেষ হোতেই আমি থেমে গেলাম। গণেশদাদার দিকে শহরের চালবাজ লোকদের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়ুক—এই আমার ইচ্ছা। আমার উদ্দেশ্য সফল হোল; শহুরে বাবুরা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—বাঃ, বাঃ, এ লোকটি তো বেশ। কি নাম তোমার? বেশ। এদিকে এসো—

ওরা চার আনা বকশিস করলে তখুনি। অর্থকরী বিদ্যা বটে ইংরিজি।···

সেই থেকে গণেশদাদার কি উৎসাহ ইংরিজি শেখবার। সাতদিনের মধ্যে আর এক ডজন শব্দ কণ্ঠস্থ করে ফেললে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শীতকাল। বাড়ীতে রুটি হচ্চে, দুধ আর গুড় দিয়ে খাবো বলে মনে খুব খুশি। এমন সময় পীতাম্বর রায় জ্যাঠামশাইদের বাড়ী হৈ চৈ শুনে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে লোকে লোকারণ্য। পীতাম্বর রায়, হরিশ জ্যাঠামশায়, নবীন চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পীতাম্বর রায় খুব চীৎকার করচেন ও হাত-পা নাড়চেন। উঠানের মাঝখানে গণেশদাদা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ব্যাপার শুনে বুঝলাম, পীতাম্বর রায়ের একটি গরু আজ দুদিন হারিয়ে গিয়েছিল, আজ সেটা গণেশদাদার বাড়ীর পেছনে মুচিপাড়ার বড় আমবাগানে (যার নাম এ গ্রামে গলায়-দড়ির বাগান) লতা দিয়ে বাঁধা ছিল এবং তার লেজ কে দা দিয়ে অনেকখানি কেটে দিয়েচে, ঝরঝর করে রক্ত পড়চে লেজ দিয়ে। এই অপরাধের সন্দেহ গিয়ে পড়েচে গণেশদাদার ওপর, কারণ প্রথমতঃ মুচিরা গরুর চামড়া বিক্রি করে, দ্বিতীয়তঃ গরু গণেশদাদার বাড়ীর পিছনে বাঁধা ছিল, তৃতীয়তঃ গণেশদাদা গরীব। সুতরাং গণেশদাদাই রাত্রে গরুটি কেটে চামড়া খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাড়ীর পিছনের আমবাগানে। দায়ের কোপও সে-ই মেরেচে।

পীতাম্বর রায়ের ও হরিশ জ্যাঠামশায়ের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তা কারো চোখে পড়লো না। গণেশদাদার বক্তব্য প্রথমতঃ সুসংবদ্ধ নয়, দ্বিতীয়তঃ ভয়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি (যার আতিশয্য তার কোনো দিনই নেই) লোপ পেয়েছিল, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনে সে পটুত্বের বিশেষ পরিচয় দিল না।

উঃ, সে কি মারটাই মারলেন পীতাম্বর জ্যাঠামশাই ওকে, পা থেকে চটি জুতো খুলে। কত কাল কেটে গিয়েচে, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর, কিন্তু আজও আমি চোখের সামনে গণেশদাদার যন্ত্রণা-ও লজ্জাকাতর মুখ দেখতে পাই। মার বটে একখানা। শুধু শোনা যায় পীতাম্বর রায়ের তর্জন-গর্জন এবং চটাং চটাং চটি জুতোর শব্দ গণেশদাদার পিঠে। পিঠ কেটে রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে। তখনও পীতাম্বর জ্যাঠার থামবার চেহারা ছিল না, নীলু বাঁড়ুয্যের ছেলে মণিদাদা, জোয়ান ছোকরা, দৌড়ে গিয়ে পীতাম্বর রায়ের হাত ধরে টেনে এনে নিরস্ত করলে।

আহা, গণেশদাদা বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। আমি জানতাম গণেশদাদা নির্দোষী। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো গণেশদাদার কান্না দেখে। ইচ্ছে হোল পীতাম্বর জ্যাঠার কান ধরে কেউ এখুনি ঘুরপাক দেয় তো আমার মনের রাগ মেটে।

এ সব বাল্যকালের কথা।

সারা বাল্যকাল ধরে দেখেছি গণেশদাদা লোকের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে দিনান্তে একথালা রাঙা আশচালের ভাত কায়ক্লেশে যোগাড় করচে। তাতেই তার কি খুশি!

—ও গণেশদাদা, আজ কি খেলে?

আমি হয়তো প্রশ্ন করি।

তখন গণেশদাদা আস্তে আস্তে বলবে, যেন কল্পনায় খাদ্যগুলো সে আবার পরম তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করছে—

—খ্যালাম? তা খ্যালাম মন্দ নয়। তোমার বড় বউদিদি রেঁধেলো অনেকগুলি। খ্যালাম ধরো (আঙুলের পর্কে হিসেব রেখে) ভাত, শুলুকোর (গ্রামের নাম) নাড়া কাঁটা দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে, পেঁজ দিয়ে বিঞ্জের ঝাল (তরকারি হিসেবে অদ্ভুত শুধু নয়, বিকট), বাগুন দিয়ে পেঁজ দিয়ে, কাঁচালংকা আর তেঁতুল। তা বেশ খ্যালাম—কি বলো?

—বেশ খেয়েচ, আবার কি খাবে?

কোনোদিন জিজ্ঞাসিত না হয়েও একগাল হেসে বলতো—দাদাঠাকুর, আজ খুব খ্যালাম—

—কি গো গণেশদাদা?

—কি বল দিনি?

গণেশদাদা সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়।

—তা কি জানি? তুমি বলো।

—আজ তোমার বউদিদি রান্না করলে। উচ্ছের (উচ্ছে) শাক আর দয়াকলা দিয়ে একটা

তরকারী আর পান্তা ভাত।

খাবারটা লোভনীয় বলে মনে না হলেও মৌখিক তারিফ না করে উপায় নেই গণেশদাদার কাছে।

খাওয়ার তো এই দশা—পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড় কিংবা গামছা ছাড়া তো গণেশদাদার ছবি মনে করতে পারিনে। অথচ ব্রাহ্মণপাড়ার অর্দ্ধেক কাজে গণেশকে না হোলে চলেই না। বেশির ভাগই ব্যাগার।

—ওরে গণশা, আজ উঠোনের কাঠগুলো ঘরে তুলে দিয়ে আসিস তো?

—গণশা, গাছের নারকোলগুলো পেড়ে দিতে হবে ওবেলা।

—গরুটো পর্টে গিয়েচে রে, তুই দুপুরবেলা একবার এসে গরুটো আজ এনে দিবি—বুঝলি?

—গণশা, আমার গাছের দুকাঁদি কাঁচকলা হাট থেকে বিক্রি করে দিতে হবে বাবা—

শুধু মিষ্টিকথা—ব্যাস্! ঐ পর্য্যন্ত। কখনো গণেশদাদা মুখ ফুটে একটা পয়সা মজুরি এ সব ফাইফরমাস খাটার জন্যে চাইতো না। বরং বলতো—বেরাহ্মণ দেবতা, ওনাদের পা ধোয়া জল খেলি স্বগ্‌গো। ওনাদের একটু সেবা করবো তার আবার পয়সা!

কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণের নয়, আমি যে-কোনো জাতির সেবা করতে দেখেচি ওকে অম্লান-বদনে। জেলে-পাড়ার অথর্ব্ব বুড়ী বিন্দের মাকে তার সঞ্চিত তেঁতুলকাঠের গুঁড়ি কুড়ুল দিয়ে চ্যালা করে দিতে দেখেচি। কত ক্রিয়াহীন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপগুলি যখন অলস যুবক ও প্রৌঢ়দের পাশা দাবা ক্রীড়ার বিবিধ ধ্বনিতে অথবা দিবানিদ্রাভিভূত ব্যক্তিদের নাসিকাগর্জনে মুখরিত, তখন গণেশদাদা কারো তেঁতুলগাছে তেঁতুল পেড়ে দিচ্চে, না হয় কারো কলাইয়ের গাছ-বোঝাই গাড়ি চালিয়ে খামারে আনচে। ঘামে ওর সারা দেহ ভিজে, মাথার চুল ধূলিধূসর, পেটে পেট লেগেচে, কারণ—এখনও খাওয়া হয়নি।

কখনো দেখিনি গণেশদাদা কারও সঙ্গে ঝগড়া করচে কিংবা চড়াসুরে কথা বলচে।

আমার বাল্যকাল কেটে গেল। কলেজে পড়ে দুটো পাস করে গ্রামে ফিরে যেতে পথেই গণেশদাদার সঙ্গে দেখা বেলতলার মাঠে। গণেশদাদা গরু চরাচ্চে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়েই আমার পথ। গণেশদাদাকে ডেকে বললাম-ও গণেশদাদা, চিনতে পারো?

—তা চিনতে পারবো না, অ্যাখোদিনি দা'ঠাকুর। কোলে পিঠি করে মানুষ করলাম আর চিনতি পারবো না? কত বচ্ছর দেখিনি। কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন আমাদের ভুলে?

—মামার বাড়ী। তুমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েচ দেখচি। মাথায় চুল পেকেচে হ্যা গণেশদাদা?

—ওমা, তোমাদের কোলে করে মানুষ করলাম, তোমরাই কত বড় হয়ে গেলে—মুই আর বুড়ো হবো না? বয়েস কি কম হোল?

—ভাল আছ, হ্যাঁ গণেশদাদা ?

—হ্যাঁ ভালো। তোমরা সব ভালো ?

গণেশদাদাকে এই বয়সে গরু চরাতে দেখে আশ্চর্য্য হলাম। কারণ পল্লীগ্রামে গরু চরানো হোল বিষয়কর্মের প্রথম সোপান। সাধারণতঃ বালকেরা এ কাজ করে থাকে—তারপর ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করে। মোটামুটি সেটা এই রকম :—

১। গরু চরানো (১৭ বছর পর্য্যন্ত)

২। জন খাটা (১৬।১৭ থেকে ত্রিশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত)

৩। অপরের কৃষাণগিরি করা (২৫।৩০ থেকে চল্লিশ পর্য্যন্ত)

৪। নিজের জমিতে চাষ-আবাদ করা (এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না)

৫। বাড়ীতে ধানের গোলা বাঁধা (যেমন অনেকেই ব্যবসা করে কিন্তু ধনী হতে পারে না, তেমনি চাষ অনেকেই করে কিন্তু গোলা বাঁধতে পারে না। এ সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে চাষীর ভাগ্যে)

৬। কিন্তু এ লিখচি কেন, এ ভাগ্য সকলের হয় না—ব্যবসাদার মাত্রেই কি টাটা-বিড়লা হয় ? তবুও এটার উল্লেখ করতেই হবে—প্রত্যেক চাষীর স্বপ্ন, প্রত্যেক রাখালের অলস-মধ্যাহ্নের স্বপ্ন, প্রত্যেক দিন-মজুরের বর্ষা-দিনে এক হাঁটু জল-কাদায় ধান বপন করতে করতে ক্লান্তি অপনোদনের স্বপ্ন—এটি উল্লেখ না করলে চলবে না। সেটি হোল নিজে মহাজন হয়ে নিজের গোলা থেকে অপরকে ধান কর্জ্জ দেওয়া।

এই উচ্চতর ষষ্ঠ স্তর প্রাপ্তি বহু পুণ্যের ফলে ঘটে !

যাক্, কিন্তু গণেশদাদা এই বয়সে বিষয়কর্মের প্রথম সোপানটিতে কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে না উঠে পারলো না। পাড়াগাঁয়ে এই বয়সেও যারা গরু চরায়, বুঝতে হবে তারা ভাগ্যলক্ষ্মী যারা নিতান্তই অবহেলিত, তারা নিতান্তই অভাজন। এ প্রশ্ন গণেশদাদাকে করলাম না, যদি ও মনে কষ্ট পায়। আমার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হোল পক্বকেশ গণেশদাদাকে পাঁচন হাতে তালপাতার ছাতি মাথায় গরু চরাতে দেখে।

গণেশদাদা বললে—বোসো বোসো দাদাঠাকুর। তামুক খাবা ?

—ও শিখিনি।

—এতটুকু দেখিচি তোমারে। কত বড়ডা হয়ে গিয়েচ। হ্যাদে, জিগ্যেস করো দিনি সেই ইন্‌জিরি ? মনে আছে কিনা দেখি।

ওঃ, অনেক দিনের কথা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালার সেই দিনগুলি কতকাল আগে অতীতে মিলিয়ে গিয়েচে। আজ পনেরো বছর আগের ব্যাপার সেই গণেশদাদাকে ইংরিজি শেখানো। কি কি শিখিয়েছিলাম তাই কি ছাই আমার মনে আছে ?

গণেশদাদা কিন্তু হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আছে আমার দিকে। বললাম—তুমি বলতে আরম্ভ করো ?

—ওভার মানে ওপর—

—বেশ, বেশ—তারপর ?

—তুমি জিগোও দাদা,—আমি বলি—

—জল ?

—ওয়াটার।

—আকাশ ?

—স্কাই।

—দুধ ?

—মিল্ক।

গণেশদাদার মুখে বিজয়ীর গর্বিত হাসি। তুমি তো ঠকাতে পারলে না দাদাঠাকুর এতদিন পরেও, ভাবটা এই রকম। আমি ভাবচি, এ-ইংরিজি শিখে তালপাতার ছাতি মাথায় গোচারণরত গণেশদাদার কি উপকার হবে ?

গণেশদাদা বললে—বলো—বলো—

—পিঁপড়ে ?

—পিঁপড়ে ? ওডা তো শিখোও নি দাদাঠাকুর। ও তুমি শিখোও নি। যা শিখিইলে, তা মুই এ্যাকটাও ভুলিনি। তা ওডা মোরে শিখিয়ে দাও, পিঁপড়ের ইনজিরি কি ?

—এ্যান্ট।

—এ্যান্ট ? এ্যান্ট এ্যান্ট-এ্যান্ট-এ্যান্ট—

জিউলি গাছটার তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য গ্রাজুয়েট আমি আমার পক্ককেশ গোচারণরত ছাত্রকে ইংরাজি ভাষায় পাঠ দিতে দিতে বড্ড দেরি করে ফেলি, বেলা যায় দেখে গণেশই বললে—তুমি এস দাদাঠাকুর। মুই গরু কডারে জল দেখিয়ে আনি পোড়ার খালে—আজ অনেক কথা শেখলনি—এ সব দেশ মুরুক্ষুর দেশ, ল্যাখাপড়ার কথা কেউ বলে না—মোর যত ইনজিরি ক'জনে জানে, ওই তো সব রাখাল ছোঁড়ারা গরু চরাচ্চে, কই ডেকে শুধোও না জলের ইনজিরি, ধানের ইনজিরি—সব মুরুক্ষু দাদাঠাকুর—সব মুরুক্ষু—

—পোড়ার খালে মাছ পড়চে আজকাল গণেশদাদা ?

—ওই হচ্চে দুচারটে—বান, ফলুই, স্তেচোকো—চলো না একদিন ধত্তি যাই—

—যাবো। দু-একদিন পরে।

—যে ক'ডা দিন গাঁয়ে থাকবা, মোরে শেখাবা কিন্তু—

—নিশ্চয়ই। এবার তোমাকে চার ডজন ইংরিজি কথা না শিখিয়ে আর—

—তোমাদের বাপ মায়ের আশির্বাদে যা মুই শিখিচি, তাতেই মোর সামনে কেউ দাঁড়াতি পারে ? ওই তো হিবু সরাবির ছেলে ওসমান গরু চরাচ্চে—ডেকে শুধোও না—

গণেশদাদা দূরে গোচারণরত একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বালকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

গ্রামে এসে গণেশদাদার কথা লোককে জিজ্ঞেস করলাম। ওর অবস্থা এত খারাপ হোল কেন ? কারণ শুনলাম ওর দুই ছেলেই মারা গিয়েচে। বুড়ো হয়েচে বলে লোকের বাড়ীতে কৃষাণের কাজে কেউ রাখতে চায় না। জমিদারের দেনার দায়ে সামান্ত একটু ভিটেসংলগ্ন জমি ছিল, তাও বিক্রী হয়ে গিয়েচে। নিজের লাঙল নেই বলে ভাগে চাষ করবার উপায় নেই —যার লাঙল নেই, তাকে বর্গা দেবে কে জমি ? সুতরাং এ-বয়েসে বাধ্য হয়ে ওকে গরু চরাতে হচ্চে।

গণেশদাদার বাড়ী গেলাম একদিন। ও বসে বসে কঞ্চি চাঁচচে—ঝুড়ি বুনবে। ঝুড়ি তৈরি করে হাটে বেচলে পয়সা হয়, কিন্তু ও ঝুড়ি বুনচে পরের ব্যাগার। এ আমি জানি। এর একটা মস্ত কারণ, ওকে পরের বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে আনতে হয়—অপরে তার দামস্বরূপ নেয় একটা ঝুড়ি, না তো একটা পাছ-ঘেরা কঞ্চির ঠোঙা। গণেশদাদার ঘরে কঞ্চির ঝোঁপের-বেড়া, চালে খড় নেই—একটা চালকুমড়ো লতা উঠিয়ে দিয়েচে চালে, চালকুমড়োর ফুল আর ফল যথেষ্ট হয়েচে, লতাগুলো চাল ছাড়িয়ে এদিক ওদিক ঝুলে পড়ে বাতাসে দুলচে, একটা ধাড়ি ছাগল ঘরের ছেঁচতলায় পরম তৃপ্তিতে কাঁঠাল পাতা চর্ব্বন করচে, ওর বৌ গৃহকর্ম্ম করচে—বেশ লাগল আমার। ঘরে পেতল-কাঁসার সংস্পর্শ নেই—মাটির কলসী, মাটির হাঁড়ি সরা, মাটির ডাবর, মাটির-ভাঁড়ে জল রাখা আছে। ভাত খায় কলার পাতায় নয়তো চাম্‌টার বিলের পদ্মপাতায়। আমাকে বললে—চালকুমড়ো একটা নিয়ে যাও দাদাঠাকুর।

—ও আমি কি করবো ?

—নিয়ে যাও, বেশ সুক্তুনি করো তোমরা। মোরা সুক্তুনি রাঁধতে জানিনে। বামুন-বাড়ীতে কত সুক্তুনি খেইচি আগে। পন্তার লাগে—

—কেন, বউদিদি সুক্তুনি করতে জানে না ?

—অত তেল মশলা কনে পাবো মোরা ? দাদাঠাকুরের য্যামন কথা। ও সব তরকারি কি মোরা খেতে জানি, না পারি ?

ওদের ঘরের দাওয়ায় একজন থুনথুনে বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলাম। গণেশদাদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও বললে—আরে ও সেই রতনের মা, ওরে চেনো না ? রতন ঘর ছেড়ে পালিয়েচে এক বাগদি মাগীকে নিয়ে। ওর মা যায় কনে ? কেউ দেখে না। দুদিন না খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছিল। তাই ওরে এনে রেখে দেলাম মোর এখানে। চকির ওপর না খেয়ে মরবে পাড়া পিরতিবাসী—চকি কি গ্যাখা যায় ? তাই ওরে এনে রেখে দেলাম। যদি মোদের জোটে, তোমারও একবেলা জোটবে! তাও নড়তে পারে না, জর, ছদি, কাশি। একটু হমনেপাতি ওষুদ এনে দিয়েলাম মগানন্দপুরের ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। দু আনা দাম নিয়েল—তা যদি কোনো উপ্‌গার হোলো দাদাঠাকুর—তুমি জানো হমনেপাতি ?

—না আমি জানিনে। আচ্ছা আমি দেখবো এখন ওবেলা ওষুধের ব্যবস্থা।

—কি দেবো তোমারে দাদাঠাকুর ভাবচি—

—কিছু দিতে হবে না। তুমি কথা বলো আমি শুনি—

কিন্তু কথা কইতে গণেশদাদা জানে না। তার সংকীর্ণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে আজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে, সে যতই সামান্য হোক, বলতে জানলে তাই নিয়েই চমৎকার কথার জাল রচনা করা যেতো যা আকাশকে বাতাসকে রাঙিয়ে দিতে পারতো, শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে পারতো—চাম্‌টার বিলের পদ্মফুলের পদ্মগন্ধি রেণু আমার নাকে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারতো। গণেশদাদা সে সব পারে না। তবুও ওর সঙ্গ আমার এত ভালো লাগে। কথার দরকার হয় না, ওর নিরুপকরণ ও অনাড়ম্বর সাহচর্য্যই আমার মনে একটি মৌন লিরিকের আবেদন বহন করে আনে।

সেবার চলে আসার পর পাঁচ ছ' বছর হবে গণেশদাদার সঙ্গে আবার দেখা।

গণেশদাদার মাথার চুল পেকে একেবারে শনের নুড়ি হয়ে গিয়েচে, পিঠের দিকটা বেঁকে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েচে—সামান্য।

শরৎকাল। পুজোর ছুটি। সেবার নদীতে একটু বন্যার আভাস দেখা গিয়েছে। কাশফুল ফুটে আলো করেচে নদীর দুই পাড়। নদীর ধারের মাঠে গণেশ গরু চরাচ্চে, খুঁজতে খুঁজতে বার করলাম ওর মাথার চুল আর ওর চারিপাশে কাশফুল একই রকম দেখতে। বৃদ্ধ গণেশদাদা সেই পাঁচ-সাত বছর আগের মত তাল পাতার ছাতি মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে গরু চরাচ্ছে। কোঁচড় থেকে বের করে কি খাচ্ছিল, আমায় দেখে লজ্জিত সুরে বললে—সৈরভির মা দুটো চাল ভাজা দেলে, বললে, গরম-গরম একখোলা নামিয়ে ফেললাম, তুমি দুটো নিয়ে যাও—তাই নিয়ে এল্যাম। বেশ লাগে।—তা এলে কবে দাদাঠাকুর? আর দ্যাখো বড্ড বুড়ো হয়ে পড়িচি, তুমি আসচো, কিন্তু মুই বুঝতে পারলাম না। বলি, কেডা আসে বাবুপানা? চকি তেমন আর ঠাওর হয় না—

—চালভাজা খাচ্চ, দাঁত আছে?

—তা আছে তোমার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে। বলি ও কথা যাক, বিয়ে-খাওয়া করেচ?

—না। বিয়ের আর বয়েস নেই।

—কি কথা বলো দাদাঠাকুর? তোমারে কোলে করে মানুষ করলাম, কালকের কাঁচা ছেলে, বয়েস ফুইরে গেল তোমার? ও কথা বোলো নি। মা লক্ষ্মীকে দেখে চক্ষু বুজোবো। বিয়ে করো—কি করচো আজকাল?

—চাকরি করচি।

—বেশ বেশ। মোদের শুনেও সুখ। তা বোসো। এই গাছটার ছিঁয়াতে বোসো—হ্যাদে, তোমরা টুপি পরো? বেনার ডাঁটার খাসা টুপি বুনি দিতি পারি। পক্কার সায়েবের টুপি। নেবা?

—না, আমি সায়েবের টুপি পরিনে।

—বোসো। জিরোও, বড্ড রদ্দুর।

কি সুন্দর নীল আকাশ কাশফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। সাধারণ

ধরনের নীল নয়, সে এক অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের নীল। ওপর থেকে হু হু হাওয়া বইচে, গণেশদাদার মাথার সাদা চুল বাতাসে কাশফুলের মত উড়চে। আমার কাছে ছবিটি বেশ লাগে।

গণেশদাদা এইবার চালভাজা খাওয়া শেষ করে নদীর পাড় বেয়ে জলে নেমে দুহাতে আঁজ্‌লা করে জল খেয়ে নিয়ে সরস তৃপ্তির সঙ্গে 'আ' বলে একটি দীর্ঘস্বর উচ্চারণ করলে। আমার কাছে এসে বললে—তামুক খাবা ?

—খাই নে।

—দাঁড়াও সাজি। মোর দা-কাটা খরসান তামাক, বড্ড তলব। কিছু নেই, শুধু তামাক আর গুড়। বাজারের তামুকে চুন মেশায়। বলি হ্যাদে দাদাঠাকুর, একটু শুধোও দিকি ?

—কি ?

—সেই ইন্‌জিরি। মুই মুখস্ত বলবো ? ওভার মানে ওপর, ওয়াটার মানে জল, বাড্ মানে পাখী, বালির ইন্‌জিরি স্যাণ্ড, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই—

—উঁহু—

—কি, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই নয় ?

—না। তবে কি এ্যাণ্ট ?

—না, এ্যাণ্ট মানে পিঁপড়ে। মাছের ইংরিজি ফিশ্, মাছির ইংরিজি ফ্লাই।

—হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। বলি হ্যাদে বয়েস হয়েচে আজকাল অনেক, সব কথা ঝকরে মনে পড়ে না, বেস্মরণ হয়ে যাই। আর তুমি না এলি তো চর্চ্চা হয় না, সব মুরুক্ষু—কার সঙ্গে ইন্‌জিরি বলবো বলো দিকি ?

আর এক ডজন ইংরিজি শব্দ বসে বসে আমার জ্ঞানপিপাসু শুভ্রকেশ ছাত্রকে শিক্ষা দিলাম, সেই কাশফুল-ফোটা চরে বসে শরতের অপরাহ্নে। আগের শেখা শব্দগুলোও একবার সে ঝালিয়ে নিলে মহা উৎসাহে। তারপর সেই বিদ্যার বোঝা বহন করে সেই বছরের মাঘ মাসে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গণেশদাদা পরলোক যাত্রা করলে। পর বৎসর পুনরায় দেশে ফিরে গিয়ে আর ওকে দেখতে পাই নি।

কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশদাদা সারাজীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছে ছিল। তাই আজকার দিনে বার বার তার কথা মনে পড়ে।

অনুসন্ধান

নারাণ মাস্টার সকালে উঠে স্ত্রীকে চা দিতে বললেন। স্ত্রী মনোরমা বললেন,—চাও নেই, চিনিও নেই। দুধ তো দিয়ে যায় নি গোয়ালা। দু-মাস তাকে টাকা দেওয়া হয় নি। তুমি সংসারের কিছুই দেখ না। আমি কি করে একা সংসার চালাই ?

বাইরে থেকে ছেলেরা বললে, বাড়ী আছেন স্যার ? নারাণ মাস্টার হন্তদন্ত হয়ে স্ত্রীকে বলেন, একটু করে দাও যা হয় করে। ওরা সব এসে গেল।

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, এলে কি হবে ? শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তোমার হয়েছে তাই। কারো কাছে পিত্যেস নেই, ওদের পেছনে ভূতের মত খাটুনি। এর চেয়ে টুইশানি ধরলে তো কাজ হয়, দু-পয়সা আসে।

বাইরে একখানা চালাঘরে গ্রামের চাষাভূষোদের অনেকগুলো ছেলে জুটেছে। নারাণ মাস্টার তাদের কাউকে অক্ষর পরিচয় করান, কাউকে ভাঙা একটা গ্লোবে ভূগোল শেখান, একজনকে কবিতা পড়তে শেখান। একটি গরীব ছেলেকে বলেন,—কি খেয়ে এসেচিস্ সকালে ? কিছু না ? শোন্, তোর কাকীমার কাছে গিয়ে বল দুটি মুড়ি দিতে। আমি বলে দিয়েচি যেন বলিস নে ?

ছেলেটি ইতস্ততঃ করে। সে তার কাকীমাকে চেনে। সেখানে যেতে তার সাহসে কুলোয় না, তবু নারাণ মাস্টারের মনস্তুটি করবার জন্যে পায়ে পায়ে অন্দরের দিকে এগোয়। মনোরমা বসে ধান সিদ্ধ করচেন রান্নাঘরে। ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ডাকতে সাহস হয় না। মনোরমা হঠাৎ এগিয়ে বলে,—কে ? বিষ্টু ? কি রে ?

—এই—এই—

—কি ?

—মাস্টার মশায় বলে দিলেন, এই—মোরে দুটি মুড়ি দিতি !

—তা আর বলে দেবেন না কেন ? তাঁর কি ? কোথা থেকে কি জোটে তাঁর সেদিকে কতটুকু খেয়াল থাকে ? যা মুড়ি নেই। বল্ গে যা—

নারাণ মাস্টার খেতে বসেচেন। বাড়ীর পাশের এক গরীব গেরস্তবাড়ীর ছোটো ছেলে ওৎ পেতে থাকে, কখন তিনি খেতে বসবেন। যদি না আসে, নারান মাস্টার ডাকেন,—

—আয় বিলু, আয়—

বিলু বলে—কি ? হ্যাঁ ?

সে ওই দুটো কথা বলতে শিখেচে।

হেঁটে স্কুল যেতে হয় অনেকদূর। দেরি হয়ে যায়, পথে যেতে যেতে শোনেন স্কুলের ঘণ্টা বাজচে। সাত মিনিট লেট্। হেড মাস্টার নীরদ রায় বড় কড়া লোক, বয়স পঞ্চাশের ওপর, চোখে চশমা, লম্বা দোহারা চেহারা।

—এত দেরি হোলে রোজ রোজ চলবে না, নারাণবাবু—

নারাণবাবু অপ্রতিভ মুখে হাজিরা খাতাখানা টেনে নেন। কিন্তু আরও পাঁচ মিনিট পরে হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু এসে একগাল হেসে বলেন,—উঃ, কি রোদ আজকে স্যার। গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

হেড মাস্টার বলেন,—আপনার মেয়ের বিয়ের ঠিক হোল হুগলীতেই? বসুন, বসুন—

—দুটো পান নিন স্যার।

একটি ছেলে ক্লাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নাম ইন্দুভূষণ। সুন্দর চেহারা। নারাণবাবুকে এগিয়ে এসে ক্লাসে নিয়ে যায়। ক্লাসে ছেলেদের ভিড়। নারাণবাবুকে সবাই ভালবাসে। পছন্দ করে, ভয়ও করে। ক্লাস চুপ হয়ে যায়—একবার মৃদু ভর্ৎসনায়। অঙ্ক কষান, বোর্ডে খড়ি দিয়ে।

ইন্দুভূষণ বলে—অঙ্ক কষার পরে সেই গল্পটা বলুন স্যার।

সব ছেলে সায় দেয়। নারাণবাবু বলেন জানলাগুলো খুলে দাও, দেখো তো কেমন সুন্দর। মাঠ, গাছপালা ভগবানের তৈরি সুন্দর পৃথিবীকে চোখ ভরে দেখতে শেখো। শুধু বইয়ের পড়া পড়লে মানুষ হবে। চোখের দৃষ্টি ফুটুক।

ইন্দুভূষণ বলে—ঐ দেখুন বাঁশঝাড়ের আকাশটা কেমন ময়ূরকণ্ঠী রং। নদীর ওপারে কি রকম কাশফুল ফুটেচে!

নারাণবাবুর মন আনন্দে ভরে ওঠে। এই একটি ছেলেকে তিনি অন্ততঃ দৃষ্টিদান করতে পারবেন হয় তো। ইন্দুভূষণ স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে—নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছে, এমন সময়ে হেড মাস্টার দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নজরে এক চমক ক্লাস রুমের দিকে চাইলেন। ইন্দুভূষণের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। নারাণবাবু থতমত খেয়ে গেলেন।

পাশে অন্য একটি ক্লাস। হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন।

মনোরমা স্বামীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষা করে। ও বেলা সত্যিই কিছু ছিল না খেতে দেবার। ভর্ৎসনার স্বরে কথা বলেচেন। দুপুরে সেই দুঃখ মনে বড় বেজেচে। একটু চা দিতেও পারেন নি।

নারাণ মাস্টার বলেন,—অত হাসি-হাসি মুখ কেন? কি খেতে দিচ্ছ।

মনোরমা বলেন,—হাত পা ধুয়ে নাও, এসো। স্বামীকে জল এগিয়ে দেন। পাখার বাতাস করেন।

নারাণবাবু জিগ্যেস করেন—ননী আজ ইস্কুলে যায় নি কেন?

মনোরমা মিথ্যে করে বলেন—পেটের অসুখ হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, ননীমাধব অত্যন্ত অবাধ্য প্রকৃতির ছেলে, এ বয়সে অনেক রকম ছল-চাতুরি শিখেচে। তার মাঠে বিলে জল বেড়েচে। সেখানে মাছ ধরতে গিয়েচে, পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে।

স্বামীর জলখাবার ও চা দেন মনোরমা। তালের বড়া আর চা। গরম গরম বড়া ভাজেন, আর ভালো ভালো দেখে স্বামীর পাতে তুলে দেন।

বাইরে ছেলেরা এসে ডাকে—বাড়ী আছেন স্যার? নারাণবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

মনোরমা বলেন—বোসো বোসো। অত খাটলে শরীর থাকবে কেন? একটু খোলো। আর দু-খানা ভেজে দিই।

সেই ছোট ছেলেটি এসে টলতে টলতে নারাণবাবুর পাশে বসে যায়। ওর মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান।

নদীতীরে প্রতিদিন একটু করে বেড়াবার অভ্যেস আছে নারাণ মাস্টারের। ইন্দুভূষণ ও আরো দুটি ছেলেকে নিয়ে নক্ষত্র সংস্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন আজ।

ইন্দুভূষণ বলেচে, ভেনাস কোন্‌টা স্যার?

নারাণ মাস্টার বলেচেন—ওই বাঁশঝাড়ের মাথার ওপরে—ঐ দ্যাখো।

—বেশ বড় নক্ষত্র—

—ওটিকে নক্ষত্র বলে না। ওটি গ্রহ। সৌর জগতের একটা গ্রহ। অন্য অন্য গ্রহগুলির নাম করো তো? তোরা দেখেচিস্ শুক্র গ্রহ?

—ঐ বাঁশ ঝাড়ের মাথায়?

হঠাৎ সেদিকে দেখা গেল ননীমাধব জলের ধারে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে। বাপকে দেখে ননীমাধব ততক্ষণ ছিপ গুটিয়ে ফেলে। নারাণ মাস্টার দুঃখিত হন। বলেন—তুই তো আজ ইস্কুলেও যাস নি—অথচ তোর দিদির বাড়ী গিয়েচিস্ শুনলাম বাড়ীতে।

ননী চুপ করে রইল। নারাণ মাস্টারের মেয়ের বিয়ে হয়েচে পাশের গ্রামেই।

—তোর মার কাছে বলে এসেছিস্ দিদির বাড়ী যাচ্চি?

—হ্যাঁ।

—কেন মিথ্যে কথা বলতে গেলি? অমন করে আর কখনো বলবে না। মিথ্যে কথা কারো কাছে কখনো বলবে না। সত্য কথা বলবে, এতে যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাও ভালো। সর্ব্বদা মনে রাখবে এটি। কেমন তো? আচ্ছা বাড়ী যাও।

বাড়ীতে মনোরমা সন্ধ্যা প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করলেন। পাশের বাড়ীর গাঙ্গুলি-বৌও শুভদা ঠাকরুণের কাছে সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলেন। শুভদা এসেচেন তেল ধার নিতে। গরীব বিধবা। মনোরমা যেটুকু তেল আছে, তার বেশি অংশটা শুভদাকে ঢেলে দিলেন। স্বামীর কথা বলেন ওঁদের কাছে।

—এমন লোক যদি দেখে থাকি কখনো পিসি। সংসারের দিকে নজর নেই; কোনো দিকে নজর নেই। কি নিয়ে যে লোকটা থাকে দিনরাত! মেয়েটার ওই কষ্ট, তখুনি বলেছিলাম ছোরের কাছে কুটুম্ব করতে নেই। দু-বেলা কথা শুনতে হবে, তখন তা শুনলেন

' না। এখন তাই হচ্ছে, যা বলেছিলাম।

শুভদা ঠাকরুণ বললেন—শাশুড়ি খারাপ না হয় বুঝলাম। কিন্তু জামাই তো শুনেচি বড় ভালো ছেলে।

—ভালো হোলে কি হবে পিসি, মায়ের কাছে জুজু। মার সামনে কথা বলতে পারে ছেলে? উনি বলেন, মায়ের বাধ্য হয়ে থাকাই ছেলের উচিত। বললাম যে, কোনোদিকে নজর নেই ওঁর—চাল নেই, তেল নেই, আজ বাদে কাল সকালে কি হবে ঠিক নেই—কে শুনচে সে সব কথা। ছাত্রদের নিয়েই ব্যস্ত। কেউ এক পয়সা দেবে না, ভূতের ব্যাগার খেটেই খুশি। আচ্ছা, বলো তো পিসি, এ কি রকম কাণ্ড?

নারাণ মাস্টার বাইরে থেকে হাঁক দেন এই সময়ে—একটা আলো ধরো। বাইরের দিকে বড্ড অন্ধকার।

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, সাতটা লণ্ঠনে আলো জ্বেলে তোমার জন্তে বসে আছি যে! পিপে পিপে তেলের ব্যবস্থা করে রেখেচ যে! এলে কোত্থেকে আমার মাথা কিনে, জিগ্যেস করি?

নারাণ মাস্টার লজ্জিত মুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোঁচট খান। মনোরমা বলেন—লাগলো নাকি? তোমার দেহটা এমনি করেই সাতখোয়ারে যাবে। দেখি কোথায় লাগলো?…

মনোরমা রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরি করচেন। ননীমাধব খিড়কী দোর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে বললে মা, বাবা কোথায়?…বাটিতে কি?

—ওঁর জন্তে দুটো চিঁড়ে ভাজা করেচি ঘি দিয়ে। না খেয়ে খেটে খেটে ওঁর শরীরটা যে গেল! এই খানিক আগে এমন হোঁচট খেলেন যে পা ভেঙে যেতে যেতে রয়ে গেল। ও থেকে তোমাকে না। তোমার জন্যে চালভাজা আছে—তেল মেখে দিচ্ছি। দিদির বাড়ী যাস নি?

—হুঁ।

—কেমন আছে সে? এতক্ষণ সেখানে ছিলি? কি খেতে দিলে?

—কিছুই না। ঘণ্টাকর্ণ। দাও চিঁড়েভাজা—দিদি ভাল আছে।

—না—না। এ ওঁর জন্যে ঘি দিয়ে ভাজা। তোকে এর পরে দেবো এখন। বোলো গে যাও!

নারাণ মাস্টার চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেন।

মনোরমা বলেন—ননী এই এল অমলার শ্বশুর বাড়ী থেকে। অনেকক্ষণ ছিল সেখানে। অমলা ভাল আছে।

নারাণ মাস্টার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কে বললে এ সব কথা?

—কেন ননী বললে, আবার কে বলবে। সে এই তো এল ওর দিদির বাড়ী থেকে। রান্নাঘরে বসে খাবার খাচ্ছে।

নারাণ মাস্টার একবার ভাবলেন স্ত্রীকে ছেলের গুণের কথা সব খুলে বলেন। তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও সে আবার তার মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেচে। কিন্তু সরলা পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে নারাণ মাস্টার সে কথা চেপে গেলেন।

বাইরে থেকে ছেলেরা ডাক দিলে—বাড়ী আছেন স্যার? ছেলেরা পড়তে এসেচে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নারাণ মাস্টার।

নারাণ মাস্টার স্কুলে গেলেন। হেড মাস্টার আজ আর কিছু বলেন না। ক্লাসে ক্লাসে ছেলেরা তাঁকে নিজের নিজের ক্লাসে পাবার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। ইন্দুভূষণের ক্লাসে নারাণ মাস্টার ঢোকেন। একটু পরে হেড মাস্টার এসে গম্ভীর ভাবে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে গেলেন, এ ক্লাসটা তাঁর নয়। রুটিনটা দেখে ঢুকলেই তো হয়।

অঙ্ক কষাতে কষাতে কি করে এসে পড়ে সূর্য্যের কথা। সূর্য্য আছে বলে, জগতে রঙের খেলা অদ্ভুত—নারাণ মাস্টার বোঝান। তা থেকে নিউটনের কথা এসে পড়লো—জ্ঞান-তপস্বী নিউটন।

বাইরে দাঁড়িয়ে হেড মাস্টার শোনেন। নারাণ মাস্টারের জনপ্রিয়তা হেড মাস্টারের চক্ষুশূল।

একটু পরে মাখনলাল সুর স্কুলে এসে ক্লাসে ক্লাসে বেড়াতে বেরুলেন। মাখনলাল সুর দু-তিনটি তেলের কলের মালিক। কালো, মোটাসোটা চেহারা, মুখখানাতে দাম্ভিকতা মাখানো। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, টাকার জোরে স্কুলের সেক্রেটারি হয়েচেন বলে শিক্ষকদের ওপর প্রভুত্ব একটু বেশি করেই খাটান।

বিভিন্ন ক্লাসে ঢুকে পরীক্ষা করেন। প্রথমে ক্ষেত্রবাবুর ক্লাস। ক্ষেত্রবাবু সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান। বলেন, পড়িয়ে যান—আমি শুনি। বাংলা সাহিত্য পড়াচ্ছেন ক্ষেত্রবাবু। সুরমশায় বলেন, ও সব কি আর কবিতা? কবিতা ছিল সেকালে যদু মুখুয্যের। কুব্জপৃষ্ঠ হ্রস্বদেহ উষ্ট্র সারি সারি, কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি, ইত্যাদি।

কৌটো খুলে পান খান ক্লাসের মধ্যেই।

তারপরে যদুবাবুর ক্লাস। ইতিহাস পড়াচ্ছেন যদুবাবু, মন দিয়ে শিবাজির জীবনী বর্ণনা করচেন ছেলেদের কাছে।

মাখন সুর এক অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—বলো দিকি, দাশু রায় পাঁচালি লিখেছিলেন কত সালে? মাস্টার বলে দাও না ওদের। দাশু রায়—আহা, অমন গান আর কেউ বাঁধতে পারবে না—

তারপর নারাণবাবুর ক্লাস। নারাণবাবু মশগুল হয়ে গিয়েচেন অধ্যাপনায়; কিন্তু তিনি অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করচেন ক্লাসে। মাখন সুর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি না অঙ্কের মাস্টার? আমি শুনেচি আপনি ক্লাসের পড়া না করিয়ে ছেলেদের কাছে বাজে গল্প করেন।

নারাণবাবু বললেন,—কথাটা উঠলো কিনা, আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী বিশেষতঃ কবিতায়। তাই আবৃত্তির নিয়মটা ওদের—

—তা শেখাবার কোনো দরকার নেই। আপনি যে জন্তে আছেন, তাই করুন। আমি অনেকদিন থেকে শুনে আসচি, কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখলাম।

একটু পরে চাকরে এসে একটা স্লিপ দিয়ে গেল। নারাণবাবুর তলব হয়েচে হেড মাস্টারের ঘরে।

নারাণবাবু পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দেখেন হেড মাস্টার অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখে বসে। বললেন—আপনি কোনো কাজ করেন না ক্লাসে—ছেলেদের যা পড়ান তা সিলেবাসের বাইরে। সেকেণ্ড ক্লাসে এ্যালজেব্রা কতদূর করিয়েছেন দেখি এ বছর। মোটে সিম্পল ইকোয়েশন ধরাচ্ছেন? তা' হোলে কবে কোর্স শেষ করবেন আপনি? আপনাকে নিয়ে বড় মুশকিল হোল দেখচি। আপনার পুরোনো রোগ গেল না। সেই বাজে গল্প করা।

নারাণবাবু বললেন—আমি বাজে গল্প করি নে—ছেলেদের উদার দৃষ্টি যাতে খোলে তার চেষ্টা করি।

—টেক্‌স্ট বইয়ের যে একটা জগৎ আছে—তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনাকে রাখা হয় নি এখানে? **Know this school to be a machine for turning out matriculates**—আপনাকে আর কত শেখাবো বলুন—

যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু ও রাখালবাবু, নারাণবাবুকে জিগ্যেস করেন শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে—ব্যাপারটা কি হয়েছিল নারাণবাবু? সব শুনে যদুবাবু খুব লাফঝাঁপ দেন।

—আমি হোলে অমন হেড মাস্টারকে দেখিয়ে দিতাম। দু-কথা দিতাম শুনিয়ে আচ্ছা করে। সিলেবাস শেখাতে এসেচে? সিলেবাস্? অন্ত্যজ কোথাকার। মুখের মত জবাব দিয়ে দিতাম আজ—

ক্ষেত্রবাবু বলেন—একটু আস্তে—আস্তে—

—কিসের আস্তে, ভয় করি নাকি? এ শর্ম্মা কাউকে থোড়াই কেয়ার করে তা বলে দিচ্ছি।

স্কুলের চাপরাশি এসে ডাকলে—হেডমাস্টারবাবু যদুবাবুকে ডেকেচেন—

যদুবাবু হঠাৎ বাতাস-বের-হওয়া বেলুনের মত চুপসে গেলেন। হেড মাস্টারের ঘরে জড়িত পদে ঢুকে বললেন, আমাকে ডাকচেন?

—হ্যাঁ, আপনি শনিবার ফোর্থ ক্লাসের উইকলি পরীক্ষার নম্বর এখনো কেন দেন নি?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

না, যদুবাবু! আজ ন'দিন হয়ে গেল—কাজে আপনার বড় গাফিলতি হচ্ছে। গত-বারও এমনি করেছিলেন আপনি। এ রকম আর কখনো করবেন না আশা করি। ওতে

ছেলেদের অসুবিধে হয়। বুঝলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। তার আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল বলেই, নইলে এতদিন—

—আচ্ছা, এখন আসুন তবে।

শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে ফিরে আসতেই অন্য সব মাস্টার আগ্রহে জিগ্যেস করেন—কর্তা কি জন্যে ডেকেছিলেন হে? যদুবাবু হাত-পা নেড়ে বলেন—দিয়ে এলুম শুনিয়ে দু-কথা। আমায় বলে কিনা ফোর্থ ক্লাসের খাতা ফেরত দিতে এত দেরি হল কেন? আমি মুখের ওপরে বলে এলাম মশাই, চল্লিশ টাকা মাইনেতে তো চলে না, আমাদের টুইশানি করে খেতে হয়। সময় পাই কখন যে খাতা সকাল সকাল দেখে দেবো! দিলাম শুনিয়ে।

—বললেন ওই কথা?

—বলবো না? এ শর্মা থোড়াই কেয়ার করে। হি মাস্ট বি টোল্ড সাম হোম ট্রুথ—

পাশের বাড়ীতে রেডিওতে গান হয়। ও যেন একটি অন্য জগৎ, রসের জগৎ। যে জগতের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনো পরিচয় নেই। শিক্ষকেরা কান পেতে শোনেন।

বেরিয়ে এসে সবাই একটা চায়ের দোকানে বসেন। ভাঙা পেয়ালায় চা খান। নারাণবাবুর অপমানে সবাই দুঃখিত। রাখালবাবু বলেন—যেদিন এদেশে শিক্ষকতার কাজ সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে, সেদিন বুঝতে হবে জাতি হিসেবে আমরা জেগেছি। আমাদের স্থান কোথায়, নারাণবাবুর ওপর মাখনবাবুর ব্যবহারেই বুঝে নেওয়া যাবে।

রাখালবাবু নারাণবাবুকে নিজের বাড়ী নিয়ে যান। বড় শ্রদ্ধা করেন তিনি তাঁর এই সরল অকপট উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন সহকর্মীটিকে। রাখালবাবু বিদেশী শিক্ষক, এখানে তাঁর বাসা। বাসাতে তাঁর স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে ও ভাইঝি নিভা থাকে। নিভার বয়স বছর আট নয়, ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়েটি। নারাণবাবু তাকে কাছে ডেকে আদর করেন।

নারাণবাবুর মেয়ে অমলার শ্বশুর বাড়ী। অমলার শাশুড়ী তার ওপর অত্যন্ত কুব্যবহার করে। ছেলে সুকুমারের সঙ্গে অমলার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। অমলা সেজেগুজে জানলায় বসে আছে—আজ স্বামী কলকাতা থেকে আসবে অনেকদিন পরে।

শাশুড়ী এসে বলেন—বলি, হ্যাঁগা বৌমা, বিকেলে ঝাঁট নেই, পাট নেই—দোরে জল দেওয়া নেই—অমন পটের বিবি সেজে জানলায় বসে রয়েছ কেন? সেগুড়ে বালি। সুকু আজ আসবে না চিঠি লিখেচে। - তুমি উঠে গিয়ে ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে এসো আর এ বেলার ভাত চড়িয়ে দাও গে।

অমলা সলজ্জ মুখে উঠে গেল রান্নাঘরে। তার মন ভেঙে গিয়েছে। স্বামী সে কথা তো

গতবার বলে যান নি। শাশুড়ী মিথ্যে কথা বলেছিলেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে সুকুমার এল। অমলার জন্তে শাড়ী নিয়ে—নিজে আহ্লাদ করে দেখাতে গেল। মা কাপড়খানা ছিনিয়ে নেন ছেলের হাত থেকে। বলেন—এ আমার পাঁচীর সাধের সময় তাকে দেবো। বৌয়ের জন্তে আর রোজ রোজ কাপড় আনতে হবে না। যে গুণধর বৌ। সংসারের কুটোটুকু দু-খানা করে উপকার নেই। সারা বিকেল সেজেগুজে ঠায় বসে রইল জানলায়। বলে, কোনো কাজ করতে পারবে না। যেমন হেজল-দাগড়া তেমনি বদমাইস। হবে না? ছোট ঘরের মেয়ে যে! ওর বাবার নাম পাগলা মাস্টার।

অমলা আড়াল থেকে স্বামীকে দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবার প্রতি অমন অপমানসূচক শব্দ প্রয়োগে সে আর স্থির থাকতে পারে না।

সামনে এসে বলে—বাবার নামে অমন যা তা বলবেন না আপনি। আমি কি করেচি না করেচি আপনাদের তা জানি নে, কিন্তু আমার বাবা যে কারো কোনো অনিষ্ট করেন নি বা করতে পারেন না এটা আমি ভালো করেই জানি।

শাশুড়ী ঠাকরুণ রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করলেন। ছেলেকে দিব্যি দিলেন সে যেন ও বৌয়ের মুখদর্শন না করে। অনেকরাত্রি জেগে দু-জন দু-জানালায় বসে রইল।

সেদিন নারাণবাবু আহার করতে বসে বললেন—এঁচড় কোথা থেকে পেলে? অসময়ে এঁচড়।

মনোরমা বললেন—আমি জানে নে, ননীমাধব কোথা থেকে এনেচে।

নারাণ মাস্টার বললেন—কোথা থেকে আনবে? এ নিশ্চয় অন্ত কারো গাছ থেকে চুরি করে এনেচে। আমাদের নিজেদের গাছ নেই—কেই বা দেবে অসময়ে? বলি শোনো, চুরির জিনিস আমার পেটে সইবে না। আমার সংসারে কেউ খাবে না। ফেলে দাও সবটুকু।

মনোরমা অনেক যত্ন করে দরিদ্র সংসারে অসময়ের এঁচড় রেঁধেছিলেন। স্বামী খেতে ভালবাসেন বলে তাঁর অত আগ্রহ। এই আগ্রহের জিনিসটা নির্মম ভাবে ফেলে দিতে তাঁর চোখে জল এল। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না মুখে। তিনি তাঁর স্বামীকে ভাল ভাবেই চেনেন। অনুনয় বিনয়ে এক্ষেত্রে কোনো ফল হবে না। অভিমান করে চুপ করে রইলেন।

মনোরমাকে বুঝিয়ে বললেন নারাণ মাস্টার—দেখো, ছেলেকে শুধু উপদেশ দিলে কাজ হবে না। "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়"—আমরা পিতামাতা, এই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া দরকার। মুখে বলি, অথচ চুরির এঁচড় রেঁধে খাই—এতে ছেলেপিলে ভালো উপদেশ কখনো নেবে না। আমি জানি তোমার মনে কষ্ট হয়েচে, কিন্তু আমি যে পিতা, তুমি যে মা—আমরা যে শিক্ষক।

নারাণ মাস্টারের ক্লাসে জানলা বন্ধ ছিল। তিনি ক্লাসে গিয়েই জানলা খুলে দিতে বলেন।

ছেলেদের বলেন—মনের জানলাও সব সময় ঐ রকম খুলে রাখতে হবে। ভাখো তো কেমন নীল আকাশ? চোখকে তৈরি করো বাইরের সৌন্দর্য্য দেখতে। জীবনে মস্ত আনন্দ পাবে।

হেড মাস্টার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। একটু পরে ডেকে পাঠালেন।

—কেন ডেকেচেন স্যার?

—এদিকে আসুন, বসুন দয়া করে।

নারাণ মাস্টার বসেন। হেড মাস্টার বলেন—আপনাকে কথাটা বলি। আপনার অঙ্কের ফল অত্যন্ত খারাপ এবার। কাল পরীক্ষার নম্বর আনিয়েচি ইউনিভারসিটি থেকে। ছ-টা ফেল অঙ্কে। আপনি এদিকে দেখি ক্লাসে বসে আর্টের চর্চ্চা করেন। সেজন্তে কি আপনাকে রাখা হয়েচে স্কুলে? কতবার না আপনাকে একথা আমি বলেচি? বড় দুঃখের বিষয় নারাণবাবু।

নারাণবাবু চুপ করে থাকেন। সাহস করে কিছু বলতে পারলেন না।

রাখালবাবু টিচার্স রুমে বসে সব কথা শুনে বলেন—ও, আর ওঁর সাবজেক্টে যে এগারটা ফেল! তার বুঝি কোনো কৈফিয়ত নেই? গরীবের ওপর যত জুলুম। বেশ!

বাজারে এসে সেই দোকানে মাস্টারেরা ভাঙা পেয়ালায় চা খান। সেখানে রাখালবাবু কথাটা তোলেন। স্কুল কমিটির অবিচার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। একজন মাস্টার (যদুবাবু) বলেন, শুধু টিউশনি করি সকাল থেকে পাঁচটা। বিকেলে আরো পাঁচটা। তাতেও কি সংসার সুচারু রূপে চলে? একটি বড় মেয়ে ঘাড়ে। দেশের তরুণদের যাঁরা গড়ে তুলবেন, গোটা জাতিটিকেই তাঁরা গড়ে তুলচেন—তাঁদের দিকে কে তাকায়?

ভগ্নমনে যে যাঁর বাড়ী যান। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

যদুবাবু বলেন—তোমরা যাও, আমি আবার গুণী মল্লিকের বাড়ী প্রাইভেট পড়াতে যাবো।

—খেলেন না কিছু? বাড়ী যাবেন না?

—বাড়ী গেলে সময় পাবো কখন? ওই কোনোদিন রাস্তায় খেতে খেতেই পথ চলি —দু-এক পয়সার বিস্কুট কি মুড়ি। কোনোদিন তারও সময় হয় না। আমাদের আবার খাওয়া, তুমিও যেমন ভায়া!

স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে সভা। সভায় নারাণ মাস্টারের ছাত্র ইন্দুভূষণ চমৎকার আবৃত্তি করলে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—এমন আবৃত্তি শিখিয়েচে কে?

—নারাণ মাস্টার মশাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম মিঃ কান্‌ওয়ার। পাঞ্জাবী। কেম্বি্রজের গ্রাজুয়েট। নারাণ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওঁর বাড়ী আসেন। পথে যখন হুর কি একটা কথা

বলতে গেলেন খোশামুদের ভাবে হাত জোড় করে—স্যার, আমাদের জয়েল বিলের লাইসেন্সটার বিষয় একবার—

মিঃ কানওয়ার বিরক্তির সুরে বললেন—আভি নেই—নট নাউ—কাম এ্যাণ্ড সি মি ইন্ মাই অফিস্—

মিঃ কান্‌ওয়ারকে নারাণ মাস্টার পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বোঝান। জ্যোৎস্না রাত্রি। মিঃ কান্‌ওয়ার বলেন—মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি একজন আইডিয়াল টিচার—আপনি আমাকেও Rural Bengal-এর রূপটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন—আমি আপনাকে মনে রাখবো—

মনোরমা ভাঙা পেয়ালায় ছু-জনকে চা দেন।

মাখন সুরের বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড। সব মাস্টার ভৃতের মত খাটচেন। কেউ অভ্যর্থনা করচেন, কেউ রান্নার তদারক করচেন।

নারাণ মাস্টারকে মাখনবাবু বলেচেন চা দেওয়া পরিদর্শন করতে। সার্কেল অফিসার মিঃ সুধীন বসুকে চা নিজের হাতে দিতে বলেন। নারাণবাবু চা দিতে গেলে তরুণ মিঃ বসু উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বলেন—স্যার আপনি কেন? রাখুন, রাখুন—আমায় চিনতে পারলেন? আমি সুধীন। আপনার ছাত্র। নারাণ মাস্টার বলেন—কোন্ বছর পাস করেছিলে বাপু, এসো এসো, দীর্ঘজীবী হও। মনে তো হচ্ছে না।

—মানিকদের ব্যাচ, উনিশশো ত্রিশ সালে ম্যাট্রিক পাস করি স্যার। আপনি আমার গুরু।

—বেশ, বেশ, বেঁচে থাকো বাবা, আজকাল তুমি কি আমাদের সার্কেল অফিসার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

—আমাদের বাগদি পাড়ায় একটা টিউবওয়েল করে দিতে পারো বাবা? খালের নোংরা জল খেয়ে সব কলেরায় মরচে। আমার দুটি ছাত্র মারা গিয়েচে। ওরা গরীব, তোমাদের সামনে অভাব অভিযোগ জানাতে পারে না। এই কাজটি তোমার গুরু-দক্ষিণা হবে বাবা, যখন গুরু বলে ডাকলে তখন বলি।

ছেলেটি খাতা বের করে বললে—গ্রামের নাম আর পাড়াটা বলুন স্যার। টুকে নি। আজকাল ভালো কাজ করবো বললেও করা যায় না, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে কি বোঝাব! বিদেশী শাসন চলেচে শোষণের জন্যে, প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়। গভর্ণমেন্টের কাজে ঢুকে সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি—আচ্ছা স্যার প্রণাম। পায়ের ধুলো দিন আর একবার।

ছেলেটি বিদায় নিতে উদ্যত হোলে মাখন সুর হাত কচলাতে কচলাতে তার পেছন পেছন খানিক দূর গেলেন।

আরো খানিকক্ষণ খেটে বেলা গেলে নারাণ মাস্টার অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী চলে গেলেন। কেউ জিগ্যেসও করলে না তিনি খেয়েচেন কিনা।

রাখাল চলে যাবার আগে কেবল বললেন—নারাণবাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন,
তাল চণ্ডীর গানের আসর হবে কিনা। থানার বড় দারোগাবাবু আসবেন খবর দিয়েছেন।

* * *

ছ বছর পরে।

রাখালবাবুর বাড়ী তাঁর স্ত্রীর কলেরা। নারাণ মাস্টার ছাত্রদল নিয়ে সেবা করচেন। ছেলেদের মধ্যে ইন্দুভূষণই পরিচালক। সবাই ব্যস্ত, কেউ জল গরম করচে, কেউ ডাক্তার বাবুর হাতে সাবান দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছে। রাখাল মাস্টারের মেয়ে প্রীতি ইন্দুভূষণকে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতায় প্রীতির তরুণ হৃদয় কানায় কানায় ভরা। রাখালবাবুর স্ত্রী রাত্রে মারা গেলেন। প্রীতিকে ইন্দু বোঝায়। এর আগেও ইন্দুর সঙ্গে প্রীতির দেখা হয়েচে দু-একবার। নারাণ মাস্টার রাখালবাবুর বাসায় খবরের কাগজ আনতে পাঠাতেন, প্রীতিই কাগজখানা ইন্দুভূষণের হাতে দিত।

কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হোল ক্রমশঃ। মাতৃবিয়োগের পর শোকাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ইন্দুভূষণ সান্ত্বনা দিত ওকে। রাখাল মাস্টার বাড়ী থাকতেন না। দু-জনে প্রেম গড়ে উঠলো। ইন্দুভূষণ ম্যাট্রিক পাস করে তখন কলেজের ছাত্র। কিন্তু নারাণবাবুর বাড়ীতে সে নিয়মিত আসে।

মনোরমা বয়স ও দারিদ্র্যের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচেন। ছেলে অবাধ্য, লেখাপড়া করলে না, দু-বার ম্যাট্রিক ফেল করেচে। মাকে এসে বলেচে, মা একটা কলের গান কিনবো, টাকা দাও। মা বললেন—কি করে বলিস এসব কথা ননী? ওঁর বয়স হয়েচে, সংসারের জন্যে ওঁর এখন চিন্তা এসে পড়েচে, আগে তো গায়ে আঁচড় লাগতে দিতাম না। এখন ভালো করে একবাটি দুধ খেতে দিতে পারি নে। তোকে কলের গান কেনবার টাকা কোথা থেকে দেব।

ছেলে মার সঙ্গে ঝগড়া করে—সমানে উত্তর করে। অবশেষে বাবার পায়ের শব্দ পেয়ে খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

নারাণ মাস্টার ঢুকে স্ত্রীকে চোখ মুছতে দেখে বলেন—কি হোল, চোখে কি? তিনি তো সংসারের কিছু খবর রাখেন না। স্ত্রী বলেন—চোখে কি হয়েচে, সব সময় জল পড়চে।

ওঁর মেয়ে আবার চিঠি দিয়েচে। মনোরমা বলেন সে কথা স্বামীকে। ওকে একবার দেখে এলো না গো। ওদিকে তো যাও। নারাণ মাস্টারের মনটা কেমন করে ওঠে। পাশের গ্রামে যাবার সময় ওর শ্বশুর বাড়ীর সামনে দিয়ে যান। মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা। জামাই বলে, আসুন বাড়ীতে। নারাণবাবু বলেন—সময় নেই, বাবো না, অমলাকে বুঝিও।

বাড়ী এলে মনোরমা বলেন,—হ্যাগা, তুমি গিয়েছিলে? নারাণবাবু বলেন—হ্যাঁ, খুব যত্ন করলে। অমলার শাশুড়ী নিজে এসে কত কথা বললে। জল খাওয়ালে।

প্রীতি ও ইন্দুভূষণের শেষ দেখা। প্রীতির বিয়ে অন্য স্থানে স্থির হয়েচে। প্রীতির অভিভাবকদের হাত এতে সম্পূর্ণ; বেচারী প্রীতি নিরুপায়া, সে শুধু জানাতে এসেচে গোপনে ইন্দুভূষণকে। বাড়ীর পিছনে এক আমতলায় দু-জনে এসে দাঁড়িয়েচে। প্রীতি বললে—আমি কি করবো ইন্দুদা, আমি কি করতে পারি? আমি তোমার সঙ্গে পালাতে পারি, কিন্তু বাবা তাতে মরে যাবেন। তা করতে পারবো না।

প্রীতির বিবাহের পরদিনই সকালে উঠে মনোরমা দেখলেন ছেলে ননীমাধব ঘরের দোর খুলে রেখে মায়ের বাক্স ভেঙে তিনশো টাকা ও বাবার সাবেক আমলের ঘড়িটি নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। একখানা চিঠি খুঁজে পাওয়া গেল, তাতে সে লিখেছে, বৃহত্তর জগতের আহ্বানে আজ সে বাড়ী ছেড়ে চললো, বাবা-মা যেন কিছু মনে না করেন। নারাণ মাস্টার স্ত্রীকে বোঝান।

মনোরমা বলেন—হ্যাগা, তুমি যাও, ওকে এনে দাও।

—যাবো, ভেবো না।

—হ্যাগা, সে কোথায় গেল?

—ভেবো না।

—তাকে এনে দেবে?

—হ্যাঁ এনে দেবো।

এমন একদিনে নারাণবাবুর চাকরি গেল। এর মূল কারণ একজন দেশসেবকের মৃত্যুতে নারাণবাবু ছেলেদের নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সভা করেছিলেন।

ছেলেদের বিদায় অভিনন্দন হোল গাছতলাতেই। নারাণবাবু গ্রহণ করলেন। হেড মাস্টার ও মাখন সুর স্কুল গৃহে উক্ত অভিনন্দনের অনুষ্ঠান করতে দিতে রাজী হোলেন না। বিদায়ের সময় নারাণবাবুর মর্মস্পর্শী বাণীতে সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

নারাণবাবু অভিনন্দন-পত্র হাতে হেঁটে আসচেন, মাখন সুর পাশ দিয়ে ফিটন হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভা। মাখন সুর এলে সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো—অথচ নারাণবাবু যে বেঞ্চিতে বসে, সেই বেঞ্চিতে বসে সাধারণ লোকে বিড়ি খাচ্চে। পেছনের বেঞ্চিতে বসে আছেন নারাণবাবু, জায়গা না পেয়ে। মাখন সুরের বক্তৃতা শুনচেন।

মাখন সুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হবেন, জনসাধারণের ভোট চান। বক্তৃতায় তিনি বলচেন, তিনি আজ অনেকদিন ধরে দেশের সেবক ও ভৃত্য তা সকলেই জানেন। স্কুল ও

সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে তিনি কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম করেচেন, তা যে সার্থক হয়েচে—এতেই তিনি ধন্য। অন্য কোন প্রতিদান তিনি চান না, কেবল দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ছাড়া...ইত্যাদি। খুব চটাচট হাততালি পড়চে।

বাইরে এসে নারাণবাবু বিড়ি টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলেন। লোকের কাছে বলেন—চমৎকার লোক মাখনবাবু। কেমন চমৎকার বক্তৃতা দিলে। দেশের মধ্যে অমন লোক আর নেই। বড় ভদ্র লোক।

এক জায়গায় বসে ছেলের কথা ভাবেন। পরের ছেলে মানুষ করেচেন অথচ নিজের ছেলের কিছুই করতে পারলেন না। চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠলো। ছেলেটা হয়তো পথে পথে ভিক্ষে করচে। হয়তো অনাহারে কষ্ট পাচ্চে। চোখের জল মুছলেন চাদরের খুঁটে।

মনোরমা বৈকালে অন্যমনস্ক ভাবে একলা বসে বাড়ীতে। স্ত্রীর চেহারা দেখে নারাণবাবুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। পতিব্রতা স্ত্রী বাইরে কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত অন্তর পুড়ে উঠচে আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্যে।

পেছন থেকে নারাণবাবু স্ত্রীর শোকাচ্ছন্ন বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি দেখেন।

ওঁকে আসতে দেখে মনোরমা ধড়মড় করে উঠে বসে,—ওমা, কখন এলে তুমি? আমি টের পাই নি।

—এই তো এলাম। লেবুর আচার করবে বলে লেবুর সন্ধানে গিয়েছিলাম।

—সত্যি তাই নাকি? পেলে?

মনোরমা কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলেন—দাঁড়াও তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, দুটো মুড়ি মেখে দিই।

নারাণ মাস্টার বলেন—বসো বসো। একটু গল্প করো। খেটে খেটেই গেলে।

মিনতিভরা সুরে মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, ননীর কোনো সন্ধান পেলে?

ইন্দুভূষণ একটা ঘাটে একদিন বসে আছে, সেখানে বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেত্রী সুরমার সঙ্গে তার আলাপ হয়। সুরমা ও তার দলবল পল্লীগ্রামের দৃশ্য তুলতে এসেছিল। ওর সাহায্য চাইলে। সেই সূত্রে সুরমার সঙ্গে আলাপ।

সুরমা ওকে কলকাতায় গিয়ে দেখা করতে বললে বারবার—আসবেন তো? ঠিক বলুন? —বালিগঞ্জের একটা ঠিকানা দিলে। সেখানে ইন্দুভূষণ দেখা করতে গেল এবং প্রথম পদার্পণের দিনই সুরমার জালে আবদ্ধ হোল। সুরমা সুন্দরী সুগায়িকা; ইন্দুভূষণ তরুণ ও সুদর্শন। দু-জনই দু-জনেরপ্রতি আকৃষ্ট হোল। সুরমা বার বার আসতে বললে ওকে, জানলায়দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ী এসে ইন্দুভূষণ মনমরা, উদাস হয়ে রইল। সুরমার চিঠি এল—একবার অতি শীঘ্র যেতে বলেচে।

সে গেল আবার। সুরমা ওকে খুব আদর আপ্যায়ন করলে। নিজের হাতে তৈরী সন্দেশ খাওয়ায়। গান শোনায়। শেষে সুরমা বলে—অনেক রাত হয়েচে, কোথায় যাবেন

যাব ? এখানেই থাকুন। কোনো অসুবিধে হবে না। দু-জনে সারারাত গল্প করি আসুন। সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে বড় ভালো লাগে।

ইন্দুভূষণ রইল না। সুরমা বার বার বলে দিলে—সামনের শনিবারে আমার জন্মদিন। নেমন্তন্ন রইলো আপনার। কথা দিন আসবেন ?

গেল ইন্দুভূষণ জন্মদিনের উৎসবে। গান, আহার-বিহার। আরো কয়েকটি অভিনেত্রী নিমন্ত্রিতা। তারা ওদের দু-জনের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানায়। সেদিন সুরমা ইন্দুভূষণকে বাড়ী যেতে দেয় না। ছাদে বসে দু-জনে গল্প করে।

সুরমা ও ইন্দুভূষণ মোটরে যায়, নারাণ মাস্টার পথ দিয়ে যান। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ছেলের সন্ধানে, মনোরমার মিনতিতে। সারাদিন নানাস্থানে ঘুরেচেন সন্ধান করে, কোথাও সন্ধান পান নি। সামান্য পয়সা হাতে, পেট ভরে জলখাবারও খেতে পারেন নি। ভবানীপুরে বকুলবাগান রোডের মোড়ে গাড়ীখানা হঠাৎ বেগে সামনে এসে দাঁড়ালো। নারাণ মাস্টার থমকে দাঁড়ালেন। কাদাজল জমেছিল রাস্তার এক জায়গায়, ছিটকে তাঁর গায়ে লাগলো। নারাণবাবু চেয়ে দেখলেন ইন্দুভূষণ ও একটি সুবেশা তরুণী গাড়ীতে বসে। পাশের একটি লোক বলে উঠলো—রগড় দেখলেন মশাই ? চিনেচেন তো ?

নারাণ মাস্টার পাড়াগাঁয়ে মানুষ। তিনি কি করে চিনবেন !

—চিনলেন না ? সুরমা দেবী ?

—সে কে ?

—কোথায় বাড়ী আপনার ? সুরমা দেবী বিখ্যাত চিত্রতারকা—নামও শোনেন নি ? এঃ ! আপনার কাপড়খানা একেবারে নষ্ট করে দিয়েচে যে !

নারাণবাবু চিনতে পারলেন। সরল মানুষ, জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে গেলেন। একজন চিত্র-অভিনেত্রীর সঙ্গে ইন্দুভূষণ কি করচে ? ও কি কোনো ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ নিল নাকি ? কিন্তু তাঁর ছাত্র, অমন দুধে-গঙ্গে-তোলা ছাত্র শেষে একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে বেড়াবে এভাবে ?

ইন্দুভূষণ চিনতে পেরেছিল নারাণ মাস্টারকে। সে চমকে উঠে, তার পর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুরমা বললে—আচ্ছা, হাজরার মোড়ে সেই যে এক পাড়াগেঁয়ে বুড়ো লোক আমাদের মোটরের সামনে পড়লো— ওমা, কি কাদাই লেগে গেল ওর গায়ে। ভাবলেও হাসি পায়। ব্রেক কষেছিল সময়ে—তাই খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েচে, তার পর থেকেই তুমি অমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন ? আর ভাল করে কথা কইচ না ? চেন নাকি ও বুড়োকে ?

ইন্দুভূষণ চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা, তোমার আবার যত বাজে কথা। ইয়ে, আমি তোমার সঙ্গে এখন আর যাবো না সুরমা।

—কেন ?

—আমায় একটু নামিয়ে দাও। একটু কাজ আছে।

—কোথায় যাবে ?

—সে বলবো এখন। তুমি যাও আমি নামি।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলে ইন্দুভূষণ নারাণ মাস্টারকে। এদিক ওদিক। কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে একটা পার্কে এসে ক্লান্ত হয়ে বসলো। নিজেকে কোথায় যেন অপরাধী বলে মনে হোতে লাগলো—নিজের কাছেই নিজেকে। না, সে সুরমার কাছে আর যাবে না। বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরে যাবে-আজই।

এইখানে একটু পরে প্রীতি ওকে দেখতে পেল সামনের জানলা থেকে। সেটা প্রীতিদের বাসা। একটি ছোট ছেলে এসে ওকে ডাকলে। ইন্দুভূষণ দ্বিধাজড়িত পদে অপরিচিত দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়াতেই দোর খুলে দাঁড়ালো প্রীতি হাসিমুখে।

—ইন্দু-দা।

—প্রীতি !

—এসো বাড়ীর মধ্যে। কবে কলকাতায় এলে ? কি করচো আজকাল ? তুমি এসো বাড়ীর মধ্যে।

—বাড়ীতে আর কে আছেন ?

—কেই নেই। কেবল এক ননদ ও বুড়ী খুড়শাশুড়ী। উনিও আসবেন এখুনি। তুমি এসো ইন্দু-দা।

—আমি যাবো না প্রীতি। একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি। অন্য সময়ে এসে দেখা করবো।

—তা হবে না। এক পেয়ালা চা অন্ততঃ খেয়ে যেতেই হবে।

এই প্রীতিকে ভুলতেই সে সুরমার ফাঁদে পা দিয়েছিল। সেই প্রীতি আজ তার সামনে। গ্রামের সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। তারপর ইন্দুভূষণ বিদায় নিলে।

ফিরেই সোজা সুরমার ওখানে গিয়ে উঠলো সে।

মনোরমা ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে শয্যা গ্রহণ করেছেন। নারাণ মাস্টার বাড়ী এলে তিনি উঠে স্বামীকে জল দেন হাত-পা ধোবার। প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চা এনে চা করে খাওয়ান—কারণ ঘরে কিছু নেই। মূর্তিমান দারিদ্র্য সংসারের প্রতি রন্ধ্রে তার পাশ বিস্তার করেচে। চাকরি নেই নারাণবাবুর। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সব টাকা আদায় হয় নি।

মনোরমা করুণ মিনতির সুরে বলেন—হাঁগো, মনীর কোনো সন্ধান পেলে ? নারাণবাবু কি জবাব দেবেন। কোনো সন্ধানই মেলে নি। সে কথা বলতেও কষ্ট হয়।

নারাণবাবু কাছে বসে স্ত্রীকে বোঝান।—ভগবানের নাম করো। সংসারে সব দুঃখ-কষ্টকে যে জয় করতে পারে, সেই তো যথার্থই মানুষ। সংসার পরীক্ষার স্থল। এই মনে

করে চলবে যে আমাদের সত্যকার স্বাধীনতাকে কেউ হরণ করতে পারে না।

হাতে পয়সা নেই। স্কুলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা বাকি। স্কুলে যান নারাণবাবু। ছেলেরা সবাই ক্লাস থেকে বার হয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, উল্লাস প্রদর্শন করে।

হেড মাস্টার সদয় ব্যবহার করেন। চেয়ারে বসিয়ে বলেন—আপনি শুনলাম কলকাতায় গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলেন?

—না।

—শুনলাম আপনার স্ত্রী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েচেন? আহা, তা তো হোতেই পারেন। I offer my sympathy Naran Babu—কিন্তু কি করবেন বলুন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

হেড মাস্টারের কথায় মাখন স্থরের সঙ্গে দেখা করেন।

মাখন স্থর বৈঠকখানায় বসে আছেন মো-সাহেব নিয়ে। নারাণবাবুকে তাঁরা বসতেও বলেন না। তিনি গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়িয়েই থাকেন।

মাখনবাবু বললেন—এই যে আসুন মাস্টার মশাই—ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক রকম চলে যাচ্চে।

—তারপরে কি মনে করে?

—আমার সেই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাটা অনেক দিন হয়ে গেল। সংসারে এখন বড় অভাব। টাকাটা আমার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন দয়া করে।

—নিশ্চয়ই, সে টাকা দিতে হবে বৈ কি। আপনার ওপর স্কুল-লাইব্রেরির ভার ছিল, তার অনেকগুলো বই পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলি আপনি মীমাংসা করে দিয়ে টাকা নিয়ে যান।

—সে কি কথা? এতদিন তো হেডমাস্টার কিছু বলেন নি? আর আমার ওপর লাইব্রেরির চার্জ্জও ছিল না। সে ছিল ক্ষেত্রবাবুর ওপর। আপনি হেড মাস্টারের সার্কুলার দেখবেন।

—আচ্ছা, এখন যান। আমি বড় ব্যস্ত।

—আমার হাত খালি। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ। ছেলেটিকে সন্ধান করতে গিয়ে খরচপত্র হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। বড্ড উপকার হোত এই সময় টাকাটা পেলে।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আমিও তো বেনিয়মে বেহিসেবে টাকা দিতে পারি নে? আমার এখন সময় নেই। এখন যান আপনি।

বাড়ী ফিরে এলেন নারাণ মাস্টার।

মনোরমার শরীর খারাপ। তার জন্যে কিছু ফল নিয়ে আসতে পারলেন না। এক দোকানে জোড়া সন্দেশ বিক্রি হচ্ছে, চার আনা জোড়া, মনোরমা এসব খেতে পান না, গরীবের ঘরের স্ত্রী। বড় ইচ্ছে হোল ঐ জোড়া সন্দেশ একখানা নেবেন। কিন্তু পয়সায় না কুলোনোতে, শুধু হাতে চলে আসেন।

মনোরমা আগে আগে এসে আগ্রহপূর্ণ ভাবে বাজারের থলি খুলে দেখতেন—জিজ্ঞেস করতেন—কি আনলে দেখি? আজ তিনি নিরুৎসাহ, মনমরা উদাস। নারাণবাবু দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠেন।

বাইরে ছেলেরা এসে ঠিক ডাকে প্রতিদিনের মত। এখন আবার অন্য ছেলেদের নক্ষত্র বোঝান। ভাবেন ইন্দুভূষণের গাড়ীর চাকায় সেদিন কাদা ছিটকে লাগার দৃশ্য, সঙ্গে অভিনেত্রী শ্রেণীর একটি মেয়ে। দুঃখ হয় তাঁর।

•

সুরমাকে নক্ষত্র চেনাচ্ছে ইন্দুভূষণ। ছাদের ওপর অন্ধকার। তারা-ভরা আকাশ।

সুরমা বললে—এই সব শিখে কি হবে? তার চেয়ে চলো—

—জানো আমার এক মাস্টার মশাই ছিলেন। তিনি আমার ছেলেবেলায় আমায় এসব চিনিয়ে ছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের দৃষ্টি যত প্রসারতা লাভ করবে, ততই সে অমরত্বের সম্মুখীন হবে। মানুষ বড় কিসে? এই বৃহত্তের সন্ধান—ভূমার সন্ধান সে পেয়েচে বলে—আমার গুরুর এই উপদেশ।

—তোমার গুরু কে? কোথায় থাকেন?

—তুমি তাঁকে দেখেচ।

—দেখেচি কোথায়?

—সে বলবো না।

—একদিন তাঁকে এখানে আনবে?

—আসবেন না তিনি। জীবনে বৃহত্তের সন্ধান তিনিই আমায় দিয়েছিলেন, এতদিন তত বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজকাল যেন বেশি করে বুঝচি সুরমা।

সুরমার বিলাসিনী পল্লবগ্রাহী মন এ উক্তির গভীরত্ব বুঝতে পারলে না।

সে বললে—চলো নিচে যাই—তোমাকে গান শোনাই। ঠাণ্ডা লাগচে। মাঝে মাঝে তোমার মুখ গম্ভীর দেখি কেন বলো তো। তোমার কি অভাব এখানে? কোনো অসুবিধার মধ্যে কি আমি রেখেচি তোমাকে? চলো!

সুরমার গানের কথায় ইন্দুভূষণ জীবনের গভীর তত্ত্ব আবার বিস্মৃত হোল।

মনোরমা শয্যাগত। পুত্রের বিচ্ছেদশোক-কাতরা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নারাণবাবু নিজেই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঠিক সেই সময় টেলিগ্রাম এল আলিপুরের জেল হাজত থেকে। তাঁর ছেলে মনীমাধব চুরির চার্জে অভিযুক্ত হয়ে আলিপুরে আছে।

স্ত্রীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নারাণ মাস্টার চলেন আলিপুরের দিকে। মনে পড়লো তাঁর একটি পুরনো গান—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া
অরুণ আজি উঠেছে
অশোক আজি ফুটেছে
না যদি উঠে, না যদি ফুটে
তবুও আমি চলিব ছুটে
তোমার মুখে চাহিয়া।

আলিপুরের জেল হাজতে ছেলের সঙ্গে দেখা হোল।

ওখানে গিয়ে শুনলেন তার ছ-মাস জেলের আদেশ হয়েচে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলে সবাই। নারাণ মাস্টার গিয়ে দেখেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত মিঃ কান্ওয়ার।

খুব খাতির করলেন তিনি। বললেন, তিনি জানেন না যে আসামী তাঁর ছেলে। খুব বিস্ময় প্রকাশ করলেন এ কথা শুনে। কেন এমন হোল?

নারাণ মাস্টার চুপ করে থাকেন। পরে নারাণবাবু সব বললেন।

দুঃখ করে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আমি জানি, এরকমই হয়। পণ্ডিতের বংশে পণ্ডিত ও সৎ ছেলে জন্মগ্রহণ করলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতো।

—আচ্ছা আমি চলি, বললেন নারাণবাবু।

মিঃ কান্ওয়ার বললেন—আপনি আমাকে Rural Bengal চিনিয়েছিলেন। প্রকৃত বাংলা দেশ কি তা আমাকে চিনিয়েছিলেন আপনি। আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আমি যদি জানতাম আসামী আপনার ছেলে, তাহোলে ওকে কনভিকশন দিতাম না। বড়ই দুঃখিত আমি যে আমার অজ্ঞাতসারে আপনার ছেলের জেল হোল। আমার বাসায় যাবেন না! আমার স্ত্রী আপনাকে দেখলে বড় খুশী হবেন।

—এখন আমার সময় হবে না মিঃ কান্ওয়ার! আমার স্ত্রী পুত্রের শোকে শয্যাগত। একা ফেলে রেখে এসেচি। আমায় আজই ফিরতে হবে।

—Really, I am so sorry! আপনার মত ভাল লোকেরা সংসারে কষ্ট ভোগ করে কেন বলতে পারেন মিঃ গাঙ্গুলী? আপনি তো একজন দার্শনিক।

—কর্মফল।

—আমার কি মনে হয় জানেন, এই দুঃখ দহনের মধ্যে প্রভিডেন্স আপনাদের শেষ খাদটুকু পুড়িয়ে খাঁটি নিষ্পাপ করে নিচ্ছেন। গ্যেটের কাউন্টের সেই লাইন স্মরণ করুন—একদিন আসবেন,আপনার সঙ্গে বসে আমার বাংলোতে কথাবার্তা বলা যাবে। Good bye।

নারাণবাবু বাড়ী এলেন।

মনোরমা সাগ্রহে জিগ্যেস করেন—হ্যাঁ গা, ছেলে কেমন আছে? তাকে দেখলে?

—দেখলাম! ভালো আছে—

—তাকে আনলে না কেন? ঠিক বলো—তোমার মুখ দেখে আমার ভাল মনে হচ্চে না—সে আছে তো?

—নিশ্চয়ই আছে—আমার কথা বিশ্বাস করো।

—হ্যাগো, তবে তাকে আনলে না কেন? আমার বুকের এইখানটাতে হাত দিয়ে ভাখো। আমি থাকতে পারচি নে।

নারাণবাবু কিন্তু মুখ বুজে শুয়ে পড়ে থাকেন।

অসুস্থ স্ত্রীকে নারাণবাবু সত্যকথা বলতে পারেন না। নিজে সেবা করেন স্ত্রীর। স্ত্রী সেই অবস্থায় উঠে নিজে চা করে দিতে যান স্বামীকে। নারাণবাবু বাধা দেন।

একখানি চিঠি এল, ছেলে জেলের মধ্যে মনের ঘৃণায় আত্মহত্যা করেচে।

মিঃ কান্‌ওয়ার দুঃখ করে পত্র লিখেচেন।

নারাণবাবু গেলেন, পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন। মুখাগ্নি করলেন।

বাড়ী ফিরে এলে মনোরমা ব্যস্তভাবে বলেন—ওগো, খোকা আমার কাছে স্বপ্নে এসেছিল। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বলো না? সত্যি করে বলো না? কথা বলো না কেন? কি হয়েচে? প্রায় মিনতির সুরে বলেন হ্যাগা বলো না আমায়? বলো না সে কেমন আছে?

নারাণবাবু রোগশয্যাগত স্ত্রীকে নিজে বাতি করে খাওয়ান।

—দাঁড়াও, আমি নিজে উঠে তোমার চা করে দিই—

—উঠো না। উঠো না। শুয়ে থাকো।

—হ্যাগা, ননী কেমন আছে? খোকা কেমন আছে? বলো না—

—ভালো আছে। তার চিঠি পেয়েছি। সে বাড়ী আসবে। এই ভাখো চিঠি। কান্‌ওয়ারের ইংরিজি চিঠিখানা নারাণ মাস্টার স্ত্রীর সামনে মেলে ধরেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

বাইরে থেকে ছেলেরা এসে হাঁক দেয়—স্যার, বাড়ী আছেন?

নারাণবাবু স্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে যান বাইরে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনি একদল গ্রাম্য বালকদের মধ্যে বসে ভূগোল ব্যাখ্যা করচেন—

পৃথিবীর এক ভাগ স্থল, তিন ভাগ জল—

টান

গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা তাঁদের পরিবারবর্গ কর্ম উপলক্ষে পূর্ব্ব আফ্রিকার নাইরোবি শহরে অনেক দিন থেকেই বাস করছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিন বসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ী-পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ী দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়ীটি চালাচ্চেন। অনেক দিন দেখি নি প্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেচেন তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মানিয়া মোহান্তির বড় গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ দু-মাস ধরে 'হোমস্‌ডেল' কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এই পথটা যেতে হল তো) প্রণববাবু ও আমি দু-জনে বসে গল্প করছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং দু-জনেই খুব খুশি হয়েছিলাম এই রকম হঠাৎ দেখা হওয়ায়।

প্রণববাবু বললেন—এখানে খেয়ে যাবেন।

—বাড়ীতে বলে আসি নি, স্নান হয় নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হোলে থাকবেন তো, একটা খুব ভাল গল্প বলবো খেয়ে-দেয়ে ঐ বুড়ো হর্ত্তুকিতলায় ছায়ায় বসে। কেমন? ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুর বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কত দিন আর থাকবেন?

—বুধবারে চলে যাবো। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভাল হোল। কতদিন দেখা হবে না আর কে জানে।

—অথচ আমরা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা না জানাতেই—

—মাংস খান তো?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর?

—খুব।

মধ্যাহ্ন ভোজন খুব ভালই হোল।

এর পর আমরা সেই হর্ত্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনে পশ্চিম দিকে নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী, ঝির-ঝির বাতাস বইচে নদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণীকে পেছনে ফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছু কিছু সকালবেলা শুনেচেন।

আজ একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলবো। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনার কাছে বলবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল হয়েছে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগাণ্ডা রেলপথ তৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমার বাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে, তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে big game hunter। লোহার মত শরীর, অনর্গল সোহালি ভাষা বলতে পারে, সে দেশের নেটিভদের মতই। এসব কথা গল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? কিন্তু ঘর-ভোলা লোকের কাছে এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানি বাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। আমাদের পৈতৃক বাসভূমি বনগাঁয়ের কাছে শিমুলিয়া। দশ বছর বয়সে আমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ান্জা হ্রদের তীরবর্তী কামপালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন ভদ্রলোক স্কুলমাস্টারী করতেন সে সময়—আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহ করেন নি, ছুটি-ছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমায় ইংরিজি পড়াবার ভারও নিয়েছিলেন।

সে সময় ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কপি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালী পরিবার ছিল। সকলেই উগাণ্ডা রেলপথের কর্মচারী। আর একজন ছিল খৃস্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি এক মিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো, মাঝে মাঝে দূর পল্লী অঞ্চলে চলে যেতো।

আমি পনেরো বছর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। ওখানকার জীবন খুব ভালই কেটেছিল। জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন স্বপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতো ভাই অতুল এসে বেলজিয়ান কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ বয়সে। বাবাকে বললাম, কাকার কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজ করবো, হাতী, সিংহ শিকার করবো, গল্পের বইয়ের নায়কের মত দুর্দান্ত এডভেঞ্চারপূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দ আস্বাদ করবো।

আমি বললাম—তখন আপনার বয়েস কত।

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুয্যে ইংরিজি পড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেয়ের কাছে অঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালবাসতেন ডসন সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ার গান নিয়ে তাঁর সঙ্গে খেলা করতাম। শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদের দু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কণ্টক ও সিমোলা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখীর দল বিচরণ করতো, এখনও করে।

আমরা কতবার এই সব জঙ্গলে যেতাম বড় জন্তু শিকারের খোঁজে। একবার একদল সিংহের সামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল, সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালে তিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিল। —সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনা কোরে ?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন ?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—অত বছর বয়সে ডাক্তারি পড়লেন ? পাস করেছিলেন ?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরের কোর্স ছিল তখন। তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনো করছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথমে প্র্যাক্‌টিস করি দার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশী রোজগার করি, সবই দার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল, সেখানে যাই, কিন্তু সেখানে আর সুবিধে হবে না। ম্যালান গবর্ণমেন্টের আওতায় ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতবাসীদের আর সেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশী ডাকতো।

—কারা ?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প, কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হলো খুব ভালো। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।—এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হোল না।—আমার খাওয়ার নাকি খুবই কষ্ট হোল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্ম্যের দোতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হোলে আমার মামার বাড়ীর ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার। আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময় এলাহাবাদ মিলিটারী একাউন্টেন্টে কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ,

আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর।' আমার মা তাঁর শেষ বয়সের সন্তান; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলে এক পুরোনো ঝি, আমার মামার বাড়ীর। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে বসেচেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছিল। বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু-পিছু যেতো মার বড় বয়েসেও।

বামা কোথাও যেতো না, নিজের দেশ বর্দ্ধমান জেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর থেকে সে কখনো আর সে গ্রামেও পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন—বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ী চলে আসে এবং মাঝে-মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাই-বাড়ী এসেই থাকতো। .

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা?

সে বলতো—না খেঁদি (মার ডাক নাম), জামাই-বাড়ী কি থাকতে আছে? লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারতো না—কিছুদিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবার সময়, মা যা খেতে ভালবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধু হাতে কখনো আসে নি।

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামার বাড়ীতেই, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্য্যন্ত বামার নাম করতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাত বছর বয়েস।

—তারপর?

—তারপর কর্ম্ম উপলক্ষে বাবা-মা উপাও চলে গেলেন এবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমে বড় হলাম সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হোল। আমার এক বোনের বিয়ে হোল মোম্বাসায়, সেখানে হুগলী জেলার বন্দীপুরের রামতারণ চক্রবর্ত্তী শিপিং কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন, তাঁর বড় ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মা মারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, ডাক্তার আসবার আগেই

মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতে লোকজন যোগাড় হোল। যে কটি বাঙালী পরিবার নাইরোবিতে সে সময় থাকতো, তাদের সকলের বাড়ী থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাত্রে আমাদের বাড়ী খবর পেয়ে। রাত এগারোটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড় নির্জ্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ-সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশী। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড়-একটা মড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জ্বেলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদের দল মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েচে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই দেবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, ও কে দাদা!

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছতলায় একজন ভারতীয় বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টে চিতার দিকে চেয়ে আছে। পরণে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্ব্বনাশ! ও যে বামা ঝি!

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মত দেখতে বটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশান-ভূমিতে কোন বাঙালীর মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্য কিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর এক তত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্ত্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্য করে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীন ভাবে একদৃষ্টে জলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখচি যেন চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমার মনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুজয়ী স্নেহের টানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশান ভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। সবশুদ্ধ বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয় হবে বামা ঝিকে

আমরা দেখতে পেয়েছিলুম সবাই মিলে। তার পরই মিলিয়ে গেল সে মূর্ত্তি।

আমরা বেশি কিছু কথা বলি নি এর পর। দাহ কার্য্য শেষ করতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম তখন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা। ওই নদী তীরেই আমার মার দশপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশদিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবির বাঙালীদের বাড়ীর মোটামুটি বিয়ে পৈতে ষষ্ঠীপুজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে 'পুরুত-কাকা'।

নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

চ্যালারাম

দিল্লীর এক পার্কে চ্যালারামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

ভীষণ জোয়ান, পুরো ছ-ফুট ছ-ইঞ্চি লম্বা, হাতের কব্জি এই মোটা, এই গোঁফ দাড়ি। এই বুকের ছাতি। কথায়-কথায় জানতে দেরি হোল না যে চ্যালারাম একজন অসাধারণ লোক। তাঁর মুখের ভাব এমনি যে, দেখলে মনে হয়, জীবনের অনেকখানি এ দেখেচে। এমন ব্যাপার ঘটেচে এর জীবনে, যা সচরাচর মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

তার ওপর মুশকিল হয়েচে আমরা বাঙালী, আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ! তবুও অমৃতসরে, দিল্লীতে, করাচীতে, ডেরাগাজিখাঁতে যারা জন্মায়—তারা অনেক কিছু দেখে অনেক কিছু করে। আমরা যারা খুব কিছু করি, বাপের পয়সার খই ছড়াতে ছড়াতে বিলেতে গিয়ে উঠি। আমাদের চেয়ে মাদ্রাজী, তেলেগু, নোয়াখালি ও চাটগাঁয়ের মুসলমানেরা ভালো—তারা তবুও পাঁচটা দেশ দেখে, জাহাজের খালাসী-টালাসী হয়, যা হোক তবুও কিছু।

চ্যালারাম আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করবে বেশী কথা নয়, যখন সে প্রথমেই বললে সে ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে আবার একটা কিসে ভর্ত্তি হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যায়। মরুভূমিতে আরবদের হাতে পড়েছিল, টাইগ্রিসে নৌকোয় বাচ খেলে এসেছে। বেবিলনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে চুরোট খেয়েচে।

আমি বললুম—তোমার জীবনে সকলের চেয়ে একটা বড় ঘটনার কথা বলো না, শুনি।

চ্যালারাম বলতে আরম্ভ করলে—

অমৃতসর জেলায় আমার বাড়ী। আমাদের গ্রামে সবাই এমন গরীব যে একজন একুশ টাকা মাইনে পেতো কলকাতায় কি কাজ করে—গ্রামের মধ্যে সেই ছিল বড়লোক ও বড় চাকরে। সে বল্‌তো কলকাতায় সে পুলিশের দারোগা।

• আমার স্বভাব ছিল ছুঁদে ও নির্ভীক। আঠারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করে কলকাতায় এলাম। ভাবলাম, পুলিশের দারোগা যদি হঠাৎ না হতে পারি, হেড কনস্টেবল হওয়া কে আটকাবে ?

কলকাতা এসেই ভুল ভেঙে গেল। গ্রামের সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে দেখলাম সে এক বড়লোকের বাড়ীর দরোয়ান। সে আমার কলকাতায় থাকবার একমাসের খরচ দিতে চাইলে, যদি গাঁয়ে ফিরে কাউকে তার দরওয়ানী করার কথাটা বলে না বেড়াই। তারই পরামর্শে মোটর গাড়ীর কাজ শিখলাম। কিছুদিন কলকাতায় মোটর চালাবার পরে ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধলো। আমি সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে করাচী ও সেখান থেকে গেলুম ফ্রান্সে। এ সব দিনের অভিজ্ঞতা খুব বিচিত্র হোলেও বিস্তৃত বর্ণনা করবার দরকার নেই। যুদ্ধ শেষ হবার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম, কিন্তু বেশীদিন ভাল লাগলো না। আবার একটা চাকরিতে ভর্ত্তি হয়ে চলে গেলুম মেসোপটেমিয়া। তিন বছর পরে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে বম্বে এলাম। হাতে তখন কিছু টাকা হয়েছে, ভাবলাম একটা ট্যাক্সি গাড়ী কিনে বম্বে কি কলকাতার রাস্তায় চালাবো। কিন্তু দু-তিন দিন পরে একটা সরাইখানায় জন কয়েক পাঠান গুণ্ডার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে ছুরি মারামারি হোল। তাতে একজন পাঠান জখম হোল। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল। পুলিশের ভয়ে দু'জনে রাতারাতি বম্বে ছেড়ে চম্পট দিলাম।

অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে দু-জনে আমরা কোয়েটা হয়ে মরুভূমির পথে কাবুল পৌঁছে গেলাম। তখন নতুন বাস ও লরি চলচে কাবুলে, অনেক বড় লোকের মোটর হয়েছে। কিন্তু ভালো মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা তত বেশী নয়। আমাদের মোটর চালানোর কাজ পেতে দেরি হোল না।

কয়েক বছর কেটে গেল। বেশ সুখেই আছি! আগের পয়সা হাতে ছিল, সেই পয়সায় নিজে একটা লরি কিনে কাবুল কান্দাহারের পথে চালাই। জিনিসপত্র সস্তা, অনেক বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল, লরি চালিয়ে ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগলো। কাবুলে ভোলানাথ বলে একজন লোক ছিল, বিখ্যাত লোক। সে জাতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অনেক দিন থেকে কাবুলে আছে। এখানে পুরুতের কাজ করে। মীরমকুদ্ বাজারের দক্ষিণে ছোট একটা গলির মধ্যে তার একটা ছোট মন্দির আর বাড়ী।

ভোলানাথের মন্দিরটি এক অদ্ভুত জায়গা।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে এসে আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। চা হরদম চলচে, মোটা কড়া তামাকের ধোঁয়ায় মন্দিরের চাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। এদিকে ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। রাত বারোটা-একটা পর্য্যন্ত লোকের পর লোক আসচে। তার মধ্যে খুব বড় প্রতিপত্তিশালী বাবসাদার থেকে আমার মত বাজে লোকও আছে। আর সবারই ওপর ভোলানাথের প্রভাব খুব বেশী। সবাই তাকে মানে, খাতির

করে, তার কাছে পরামর্শ নেয়।

একদিন রাত আটটার সময়ে ভোলানাথের মন্দিরে গিয়েচি।

চা পান শেষ হয়ে গিয়েচে। ভোলানাথ আমায় বললে—চা খাবে নাকি?

বললাম—থাক, রাত হয়েচে, এখন আর চা খাবো না।

হঠাৎ আমার নজরে পড়লো দলের মধ্যে একজন আফগান রাজকর্মচারী বসে। আমি তাঁকে অনেকবার পথেঘাটে মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেচি। অত বড় লোককে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো কথা কাউকে বলা উচিত বিবেচনা না করে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আফগান অফিসারটি চলে গেলেন।

শুনলাম আমাদের মধ্যে কে কে মেশিনগান চালাতে জানে আফগান অফিসার তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন।

—ব্যাপার কি? মেশিনগান কি হবে? লড়াই কোথায়?

অনেক রাত্রে উঠে আসছি, আমার এক বিশেষ বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ আমায় চুপি চুপি বললে—টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কে থাকে, উঠিয়ে নাও এই বেলা—

অবাক হয়ে বললাম—কেন, কি হয়েচে?

—আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে শীগ্‌গির।

—কে বিদ্রোহ করবে!

আমার কাছে অত খবর তো পৌঁছোয় নি। তুমি নিজে সাবধান হও, মিটে গেল। দু-একদিনের মধ্যে আগুন জ্বলবে। বেশী রাতে রাস্তায় চলাফেরা কোরো না।

মীরমকুদ্ বাজারের নীচ শ্রেণীর কাফিখানাগুলোতে তখনও আমোদ-প্রমোদ চলচে। এ সবগুলো ভয়ানক জায়গা রাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেখাপ্পায় ছোরার ঘায়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েচে তার ঠিকানা নেই।

বাজার ছাড়িয়েচি, এমন সময় হঠাৎ দূরে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পট্-পট্-পট্-পট্ মেশিন গানের আওয়াজ।

বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

মীরমকুদ্ বাজারের লোকজন হুড় হুড় করে দোকান কাফিখানা ছেড়ে বার হয়ে এল, কেউ কিছু জানে না, সবাই কান খাড়া করে শুনচে।...

বিদ্রোহ কথাটা কিন্তু শীগ্‌গির তুলোর আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত হয়ে উঠলো—বিদ্রোহ মানে খুন, মানে লুটপাট, মানে গৃহদাহ, মানে পৈশাচিক অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতা। বিশেষতঃ এই সব জায়গায়।

ঠিক তাই ঘটল। বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ যখন পুরোমাত্রায় চলেচে, তখনকার কথা সবই জানি, কিন্তু সে সব কথা বলবো না। চোখের সামনে যে সব ব্যাপার দেখেচি, এতদিন পরেও সেকথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। মীরমকুদ্ বাজারে রক্তের স্রোত বইল। কে

যে কাকে মারে, তার ঠিকানা নেই কিছু। সুযোগ পেয়ে বদ্‌মাইস খুনী গুণ্ডার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে—বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যরা করেচে রাজনৈতিক বিদ্রোহ—সুবিধা পেয়ে শহরের সাধারণ গুণ্ডা ও দস্যুর দল দিন-দুপুরে খুন রাহাজানি শুরু করে দিলে। আরও কত কি করলে, তার আর উল্লেখ না করাই ভালো।

একদিন রাত্রে আমার বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ এসে আমায় বললে—চুপি চুপি উঠে এসো ভোলানাথের ডেরায়—কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না।

মীরমকুদ্ বাজার পার হবার সময়ে তার অন্ধকার চেহারা দেখে মনটা দমে গেল। ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে দেখি শিখ ও জাঠ যে-কজন ড্রাইভার কাবুলে উপস্থিত ছিল, সবাই জড় হয়েচে—জনদশেক সবসুদ্ধ। আর উপস্থিত আছেন সেই আফগান অফিসার আর তার সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ আফগান, সাহেবী পোশাক পরা। মন্দিরের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ ভাল দেখা যায় না।

আফগান সর্দার বললেন—তোমাদের মধ্যে কে কে এই রাত্রেই কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে মোটর নিয়ে যেতে পারবে? সেখান থেকে কে কে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবে?

আমি তো অবাক। কোথায় কান্দাহার, আর কোথায় বোম্বাই। তাছাড়া যাবার পথ কৈ?

বিদ্রোহীরা তো খাইবারের পথ আটকেচে। আপাততঃ কাবুল নদী পেরুনো যাবে কিনা সন্দেহ। কেন, কাকে নিয়ে যেতে হবে?

আফগান অফিসার বললেন—চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই পৌঁছুতে হবে। দশখানা লরি চাই। প্রাইভেট মোটর দু-খানা থাকবে। তা চালাবার লোক চাই। যত টাকা চাও পাবে।

আমরা সবাই ঘাড় নাড়লুম। অসম্ভব। চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই! এই ভীষণ দিনে।

আফগান অফিসারটি অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করলেন, ভয়ও দেখালেন—কোনো ফল হোলো না।

এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা সেই সুপুরুষ লোকটি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন, তোমাদের আপত্তিটা কি?

আমার ডাইনে বাঁয়ের দু-তিন জন শিখ ও জাঠ চমকে উঠেই আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে। জোয়ালাপ্রসাদ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে কলের পুতুলের মত বলে উঠল—জাঁহাপনা!... আমিও তখন চিনলাম। কি সর্বনাশ! স্বয়ং রাজা আমানুল্লা।

আমানুল্লা বললেন—শোনো। যা চাও তাই পাবে, আমার দশখানা লরি দরকার। কে কে রাজি আছ? আমাকে বোম্বাই পৌঁছে দিতে হবে। বড় বিপদে পড়ে তোমাদের ডেকেচি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম—জান কবুল, হুজুরালি—আমরা তৈয়ার। হুকুম করুন

কোথায় গাড়ী আনতে হবে। আমানুল্লা রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন—একঘণ্টার মধ্যে গাড়ী এইখানে নিয়ে এসো। তারপর কোথায় যেতে হবে ইনি বলে দেবেন।

সেই রাত্রে দশখানা লরি ও দু-খানা প্রাইভেট মোটর চুপি চুপি কাবুল ছেড়ে কান্দাহারের পথে রওনা হোল। চারখানা লরিতে বোঝাই হল শুধু টাকা—তামার চওড়া পাতে আঁটা কাঠের ভারী বাক্স বোঝাই নগদ টাকা। প্রাইভেট মোটর দু-খানায় রাজা, রাণী, ছেলেমেয়ে। সামনে পেছনে দু-খানা লরিতে তেরপল চাপা মেসিনগান।

শেষ রাত্রে কুয়াশার মধ্যে কাবুলের নিঃশব্দ রাজপথ দিয়ে দেশের রাজা রানীকে নিয়ে আমরা তীরের বেগে গাড়ী উড়িয়ে দিলাম।

কাবুল নদী পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের একটা ঘাঁটি। এতগুলো গাড়ী গেলে নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করে পথ আটকাবে। আঠ পুরণদল মেসিন গানের পেছনে তৈরী হয়ে বসলো। আমরা কি করব ভাবচি—স্বয়ং আমানুল্লা হুকুম দিলেন কেটে বেরিয়ে চলো—

গম্বুজের কাছে ওরা অনেকে জড় হয়েচে দূর থেকে দেখতে পাচ্চি। আমরা অ্যাকসিলারেটরে পা দিয়ে সজোরে চাপলাম—চালাও! হু হু করে স্পিডোমিটারে ত্রিশ মাইল থেকে ঠেলে উঠল—চল্লিশ…পঞ্চাশ—চক্ষের নিমেষে ওদের ঘাঁটিটা একটা রাঙা কালো আবছায়ার মত পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল—দুমদাম রাইফেল চললো…পটপট মেসিনগান উত্তর দিলে আমাদের দিক থেকে। একখানা টাকা বোঝাই লরি টায়ার ফেটে অচল হয়ে পড়লো। রইল সেটা পড়ে—কেউ তার দিকে চাইলাম না।

পেছনে ওরা এবার তাড়া করবে নিশ্চয়ই। আমাদের সময় ছিল না; কান্দাহারের খবর পেলাম, কোয়েটা যাবার পথ বিদ্রোহীরা আটকেছে। ঘুরে হেলমন্দ নদী পার হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আমরা আফগানিস্থানের সীমানা পার হই। তারপর বেলুচিস্তানের দুর্গম মরুভূমি…কালো কালো গাছপালাহীন পাহাড় আর কটা বালির মরুভূমি—মরুভূমি আর পাহাড়।

এই মরুভূমির মধ্যে কালাত থেকে চাঘানের পথে বেলুচ দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করলে, ভাবলে লরি বোঝাই সওদাগরী মাল যাচ্চে। মেসিনগান খেয়ে হটে গেল। একবার জল গেল ফুরিয়ে। এঞ্জিনের ট্যাঙ্কের গরম জল রাজা রানীকে খেতে দিলাম নিজেদের বঞ্চিত করে। হয়তো সেবার সবসুদ্ধ মরতে হোত মরুভূমির মধ্যে; কারণ ঠিক সেই সময় বেজায় বালির ঝড় উঠলো। রাস্তা নেই, দিক মুছে গেল, তার ওপর মুশকিল একখানা সেলুন গাড়ীর এঞ্জিন অকর্মণ্য হয়ে পড়লো, কি যে সেটার ঘটল, কিছুতেই আমরা তা ধরতে পারলাম না। বাকী গাড়ীখানায় ঐ গাড়ীর ছেলেমেয়েদের তুলে দিলাম—সেই ভীষণ গরমে, তৃষ্ণায় আর ঠাসাঠাসিতে তাদের কি কষ্ট! একেবারে নেতিয়ে পড়লো গাড়ীর মধ্যে। আমানুল্লা নেমে এসে লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে কালাত থেকে করাচীগামী গবর্ণমেন্টের ডাক মোটরের সঙ্গে আমাদের দেখা হোল। ডাক পাহারা

দেবার জন্যে সঙ্গে একখানা গাঁজোয়া গাড়ী, কারণ ঐ সময়টা বেলুচ হঙ্গামের বড় উৎপাত চলছিল মরুভূমির পথে। একদিনে চামান, পরদিন দুপুরে করাচী। ঠিক হোল সেখান থেকে স্টীমারে রাজা রানী বম্বেতে যাবেন। আমরা ফিরলাম সেই দিনেই কাবুলে। অনশিঙ্গ দুশো টাকা বকশিশ দিলো, গাড়ী ভাড়া ও তেলের দাম বাদে। বিদায় নেবার সময় আমানুল্লা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন— যদি কখনো ফিরি, তোমাদের ভুলবো না। চেয়ে দেখি রানীমার চোখে জল। আমাদেরও কারো চোখ সে সময় শুষ্ক ছিল না, বোধ হয় কঠোর প্রাণ দুর্দ্ধর্ষ আঠ পুরণমলেরও না—নইলে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল কেন?

যাচাই

গরুর গাড়ী ঢুকলো চাঁদপুর গ্রামের মধ্যে। ননীবালা ছেলেকে বল্লে—

—বাবা, চেয়ে ভাখো—

—ঘুমুই নি মা। চেয়ে আছি—

—এই গাঁয়ের সীমানা। ওই গেল দুলে পাড়া—

—ব্রাহ্মণ পাড়া কতদূর?

—আরও আগে।

ননীবালার সারা দেহে মনে একটি অপূর্ব্ব অনুভূতির শিহরণ!

মনে পড়লো আজ ত্রিশ বত্রিশ বছর পূর্ব্বে একদিন এই গ্রামে নববধূ রূপে ঢুকবার সেই দিনটির কথা। তিনি ছিলেন পাশে—আজ যেমন ছেলে সুরেশ তার পাশে বসে রয়েছে। তেমনি মুখচোখ, তেমনি চোখের দৃষ্টি, বয়েসও তাই।

চাঁদপুর গ্রামে ঢুকবার কিছু পরেই কাককোকিল ডেকে ভোর হয়ে গেল।

সুরেশ গাড়ী থেকে নেমে গাঁয়ের পথের ধুলো তুলে মাথায় দিলে।

মাকে বল্লে—তোমরা কতদিন গাঁ থেকে গিয়েছিলে?

—তোর বয়েস।

—একুশ বছর!

—হ্যাঁ। ওঁর ইস্কুলের চাকরী গেল—আমরা এখানকার মায়া কাটালুম।

—বাবা দুঃখ করেন নি?

—আহা! মরবার আগেও প্রায়ই বলতেন—বড় বৌ, একবার যদি চাঁদপুর যেতে পারতাম ফিরে, তবে বোধহয় কিছুদিন আরো বাঁচতাম। ওখানে এখনো চৈত্র মাসের দুপুরে বুড়ীরা কুলচুর শুকুচ্চে রোদ্দুরে। বাঁশবনে কত কোকিল পাপিয়া ডাকচে—আমি গাঁয়ে যাবো। শহরের ছোট্ট বাসার মধ্যে উনি চিরকাল হাঁপিয়ে এসেচেন। আর তেমনি গরম সেখানে।

—আমি যদি তখন বড় হোতাম, বাবাকে বাবার জন্মভূমিতে ঠিক নিয়ে আসতাম বলে দিচ্চি।

সুরেশ ছিপছিপে চেহারার শক্ত হাতপা-ওয়ালা যুবক। ফুটবল খেলে ভালো। দেশ স্বাধীন হবার পরে রাইফেল ক্লাবে যোগ দিয়ে খুব রাইফেল ছোড়া অভ্যেস করচে। এইবার রেলের শিক্ষানবিশি শেষ করে ভালো চাকুরী একটা পাবে। শিক্ষানবিশির সময়েই ও খেলোয়াড় হিসেবে রেলের উপনিবেশের শহরটির অনেক বড় বড় অফিসারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে। শিক্ষানবিশির ছাত্রও সে ভালো—অঙ্ক বেশ ভালো জানে বলে অঙ্কের টুইশানিতে মাসে আজকাল সত্তর আশি টাকা রোজগার করে।

স্বামী মারা গিয়েচেন আজ দশ এগারো বছর। সুরেশ তখন দশ বছরের ছেলে, নিচের ক্লাসে পড়ে। কি আতান্তরেই ফেলে গিয়েছিলেন সেদিন! মনে হয়নি যে আবার একদিন এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। রেল উপনিবেশের সকলেই খুব দয়া করলেন। একটা বাসা দেখে দিলেন, কারণ রেলের কোয়ার্টার ছাড়তে হোল, ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর হরিচরণ বসু নিজে দেখাশুনো করলেন। সুরেশের লেখাপড়া যাতে বন্ধ না হয়, যাতে এ গরীব অসহায় পরিবারটি অনাহারের পথ থেকে রক্ষা পায়—এ সমস্তই ওখানকার বড় বড় লোকেরা করলে। সে সব দিনের কথা ভাবলে জ্ঞান থাকে না। এমন দিনও আসে মানুষের জীবনে!

আজ মনে হচ্চে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এসে অদূরে এবার কূলরেখা যেন দেখা দিয়েচে। ওরা সবাই বলে আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, আর সে যুগের মত কষ্ট করতে হবে না। এখন ছেলেপিলেদের ভালো চাকুরী হবে, চাকুরীতে উন্নতি হবে, আগের মত অল্প মাইনেতে ঘসটাতে হবে না। না খেয়ে মরবে না কেউ এ স্বাধীন ভারতের মাটিতে। অনেক বড় বড় আশার কথা সে শুনেচে, ছেলে-ছোকরারা কত মিটিং করে, বক্তৃতা দেয়। গান্ধীজীর ছবিতে মালা দিয়ে গান করতে করতে শহর ঘুরে বেড়ানো এই তো সেদিন। তাঁর মৃত্যুর পরে সেদিন এক বৎসর বুঝি ঘুরলো। সুরেশও চমৎকার গান গাইতে পারে। আর একটা গান গায় সুরেশ, গান্ধীজী নাকি বড় ভালবাসতেন। সবাই বলে, রামধুন গান।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিতপাবন সীতারাম।

ভোরের আলো বেশ ফুটেচে। সামনের পুরোনো কোঠাবাড়ীটা থেকে একজন বার হয়ে এসে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের গরুর গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলে। নন্দীবালা চুপিচুপি বল্লে—ও সুরেশ, ওই বোধহয় তোর বিনোদ কাকা, ওঁর খুড়তুতো ভাই। আমি চিনেচি। তুই এগিয়ে যা। পরিচয় দিয়ে প্রণাম করবি। ওঁকেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

মিনিট পনেরো কেটে গেল উভয়ের কথাবার্তায়। সুরেশ আর তার বিনোদ কাকায়।

তারপর বিনোদ কাকা এগিয়ে এসে নন্দীবালাকে আদর করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

বহুদিন পরে গ্রামের বৌ গ্রামে ফিরে এলেচে। আজ কুড়ি একুশ বছর পরে। গ্রামের বৌ-ঝি দেখা করতে এল এপাড়া ওপাড়া থেকে। অভয় নাপিতের বৌ এসে বল্লে—ও বৌ কেমন আছ? খোকা কই? কতবড়ডা হয়েচে দেখি? দাঁড়াও, একটু পায়ের ধুলো তাও দিনি আগে।

তারপর দুই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সে সামনে বসলো।

অভয়ের বৌকে দেখে ননীবালা যেমন-আশ্চর্য্য হয়ে গেল তেমনি মনে মনে কেমন এক ধরনের দুঃখও হোল। অভয়ের বৌ তার চেয়ে অন্তত কুড়ি পঁচিশ বছরের বড়, তার মার বয়সী, চুল অর্দ্ধেক পেকে গিয়েছে—শুধু দাঁত ভাল আছে বলে অত বয়েস বোঝা যায় না—কিন্তু অভয়ের বৌ এখনো সধবা। পাকা চুলে সিঁদুর পরচে। অভয় নাপিত এখনো বেঁচে থাকবে সেটা ভেবে দেখলে এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়, বড় জোর সত্তর বাহাত্তর না হয় তার বয়েস হয়েছে—কিন্তু—

এ 'কিন্তুর' কোন সান্ত্বনা ননীবালা মনের মধ্যে খুঁজে পেলে না। ওঁর কি মরবার বয়েস হয়েছিল? পরদিন সে দেখলে, শুধু অভয় নাপিতের বৌ নয় তার চেয়ে অনেক বড় বয়েসে বৌ এখনো দিব্যি সিঁদুর পরছে পাকা আধপাকা চুলে। কেন চলে গেলেন অল্প বয়সে ওদের বিদেশে ভাসিয়ে? গ্রামের মেয়েরা যখন দেখা করতে আসে, তখন বার বার ওই কথাটাই মনে হয় ওর।

ননীবালার শ্বশুরবাড়ী বিনোদ কাকাদের বাড়ীর দক্ষিণ গায়ে। কুড়ি একুশ বছর ধরে সে বাড়ীতে কেউ না থাকায় উঠোনে একগলা নোনা, ভাঁট, সেঁউতি লতার জঙ্গল, জংলী ডুমুরের বড় গাছে ডুমুর ফলচে পাঁচিলের মাথায়, জানলায় কাঁটালতা উঠে জানালার কবাট ঢেকে ফেলেচে।

সুরেশ কেবলই বলছিল, মা, আমাদের নিজের বাড়ীতে চলো গিয়ে। গ্রামে এসে পরের বাড়ীতে থাকবো কেন? আজ তিন চার দিনে জঙ্গল কাটিয়ে উঠোন পরিষ্কার করে তবে ননীবালা নিজেদের ভিটেতে ঢুকলো।

মাত্র তিনখানি ঘর, দুটো বারান্দা দুদিকে, ভাঁড়ার-রান্নাঘর আলাদা। কতকাল পরে আবার এ ভিটের মাটিতে সে পা দিল? দীর্ঘ একুশ বছর। এতও তার জীবনে ঘটবার ছিল।

সুরেশ বলে—কই মা আমার তো কিছু মনে নেই এ বাড়ীতে থাকবার কথা?

ননীবালা বলে—দূর, তোর বয়েস যখন ন মাস, তখন এ বাড়ী ছেড়ে আমরা চলে যাই যে।

—এখন এখানে কিছুদিন থাকো মা। আমার বড্ড ভালো লাগচে।

—থাকতেই তো এলাম। এখন মা মঙ্গলচণ্ডী যা করেন।

ননীবালা সারাদিন ঘর ঝাড়ে পোঁছে সাজায়। আজ একুশ বছরের ধুলোর স্তর পড়েচে ঘরখানার ওপর। কেবলই ওর মনে পড়চে আজকাল ওদের বিবাহিত জীবনের সেই মধুমাখা দিনগুলি—নববধূর নতুন স্বপ্ন মাখানো অপূর্ব্ব রাত্রি ও দিনগুলি। উনি তখন একেবারে তরুণ, সে চোদ্দ বছরের কিশোরী।

ওই তো সেই কুলুঙ্গিটা। ওটাতে উনি একদিন রসগোল্লা এনে লুকিয়ে রেখে মজা করেছিলেন। একটা বিলিতি ওষুধের কাগজের বাক্সের মধ্যে রসগোল্লা ছিল লুকোনো। উনি বলেছিলেন—কি বলো তো ওতে ?

প্রগল্‌ভা নববধূ বলেছিল—তোমার জিনিস তুমিই জানো। ও তো একটা বিলিতি ওষুধ।

—বাজি ফেলবে ?

—অত শত আমি বুঝি নে। কি ওতে ?

—রসগোল্লা।

—হাতী।

—পা ছুঁয়ে বলচি। এই ছাখো—ক'টা খাবে বলো।

তারপর দুজনে কাড়াকাড়ি করে সেই রসগোল্লা খেয়েছিল—ত্রিশ বছর আগের কথা। মনে হচ্চে কাল ঘটেচে। এখানে বসে বড্ড বেশি করে স্বামীর কথা মনে পড়চে ননীবালার। সব ঘরে, সব বারান্দায়, প্রতি কোণে, ওই রান্নাঘরের খেতে বসবার বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানায় ওর নববধূজীবনের স্মৃতি মাখানো। তরুণ স্বামী সেখানে ঘুরচেন এঘরে ওঘরে, ও নিজে সেখানে ব্রীড়ানম্র কুণ্ঠিতা কিশোরী বধূ, নতুন প্রেমের স্পর্শে দুরুদুরু বুক নিয়ে আলতাপরা পায়ে এঘরে ওঘরে গৃহকাজ করে বেড়াচ্চে নবীন উৎসাহ নিয়ে !

ননীবালার মনে হচ্চে যেন ওঘরে গেলেই দেখবে তিনি বসে আছেন তক্তপোশে আবার ওঘরে থাকলে মনে হয় বুঝি এঘরে এলেই দেখা পাবে। আগেকার দিনের মত লুকোচুরি খেলা এখনো কি চলচে ?

একবার উনি নতুন ধানের শিষ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বল্লেন—লক্ষীর ঝাঁপিতে রেখে দাও। নতুন জমির নতুন ধান। শাঁখ বাজাও, তুমি ঘরের লক্ষী, শাঁক বাজিয়ে অভ্যর্থনা করা নিয়ম তোমার।

ঠিক দুপুরের গম্ গম্ রোদে অলস নিমফুলের গন্ধের মধ্যে কতকাল আগের তার কথাই মনে পড়ে। ননীবালা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাঁশঝাড়ের ঘন ডালের দিকে, কিন্তু মন তখন অতীত দিনের কোন্ আবেশাতুর মুহূর্ত্তটিতে স্থিরনিবদ্ধ। হয়তো সে সময় ছেলে সুরেশ বলে ওঠে—মা, একটু খাবার জল দাও না। ননীবালা চমকে ওঠে ধ্যান ভেঙে, লজ্জা পায় পাছে ছেলে কিছু বা বুঝে ফেলে। ছেলেকে জল দিয়ে হয়তো কাঁথা সেলাই করতে বসে গেল, কিংবা নতুন-পাড়া তেঁতুলের রাশ বঁটি পেতে কাটতে আরম্ভ করে দিলে।

অমনি মনে পড়ে যায় সেই সব দিনে এমন চৈত্রের দুপুরে—

বাড়ীর পেছনের গাছের তেঁতুলের রাশ এমনি কাটতে বসেছিল একদিন—

উনি পেছন থেকে এসে চুপিচুপি বল্লেন—তেঁতুল কাটা দাখো। নুন দিয়ে নেবুপাতা দিয়ে তেঁতুল জরাও দিকি বেশ করে ?

—চুপ! মা টের পাবেন। পালাও তুমি। তেঁতুল খেলে জর হয়।

—ইস্! উনি যেন আর খাবেন না, একলা আমি খাবো কিনা ? মা ঘুমুচ্চে। তুমি

তাড়াতাড়ি ওঠো তো লক্ষীটি। জিভে জল আসচে না তেঁতুলের নামে! সত্যি কথা বলো।

ননীবালাকে উঠে যেতে হয় কাটা তেঁতুল নিয়ে রান্নাঘরের দিকে। উনি বলেন—দাঁড়াও, আমি নেবুপাতা নিয়ে আসচি। তেঁতুলগুলো একটু ধুয়ে নিও, বড্ড বালি কিচ্ কিচ্ করবে নইলে—

ননীবালা ধমকের সুরে বলে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সর্দারি করতে হবে না। তেঁতুল ধুয়ে কেউ জরায় না। জিগ্যেস করো গিয়ে। পান্সে হয়ে যায়।

দুজনে কাড়াকাড়ি করে সেই একতাল জরানো তেঁতুল খেয়ে ফেলে। পরদিনই ওঁর সর্দি আর গলাব্যথা, ননীবালা আঙুল তুলে কৌতুকের সুরে বলে—কেমন? বলেছিলাম না? কথা শোনা হোল? আমার কথা শোনা হবে কেন। আমি কি আর কেউ?

—মাকে যেন কোনো কথা বোলো না—

—ঠিক বলে দেবো। চালাকি বার করে দেবো, দেখো। আর একটু তেঁতুল চলবে? নিয়ে আসবো নুন নেবুপাতা দিয়ে?

ননীবালার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে আঁচল দিয়ে, ছেলে পাছে টের পায়। আজ যদি তিনি থাকতেন! মরার বয়েস হয়নি তো। অনায়াসেই থাকতে পারতেন। আজ কি সুখের দিন তা হোলে। খোকা এত বড় হয়েছে। যে দেখে সেই ভালো বলে। দুদিন পরে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় হেসে ভালো চাকরী করবে। উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খান না কেন! আমরা তাঁকে কাজ করতে দিতাম না। আরাম করে খান না ছেলের রোজগার। এই দুপুরে বসে বসে কত গল্প করতাম দুজনে। ছেলের বৌ সেবা করতো, তেঁতুল জরিয়ে নিয়ে আসতো।

পৃথিবীর পথে সে যেন একা।

সঙ্গী চলে গিয়েচে তাকে ফেলে।

দীর্ঘ পথ সামনে দূর থেকে দূরে বিস্তৃত। কে জানে কতদিন চলতে হবে এই টানা পথ বেয়ে?

না না, তার খোকা, তার সুরেশ আছে। বেঁচে থাক সে। তার ঘরকন্না গুছিয়ে দিতে হবে না? আজ বাদে কাল সুরেশের বিয়ে দিতে হবে। ছেলেমানুষ ওরা, সংসারের কি জানে। তাকেই গুছিয়ে দিতে হবে সব।

সুরেশ এসে বলে—মা একটু তেঁতুল জরাও না? নুন দিয়ে, নেবুপাতা দিয়ে।

ননীবালা চমকে উঠে ছেলের তরুণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের জল রোধ করলে।

ছেলে কি করে জানলে তার বাবা অবিকল এমনি সুরে, এমনি টান দিয়ে কথা বলতো?

প্রাণে ফিরে আসা পর্য্যন্ত ওঁর প্রতিধ্বনিকেও যেন সে শুনতে পায়। কি জানি, কিছুই যেন ভাল লাগে না। সব যেন ফাঁকা, অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কোন কাজে আর উৎসাহ নেই।

একদিন ওপাড়ার হরিদাস চক্কত্তির বাড়ী সত্যনারায়ণের পুঁথি শোনা ও প্রসাদ খাওয়ার নিমন্ত্রণে সে পাড়ার ঝি-বৌয়ের সঙ্গে গেল। সেকেলে কোঠাবাড়ী, দালানে পুজোর জায়গা হয়েচে, মাদুর পেতে দেওয়া হয়েচে, নিমন্ত্রিতা মেয়েদের জন্যে। পুরুষেরা বসেচে বাইরের রোয়াকে। পূর্ণিমার রাত্রে উঠোনের বড় নারকোল গাছগুলোর ছায়া পড়েচে রোয়াকে। সন্ত-তোলা যুঁই ফুলের সুগন্ধে ভুরভুর করচে পুজোর বারান্দা।

হরিদাস চক্কত্তির বৌ বল্লেন—এসো এসো ভাই। কতদিন গাঁয়ে আস নি, সেই একবার এসেছিলে অনন্তচতুর্দ্দশীর ব্রত উদ্‌যাপনের সময়, মনে পড়ে?

ননীবালা বল্লে—খুব মনে পড়ে।

—তখন তোমার নতুন দু' এক বছর বিয়ে হয়েচে।

—দুবছর হবে।

—চেহারা আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েচে।

—আর চেহারা দিদি! কি দরকার আমাদের চেহারায় বলুন। সে পাট তো ঘুচে গিয়েচে।

—আহা হা, সে আর বোলো না ভাই। ঠাকুরপো তো ছেলেমানুষ। আমাদের ওঁদের চেয়ে কত ছোট। তার কি এখন যাবার বয়েস হয়েছিল? সবই অদেষ্ট! কি বলবো বলো।

ননীবালার দুচোখ ততক্ষণ জলে ভরে গিয়েচে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, নয়তো জল গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে। সে একটা লজ্জার কথা এদের সামনে। তার মনে যে কি অভাব, সে কথা এরা কেউ বুঝবে না। সে মধুর অনুভূতির স্মৃতি এদের জীবনে পুঁজি নেই, স্থূল জীবনযাত্রা চালিয়ে যায় রান্নাবাড়া করে, খাইয়ে, ঘরকন্না গেরস্থালি করে। তার মনের সে অনুভূতির খবরাই নেই এদের। চোখের জল দেখে ভাববে ঢং করে কাঁদচে লোক দেখানোর জন্যে।

পাশের বাড়ীর কানাই গাঙ্গুলির পুত্রবধূ এসে বসলো ওর পাশে। ওর সঙ্গে আলাপ করে ফেল্লে। অল্পদিন বিয়ে হয়েচে, একটি মাত্র মেয়ে, ন' মাস বয়েস। বাপের বাড়ী শান্তিপুরের কাছে হবিবপুর। বেশ শহুরে টান কথাবার্ত্তায়। ওকে বল্লে— কাকীমা, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো ভাবচি আজ ক'দিনই।

—আমার কথা কে বল্লে তোমায়?

—সবাই বলে। আমার পিসশাশুড়ী বলছিলেন, বড় ভালো বৌ ছিল এ গাঁয়ের। গিয়ে দেখা করে এসো বৌমা। আপনার নাম কি কাকীমা?

—ননীবালা। তোমার?

—প্রীতিলতা।

—বেশ নামটি। খুকির নাম কি?

—এখনো কিছু রাখি নি। ডাকনাম টুনু। আপনার কাছে যাবো এখন। একটা

নাম ঠিক করে দেবেন এখন আপনার মাতমীয়।

—দেবো না কেন বৌমা, কালই দেও। গান কর নাকি?

—গাই। সে তেমন কিছু না। আপনার মুখে শুনবো। এইমাত্র ওরা বলছিল আপনি ভালো গান জানেন।

—আমি? আমার গানের পাট তো চুকে গিয়েচে মা। আবার—

নাঃ, যখন তখন চোখে জল এসে বড় অপ্রতিভ করে দেয়, এইসব ছেলেমানুষ ঝি-বৌয়ের সামনে! তার কি এখন চোখ পানসে করে কাঁদবার বয়েস? সে না গিন্নিবান্নি? ছেলের মা?

প্রীতিলতা মেয়েটি বেশ দেখতে, কত আর বয়েস হবে, আঠারোর বেশী নয়। মনীবালা সামলে নিয়ে বল্লে—দেও বৌমা। তোমাদেরই মুখের দিকে চেয়ে তো আবার এ গাঁয়ের মাটিতে পা দিলাম। যাবে বৈকি।

সব বেশ ভালভাবেই চলছিল, এমন সময় আর একটি ওর সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে দেখা হোল, তার নাম কনক, এপাড়ার কোনো এক বাড়ীর মেয়ে, বোধহয় উপেন ভট্টাচার্যের মেয়ে। কনক ছুটে এসে ওর হাত দুখানা চেপে ধরে বল্লে—মনে পড়ে বৌদি? মনে পড়ে?

একে খুবই মনে পড়ে। স্বামীর ঘরে প্রথম প্রথম যাবার সময় এই মেয়েটি আর রায়-চৌধুরী পাড়ার সুবাসিনী এই দুজনে কি অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই তাদের রুদ্ধ দুয়ারের বাইরে আড়ি পেতে বসে থাকত রাত দুপুর পর্য্যন্ত।

একদিন—না, সে সব কথা এখন মনেই চাপা থাক।

যুঁইফুলের গন্ধেভরা দীর্ঘবিলসিত তাদের পুরণো বাতাস কোন্ দিগন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এসব পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের জ্ঞানকাণ্ড বোধহয় একটু কম। নইলে সে যেটা প্রাণপণে চাপা দিতে চাইচে, ওরা সেটা খুঁচিয়ে তুলতে চাইবে কেন? একটা সাধারণ বুদ্ধিও তো আছে! কনক সামনে এলেই মনে পড়ে সে সব মাধবী-রাত্রির টাটকা যুঁই চাঁপার গন্ধ। কেন এরা সামনে আসে? কেন এরা সামনে আসে? মনীবালা মুখে অতি কষ্টে হাসি টেনে বল্লে—হ্যাঁ ভাই, কনক ঠাকুরঝি। ভালো?

—ভালো। তুমি?

—দেখতেই পাচ্ছ।

—তা তো দেখচি। আহা, মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। সেদিনের কথা। সেই রাত্রে দাদা আমার মুখে খড়িগোলা মাখিয়ে দিলে আড়ি পাতবার জন্যে, মনে পড়ে?

না, এদের যেন আর কোনো কথা নেই আজকার দিনে। মনীবালা চুপ করে রইল দেখে কনক বোধহয় কিছু অপ্রতিভ হোল। সেও চুপ করে গেল।

খুব লোকজনের ভিড়। দালানের মধ্যে মেয়েদের প্রসাদ খাবার পাতা সাজিয়ে দেওয়া হোল। মনীবালা এবং অন্যান্য মেয়েরা সেখানেই বসলো। সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়া আরম্ভ হোল।

খানিক পরে সেখানে একজন বৃদ্ধ লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধের বাঁ হাতে একটা বাটি। বৃদ্ধ এসে বল্লে—পূজো হয়নি ?

হরিদাস চক্কত্তির ছেলে বল্লে—না। আসুন জ্যাঠামশায়। বসুন—

—মেয়েদের মধ্যে আর বসব না। যাই বাইরে। কত দেরি হবে ?

—বেশি দেরি হবে না জ্যাঠামশায়।

—আবার বাড়ী গিয়ে রুটি করতে হবে, তবে খাবো। বেশি রাত্তির না হয়।

ননীবালা পাশের কাউকে জিগ্যেস করলে—উনি কে ভাই ?

সে বল্লে—চাটুয্যে বুড়ো। ছেলেরা বড় রোজগেরে, কলকাতায় থাকে। বুড়ো বাবা এখানে পড়ে আছে, খোঁজও নেয় না।

—বৌ বেঁচে নেই বোধ হয়।

—খুব আছে। ছেলেদের কাছে কলকাতায় থাকে।

—ইনি যান না কেন ছেলেদের কাছে ?

—তা কি জানি দিদি। তা বলতে পারিনে। এখানে থাকে, তাই তো দেখি আর তুমিও যেমন! নিজের খবরই রাখতে পারি নে, তার আবার পরের খবর নিতে যাচ্ছি।

রাত অনেক হয়ে গেল পূজো ও পুঁথি-পড়া শেষ হতে। ননীবালা যখন ছেলের সঙ্গে বাড়ী যায়, তখন দেখতে পেলে সেই বৃদ্ধ ওদের আগে আগে চলেচেন লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে। ওদের দেখে বল্লেন—কে যায় ? তোমাদের তো বাবা চিনতে পারলাম না ?

সুরেশের পরিচয় পেয়ে বড় খুশি হোলেন। তাকে কত আশীর্বাদ করলেন, ননীবালাকে বল্লেন—তোমায় বিয়ের পর একবার বৌমা তোমায় দেখেছিলাম—বিয়ের বৌভাতের দিন। যেও আমাদের বাড়ী, কেমন ? কালই যেও।

পরদিন বিকেলে ননীবালা চাটুয্যে বুড়োর বাড়ী গেল। সামনে বারান্দাওয়ালা সেকেলে কোঠাবাড়ী, একদিকে ডুমুর গাছ অন্যদিকে একটা বাতাবিনেবুর গাছ—উঠোনের পুবদিকে একটা পেঁপেগাছে অনেকগুলো পেঁপে ধরেছে।

বুড়ো বল্লে—কি দেখচো বৌমা, ও সব আমার নিজের হাতে করা। সবাইপুরের বিশ্বেসদের বাড়ী থেকে বীজ আনিয়েছিলাম আজ ন' বছর আগে। সেই গাছ। তখন ওরা সব এখানে ছিল।

ননীবালা বল্লে—ওরা কারা জ্যাঠামশায় ?

—তোমার জ্যেঠিমা।

—আপনাকে এখানে রেঁধে দেয় কে ?

—নিজেই। খুব ভালো রাঁধতে পারি। এই এখন বসে পরোটা করবো।

—জেঠিমা থাকেন না এখানে ?

—না না। ওরা বড় ছেলের কাছে থাকে কলকাতায়।

—ক' ছেলে আপনার ?

—তিনটি। তা নিজের মুখে বলতে নেই, তিন ছেলে ভালো চাকুরীই করে। শ্যামবাজারে তেতলা বাসা। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান। বড় ছেলের মোটর গাড়ী। দশে মানে, দশে চেনে। চাটুয্যে সায়েব বল্লে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের একডাকে সকলে চেনে। চেহারাও একেবারে সায়েবি— নিজের ছেলে বলে বলচি তা ভেবো না—

বৃদ্ধের মুখে-চোখে গর্বের ভাব অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিজের মনে আপনা-আপনি হেসে উঠে বল্লেন—জন্মাবার পরে এতটুকু ছিল। ওর মা কুলেসবলার পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরে তবে ওই ছেলে বাঁচায়! ছ'বছর বয়েসে কাঁকড়াবিছের কামড়ে ছেলে নীলবর্ণ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হয়েছিল। কাঁটানটের শেকড় বেটে খাইয়ে জলপড়া দিয়ে তেলপড়া দিয়ে সে যাত্রা অতিকষ্টে রক্ষা হয়। তবে আজ আমাদের নৃপেন—তা এসো, বোসো বৌমা। এই পরোটা কখানা ভাজি আর তোমার সঙ্গে গল্প করি।

একটা ক্ষুদ্র ভাঁড়, চেঁচে-মুছে ঘি বেরুলো আধ-ছটাক খানেক।

বৃদ্ধ ভাঁড় দেখিয়ে বল্লেন—দালদা। ভালো দালদা। আর তা ছাড়া পাচ্চি কোথায়? খাঁটি ঘি আট টাকা সের।

—কেন আপনার ছেলে টাকা পাঠায় না?

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—নৃপেন? তার অনেক খরচ। রোজগারও যেমনি, খরচও তেমনি। আমি আর তাকে বিরক্ত করিনে। আমার বিঘে তিনেক ধানের জমি আছে, আর ধরো লাউ করি, কুমড়ো করি, ঢেঁড়স, ডাঁটা—সব তৈরি করি নিজের হাতে। বেশ চলে যাচ্চে। নৃপেন পুজোর সময় একখানা ভালো থান কাপড় পাঠিয়ে দিয়েচে—ফাইন থান —তা বৌমা সে আমি তুলে রেখে দিয়েছি। বার বার দেখি, বলি বড় খোকা আমায় দিয়েচে। ছোট ছেলের বাসা আগে ছিল কলকাতায়—এখন মণিপুরে। সে একজোড়া চটিজুতো পাঠিয়ে দিয়েছিল পুজোর সময়।

মনীবালা ইতিমধ্যে পরোটা কখানা বেলে দিয়ে বল্লে—আপনি ভেজে নেবেন, না আমি দেবো?

—না না আমিই নিচ্চি।

—কেন কষ্ট করবেন? সরুন। আমি করে দিচ্চি।

মনীবালা খাবার তৈরী করে আসন দিয়ে পিঁড়ি পেতে বৃদ্ধকে যত্ন করে খেতে বসিয়ে দিলে। চাটুয্যে বুড়োর মুখের ভাব দেখে মনে হলো অনেকদিন তাকে এমন যত্ন করে কেউ খাবার করে খাওয়ায় নি।

বুড়ো বল্লে—কি সুন্দর পরোটা হয়েছে! মেয়েমানুষ না হোলে কি খেয়ে তৃপ্তি? মেয়েদের হাতের রান্নাই আলাদা। বেঁচে থাকো বৌমা বেঁচে থাকো। মুখ বদলালাম অনেকদিন পরে।

—আপনার ছেলেদের বৌ কেউ এখানে থাকেন না কেন?

—না না। পাগল। তাদের কি এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে বলতে পারি? তুমি

জানো মা, এসব অশিক্ষিত স্থানে তাদের আমি আসতে বলতে পারি না। তাদের মন টেঁকে এখানে? গরীব ছিলাম নিজে বটে কিন্তু ছেলেদের মানুষ করে দিয়েছি কষ্ট-দুঃখ করে। বিয়েও দিয়েছি তেমনি ঘরে। বড় বৌমার বাবা মতিহারিতে সিভিল সার্জন। মেজ বৌমার বাবা নেই, মামারা খিদিরপুরে বড় কনট্রাকটর, রায় চৌধুরী কোম্পানীর নাম শুনেছ? সেই রায় চৌধুরী কোম্পানী। ছোট বৌমার বাবা এখন বাঁকুড়োর সদর এস. ডি. ও.। বড় বৌমা ম্যাট্রিক পাশ। ছোট বৌমা বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, পরীক্ষা দেন নি। ইংরিজি বলেন কি? আড়াল থেকে শুনেচি—যেন মেমসাহেব! হুঁ হুঁ বৌমা—এসব গল্পকথা এখান থেকে শোনাবে। নিজের চোখে না দেখলে—

—তাঁরা কখনো এখানে আসেন নি?

—বড় বৌমা এসেছিলেন একবার পুজোর সময়, যেবার আমার বড় নাতির ভাত হয়। প্রথম ছেলের ভাত এখান থেকেই হয়েছিল কিনা! সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সে নাতি এবার ডাক্তারি পড়ছে মেডিকেল কলেজে। ওর পরে দুই মেয়ে, তারা ইস্কুলে পড়ে। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছে একটি। ছোট বৌমাকে নিয়ে আমার ছোট খোকা এসেছিল সেবার মোটরে করে, ঘণ্টা চারপাঁচ ছিল সবাই। আমি অনেকদিন দেখি নি কিনা, তাই চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি পেয়ে বৌ নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। ছোট বৌমা এসে শুধু ভাব আর চা খেয়েছিলেন—পাড়াগাঁয়ের জল খেলেই ম্যালেরিয়া হবে। তাদের অবস্থা ভালো, শিক্ষিত, সব বোঝে তো। রাত কাটালো না এখানে। কোথায় বা শুতে দিতাম, না বিছানা, না মশারি। নিজে শুই একটা ছেঁড়া মশারি টাঙিয়ে। সারারাত মশা কামড়ায়, নিজে ভালো দেখতে পাই নে চোখে যে সেলাই করবো।

—আমি কাল আপনার মশারি সেলাই করে দিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই।

—তা বেশ। এসো বৌমা। একটু গুড় সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারো? খাবার ইচ্ছে হয়, এবছর কিনতে পারি নি। বড্ড দাম! পরোটা দিয়ে খেজুরের গুড় লাগে বড় ভালো।

খাওয়া শেষ করে চাটুয্যে বুড়ো তামাক সাজতে বসলো। মনীবালা চলে এল। তার মনে সম্পূর্ণ অন্তরকম ভাব।

সুরেশকে সে খেতে দিলে। সুরেশ বল্লে—বেশ জোৎস্না উঠেছে মা, এখানে বোসো।

মনীবালা বল্লে—তাঁকে তোর মনে পড়ে?

—খুব। আমায় নামতা পড়াতেন রোজ সকালে উঠে। বাবা যদি আজ থাকতেন!

সুরেশের গলায় স্বর ভাঙা, আবেগে আড়ষ্ট।

মনীবালা ভাবলে, এই ভালো, এই ভালো। খোকা আজ তোমার নাম করচে, তুমি নেই বলে। ওর চোখের জলে তোমার স্মৃতি সার্থক হোক। বেঁচে থাকো মাঝে-মাঝে খোকার মনে। মন শুকিয়ে যায়, তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো চাটুয্যে জ্যাঠামশায়ের মত তোমাকেও অবহেলা পেতে হোত। ভালোই হয়েচে তুমি মানে মানে চলে গিয়েচো।

পত্রাবলী

[বিভূতিভূষণের পত্রগুলি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় লিখিত। সেখানে কুশলতা বা লেখকমনের কারিগরি প্রকাশ করিবার বাসনা বা ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তবুও মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাদেশে এত অজস্র সুন্দর পত্র রচনা খুব কম লেখকই করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের সমগ্র পত্রগুলি যদি একত্রে সম্পাদিত হইয়া কখনো মুদ্রিত হয়—তাহা হইলে আমরা বিভূতিভূষণের জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাঁহার রচনার উৎস এবং সাহিত্যকীর্তির কিছু পরিচয় পাইব বলিয়া মনে করি। বর্তমান খণ্ডে বিভূতিভূষণের এইরূপ ১৭টি পত্র মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক।]

(নীচের পাঁচখানি পত্র পত্নী শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

১

ইং—১৯৮।৪৭, সোমবার

কল্যাণীয়াসু,

বেশ মানুষ, নীরব কেন ? তোমাদের আসবার কথা ছিল ও সপ্তাহে, রোজ চাবিটা দরওয়ানের কাছে রেখে যেতাম আর রোজ ভাবতাম আজ গিয়ে দেখবো ঠিক কল্যাণী এসেচে। তোমার জন্তে Rowntree চকলেট কিনে রাখলুম, ঘরে ফিরে রোজ রোজ নিরাশ হয়ে একদিন রাগ করে চকোলেট নিজেই খেয়ে ফেললাম। তারপর অবশ্য তোমার বাবার পত্র পেলুম, পেয়ে জানলাম আসা তোমাদের হোল না। নিরাশ তো হয়েই ছিলাম, তোমার ওপর অকারণ রাগও হয়েছিল। সত্যি কথা বলাই ভালো।

এবারও বনগাঁয়ে দুদিন আনন্দে কেটেছিল, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বেলুর জন্ম-তিথির শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আমি আমার নিজের বাল্যদিনের অনুভূতি ফিরে পেয়েছিলাম। বিশেষত এই বর্ষাকালে। কেন যে বর্ষা ও শরৎ এই দুটি ঋতু আমার এত প্রিয় তা জানি নে—কিন্তু আমার শৈশবের সকল স্বপ্নলোক যেন এক সময় জন্ম নিয়েছিল এই ঋতুর মধ্যে, তাই শরতের নীল আকাশ, পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, ঘন সবুজ বনঝোপ আমার মনে শৈশবের সেই হারানো জগৎকে আবার ফিরিয়ে আনে, যে জগতের রহস্ত আমার কাছে কোনদিন শেষ হবে না, জন্মান্তরের পথে কতবার যার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।

কল্যাণী, তোমার মধ্যে একটি ভাবুক মনের পরিচয় পেয়েই তোমায় এ-কথা লিখলুম। এ জগতে বেশির ভাগ লোকে বস্তুকে, অর্থকে, বিষয়কে, পদগৌরবকে বেশি করে বোঝে, ভাবানুভূতিকে বোঝে না। কিন্তু সেদিন যখন বালুরঘাটের জীবনের প্রতি তোমার পিছুটানের কথা ও নানা জায়গার প্রকৃতি-বর্ণনা শুনলাম, তখনি আমার মনে হয়েচে তুমি এসব বোঝো ও ভালোবাসো। ছেলেমানুষ হলেও এই কল্যাণময়ী প্রকৃতির রূপ অন্ততঃ আবছায়া ভাবেও তোমার চোখে ধরা পড়েচে। সকলের পড়ে না

এবার শরতে একদিন বনগাঁয়ে আমরা সবাই বৈকালের আকাশের তলা দিয়ে নদী বেড়াতে যাবো, নৌকোয় করে। নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগবে, আমি বলতে পারি। শরতের নদীচরলগ্ন কাশবনের শোভা আশা করি পূর্ব্বে অনেক দেখেচ, এবারও দেখাবো। তোমার গল্প লিখবার খোরাক জুটবে।

তোমার চিঠি না দেওয়া ভুল হয়েচে। রোজ দেখি চিঠি এসেচে কি না। ভারি অন্যায় কল্যাণী। পত্র পেয়েই চিঠি দেবে। তোমায় এ কদিন পত্র লিখবো ভেবেছিলাম ; রাগ করে লিখিনি—এখন সত্যি আর থাকতে পারলুম না। কেন না মন উদ্বিগ্ন হয়েছে। ভাবচি, অসুখ বিসুখ হয়নি তো কল্যাণীর ?

আমি একটা কবিতা লিখেচি। তোমায় পাঠালুম। ভাল করে নকল করে আমায় দিও না? কেমন হয়েছে? আমি সাধারণতঃ তো কবিতা লিখি না।

তুমি স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। খোকাখুকীদের জানিও। যোড়শীবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার দিও।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার জন্য আমার মন সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়েচে, পত্র পেয়েই চিঠি দাও। ভুল না হয়, না হয়, না হয়।

পুনঃ—কপি করে তোমার বাবাকে কবিতাটি দেখিয়ে তাঁর মত নিও। তাঁর কেমন লাগে জানিও ঠিক আমাকে। তোমরা ভালো বললে একটা কাগজে দেবো।

নবযুগের কবি

দুঃখ হতে ক্ষতি হতে যে অমৃত করেছি সঞ্চয়
নিত্য পলে পলে
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি গাহি তারি জয়
নানা কুতূহলে
রজনীর অন্ধকারে অগণিত তারকার দ্যুতি
গগন অঙ্গনে
কি বিস্ময়ে হেরিয়াছি পুলকিত একা সারারাতি
মুগ্ধ শিহরণে—
মনে হবে জন্মে জন্মে জন্ম হতে নব জন্মান্তরে
মৃত্যুলোক পারে
সেই কথা রেখে যাব অরণ্যের পল্লব-মর্ম্মরে
ধরার দুয়ারে।
দুঃখ ভরা পৃথিবীর কবি আমি নামগোত্রহীন
অখ্যাত অনামী
মানুষের চিত্ত মাঝে তবু ক'বে মোর মর্ম্মবীণ
শাশ্বত সে বাণী,
অনন্ত বেদনা মাঝে চিরন্তন সৃষ্টির সম্ভার
আনন্দ স্বরূপে—
আমি যে দেখেছি তার প্রশান্ত স্বভাব
অপরূপ রূপে;
তাই মোর কাব্যকথা নবছন্দে হয়েছে মুখর
অশ্রুজল মাঝে,
কুসুম সঙ্গীতে তাই ধরিত্রীর ব্যাকুল অন্তর
ক্ষণে ক্ষণে বাজে।

২

৪১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬ই ভাদ্র, '৪৭ সাল, বৃহস্পতিবার রাত্রি

কল্যাণীয়াষু,

তোমার চিঠিখানা আজই আশা করেছিলুম, কিন্তু যখন চিঠি পেলাম তখন স্কুলে বার হচ্চি, কাজেই আজ উত্তর দেওয়া সম্ভব হোল না, যদিও আজই উত্তর দিলে তবে শুক্রবারে পাও। আজ আবার বারবেলা ক্লাবের বৈঠক ছিল, সুতরাং সেখান থেকে রাত্রে ফিরে তবে চিঠি লিখচি, শনিবারে পাবে। তাতে একদিন দেরি হোল বটে, রাগ করতে পাবে না বলে দিচ্চি।

আমার চিঠি দিতে না হয় দেরি হয়েচে, তুমি তো চিঠি দিলে পারতে? কেন দিলে না? যদি মরে যেতাম? কি করে জানলে আমার খুব অসুখ হয় নি? শুধু আমার দোষ দিলেই বুঝি চলবে? আমি তোমাকে চিনি না এমন সব ব্যবহার করি? বোলো না ও কথা, কল্যাণী। অমন বল্লে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

আমার কবিতা তোমাদের ভাল লেগেচে, ষোড়শীবাবুর ভাল লেগেচে জেনে খুব আনন্দ পেলাম। আজ ওটা বারবেলায় পড়া হয়েচে। আমার গল্প পড়ার কথা ছিল, কিন্তু গল্পটার আধখানা এখনও বাকি বলে পড়লাম না। ভাবচি, সামনের শনিবারে ঘাটশিলা যাবো, সেখানে 'সুবর্ণ' সঙ্ঘের অধিবেশনে গল্পটা পড়বো।

নিশ্চয়ই যাবো তোমার জন্মদিনে। তোমাদের সাদর নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারি, কল্যাণী? এই অল্প দিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েচে—এখন মনে হয় যেন কতদিন থেকে (যেন) তোমাকে জানতাম; বেণুকে জানতাম, মায়াকে জানতাম, ষোড়শীবাবুকে জানতাম। কি জানি কেন এমন হয়!

আমার বইখানা (মরণের ডঙ্কা বাজে) তোমাদের ভাল লেগেচে, এতে সত্যিই আনন্দ পেলাম। তোমাদের সমজদারিত্ব আছে, তোমাদের ভাল লাগলে অনেকেরই ভাল লাগবে এ আমার ধারণা।

তোমার উপর রাগ করেছিই তো। ঠিক কাজ করেছি। উচিত ছিল না তোমার একখানা চিঠি দেওয়া? কত আশা করে থাকতাম প্রতিদিন তা যদি জানতে? আমি মরে যাই নি কি করে জানলে? হায়রে! আমি মরে গেলে কারই বা কি!

বেণু রাগ করলো তাকে খোকাখুকির দলে ফেলেচি বলে! হাসি পেল কথাটা পড়ে। সে খোকাখুকির দলে না তো কি? আচ্ছা যাক্ এখন থেকে ওকে সে দলে ফেলবো না। বেণু কেমন আছে? বেণু! হয়েচে তো? বেণুর ওপর আমি রাগ করেচি কে বললে? ও ছেলেমানুষ, সব বলতে পারে, তুমি বিশ্বাস কোরো না সে কথা।

পরশু ঘাটশিলায় যাবো, সোমবার ছুটি আছে, মঙ্গলবার সকালে আসতেই হবে, থাকবার উপায় কি স্কুল কামাই করে? তুমি বেশ লোক, অমনি বলে দিলে তোমার কথা শুনিয়ে?

তোমার কোন্ কথা কবে না শুনিচি! বেলু সাক্ষী আছে। তোমার জন্মদিনে একটা গল্প পড়বার ইচ্ছে রইল। সেদিন কি সম্ভব লাতভেয়েগুলা যাবার—হবে না বোধ হয়। আগের দিন যদি হয় দেখা যাবে।

আমার কেবল ভয় হয় বনগাঁ থেকে তোমরা চলে যাও, তবে কি দুঃখই পাবো! এমন বন্ধুত্ব চলে যাবে ভাবলে মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

অল্প লইয়া থাকি তাই

মোর যাহা যায় তাহা যায়—

মানুষের জীবনে যে ক'দিন আনন্দ করা যায়, আমি এই বুঝি। এই সম্বন্ধে গ্রীক কবি হিপোলিটাসের একটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ আছে—"**The apple tree, the singing and the gold.**" কবিতার একটি অতি বিখ্যাত ছত্র এটি।

যদি সম্ভব হয় এবার তোমাকে ছুটি ভূতের গল্প শোনাবো। মনে করে দিও। তবে ভয় পেলে চলবে না কিন্তু। ভয়টয় আমি দেখতে পারি নে। অন্য দেশে মেয়েরা যুদ্ধে যাচ্ছে আর আমাদের মেয়েরা ভূতের ভয়ে রাত্রে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারবে না, এ কি ভাল কথা?

রাত হয়েছে অনেক। আজ এই পর্যান্ত। তোমার জন্মদিনের আগের শনিবারে আবার দেখা হবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও ও বেলুকে এবং খোকাখুকিদের দিও। বেলু কেমন আছে? বেলু বড় ভাল মেয়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

ভাদ্র

মঙ্গলবার

১০।৯।৪০

কল্যাণীয়াসু,

আমিও ভেবেছিলুম আজ তোমার পত্র আসবে। বেশ চমৎকার পত্র, তোমার প্রকৃতি বর্ণনা আমার এত ভাল লাগে! এবার যে 'পড়চে' ক্রিয়াপদের ব্যবহার এত কম? কেন? সংশোধন করে দিয়েছিলাম বলে রাগ করো নি তো?

ভয়ঙ্কর লেখার ভিড় পড়ে গিয়েচে। এই সপ্তাহের মধ্যে লেখা না দিলে আর কোন কাগজ নেবে না। এবার পুজোর কাগজগুলো একটু তাড়াতাড়িই বেরুবে। তোমার নীলোৎপল গল্পটা আমার বেশ ভাল লেগেচে, ওটা 'পত্রিকা' কাগজে দেবো। সম্পাদক আবার এখানে আমার লেখার তাগাদায় আসবে, যদিও আমি বলেচি আমি এবার দিতে পারব না—তোমার লেখাটা দেবো।

তোমার বুনো শটী-ফুলের গল্প বেশ লাগলো। সামান্য ঘটনা গুছিয়ে লিখবার গুণেই পড়তে ভাল লাগে এমন! বেশ ভাবুক মন কিন্তু তোমার, সময়ে সময়ে ভাবি, এত অল্প বয়সে এমন ভাবুক মন কোথায় পেলে?

আমার যখন তোমার বয়েস (সে যুগের কথা অবিশ্যি), তখন বনগাঁয়ের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ি, বারাকপুর ছেড়ে এসে মায়ের জন্যে বাবার জন্যে বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্যে মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয়, পথের পাঁচালীর উৎপত্তি।

চিরকাল বারাকপুর ভালবাসি। কেউ নেই সেখানে আপনার বলতে, তবুও যে যাই সেখানেই, সে শুধু বারাকপুরের প্রকৃতির টানে, কি জানি কি দিয়ে আমার মন বেঁধেছে ওখানকার পল্লী-প্রকৃতি! যদি সম্ভব হয় একদিন পুজোর ছুটিতে তোমাদের ওখানে যাবো নিয়ে। আমার মনে হয় তোমারও ভাল লাগবে।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার। গোয়ালিয়রে পুজার পূর্ণিমা থেকে ভারতবর্ষের কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে—রাজদরবার থেকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েচে বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্যিকের উপস্থিতি প্রার্থনা করে। তার মধ্যে আছে সজনী দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, মণীন্দ্রলাল বসু ও আমি। ১২ অক্টোবর তারিখে আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে ওরা সবাই এখান থেকে যাবে, ১৫ দিন সেখানে থাকতে হবে, সাহিত্যিকদের থাকবার জন্য রাজদরবার থেকে খুব ভাল বন্দোবস্ত করবে এবং মোটরে ও-অঞ্চলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখাবে। সজনীবাবুর বিশেষ অনুরোধ আমি যেন যাই, কাল সজনীবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিল, সবাই বললে, একসঙ্গে বেশ আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যাবে। তা ছাড়া যাতায়াতের খরচ স্টেট থেকে দেবে স্থির হয়েচে। সজনীর নামে ওরা টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আচ্ছা, এখন কি করি আমি? যদি ১২ই অক্টোবর গোয়ালিয়র যাই দিল্লী এক্সপ্রেসে—তাহলে যেখানেই থাকি, ১১ তারিখে অর্থাৎ ৺পুজোর পরে একাদশীর দিন আমায় কলকাতায় আসতে হয়। ১৫ দিন গোয়ালিয়র কাটালে ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেখানে থাকতে হয়, কলকাতায় এসে পৌঁছুতে আরও দুদিন—অক্টোবর মাস শেষ হয়ে গেল। ছুটির বাকি রইল আর মোটে দশ দিন। এর মধ্যে কবে বা যাই চাটগাঁ, কবে বা থাকি বারাকপুর কবে বা যাই বনগাঁ।

এবাদে ঘাটশিলাতেও যেতে হয় তাহলে ২রা বা ৩রা অক্টোবর—থাকা হয় মোটে ৭ দিন। এই সব বিবেচনা করে দেখে এখনও বুঝতে পারচিনে কি করা উচিত। ভীষণ মুশকিলে পড়ে গিয়েচি, কল্যাণী।

তারপর ধরো যাওয়া নিজের ইচ্ছাতে, কিন্তু আসা পরের ইচ্ছায়। যদি সেখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখে সঙ্গীরা বলে বসেন একেবারে পুজোর ছুটিটা কাটিয়েই যাওয়া

থাক, তবে তো আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসতে পারবো না, সুতরাং ছুটির গোটা দিনগুলো গোয়ালিয়রেই কাটিয়ে আসতে বাধ্য।

হয়ে গেল ব্যারাকপুর, হয়ে গেল বনগাঁ, হয়ে গেল চাটগাঁ।

তোমার কি মত কল্যাণী ? আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে এখনও। মন এদিকেও টানচে, ওদিকেও টানচে।

যদি কোনো কারণে গোয়ালিয়র না যাওয়া হয়, তবে আমার আগের ভ্রমণতালিকা অনুসারেই কাজ করা যাবে। একটা বড় বাধা এই দাঁড়াবে যা বুঝচি, একখানা উপন্যাসের Contract হবার কথা হচ্চে, মিত্র ও ঘোষ কোম্পানী প্রকাশকের সঙ্গে। তা যদি হয়, তবে যাওয়া হবে না, কারণ হৈ হৈ করে ছুটিটা কাটিয়ে দিয়ে নিরিবিলি লিখবার সময় পাবো না।

আগের লাইনটা লিখবার পরে আমার ঘরটার নীচে রেডিওতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতার আবৃত্তি করলে—সেই য়েটা আমি একদিন বনগাঁয়ের পুরনো বাসায় করেছিলুম, 'অত চুপি চুপি কেন কথা কও'···সেইটি—মনে আছে ? এতক্ষণ চিঠি লেখা বন্ধ করে আবৃত্তি শুনছিলাম, বেশ করলে। দু' এক জায়গায় বেশ ভাল লাগলো—তবে বড্ড চিৎকার করতে হয় ওটাতে, ভাল দম রাখতে না পারলে ওটা ভাল করে আবৃত্তি করা যায় না। পরিশ্রমের কাজ ওটা আবৃত্তি করা। নৃপেনের যেন দু'জায়গায় দম রইল না—তাই আবার খুব নীচু স্বরে আরম্ভ করলে। আমি ছুটির সময় ওটা আবৃত্তি করে শোনাব এখন।

'চাঁদের পাহাড়' ভাল লেগেচে মায়ের, খুব আনন্দের কথা। বেশ, ও-ধরনের adventure আরও লিখবো—আমারও ইচ্ছে রয়েচে লিখবার। তুমি তো আগেই পড়েছিলে, না ? কি রকম লেগেচে লিখো। তোমাকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কিন্তু এবার বনগাঁয়ে ছুটির সময়। কেমন ?

হায়, হায়, এবার পুজোর ছুটিটা মাঠে মারা গেল !

তবে ঘাটশিলা আমরা কিন্তু যাবোই। যে ক'দিনের জন্যেই হোক, বা যখনই হোক। মুশকিল হোল বেচারী রেণু-মায়ের। হয়তো সে মিথ্যেই অপেক্ষা করে থাকবে, সেখানে যাওয়া ঘটবে না। নিজের অনিচ্ছাতেও যে কত লোকের মনে কষ্ট দিই ! এতে পাপ হয় কল্যাণী ? তোমার কি মত ? আচ্ছা তোমার চিঠিতে 'পুজোর ছুটিতে যে আপনি—' এই পর্য্যন্ত লিখে বলেচ 'যাক সে বলবো না'—ও কথার মানে কি ? সত্যি, কিছু বুঝতে পারি নি। পুজোর ছুটিতে আমি কি করব বলেছিলুম ? বলবে না কল্যাণী ? আমি বুঝি রাগ করতে জানিনে—না ? আমার ভারি কষ্ট হয়েচে ও কথা কেন লিখেচ—'আমার মত সামান্য মেয়ে কি জন্য আপনাকে তার কথা জানাবে' ইত্যাদি। কি কথা, বল তো ? কিছুই বুঝলাম না। কি করবো বলেছিলুম বলো তো ? লক্ষীটি, না যদি বলো, রাগ করবোই।

বুধবারে চিঠির উত্তর চাইলে কি হবে, ওবেলা তোমার চিঠি পেলুম তখন স্কুলে বেরিয়েচি, স্কুল থেকে এসে উত্তর লিখলুম—কাল বেরুবে এখান থেকে, পরশু বৃহস্পতিবার সকালে পাবে। অতএব রাগ করো না। বেলু কেমন আছে ? বেশ মেয়ে বেলু। তাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ

দিও এবং বালক-বালিকাদেরও জানিও। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

৪১, মির্জ্জাপুর স্ট্রীট

৩রা আশ্বিন '৪৭ সাল, বৃহস্পতিবার

কল্যাণীয়াসু,

আজই ওবেলা তোমার পত্র পেলুম এবং তোমার শরীর ভাল আছে জেনে আনন্দ হোল। তোমার রাগের আমি মূল্য দিইনে, কল্যাণী? তোমার রাগের ভয়ে কতবার যা তুমি বলেচ তাই শুনেচি। তবে সেদিন ওই ব্যাপারটা ছিল তাই তোমার সাগ্রহ আহ্বানের সম্মান রাখতে পারি নি, সেজন্য কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু। কিছু মনে আসে যদিও, স্নেহভরে উপেক্ষা করো।

সেদিন ওরা মানপত্রের সঙ্গে এই যে চিঠির কাগজে তোমায় লিখচি, এরকম তিনশো কাগজের প্যাড বাঁধিয়ে দিয়েচে—নাম ছাপানো সুদ্ধ। আর দিয়েছে একটা পার্কার **vacumatic** পেন, একটা রুপোর সিগারেট কেস। এ ছাড়া অনেক ফুল, মালা, ফুলের তোড়া ইত্যাদি। অনেক লোক এসেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেছিল। গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ-পাঠ, কবিতা-পাঠ হয়েছিল। যখন জিনিসগুলো নিয়ে, বিশেষতঃ ফুলগুলো নিয়ে মেসে ফিরলুম, তখন তোমার কথা এত মনে হচ্ছিল! তুমি থাকলে ফুলগুলো দিয়ে দিতুম, জিনিসগুলো দেখাতুম, মায়াকে সভায় আনবো ভেবেছিলুম—কিন্তু তারাশঙ্কর আর একটা কোথাকার সভা সেরে কখন আসবে তার স্থিরতা ছিল না বলে মায়াকে আনা হয় নি—বিশেষ করে বেলা ২॥০ টার সময় বৌবাজারে আমায় 'কৃষ্টিকলা সাহিত্য সমিতি'তে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। মায়াকে আনার সময়ই পাওয়া গেল না।

ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটে নি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেচি মাত্র, কিন্তু তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি—কেউ দেখায় নি। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তোমার ভাল লাগবে বলে তোমার ফরমাশ মত তো ধূমকেতু উঠতে পারে না। এখনও ৪৫ বছর দেরি আছে আবার সেটা ফিরে আসতে। ততদিন অপেক্ষা কর।

এখন তোমার বয়েস ১৫ তো? ১৫+৪৫=৬০ বছর যখন তোমার বয়েস হবে, তখন যদি ধূমকেতু দেখতে পাও—আমার কথা তোমার মনে হবে কি তখন? আমি তখন মরে ভূত হয়ে যাবো। তুমি তখন বৃদ্ধা, নাতিপুতি-বেষ্টিতা হয়ে গল্প করবে বসে সন্ধ্যাবেলায়। নাতনীকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—ওই ছাখ রেখা, হ্যালির ধূমকেতু উঠেচে—বিভূতিবাবু বলে একজন লোক আমার ছেলেবেলায় আমায় বলেছিল, এ ধূমকেতু আমি দেখবো। আজ বিভূতিবাবুর কথা তাই মনে পড়চে।

রেখা বলবে—কে বিভূতিবাবু ঠাকুরমা?

তুমি বলবে—ওই আমাদের সেকেলে একজন লেখক ছিল, বেশ বইটই লিখতো—

রেখা ভবিষ্যৎ যুগের মেয়ে তো—তাই ছোট বোন শিখার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে বলবে—ঠাকুরমার যেমন কথা তাই! কোথাকার কে বিভূতিবাবু, সে নাকি আবার বই লিখতো! আমাদের নবজীবনবাবু কি প্রদীপবাবুর মত লেখক কোন কালে বাংলা দেশ্‌ দেখেচে? ঠাকুরমার সব সেকেলে ঢং—তারপরে দুইবোনে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

মৃত্যুলোকের পার থেকে হয় তো সস্নেহ দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ যুগের নবীনা বালিকা দুটির দিকে চেয়ে ভাববো—একদিন ওদের ঠাকুরমা ওইরকম বালিকা ছিল, ওদের মতই। তার নাম কল্যাণী—কিন্তু নাতনীরা হয়তো সে নাম জানে না। বুড়ী ঠাকুমার নাম জানবার জন্যে তাদের তত আগ্রহ নেই, নিজেদের প্রসাধন নিয়েই ব্যস্ত। তরুণ মাত্রেই স্বার্থপর কিনা—নিজেদের কথা ছাড়া অপরের কথা ভাববার অবকাশ বা স্পৃহা ওদের বড় একটা থাকে না।

জ্যোৎস্নার কথা তুমি লিখেচ, আমার ভাই লিখেছে ঘাটশিলার মাঠ বন জ্যোৎস্নালোকে অদ্ভুত হয়েছে দেখতে, সেবা লিখেচে শিলং-এ এবারে নাকি অদ্ভুত জ্যোৎস্না। গত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না নিশ্চয় খুব অদ্ভুত না হলে তিন জায়গা থেকে তিনজনে লেখে নি—কিন্তু হায়! আমি জ্যোৎস্নার এতটুকু দেখি নি। আকাশের চাঁদ দেখেচি হয় তো, ভেবেচি—আজ দেখচি চাঁদ বেশ বড়, বোধ হয় একাদশী কি চতুর্দ্দশী তিথি হবে—এই পর্য্যন্ত। সে চাঁদের জ্যোৎস্না মাটির পৃথিবীতে পড়তে দেখি নি—বেচারী চাঁদের সাধ্য কি বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম সুসভ্য শহর কলিকাতার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যূহ ভেদ করে তার আলো পাঠাতে সাহস করে সেখানে?

আমি তোমার জন্মভূমিকে ভালবাসি কিনা জিগ্যেস করেছ—নিশ্চয়ই বাসবো। তোমার যখন জন্মভূমি তখন সে আমার শ্রদ্ধার পাত্রী নিশ্চয়ই। তবে চোখে না দেখলে তো ভালবাসা যায় না, একদিন সুতরাং দেখার আগ্রহ রইলো। ফটো নিশ্চয়ই পাবে। আমার মনে আছে—তবে এই সময়টা বড় ব্যস্ত আছি বলে পরিমলকে দিয়ে ফটো তুলবার অবসর পাচ্ছিনে। পূজার সময় ঠিক পাবে।

আচ্ছা, আমার ভ্রমণ তালিকা বনগাঁয়ে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে। তোমাদের মানে তুমি আর বেলু, আর অবিশ্যি মায়া যদি ওখানে সে সময় থাকে। তবে চাটগাঁ যেতেই হবে যদি গোয়ালিয়র যাওয়া না ঘটে—রেণু আবার একখানা চিঠি দিয়েচে, চাটগাঁয়ে যেতেই হবে নইলে সে নাকি রাগ করবে। এ মাসের প্রবাসীতে আমার 'সুলোচনার কাহিনী' গল্পটা বেরিয়েচে। ওখানে 'প্রবাসী' পাও তো পড়ে দেখো—নয় তো আমি নিয়ে যাবো এখন। সেদিনকার সেই প্লটটা নিয়ে 'বাক্সবদল' নাম দিয়ে গল্পটা লিখেচি—কার্ত্তিক মাসের শারদীয়া সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে বেরুবে। মায়ার সেই বাক্সবদলের কথা—মনে আছে তো?

আশা করি কুশলে আছো। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও—বেলু ও অন্যান্য বালক-বালিকাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার জন্ত ভালো কাঁচের চুড়ি নিয়ে যাবো। হাতের মাপ দরকার হবে মাপ সুতো দিয়ে হাতের মাপ পাঠালে কেমন হয় ? এসব কারবার কখনো করি নি, জানা নেই বোটেই। তাই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য কোরো লক্ষীটি।

তুমি অমন কেন লিখেচো 'অনেক অপরাধ করেচি, ক্ষমা করুন'। এতে মনে ভারি কষ্ট পাই, কল্যাণী—অমন লিখো না।

৫

প্যারাডাইজ লজ
৪১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১৬ই আশ্বিন, ৪৭ সাল

কল্যাণীয়াসু,

এসে অবধি মন সত্যিই বড় উতলা হয়ে রয়েচে, কল্যাণী। এবার যেন কিছু ভাল লাগচে না। ঘাটশিলা যাইনি, কাজ এখনও মেটাতে পারি নি, আগামী কাল (বুধবার) সকালে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে নিশ্চয় যাবো। তুমি সঙ্গে থাকলে কি ভালোই লাগতো ! আমি চলে এলুম, সেই যে তুমি, মায়া, বেলু জানালায় দাঁড়িয়ে রইলে সেই কথাই মনে হচ্ছে। তুমি যে অত ভোরে উঠে এলে, আমায় অনুরোধ করলে থাকবার জন্যে, সেই ছবিই কেবল মনে হচ্চে।

আজ মহালয়ার ছুটি ছিল, কিন্তু আমার এখানে সকাল থেকেই কেবল লোকের ভিড়। একদল যায়, আর একদল আসে। বিরক্ত হয়ে বেলা সাড়ে নটার সময় বেরিয়ে পড়লুম। সজনীর ওখানে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড আড্ডা বসেছে সেখানে—তারাশঙ্কর, ব্রজেনদা, সীতারু শান্তি পাল, সমুদ্ধ, সজনী, নির্ম্মলদা, শৈলজানন্দ, বিভূতি মুখুয্যে, ডাঃ সুশীল দে (ঢাকা ইউনিভার্সিটির খুব বড় একজন অধ্যাপক, লণ্ডনের ডি-লিট) প্রভৃতি উপস্থিত। রীতিমত সাহিত্যিক আড্ডা। ওরা সবাই কেউ পুরী যাচ্চে, কেউ নাগপুর যাচ্চে, ডাঃ দে বোম্বে যাচ্চেন, সজনী ও তারাশঙ্কর গোয়ালিয়র যাচ্চে (সেই গোয়ালিয়র)—আমায় সজনী বললে—আপনি গেলে বেশ আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যেতো—কিন্তু আপনি রাঁচীতে সভাপতিত্ব নিয়ে আমাদের আমোদ মাটি করে দিলেন, নইলে আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতাম।

ভালোই হয়েচে গোয়ালিয়র যাই নি, তাহলে তো তোমাদের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে আর দেখাই হোত না। ও আমার ভালো লাগে না হৈ হৈ করে বেড়ানো, চির জীবনটাই তো হৈ হৈ করেই কাটিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করে নিভৃত নিরিবিলি কোথাও দুদিন বিশ্রাম করি, অলস শরতের দুপুরে দূরশ্রুত ঘুঘুর উদাস কণ্ঠের সঙ্গীত শুনে জীবনস্বপ্নে বিভোর থাকি, জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে শুয়ে বিরাট তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আপন মনে কত কথা ভাবি— . .

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি
সাধ যায় দিবানিশি অনিমেষে চেয়ে থাকি।
নিঝুম নীরবে সেথা কি যেন চোখের 'পরে
উজল জ্যোছনা সম নিরত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কায়া,
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা ?

তবে এ সব সাধই। সাধ হলে কি হবে, তা হবার নয় তাও জানি। জীবনের জটিল কর্মভার থেকে আমার মুক্তি নেই কোনোদিন।

চিঠি দিলাম এই লোভে, বৃহস্পতিবার পেয়ে যদি শুক্রবারে উত্তর দাও—তবে আমি রবিবারে পাবো। চিঠি দিও, ভারি আনন্দ পাবো তা হোলে, পূজোর ষষ্ঠীর দিন তোমার চিঠি পাই যদি। কেমন তো ?

অনেক রাত হয়েছে। এখুনি চিঠি ডাকে দেবো—নইলে কাল সকালে তাড়াতাড়িতে সময় হবে না।

আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও, ও বেলু, খোকা ও অন্যান্য বালক-বালিকাদের জানিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

(নীচের পত্রটি শ্বশ্রূমাতা ৺ সাধনা দেবীকে লিখিত)

ডাকমোহর ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৫ ইং
বারাকপুর—৭ই জানুয়ারী।

৬

শ্রীচরণেষু—

মা,

কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। সেখান হইতে আগ্রা যাওয়া ঘটে নাই, তবে আসিবার পথে এলাহবাদ ও মোগলসরাই হইয়া আসি। আমাদের রিজার্ভ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় দিল্লী মেলে হাওড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোন কষ্ট হয় নাই। তবে পশ্চিমাঞ্চলের দুরন্ত শীত সহ্য করিতে হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেরি হইল, তাই আমরা যাইতে পারিলাম না। ২রা জানুয়ারী স্কুল খুলিয়াছে। সরস্বতী পূজার সময় ঘাটশিলা যাইব, ধলভূমগড়ে সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করিতে হইবে। যত শীঘ্র হয় আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে যাইব ইচ্ছা আছে। আপনার শরীর কেমন আছে ? কল্যাণী ও উমা ভালো আছে। বৌমা গত শনিবার ঘাটশিলায় গেলেন। তুটু লইয়া গিয়াছে। মায়াদিদি কোথায় ও কেমন আছে ? বেলু তুলুকেও বহুদিন দেখি নাই। খোকা আশা করি পড়াশুনা করিতেছে। শ্বশুর

মহাশয়কে আমার সভক্তি প্রণাম জানাইবেন ও আপনি গ্রহণ করিবেন। আমতা এমন স্থান যে সেখানে ইচ্ছা করিলেও যখন তখন যাইবার কোন উপায় নাই। নতুবা এই এক বৎসর সেখানে যাই নাই! বনগ্রাম বা ঝাড়গ্রামে কতবার যাইতাম। আমতা যাওয়া অপেক্ষা কাশী যাওয়া সহজ। ছোটখুকি কেমন আছে? সে কি আজকাল কথাবার্তা বলিতে শিখিয়াছে? আশা করি সে আমায় দেখিয়া আর ভয় পাইবে না।

লক্ষ্ণৌ শহরটি সুদৃশ্য ও সুন্দর। হজরতগঞ্জ বাদশাবাগ প্রভৃতি স্থান কলিকাতার চৌরঙ্গির মত দেখিতে। লক্ষ্ণৌর Zoo দেখিবার মত জিনিস। বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক অরণ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে রাখা হইয়াছে। জিনিসপত্রও খুব সস্তা। আমিনাবাদের বিখ্যাত রাবড়ি ১৲ সের। কানপুরে গঙ্গার ধার জ্যোৎস্না-রাত্রে পরম রমণীয় হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একটা বেডকভার কিনিয়াছি ৭৲ টাকা দামে—কলিকাতায় সে জিনিসই পাওয়া যাইবে না। পাইলেও দাম ১৬৲ টাকার কম নয়। মাংস ॥৵০ সের, মাছ ৮৶০/১৲ টাকায় বড় রুই মাছ। ,

পত্রোত্তরে কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন। বালক-বালিকাদের আশীর্ব্বাদ দেবেন।

ইতি--

প্রণত—

বিভূতি

(নীচের দুইখানি পত্র শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে লিখিত)

৭

বারাকপুর (যশোর)

মঙ্গলবার,

জুলাই, ১৯৩৭

প্রিয় গজেনবাবু,

গত রবিবারে যাওয়ার ঠিক ছিল, কিন্তু সকালের সংবাদপত্র দেখে শ্বশুরমশায় বারণ করলেন, কে বললে লোকাল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মেও ছোরা মেরেচে কে কাকে। আপনার বৌদিদিও বারণ করলেন। না যাওয়ার জন্তে দুঃখিত। আমি একা বারাকপুরের বাড়ীতে ভাল লাগচে না। পাড়ার লোক রান্না করে দিচ্চে। সে বিষয়ে এখানকার লোক ভালো। এখানকার বন-শোভা আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়--আর ইচ্ছামতীর কালো স্বচ্ছ জলধারা। ষ্টিভেনসন বাস করেছিলেন সামোয়া দ্বীপের নির্জ্জন অরণ্যে ৩০০ বিঘে জমি কিনে। সেখানে তাঁর কাঠের বারান্দা থেকে দেখতেন কত রকমের ফার্ণ। গাছের ডালের মধ্যে গজিয়েচে কত রকমের রঙীন ফুলে ভরা অর্কিড, বাতাসে ভেসে আসতো বন্য লেবুর গন্ধ, বন্য ফ্র্যাংগিপিনি ফুলের গন্ধ, বনটিয়ার কাকলি—যাকে বলে লেখকের পক্ষে ideal জীবন ideal পরিবেশ।

সেদিন ব্যারাকপুরে একটা পুকুরে নাইতে নেমেছি, তার চারিধার খোলা ইট বার-করা ভাঙা পাইখানা, আর তাদের উপরে উঠেচে কি লতা—দেখে এত খারাপ লাগলো—আমার মন সংকুচিত হয়ে যায় কুশ্রী পরিবেশে ; মন হাঁপিয়ে ওঠে। মন বলে কোথা মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী ?

আমি বোধ হয় পূর্ব্বে জন্মেছিলাম ঐ রকম উষ্ণ কটিবন্ধের অরণ্য প্রদেশে, একটি ম্যাকাও পাখী হয়ে। মানুষের বাস যেখানে ঘিঞ্জি, সেখানে আদৌ মন টেকে না কি জানি। **I am most happy when I am in a lonely primeaval forest.**

বড়দা

৮

রামগড়
(হাজারিবাগ)
২৩।৭।৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

বর্ষার প্রভাত। কাল সারারাত্রি বৃষ্টি হওয়ার ফলে অদূরবর্ত্তী দামোদর স্ফীত হয়ে উঠেছে। নীল শৈলমালার গায়ে গায়ে সাদা মেঘ খেলা করচে। আমি একটি অতি নির্জ্জন বাংলো ঘরে বসে শৈলমালার দিকে চেয়ে চেয়ে গল্প লিখছি, আপনি কি বিশ্বাস করবেন ? কাল সকালে কিংবা ওবেলা মোটরে রাজরোপ্পা falls দেখতে যাব—দামোদর ও ভেড়া নদীর সঙ্গমস্থান। সত্যি, বর্ষার কি রূপ এদেশে, শৈলসানুতে অলস মেঘ ঘুমিয়ে আছে সারাদিন, কালো আকাশের ছায়া পড়েচে উন্মুক্ত উচ্চাবচ প্রান্তরে, সজল বাতাস বইচে শালবনের ফাঁক দিয়ে, দামোদরের পাষাণময় তটভূমি বেয়ে বেয়ে। আর কি ফুল-ফোটা কুরচি বন নদীর দুই বনময় তীরভূমিতে ! একবার বৌমাকে এখানে আনতে হবে এই বর্ষায় ! বাবলুসুদ্ধ মাকে, বৌমাকে, মৃদুলা বৌমা ও স্বরূপা বৌমাকে। একটা পার্টি তৈরি করে। মিঃ সিংহ এখানে নেই, রাঁচিতে। আমি আছি নগেন্দ্রনাথ দাস বলে পুনসিয়া গ্রামের এক মৌজাদারের আশ্রয়ে। খাওয়ার বড় সুখ, মাংস ও দুধ ঘি প্রচুর সস্তা। মুরগী বিশেষতঃ।

গৌরীশঙ্করকে বলবেন, শরৎ পালের গল্প complete, আরও ৬টি complete, বসুমতী ১০০৲ টাকা পাঠাতে চেয়েচে। তার গল্প এখানে বসে লিখবো। এখান থেকে ডালটনগঞ্জ হয়ে গয়া যাবো। হাজারিবাগ যেতে পারি। আজ রাজরোপ্পা falls. কাল চুটুপালু ও চাতরা *forest*—এই ঠিক করেছি।

আপনি, সুরথ, গৌরীশঙ্কর ও মন্তু প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

বৌমাকে বলবেন এই জায়গায় এসে দেখা দরকার।

ইতি—

বড়দা

(নীচের নয়খানি পত্র শ্রীমতী বাণী রায়কে লিখিত)

১

বারাকপুর,
২৯-৯-৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে আপনি যে কবিতা পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে মস্ত একটা ভবিষ্যদ্বাণী রয়েচে—এবং আমার মনে হয় স্বয়ং আমি ছাড়া এ ভবিষ্যদ্বাণী আপনিই করলেন। অর্থাৎ সেটি হচ্ছে এই যে 'আজি হতে শতবর্ষ পরেও' আমার বই লোকে পড়বে।

মস্ত কথা সন্দেহ নেই। আপনাকে এজন্য অগণিত ধন্যবাদ। অবশ্য আমার ও সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই, আমি 'পথের পাঁচালী' লিখবার সঙ্গে সঙ্গে এবং তার পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আমার বন্ধু নীরদ চৌধুরীকে এ কথা লিখি। কিন্তু আমার বই সম্বন্ধে আমি তো বলবোই—নিজের ঢাক, নিজে না বাজালে বর্ত্তমানকালে আর কে বাজাবে বলুন। সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে না এই একমাত্র যা গলদ। না করুক গে, আমি যা বলবার বলবোই। আর বললেন আপনি। খুব আনন্দের কথা বলেছেন। প্রীতির চক্ষে দেখেন বলেই এত বড় কথা আপনি বলতে পেরেছেন। এজন্যে আবার ধন্যবাদ দেবো। তবে বার বার ধন্যবাদ আপনি হয়তো আবার পছন্দ করবেন না।

আমি কলকাতায় অনেকদিন যাইনি এ কথা সত্যি নয়। কিন্তু সময়ের অভাবে আর সুইনহো ষ্ট্রীটের বাসায় মামাশ্বশুরেরা অনেকদিন না থাকাতে আমি দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলেই যাইনি—কেবল গিয়েছিলাম গত রবিবারে। গিয়েই দেখি ট্রাম বন্ধ, নীরদবাবুর বৈঠকখানায় আমি, সুবর্ণ দেবী, আমার বড় শালী মায়াদি সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত গল্প করলাম। টেলিফোন নেই আপনাদের জানি, কাজেই টেলিফোন করবার চেষ্টাও করিনি।

৪ঠা অক্টোবর কল্যাণীদের নিয়ে কলকাতা যাবো বেলা এগারোটা আন্দাজ সময় এবং ওদের ওখানে রেখে ছুটো খেয়েই বেরিয়ে পড়বো সজনীর ওখানে। ওর ওখানে একটা বিশেষ কাজের কথা বলে দিয়েছে বনফুল (বলাই)—আমি ওইদিন সন্ধ্যা ৭টায় লুপ এক্সপ্রেসে ভাগলপুর রওনা হচ্চি ওখানকার সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করতে। আমি আপনাকে টেলিফোন করবো ওইদিন—কিন্তু আপনি বোধ হয় থাকবেন না, দেশে যাবেন বোধ হয়। যা হোক, টেলিফোন করে দেখবো। দেশে গিয়ে ঘাটশিলার ঠিকানায় একখানা চিঠি দেবেন—গৌরীকুঞ্জ, ঘাটশিলা। নীরদবাবুরা মহালয়ার দিন ঘাটশিলায় যাচ্ছেন। আমি ভাগলপুর থেকে ৭ই ফিরে এসে আবার ছ'দিন স্কুল করবো, ১০ই আমার ছুটি হবে, ওদিনই বম্বে মেলে কিংবা রাঁচী প্যাসেঞ্জারে ঘাটশিলা রওনা হবো।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার দাদামশায় কেমন আছেন ?

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—আমার জন্মদিনের উৎসবে আপনি নিমন্ত্রণ পত্র পাননি শুনে কত দুঃখিত যে হয়েছি! আমি আমার সব বন্ধুদের ঠিকানা দিয়েছিলাম যাঁরা এ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেছিলেন, তাঁদের কাছে। এখন দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তাঁদের খেয়ালখুশি মত কাউকে জানিয়েছেন, কাউকে জানান নি।

১০

P. O. Gopalnagar
Village. Barrakpur
Dt. Jessore.
বুধবার।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সেদিনকার কথামত আমি প্রবোধ সান্ন্যালকে বলেছিলাম, কিন্তু সে রাজী নয়। সে বল্লে, কি একটা ফিল্ম্ সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে সে। এখন কোনো কাজ পারবে না। এই কথাটি জানিয়ে দেবার জন্যে আজ দুদিন থেকে আপনাকে চিঠি লিখবো ভাবচি, কিন্তু বড় ব্যস্ত ছিলাম একটা লেখা নিয়ে। আপনি কি করবেন, না করবেন আমাকে জানাবেন। তারাশঙ্করকে কি বলালেন সজনী দাসকে দিয়ে। আমি কাল কুচবিহার যাচ্ছি, ফিরতে সোমবার।

সেদিন আপনাদের ওখান থেকে বেরিয়ে কবির রোডে সোমনাথবাবুর বাড়ী খুঁজতে গিয়ে কি মুশকিল। খুঁজে খুঁজে তো পাওয়াই গেল না, তারপর রাস্তা ভুলে গোলকধাঁধায় পড়ে কোথায় গিয়ে যে ঠেলে উঠলাম, হঠাৎ দেখি লেক আমার সামনে—সে আবার লেকের উল্টো দিক, সেদিকে কখনো আমি যাইনি, তখন একটা লোকের সাহায্যে অতি কষ্টে সে গোলকধাঁধা পার হই। অনিলবাবুকে বলবেন যদি সময় হয় যেন সোমনাথবাবুকে এই কথাটা তিনি বলেন।

চিঠি দেবেন কিন্তু। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

বারাকপুর
১২-৭-৪৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এখানে এসে ক'দিন পড়ে ছিল, আমি অন্যত্র সভা উপলক্ষে গিয়েছিলাম, এখানে ছিলাম না। আমি মামাদিকে অনেকদিন আগেই এ সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করে পত্র

দিয়েছি তো, মায়াদি আপনাকে জানাননি কেন বুঝলাম না। আমাকে যে পার্ট দেবেন, তাই নেবো জানবেন। কবে কলকাতায় যেতে হবে জানাবেন। এখানে খুব বর্ষা নেমেছে। প্রচুর বকুলফুল ও শিউলিফুল ফুটচে। শীঘ্রই একবার কলকাতা যাবো এবং আপনার সঙ্গে দেখা করবো—কিন্তু পত্র ঠিক (কিন্তু) দেবেন আপনি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২

ঘাটশিলা
২২-৯-৪৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন ও মাকে এবং আপনার বাবাকে জানাবেন।

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা করা হয়নি। দাঙ্গার পরেই আপনাদের কুশল সংবাদ চেয়ে নীরজাবাবু (মাখন)কে পত্র দিই। তিনি আপনাদের বোধহয় সে চিঠি দেখিয়েছিলেনও। কিন্তু আপনি তো ঠিকানা জানতেন, কোনো চিঠি দিলেন না কেন? দেওয়া উচিত ছিল। আমি ঠিকানা ভুলে গিয়েছিলুম বলেই চিঠি দিতে পারিনি। ঘাটশিলাতে কল্যাণীরা আছে। আমি কাল চাইবাসা থেকে রাতের ট্রেনে ফিরেচি। ওদিকে অরণ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। সারাণ্ডা ও কোল্হান অঞ্চলের বিস্তৃত বনভূমি কয়েকদিন ধরে দেখে বেড়িয়েচি। সে সৌন্দর্য্য দেখবার জিনিস। বনকুসুমের সুগন্ধ যে এত সুন্দর হতে পারে এবং তা যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমানভাবে বনের বাতাসে বর্ত্তমান থাকে—এ অভিজ্ঞতা এইসব হেমন্তের শান্ত দিনে বনে বনে না বেড়ালে বোঝা যেতো না। বন্যহস্তীর বৃংহিত শুনেছি গভীর রাত্রে ডাকবাংলোয় লোহার খাটে শুয়ে। জ্যোৎস্নায় উচ্চ বনস্পতির শাখায় বন্যকুক্কুটকে উড়ে এসে বসতে দেখেছি। এখন তো বন্যঝর্ণার ধারে ধারে দেবকাঞ্চন ও পিটুনিয়া ফুলের শোভা সর্ব্বত্র।

আশা করি ভালো আছেন। কালীপূজোর পরে স্কুল খুলবে। ২৬শে দেশে ফিরবো এখান থেকে। সেখানে পত্র দেবেন। দাঙ্গার পরে দু'বার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সজনীর বাড়ীতেও একদিন যাই—কিন্তু যেদিন গিয়েচি, সেদিনই চলে আসতাম।

ভাল আছি। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩

ডাকমোহর ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৩
Gopalnagar P. O. মঙ্গলবার

সুচরিতাসু

আমি ৮।১০ দিন হোল দেশে ফিরেছি। আপনার চিঠি পেলে খুশী হই। গত শনিবার কলকাতা গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেও সময় পেলাম না। আগামী রবিবার বেলা ৪॥টার সময়ে আপনি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর বাড়ীতে আসুন না কেন। আমি ওখানে বনভ্রমণ সম্বন্ধে গল্প করবো। অমিয়বাবু শুনতে কৌতূহলী। তিনিই বিশেষ অনুরোধ করেছেন ঐদিন ওখানে ওই সম্বন্ধে কিছু বলতে। রবিবার বেলা ৩টায় সময় আমার ট্রেন কলকাতায় পৌছবে। আমি কানুমামার সঙ্গে দেখা করে ওখানে সোজা চলে যাবো।

'বুড়ো হাজরা কথা কয়' গল্পটা আপনার ভালো লেগেছে শুনে আনন্দ পেলাম।

আপনার কি কোনো গল্প ওতে আছে? বইখানা হস্তগত হয়নি এখনো।

আপনি জন্মদিনে টেলিগ্রাম করেছিলেন সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সে সংবাদ আপনার চিঠিতেই জানলুম। এমন কোনো টেলিগ্রাম আমার হস্তগত হয়নি। আজকাল ডাক বিভাগের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা আপনার অবিদিত নেই। গত বিজয়া দশমীর দিন কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি আমি পেয়েছি আজ তিন দিন আগে। কোথায় ঘোরাঘুরি করতে হয়নি চিঠিখানাকে। কলকাতা থেকে গোপালনগর ডাকঘরে পৌছতেই দেড় মাস।

কল্যাণী ভাল আছে। আপনার মা ও বাবাকে আমার নমস্কার জানাবেন। আশাকরি ওঁরা ভাল আছেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

ব্যারাকপুর
৫-১-৪৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এখানে এসে পড়ে ছিল। কেউ ছিল না। আমি কল্যাণী ও উমাকে এখান থেকে নিয়ে কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে বোনাইসড় স্টেটের অরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণে গিয়েছিলুম। ৭।৮ দিন ঘন বনের মধ্যে ডাকবাংলোতে বাস করেছি। কত যে পাখীর ডাক পাহাড়ের বনে বনে, বেশীর ভাগই অজানা পাখী। ও দেশের পাখীর সুর আমি চিনিনে, কেবল চিনলাম বনটিয়া আর ধনেশ পাখীর ডাক। আর কি ঘন বন। চারিদিকে

অরণ্যাবৃত লৌহ প্রস্তরের পর্ব্বতমালা ; রাত্রে বাংলোর নিচেকার উপত্যকায় বন্যহস্তীর বৃংহিতধ্বনি প্রতি রাত্রেই শোনা যায়, বাংলোটা পাহাড়ের ওপরে সেখান থেকে নেমে একটা অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে একটা লতাদোলানো বটগাছের তলায় শিলাসনে বসে সারা দুপুর লিখতুম, বই পড়তুম—আবার শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ হোলেই সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতুম, কোনো বন্য জন্তু আসচে কিনা দেখতে। হাতীর ভয় সে বনে সবচেয়ে বেশি। বাঘ আছে তবে তারা বেরোয় না দিনমানে। হাতী কিন্তু দিন রাত মানে না। ওখানে চুপ করে বসে থেকে দেখেছি একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, প্রকৃতি যেন এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীর শৈলশিখরে, লৌহপ্রস্তর দিয়ে বাঁধানো বন্য ঝর্ণার কূলে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে সে মহাকাব্যের দু-একটা পংক্তি পড়তে পারা যায়। চোখ বুজে পড়তে হয় সে কাব্য।

অমিয়বাবুর বাড়ী না যাওয়াতে খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। খুব আশা করেছিলুম আপনি যাবেন। মায়াদিদি বারাকপুরেই আছেন। কল্যাণীর খুব জ্বর হোল যেদিন ওখান থেকে এখানে আসবো সেদিন। ওকে এখানে আনলুম না, এখানে দেখাশোনার লোক নেই। বাপের বাড়ীতে আছে, সেখানে অনেক লোক। ওর জন্তে মন খারাপ রয়েচে। পারেন তো ওখানে চিঠি দেবেন—C/o. S. K. Chatterjee. মহামায়া কুটির, স্টেশন রোড, বারাকপুর, জেলা ২৪-পরগণা। মায়াদিও সেখানেই আছে। 'কথাশিল্প', বইখানি এতদিন আমাকে পাঠায় নি। বড়দিনের ছুটির পূর্ব্বে বইখানা ওরা পাঠিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাইনি, কারণ বাংলা বইয়ের অনেক শত্রু। ইংরিজি বই ঘরেও ছোঁয় না। আপনার চিঠি পড়বার পরে 'কথাশিল্প' খোঁজ করে 'ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী' পড়লুম। চমৎকার, Complex রচনাশৈলী। Composite শ্রেণীর যেমন ফুল আছে তেমনি এ গল্পও। সাদামাঠা শ্রেণীর নয়। সাধারণ পাঠকের জন্তে নয়। তারা এ বুঝতেও পারবে না। বিদগ্ধ মন দরকার হবে এ গল্পের রসগ্রহণ করতে। আমার খুব ভাল লাগলো। ওদের লিখে পাঠাতেই হবে আমাকে।

আপনার সঙ্গে দেখা করবো, কল্যাণীর অসুখ সেরে গেলে বাড়ী এসে কলকাতা যাবো, তখন। বাড়ী কেউ নেই। উমাকে এনেচি, তাকে একলা রেখে কোথাও যেতে পারিনে।

আমি দোলসংখ্যা আনন্দবাজারের জন্তে একটা বড় গল্প লিখছি। ভ্রমণকাহিনী হিসেবেও একটা লেখা একটা কাগজে চেয়েচে। দুটোই লিখবো।

প্রীতি শুভেচ্ছা নিন। আপনার মাকে নমস্কার জানাবেন। পূর্ণবাবু কেমন আছেন?

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫

ব্যারাকপুর

শুক্রবার,

ডাকঘোহর ৬ঠা মার্চ, ১৯৪৭

সুচরিতাসু,

জানেন, আমাদের উত্তর মাঠে একটা মস্ত বড় প্রাচীন শিমূল গাছ আছে—ওর নাম কেন যে 'মরিসন সাহেবের শিমূল গাছ' তা জানি নে, সম্ভবত পুরনো দিনের নীলকুঠীর কোনো সাহেবের নামের সঙ্গে কি ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল গাছটা। সকালবেলার প্রথম (রোদ) পড়লে গাছটার কাছে গিয়ে দেখতে হয়—স্তবকে স্তবকে রাঙা ফুলগুলি ফুটে কি অপরূপ শোভা ধরেচে গাছটি। আধ বিঘে জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়া, ঘুঘু, ছাতারে, শালিক, আরো কত কি পাখী এসে বসে তার আঁকা-বাঁকা ডালে ডালে, নীল আকাশের তলায় এক পরম বিস্ময়ের মত মনে হচ্ছে ওকে। যেন কোন মহাশিল্পীর হাতের অপূর্ব শিল্প। কাল কলকাতা থেকে মোটরে ছবি আঁকিয়ে সুনীলমাধব সেনগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী এবং আর একটি বৌ আমার বাড়িতে এসেছিলেন—তাঁদের নিয়ে গেলাম 'মরিসন সাহেবের শিমূল গাছ' দেখাতে। সুনীলবাবু তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন—দুতিন দিনের মধ্যে আমি রং তুলি পট নিয়ে আবার আসবো, এই গাছের ছবি আঁকতে। বৌ দুটি তো গাছতলায় ঘাসের ওপর বসে পড়ল, কতক্ষণ আমরা সবাই বসে রইলাম সেখানে। আর এত বনবিহঙ্গের কাকলী কি গাছটা জুড়ে! কারো কথা প্রায় শোনা যায় না। আপনার কথা তখনি মনে হোল, ভাবলাম আপনি দেখলে খুশী হবেন। আমি আর্টিস্টকে বল্লাম—ছবি যদি আঁকেন তবে যত শীগগির আসতে পারেন ততই ভালো। শিমূল ফুলের আয়ু বেশী দিন নয়।

কলকাতায় যাই, কিন্তু ট্রামধর্মঘটের জন্যে দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। শেয়ালদার কাছে কাছে বই-এর দোকান ঘুরে চলে আসি। কল্যাণীর চিকেন পক্স হয়েচে। সে বাপের বাড়ি আছে। আমি শ্রীহট্ট-প্রগতি-লেখক-সংঘের একটা অধিবেশনে যাচ্চি সামনের সপ্তাহে। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো, ততদিনে ট্রাম বোধহয় চলবে। বাসে ওঠা আমার কর্ম নয়। এঞ্জিনের ওপর পর্য্যন্ত লোক বসে, বাসে ওঠার চেয়ে যে কোনো দুহাজার ফুট উঁচু পাহাড় আরোহণ করতে আমি রাজী আছি।

ভাল আছি। আশা করি আপনাদের সব কুশল। আপনার বাবা ও মাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

বারাকপুর
৫ই বৈশাখ, ১৩৫৩।

সুচরিতাষু

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার চিঠি কাল পুরী থেকে ফিরে এসে পেয়েছি। কটকে গিয়েছিলাম নববর্ষের বিশেষ উৎসবে সভাপতিত্ব করতে, সেখান থেকে একদিনের জন্যে পুরী গিয়েছিলাম। টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের পেছনে সমুদ্রকূলের ঝাউবনে সমস্ত সময়টা একা বসে নীল সমুদ্রের ঢেউ গুণেছি। ভারি চমৎকার কেটেছিল দিনটা।

সেদিন বেলা আড়াইটের সময় ইন্‌স্পেক্টর আপিসেই শুনলাম হাঙ্গামা বেধে গিয়েছে। বাস বন্ধ হয়ে গেল। বালিগঞ্জ স্টেশনে এলাম আলিপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে। অনেক লোকই বালিগঞ্জ দিয়ে চলেছে—কাজেই ভিড় খুব বেশী। কলকাতার কয়েক জায়গা পরশুও বেড়িয়েছি, তবে ভয়ে ভয়ে। কলকাতার জীবনযাত্রা দুর্বিবহ হয়ে উঠলো।

সুরেশবাবুকে বইয়ের কথা বলেছিলেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমি কলকাতা গেলে আপনার বই সম্বন্ধে দেখবো কি? গজেনকে বলবো। Signet Press-এ কিছু লিখেছিলেন?···বাবুর ব্যবহার আদৌ ভাল না।

এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা আছে। কলকাতায় গেলেই আপনার ওখানে যাবার ইচ্ছা রইল।

এবার ট্রাম খুলেছে: যাওয়ার অসুবিধা দূর হয়েছে খানিকটা।

কল্যাণী এখানেই আছে এবং এখন ভালোই আছে। গরমের ছুটিতে পুরী যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, দেখি কতদূর কি হয়।

আপনার মা ও বাবাকে আমার নববর্ষের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

ডাকযোগে ১২ই মে, ১৯৪৭
বারাকপুর—রবিবার

সুচরিতাষু,

ক'দিন কি ভীষণ গরম পড়েছিল। কাল রাত্রে গরমে ঘুম আসছিল না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি, এমন সময় হঠাৎ ঘন কালো কালবৈশাখীর মেঘ উঠলো ঈশান কোণে, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে এল ভীষণ ঝড়, তারপরে বৃষ্টি। রাত তখন ১২টার কম নয়। পুরো দু'ঘণ্টা চললো ঝড়বৃষ্টি, কত গাছ ভেঙে গেল, কত খড়ের চালা উড়ে গেল—সেই

মধ্যে আমাদের বাড়ীর উঠোনের পেপে গাছের মাথাটাও। কোথায় গেল অমন গরম, শীত করতে লাগলো। রাত যখন দুটো, তখন দুটি মেয়ে এসে বললে, চলুন কাকা আর ঘুমুতে যাই। বাড়ীর পেছনে ঘন বন ও বাঁশবাগান, বরোজপোতার ডোবার একযোগে বোধ হয় হাজার ব্যাঙ ডাকচে, তখন গেলাম আলো নিয়ে ওদের সঙ্গে আর ঘুমুতে। ফলে হোল এই যে, আজ সকালের ট্রেনে গাঙরাগাছি রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করতে যাবার কথা ছিল, ঘুমও ভাঙলো না—ট্রেন ধরাও হোল না।

কলকাতার অবস্থা নাকি একটু শান্ত। সামনের সপ্তাহে গরমের ছুটি হবে। ২২শে মে রেডিওতে কিছু বলতে হবে। ঐ সময় কলকাতায় গিয়ে দু'তিন দিন থাকবো। সেসময় নিশ্চয় দেখা করবো।

না, ওরা বই পাঠায় নি। অনেক কথা বলবার ও শুনবার আছে ওদের সম্বন্ধে।

আশা করি কুশলে আছেন। এবার 'গল্পভারতী'তে আপনার 'কিউ' গল্পটা ভালো হয়েচে।

আপনার মাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন।

আপনি আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।